ময়ূরপঙ্খী

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রূপকথা সংগ্রহ

ময়ূরপঙ্খী

সম্পাদনা

তপনকুমার দাস

এডুকেশন ফোরাম

স্টল-৪১, ভবানী দত্ত লেন, কলেজ স্ট্রীট, কলি-৭৩

MAYURPANKHI

A Collection of eminent Fairy Tales, Edited by Tapan Kumar Das, Published by Education Forum, Calcutta-73,

প্রচ্ছদ ঃ সুব্রত চৌধুরী

অলংকরণ ঃ অবি সরকার

এডুকেশন ফোরাম, স্টল-৪১, ভবানী দত্ত লেন (কলেজ স্ট্রীট), কলকাতা-৭০০ ০৭৩ থেকে আজিজুল হক কর্তৃক প্রকাশিত। অক্ষরবিন্যাস : এল. টি. এম গ্রাফিক্স, বারুইপুর। মুদ্রক : শ্রীকান্ত প্রেস, ৭৫ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

ISBN-81-87657-16-2

শ্রীসুভাষ রঞ্জন ঠাকুর,

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

কথানুক্রম

পক্ষিরাজ আর হীরেমন

রেভারেন্ড লালবিহারী দে

এক ছিল ব্যাধ, তার পাখি ধরা ব্যবসা। তার ছিল এক বৌ। একদিন বৌ তাকে বলল, "যত পাখি তোমার ফাঁদে পড়ে, তুমি সব বেচে দাও বলে, আমাদের অবস্থা ভালো হয় না। দুটো-একটাকে যদি আমরা খেতাম, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের উন্নতি হত। আমি বলি আজ তুমি যত পাখি ধরবে, তার একটাকেও বেচবে না। সব বাড়ি নিয়ে আসবে, আমরা রেঁধে খাব।"

ব্যাধ স্ত্রীর কথায় রাজি হয়ে বেরোল পাখি ধরতে। সেদিন বৌয়ের সঙ্গে চুন মাখানো ডাণ্ডা নিয়ে বনে বনে ঘুরে একটি পাখিও পেল না। যখন সন্ধে নেমেছে, তখনও পর্যন্ত কিছু পায়নি তারা, কিন্তু তারপর যখন বাড়ি ফেরার কথা ভাবছে এমন সময়, ফাঁদে একটা সুন্দর হীরেমন পাখি পড়ল।

ব্যাধের বৌ পাখিটি হাতে নিয়ে বলল, "হ্যাঁ গো, এতটুকু পাখি মেরে কি লাভ? ওর কতটুকুই বা মাংস।"

অমনি হীরেমন পাখি বলল, "মাগো, আমাকে মেরো না। রাজার কাছে নিয়ে যাও, তিনি অনেক টাকা দিয়ে আমাকে কিনবেন।"

পাখির মুখে এরকম কথা শুনে ব্যাধ আর তার বৌ অবাক হয়ে গেল। তবু তারা পাখিকে জিজ্ঞাসা করল, "রাজার কাছে কত টাকা দাম চাইব?" হীরেমন বলল, "সেসব তোমাদের ভাবতে হবে না। রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে বল আমাকে বেচতে এনেছ। কত দাম চান জিজ্ঞাসা করলে বলবে 'পাখি নিজের দাম নিজেই বলবে।' আমি তখন বুঝে শুনে একটা ভালো দাম বলব।"

তার কথামতো ব্যাধ পরদিনই রাজবাড়িতে গিয়ে বলল, "এই পাখিটা বিক্রি করতে এনেছি।" পাখির চেহারা আর রঙ দেখে রাজাতো মুগ্ধ। জিজ্ঞাসা করলেন, "কত দাম চাও বল।"

ব্যাধ বলল, "মহারাজ, পাখি নিজেই নিজের দাম বলবে।"

মহারাজ বলল, "পাখি কথা বলে নাকি?" ব্যাধ বলল, "তা বলে, মহারাজ। ওকেই ওর দাম জিজ্ঞাসা করুন।"

হীরেমন বলল,

"আমার দাম দশ হাজার টাকা। মহারাজ দামটা কিছু বেশি মনে করবেন না। ব্যাধকে টাকাটা গুণে দিয়ে দিন। আমি আপনার পরম উপকারে লাগব এটা আমি নিশ্চিত করে বলছি।"

রাজা অবাক হয়ে বললেন,

"হীরেমন তুমি আবার আমার কি উপকার করবে?"

পাখি বলল, "মহারাজ সময় হলেই দেখবেন।"

হীরেমনকে জ্ঞানী মানুষের মতো—কথা বলতে দেখে, অবাক হয়ে রাজা পাখিটা নিয়ে খাজাঞ্চি মশাইকে নির্দেশ দিলেন, "দশ হাজার টাকা দিয়ে দাও ব্যাধকে।"

রাজার ছয় রানী ছিল। কিন্তু পাখি নিয়ে তিনি এমনি ডুবে গেলেন যে তাঁদের কথা আর তাঁর খেয়ালই রইল না। রানীদের সঙ্গে সময় না কাটিয়ে রাতদিন তিনি পাখি নিয়ে মেতে রইলেন। হীরেমন শুধু যে সব প্রশ্নের জ্ঞানীর মতো উত্তর দিত তাই নয়, তার উপর তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম-গান শোনাতো, সে গান শুনলেও পুণ্য হয়।

রাজা রানীদের দিকে আর ফিরেও তাকান না বলে পাখির ওপর তাঁদের খুব হিংসে। তাঁরা স্থির করলেন পাখিটাকে মেরে ফেলবেন। কিন্তু রাজা

তাকে সবসময় চোখে চোখে রাখেন, তাই পাখি মারার সুযোগ পাওয়া শক্ত।

একদিন রাজা মৃগয়ায় যাবেন, দুদিন দু-রাত প্রাসাদে থাকবেন না। রাণীরা ভাবলেন এমন সুযোগ ছাড়া হবে না। এইবার পাখিটাকে শেষ করতে হবে।

তাঁরা নিজেদেরকে বললেন, "চল, পাখিটাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, ওর মতে আমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে বাজে দেখতে। ও যার নাম করবে, সে-ই ওর ঘাড় মটকাবে।"

এই ঠিক করে রানীরা দল বেঁধে যে ঘরে পাখি ছিল, সেই ঘরে গেলেন। কিন্তু তাঁরা কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই এমন মধুর সুরে পাখি দেবতাদের নাম-গান করতে লাগল যে রানীদের মন নরম হয়ে গেল। তাঁরা পাখি না মেরেই ঘর থেকে চলে এলেন।

পরদিন কিন্তু আবার তাঁদের কুবুদ্ধি ফিরে এল। আগের দিনের বোকার মতো কাজের জন্য তাঁরা নিজেদের বারবার দোষ দিতে লাগলেন। আবার তাঁরা ঠিক করলেন আর দয়াটয়া নয়, আজ মন শক্ত করে পাখিটাকে মারতে হবে।

আবাব তাঁরা দল বেঁধে হীরেমনের ঘরে গিয়ে বললেন, "হীরেমন, লোকে বলে তুমি ভারি বুদ্ধিমান পাখি। বল দেখি আমাদের মধ্যে কে সব চাইতে সুন্দর আর কে সবচাইতে কদাকার?"

পাখি আগে থেকেই রানীদের কুবুদ্ধির কথা আন্দাজ করতে পেরেছিল। সে বলল, "রানীমারা, ঠিকমতো বিচার করতে হলে, পায়ে শেকল বেঁধে বিচার করা যায় না। আপনাদের সকলের মাথা থেকে পা পর্যন্ত, চারিদিক থেকে দেখে, তবে বলতে পারব। সত্যিই যদি আমার মত জানতে চান, তাহলে আমার পায়ের শেকল খুলে দিন।"

রানীরা ভাবলেন, ছাড়লেই যদি পাখি উড়ে পালায়! তাই তাঁরা আরেকবার ভেবে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে, হীরেমনকে ছেড়ে দিলেন। চারদিকে তাকিয়ে হীরেমন দেখল ঘরে একটা জল যাবার নালা আছে, তার ভিতর দিয়ে বেরোনো যায়।

রানীরা পাখিকে ছেড়ে দিয়ে প্রশ্নটা বারকয়েক বলবার পর হীরেমন

বলল,

"রানীমারা, আপনারা হাজার সুন্দরী হলেও, সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যে কন্যা থাকেন, তাঁর বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলের পাশে দাঁড়াবার যোগ্য নন।"

পাখিকে তাঁদের অসামান্য রূপ নিয়ে এমন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলতে শুনে, ছয়রানী রেগেমেগে পাখিকে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবার জন্য তেড়ে এলেন। কিন্তু তাঁরা ওকে ধরার আগেই হীরেমন সেই জল যাবার নালার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে আশ্রয় নিল কাছাকাছি এক কাঠুরের বাড়িতে।

পরদিন মৃগয়া থেকে ফিরে রাজা দেখলেন দাঁড়ের ওপর পাখি নেই। দুঃখে তিনি পাগলের মতো হয়ে গেলেন। রানীদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন, "আমরা তো কেউ পাখি-টাখি দেখিনি।"

পাখিকে রাজা খুবই ভালবেসে ফেলেছিলেন, তাই দিনরাত তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। মন্ত্রীরা ভাবলেন এভাবে কাঁদতে-কাঁদতে হয়ত রাজা সত্যি-সত্যি পাগল হয়ে যাবেন। চব্বিশ ঘণ্টা তিনি কেবলি কাঁদেন আর বলেন, "হায় রে আমার হীরেমন! হায় রে আমার হীরেমন। তুমি কোথায়!"

শেষপর্যন্ত সারা রাজ্যে ঢেঁড়া পিটিয়ে দেওয়া হল, যে রাজার পোষা হীরেমনকে এনে দিতে পারবে,তাকে দশ হাজার টাকা দেওয়া হবে। তাই শুনে কাঠুরে খুব খুশি। ঐ টাকা পেলে আর তার কোনো পেটের চিন্তাই থাকে না! সে পাখিটাকে নিয়ে রাজাকে দিয়ে এল। দশ হাজার টাকা তাকে দেওয়া হল।

হীরেমনকে ফিরে পেয়ে রাজার আনন্দ আর ধরে না। তাকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন, "হীরেমন তুমি কেন চলে গেছিলে, তোমার কি এখানে ভালো লাগে না?"

পাখি তখন তাঁকে সব কথা খুলে বলল। শুনে রাজা রাগে অস্থির হয়ে পড়লেন। তখনি ছয় রানীকে নির্বাসন দিলেন চিরদিনের মতো। আর তাঁদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রইল না।

এর কিছুদিন বাদে রাজা হীরেমনকে জিজ্ঞাসা করলেন,

"ঐ যে তুমি বলেছিলে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে কোন সুন্দরী আছেন, যাঁর পায়ের কাছে রানীরা কেউ দাঁড়াতে পারেন না, সেই মেয়েকে কি একবার দেখা যায় না?"

হীরেমন বলল, "কেন যাবে না মহারাজ। ঐ পরমাসুন্দরী কন্যা যে প্রাসাদে থাকেন, আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি। আর আপনি যদি আমার পরামর্শমতো কাজ করেন, তবে ঐ মেয়ের সঙ্গে আপনার বিবাহও ঠিক করে দিতে পারি।"

রাজা বললেন, "তুমি যেমন বলবে, আমি তেমন কাজ করব! কি করতে হবে বল।"

হীরেমন বলল, "মহারাজ একটা পক্ষিরাজ ঘোড়া লাগবে, পক্ষিরাজ ঘোড়ার পিঠে চড়ে দেখতে-দেখতে আমরা সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে সেই দেশে পৌঁছে, কন্যার প্রাসাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারব।"

রাজা বললেন, "পাখি চল তো, দেখে আসি একবার, আমার অমন বিশাল ঘোড়াশালের শত শত ঘোড়ার মধ্যে একটিও পক্ষিরাজ আছে কিনা।"

রাজা পাখিকে নিয়ে গেলেন ঘোড়াশালে। ভালো করে সব ঘোড়া পরীক্ষা করা হল। হীরেমন অত সব চমৎকার চেহারার তেজি ঘোড়ার দিকে ফিরেও তাকাল না। শেষে একটা ছোটখাটো রোগা ঘোড়া দেখে বলে উঠল,

"মহারাজ এই যে! এই তো আসল পক্ষিরাজ। এই ঘোড়াই দরকার আমাদের। তবে একে ছয় মাস ধরে সবচাইতে সেরা দানাপানি খাইয়ে তৈরি করে নিতে হবে।"

তাই শুনে রাজা সেই রোগা ঘোড়ার জন্য আলাদা আস্তাবলের ব্যবস্থা করলেন। তার জন্য রোজ দেশের সবচাইতে ভালো দানা আসত। দেখতে দেখতে জৌলুস এল ঘোড়ার চেহারায়। ছয় মাস পরে হীরেমন বলল, 'এবার ঘোড়া তৈরি।'

তারপর পাখি বলল, "মহারাজ স্যাকরাকে দিয়ে অনেকগুলো রূপোর খৈ তৈরি করিয়ে নিন, দরকার হবে।"

রাজার স্যাকরা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অনেকগুলো রূপোর খৈ

বানিয়ে দিল। তারপর যাত্রার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেল, এইবার রওনা হতে হবে, এমন সময় রাজাকে হীরেমন বলল,

"মহারাজ আর একটিমাত্র অনুরোধ আছে আমার। যাত্রা শুরু করবার সময় মাত্র একবার ঘোড়াতে বেত মারবেন। তারপর আর নয়। আরেকবার যদি মারেন, তাহলে কিন্তু মাঝপথে ঘোড়া থেমে যাবে। তারপর কন্যাকে নিয়ে ফিরে আসবার সময়ও ঐ একবারই বেত্ত মারবেন ঘোড়াকে। নইলে মাঝপথের বেশি এগোতে পারবো না আমরা!"

হীরেমন আর রূপোর খৈ নিয়ে রাজা চড়লেন ঘোড়ায়। আস্তে একবার ঘোড়ার গায়ে বেত ছোঁয়ালেন। সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্যুতের বেগে ঘোড়া ছুটে চলল শূন্য দিয়ে। তারপর কত দেশ, কত রাজ্য, কত সাম্রাজ্য পার হয়ে, সাত সমুদ্র তেরো নদী ডিঙিয়ে সন্ধ্যাবেলায় ঘোড়া গিয়ে নামল এক অপূর্ব সুন্দর রাজবাড়ির সিং-দরজায়।

সিং-দরজার কাছে এক উঁচু গাছ। তার পাশেই এক আস্তাবল। হীরেমন বলল, "মহারাজ, ঘোড়াটাকে ঐ আস্তাবলে রেখে, আপনি ঐ গাছে উঠে লুকিয়ে থাকুন।"

তারপর খৈয়ের থলেটি নিয়ে, হীরেমন ঠোঁটে করে একটি একটি খৈ নিয়ে ঐ গাছের গোড়া থেকে একেবারে সেই রূপসী কন্যার শয়নমন্দিরের দরজা পর্যন্ত ফেলে এল। তারপর রাজা যে গাছে লুকিয়ে ছিলেন ফিরে এসে বসল সেই গাছের একটা ডালে।

কন্যার দাসী কন্যার ঘরেই শুত। মাঝরাতের কয়েক ঘণ্টা পরে, দাসী একবার বাইরে এল। তার চোখে পড়ল রূপোর খৈগুলি। অমনি দাসী কয়েকটা খৈ কুড়িয়ে নিয়ে, কি জিনিস বুঝতে না পেরে, ঘরে গিয়ে দেখাল কন্যাকে।

এমন সুন্দর রূপোর খৈ দেখে কন্যা খুব খুশি। তিনি ভাবতে লাগলেন কোথা থেকে এল এ খৈ। ভাবতে-ভাবতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, তিনি খৈ কুড়োতে লাগলেন। দেখলেন তাঁর দরজা থেকে আরম্ভ করে খৈয়ের সারি কতদূর চলে গেছে! তখন একটা ছোট্ট টুকরি এনে তাতে খৈ তুলে রাখতে-রাখতে কন্যা গিয়ে পৌঁছলেন একেবারে সেই উঁচু গাছের পায়ের কাছে।

যেই না রূপসী কন্যা গাছতলায় এসে পৌঁছলেন, হীরেমনের পরামর্শ-মতো অমনি রাজা গাছ থেকে নেমে এসে তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে চড়লেন ঘোড়ায়। হীরেমন এসে বসল তাঁর কাঁধে। রাজা ঘোড়ার গায়ে আস্তে একবার বেত ছোঁয়ালেন। অমনি সকলকে পিঠে নিয়ে পক্ষিরাজ বিদ্যুতের বেগে উড়ে চলল আকাশপথে।

এদিকে রাজার ইচ্ছা কন্যাকে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারেন প্রাসাদে পৌঁছে যান। হীরেমনের বারণ ভুলে তিনি ঘোড়ার গায়ে আবার বেত ছোঁয়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া এক ঘন বনের ধারে এসে মাটিতে নামল।

হীরেমন চেঁচিয়ে উঠল, "মহারাজ! এ কি করলেন! ঘোড়াকে একবারের

বেশি দুবার বেত মারবেন না বলেছিলাম না! তবু দুবার মারলেন, মহারাজ, এ কি সর্বনাশ ডেকে আনলেন! এইখানে আমাদের জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করে আছে কি না কে জানে।"

কিন্তু ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে। আর কোনো উপায় ছিল না। পক্ষিরাজের সব শক্তি শেষ হয়ে গেল। ওঁদের আর যাত্রা করবার উপায় রইল না। ঘোড়া থেকে নেমে তাঁরা কোথাও কোনো মানুষের বাসের চিহ্ন দেখতে পেলেন না। তাঁরা সে রাতের ফলমূল খেয়ে মাটিতে শুয়ে ঘুমোলেন।

পরদিন ঐ দেশের রাজা শিকার করতে এলেন ঐ বনে। একটা হরিণের গায়ে তীর মেরে, তিনি তার পিছন-পিছন ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছিলেন। হঠাৎ চেয়ে দেখলেন এক রাজা আর তাঁর সঙ্গে অপরূপ রূপসী এক কন্যা। কন্যার রূপ দেখে তাঁকে প্রাসাদে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা হল সেই রাজার।

অমনি জোর শিস্ দিলেন রাজা, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর চারদিক ঘিরে দাঁড়াল অনুচররা। বন্দী করা হল কন্যাকে, রাজাকে মেরে ফেলা না হলেও, তাঁর দুই চোখ গেলে দেওয়া হল। তারপর তাঁকে ঐ বনে একা ফেলে, ওঁরা চলে গেলেন। একা হলেও ঠিক একা নয় কারণ হীরেমন তাঁর সঙ্গে ছিল।

রূপসী কন্যার সঙ্গে ঐ দেশের রাজা পক্ষিরাজ ঘোড়াটিকেও তাঁর প্রাসাদে নিয়ে গেলেন।

কন্যা রাজাকে বললেন, "আমি একটা ব্রত নিয়েছি, আপনি ছয় মাস আসবেন না আমার কাছে।" কন্যা ছয় মাস সময় নিলেন, কারণ পক্ষিরাজের শক্তি আসতে ছয় মাস সময় লাগে।

কন্যা রোজ পুজো করবেন, তাই রাজা তাঁর জন্য আলাদা বাড়ি ঠিক করে দিলেন। কন্যা সেখানে নিয়ে গেলেন ঘোড়াটিকেও। রোজ ঘোড়াকে ভালো দানা, তাজা ঘাস খাওয়ানো হত। কিন্তু হীরেমনের দেখা না পেলে তো এত করেও কোনো লাভ হবে না। এখন পাখিটার সঙ্গে কি করে দেখা হয়?

হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল। কন্যা তাঁর দাসীদের বললেন, "আমার ব্রতের নিয়ম, পাখিদের খাওয়াতে হবে। আমার বাড়ির ছাদে রোজ ধান, চাল, ডাল, খৈ ছড়িয়ে রাখবি।" দাসীরা তাই করল।

রোজ হাজার-হাজার পাখি এসে ঐ শস্য খেতে লাগল। হীরেমন যদি

আসে, কন্যা সেদিকে লক্ষ রাখলেন।

এদিকে বনের মধ্যে হীরেমনের দুর্দশার শেষ নেই। শুধু নিজের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করলেই চলবে না, অন্ধ রাজাকেও দেখতে হবে। পাখি গাছের ফল পেড়ে আনত, রাজাকে খাওয়াত, নিজেও খেত। এইভাবে দিন কাটত লাগল।

একদিন বনের অন্য পাখিরা হীরেমনকে বলল, "ভাই, তুমি বনের মধ্যে থেকে এত কষ্ট পাও কেন? আমাদের সঙ্গে চল শহরে। সেখানে এক ধার্মিক মহিলা রোজ তাঁর ছাদে পাখিদের জন্য মণ মণ শস্য ছড়িয়ে রাখেন। আমরা তো রোজ সকালে সেখানে যাই, সারাদিন পেট ভরে খেয়ে, আবার সন্ধ্যায় ফিরে আসি।"

তখুনি হীরেমনের মনে হল, সেই কন্যাই নয় তো? হয়তো অন্য উদ্দেশ্যে তিনি শস্য ছড়ান, শুধু পাখিদের সেবার জন্য নয়। তাহলে কালকেই অন্যদের সঙ্গে সেখানে যেতে হবে।

অন্য পাখিদের সঙ্গে ধান খেতে গিয়ে হীরেমন দেখল সে যা ভেবেছিল ঠিক তাই। ইনিই সেই সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের রূপসী কন্যা। কন্যাও ওকে চিনলেন। রাজার দুরবস্থার কথা শুনে কত কাঁদলেন। হীরেমন তাঁর দেখাশুনো করে বলে তাকে খুব আদর করলেন।

তারপর দুজনে পরামর্শে বসলেন, অন্ধ রাজাকে নিয়ে কি করে এ দেশ থেকে পালানো যায়।

কন্যা বললেন, "মহারাজের চোখ আগে সারাতে হবে, হীরেমন। সে কি করে সম্ভব হবে?"

হীরেমন বলল, "কন্যা, সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে তোমার দেশে তোমার বাড়ির সিং-দরজার বাইরে যে বড় গাছে আমরা রাত কাটিয়েছিলাম, তারই মগডালে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর বাসা। তাঁরা কোথাও গেছেন, কিন্তু তাঁদের ছানারা আছে। সেই ছানাদের তাজা বিষ্ঠা রাজার চোখে লাগিয়ে দিলেই তাঁর চোখ ভালো হয়ে যাবে।

তুমি এখানে সাবধানে থাকো। দেখো যেন এসব কথা কেউ জানতে না পারে। আমি একদিন উড়ে গিয়ে, সেই বিষ্ঠা নিয়ে পরদিন আবার ফিরে আসব। তারপর মহারাজাকে নিয়ে দেশে ফেরা খুব শক্ত কাজ হবে না।"

কন্যা হীরেমনকে অনেক আশীর্বাদ করলেন, অনেক আদর করলেন। বললেন, "এই ছয় মাসে পক্ষিরাজও সেরে উঠেছে। তুমি ফিরে এলেই আমরা রওনা হতে পারব।"

পরদিন ভোরে রাজার জন্য দুদিনের ফলমূল রেখে, হীরেমন রওনা হল।

সন্ধ্যাবেলায় সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে সেই গাছের ডালে গিয়ে বসল। সারারাত বিশ্রাম করে, তার পরদিন ভোরে ব্যাঙ্গমার ছানাদের তাজা বিষ্ঠা পাতায় নিয়ে সেই পাতা, ঠোঁটে করে ধরে, আবার হীরেমন রওনা হয়ে গেল।

সন্ধ্যাবেলায়, রাজা যে বনে মনের দুঃখে দিন কাটাচ্ছিলেন, হীরেমন পৌঁছল সেখানে। আকাশ থেকে নেমে রাজাকে বলল,

"মুখ তুলুন মহারাজ, আমি ওষুধ এনেছি।"

সেই ওষুধ দেওয়া হল রাজার চোখে। সঙ্গে-সঙ্গে রাজা তাঁর দৃষ্টি ফিরে পেলেন। চোখ মেলে চেয়েই বললেন,

"কোথায় কন্যা? কোথায় কন্যা?"

হীরেমন বলল, "মহারাজ আপনি প্রস্তুত থাকুন, আমি তাঁকে সব কথা জানিয়ে আসি।"

হীরেমনের মুখে রাজার দৃষ্টি ফিরে পাবার কথা কন্যা যেই শুনলেন, তাঁর বুক ভরে গেল আনন্দে। হীরেমনকে নিয়ে তিনি বাড়ির উঠোনে নেমে এসে চড়লেন পক্ষিরাজ ঘোড়ায়।

আকাশে উড়ল পক্ষিরাজ। তারপর বন থেকে রাজাকে তুলে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁরা নিরাপদে পৌঁছলেন রাজধানীতে। এত বিপদ, এত দুঃখের পর কন্যার সঙ্গে রাজার বিয়ে হল। সাত দিন ধরে দেশের সমস্ত প্রজারা আমোদ-আহ্লাদ করল।

অনেকদিন রাজারানী সুখে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁদের কয়েকটি সুন্দর ছেলেমেয়ে হয়েছিল। আর হীরেমন পাখি সোনার দাঁড়ে বসে দিন রাত দেবতার নামগান শোনাত। আর কখনো তার পায়ে শেকল পরানো হয়নি।

আমার কথাটি ফুরোল,
নটে গাছটি মুড়োল।

চন্দ্রমুখীর সাজা

শিবনাথ শাস্ত্রী

একজন ভদ্রলোক জানোয়ার পুষিতে বড় ভালবাসিতেন, তাঁহার বাড়িতে তিন-চারিটি কুকুর, একটি বানর, দুই-তিনটি খরগোস ও অনেকগুলি বিড়াল ছিল। ভদ্রলোকটির বাড়িতে জায়গা বড় বেশি নয়। একটি ছোট উঠানে তাঁহার পালিত পশুগুলিকে সর্বদাই খেলিতে হইত। সুতরাং তাহারা সকলে একসঙ্গে খেলা করিত। সে বাড়িতে কেহ বেড়াতে আসিলে, আশ্চর্য হইয়া বলিত, বাঃ! বানর বিড়াল খরগোসে একত্রে খেলাটাতো কখনও দেখি নাই।

সকলের বড় কুকুরটি—নাম ভুলো। সে একটি প্রকাণ্ড বিলাতি কুকুর, কিন্তু, বড় ভাল মানুষ। সে বেচারা তাহার সঙ্গীদের অনেক উপদ্রব সহ্য করে। বানরটি তাহাকে কখনও -কখনও ঘোড়া করে তার ঘাড়ে চড়িয়া বসে, কখনও তাহার লেজ ধরিয়া টানে, কখনও তাহার কান মলিয়া দেয়। আবার কখনও বা আদর করে। ভুলো চারি হাত-পা ছড়াইয়া চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া থাকে, আর বানরটি তাহার উকুন বাছিয়া দেয়, তাহাকে উলটিয়া-পালটিয়া পরীক্ষা করে, তাহার তলপেট চুলকাইয়া দেয়, ভুলোর তাহাতে বড় আনন্দ। বানরটির নাম মহাবীর। ভুলো মহাবীরের প্রতি বড় কৃতজ্ঞ।

সে মাঝে-মাঝে ভাল খাবার জিনিস পাইলে নিজে না খাইয়া মুখে করিয়া মহাবীরকে আনিয়া দেয়।

বিড়ালগুলির মধ্যে একজন গিন্নি, অন্যগুলি তার ছেলেমেয়ে। তাহারা সেই বাটীতেই জন্মিয়াছে। মহাবীর তাহাদের সকলকেই কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। ছানাগুলি যতদিন ছোট থাকে, মহাবীর তাহাদিগকে বড় ভালোবাসে। সর্বদাই একটি না একটি ছানা বগলে থাকে। ছানাগুলির এমনি অভ্যাস যে, তাহারা মায়ের বুকে যেমন সুখে ঝোলে, মহাবীরের বগলেও তেমনি আরামে থাকে। মধ্যে-মধ্যে মহাবীরের ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দুধের ঢাকা খুলিয়া ছানাগুলিকে দুধ পান করায়। দুই-একবার এইরূপ ধরা পড়াতে তাহার কোমরের দড়ি প্রায় খুলিয়া দেওয়া হয় না। ছানাগুলি বড় হইলে মহাবীরের আর ততটা ভালোবাসা দেখা যায় না। তখন আর দিনরাত্রি বগলে করিয়া বেড়ায় না কিন্তু তাহাদের সুখ-দুঃখের প্রতি দৃষ্টি থাকে। তাহারা পরস্পর কামড়াকামড়ি করিলে মহাবীর তৎক্ষণাৎ গিয়া বিবাদ ভাঙিয়া দেয়।

খরগোসগুলি পথে-ঘাটে লোহিত কর্ণ-চক্ষু উল্টাইয়া শুইয়া থাকে, বিড়ালের ছানাগুলি তাহাদের লম্বা-লম্বা কান লইয়া খেলা করে। তাহাতে তাহাদের বিরক্তি নাই। বিড়ালদের গিন্নিও কখনো-কখনো আসিয়া খরগোসের গিন্নির কাছে শুইয়া লেজটি নাড়িয়া ছানাগুলিকে খেলা দিয়া থাকেন।

কুকুরদের মধ্যে সকলের ছোট একজন আছে, তাহার নাম 'পেমা'। সে কিছু লোভী। অন্যসময়ে সে বেশ খেলা করে, বেশ লাফায়, বেশ ছোটাছুটি করে। বিড়ালের ছানাদের মুখের কাছে ঘেউ-ঘেউ করিয়া তাহাদের ছোট-ছোট হাতের থাবার প্রহার খাইতে ভালবাসে। মহাবীরের কাঠের ঘরের ছিদ্রের ভিতর মুখের অগ্রভাগ পুরিয়া দিয়া কৌতুক করে। এ-সকল বেশ, কিন্তু আহারের সময় সে আর-এক মূর্তি ধারণ করে। যখন সে ক্ষুধাতে খেঁকি হইয়া থাকে, এবং আহার করিতে আরম্ভ করে তখন তাহার নিকট যায় কাহার সাধ্য। দশ হাতের মধ্যে একটা পায়রা চরিতে আসিলে তাহাকে তাড়া করে। তখন কাহারও নিস্তার নাই, ছোট-বড় জ্ঞান নাই সকলকেই কামড়াইতে যায়। এইজন্য তাহাকে স্বতন্ত্র খাবার দেওয়া হয় এবং তাহার সঙ্গীদের কেহই তাহার নিকট যায় না। বেচারা ভুলো ভাল মানুষ, সে
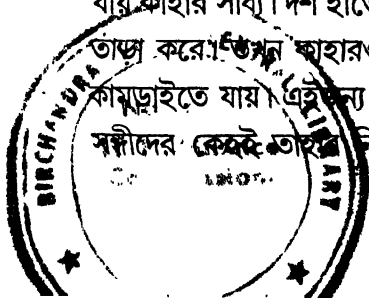
রাক্ষসদের মত তাড়াতাড়ি নাকে-মুখে কতকগুলো গিলিতে পারে না। এইজন্য 'পেমা'র জ্বালায় তাহাকে কখনো-কখনো আধপেটা থাকিতে হয়। কোন-কোন দিন পেমার খাবারে পেট ভরে না, সে তাড়াতাড়ি আপনার খাবার খাইয়া ফেলিয়া ভুলোর পাত্র আক্রমণ করে। ভুলো বেচারা যখন দেখে যে ছোট ভাইটির পেট ভরে নাই, ক্ষুধার্ত হইয়া আসিয়াছে, অমনি মুখটি সরাইয়া লয় ও নিজের খাবার তাহাকে খাইতে দেয়।

এইরূপে কয়জনে সুখে বাস করিতেছে। একদিন কর্তাবাবু একটি সুন্দর বিড়াল আনিলেন। তাহার রূপ অতি চমৎকার। চক্ষুদুটিতে যেন মানিক জ্বলিতেছে, লোমগুলি নরম-নরম। গলাতে পুঁতির মালা, পেটের তলাটি মেজেন্টার দিয়ে রাঙান। দেখিলেই বোধহয় বড় সুখী বিড়াল, যেন ননীর পুতুলটি। ভিতরকার কথা এই, সেটি এক আঁটকুড়ো ঘরের বিড়াল। একটি বিধবা স্ত্রীলোক তাহাকে পুষিয়াছিলেন। তাহার আর কেউ ছিল না; সুতরাং দুধটুকু-সরটুকু ঘরে যখন যাহা হইত সমুদায় 'চন্দ্রমুখী' পাইত। ঐ বিধবা তাহাকে চন্দ্রমুখী বলিয়া ডাকিতেন। চন্দ্রমুখী সর্বদাই লেপ ও বালিশের উপরে শয়ন করিয়া ঘোঁড়-ঘোঁড় করিত। একটি দিনের জন্য কাদাতে পা বৃষ্টিতে ভিজে নাই। বৃষ্টি আসিলে সে লেজটি গুটাইয়া পা দুখানি পাতিয়া ঘরের দ্বারে বসিয়া বৃষ্টি দেখিত ও মাঝে-মাঝে গা, হাত, পা চাটিত, জলের ত্রিসীমানায় যাইত না। চন্দ্রমুখীর রুচিটি নবাবের মত হইয়াছিল। সে ছোটলোকের মত ডাল-ভাত খাইতে পারিত না, কাঁটা নাক দিয়া শুঁকিত না, হয় দুধ, না হয় মাছ দিয়া ভাত খাইত, ভাত মাখিয়া না দিলে তাহা স্পর্শ করিত না। বিধবা নিজে মাছ খাইতেন না, কিন্তু চন্দ্রমুখীর জন্য ভাল-ভাল মাছ কিনিয়া আনিতেন; সুতরাং চন্দ্রমুখী একলা ঘরের একলা মেয়ে সেই সুবাদে মাছ একলাই খাইত। এইরূপে সুখে-স্বচ্ছন্দে চন্দ্রমুখীর দিন যাইতেছিল, হঠাৎ বিধবাটির গুরুতর পীড়া হইয়া মৃত্যু হইল। সুতরাং চন্দ্রমুখী পরের হাতে পড়িল। আমাদের কর্তাবাবুটি বড় জানোয়ার-ভক্ত, সুতরাং ঐ বিড়ালটিকে যত্ন করিয়া বাড়িতে আনিলেন। কিন্তু আনিয়া যেই উঠানে ছাড়িয়া দেলেন, ভাবিলেন ভুলো ও মহাবীরের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবেন, অমনি চন্দ্রমুখী আর-এক মূর্তি ধরিল! ভুলো নিকটে আসিবামাত্র লেজ ফুলাইয়া ও গায়ের লোম খাড়া করিয়া দাঁড়াইল, পেমা

নবাগত বন্ধুর সহিত কৌতুক চলিবে কিনা পরীক্ষা করিবামাত্র তাহাকে থাবা মারিল, এবং অন্য বিড়ালগুলিকে দেখিবামাত্র গর্জন করিয়া বিবাদ আরম্ভ করিল।

গৃহস্বামী দেখিলেন বড় বিপদ, তাঁহার শান্তির সংসারে অশান্তি আসিল। ভাবিলেন সময়ে চন্দ্রমুখী একুট শিখিবে। দুই-চারি দিন তাহাকে দূরে-দূরে রাখিলেন; অনেক যত্ন করিলেন। কিন্তু সে সঙ্গীদের সহিত মিশিতে চাহিল না। পেমা বালক, তাহার অগম্য স্থান বাড়িতে ছিল না। চন্দ্রমুখী কোন কোণে বা বিছানার পার্শ্বে শুইয়া আছে, পেমা সেখানে আসিত, আর চন্দ্রমুখী তাহাকে মারিয়া অপমান করিয়া তাড়াইত। গৃহস্থ মধ্যে-মধ্যে সকলের খেলা দেখিবার জন্য সকলকে ঘরের মধ্যে আনিতেন, তখন চন্দ্রমুখী জানলা দিয়া বাহির হইয়া যাইত এবং বাড়ির মধ্যে একপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিত।

ক্রমে চন্দ্রমুখীর আরও অনেক বিদ্যার প্রকাশ পাইল। একটি খাঁচাতে গৃহস্থের একটি পাখি ছিল, তিনি তাহাকে স্নান করাইয়া মধ্যে-মধ্যে মাটিতে রৌদ্রে বসাইয়া রাখিতেন। চন্দ্রমুখী তাহাকে ধরিবার জন্য খাঁচার উপরে ঝাঁপ দিয়ে পড়িত। গৃহস্থ দেখিয়া বলিতেন—হাঁ তাইতো কোন গুণ নাই, এটি তো বেশ আছে। চন্দ্রমুখীর দ্বিতীয় বিদ্যা চুরি করা। সে দুধের ঢাকা খুলিয়া মধ্যে-মধ্যে চুরি করিয়া দুধ খাইত।

একদিন চন্দ্রমুখীর স্বার্থপরতার প্রতিফল ফলিল। সেই দিন গৃহস্থ খেলা করিবার জন্য ঘরের মধ্যে পশুগুলিকে আনিবামাত্র চন্দ্রমুখী জানালা দিয়া বাহির হইয়া গেল। সেদিন তাহার এত অসহ্য হইল যে, সে এই বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক প্রতিবেশীর বাড়িতে যাইবে মনে করিল। কিন্তু যেই যাইবার জন্য পথে বাহির হইল অমনি তীরের বেগে এক বিলাতি কুকুর আসিয়া একেবারে তাহার ঘাড়ে কামড়াইয়া ধরিল। সে কুকুরটি নিজের প্রভুর সহিত পথ দিয়া যাইতেছিল, সে বড় দুরন্ত। চন্দ্রমুখীর বিপদসূচক আর্তনাদ উঠিবামাত্র ভুলো গৃহের বাহিরে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু আসিয়া যখন দেখিল চন্দ্রমুখীকে বিলাপ করিতেছে, আর যেন তাহার উৎসাহ হইল না। সে নিজে বিলাতি কুকুর, গায়ে যথেষ্ট জোর ছিল, মনে করিলে চন্দ্রমুখীকে শত্রুপক্ষ হইতে উদ্ধার করিতে পারিত, কিন্তু তাহার

মনে সে উৎসাহ আর রহিল না। সে আসিয়া দেখিয়াই দূরে দাঁড়াইয়া রহিল ও আবার বাড়ির মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। গৃহস্বামী চন্দ্রমুখীর আর্তনাদ শুনিতে পান নাই, কেবল ভুলো হঠাৎ ছুটিয়া গেল কেন এই বলিয়া কারণ জানিবার জন্য দ্বারের দিকে যাইতেছিলেন, দেখিলেন, ভুলো ফিরিয়াছে, তখন তিনিও ফিরিলেন। অবশেষে চাকরেরা চন্দ্রমুখীর রক্তাক্ত মৃতদেহ আনিয়া উপস্থিত করিল। গৃহস্থ বড় একটা দুঃখিত হইলেন না, বলিলেন, স্বার্থপর, বিড়ালটা আচ্ছা সাজা পাইয়াছে। চন্দ্রমুখী যে মরিল তাহাতে কাহারও একবিন্দু কষ্ট হইল, এরূপ বোধ হইল না। সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল, —আচ্ছা যে ভুলো পেমাকে বাঁচাইবার জন্য বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াছে, সে আজ কিছু বলিল না কেন? ভুলো মনে-মনে ভাবিল, 'যে আমাকে দেখিতে পারে না, তাহার জন্য মরিব কেন?'

এই তো গেল চন্দ্রমুখীর দশা। ভুলোর মৃত্যুশয্যার ছবি একবার দেখ। কিছুদিন পরে বেচারা ভুলোর কি একপ্রকার পীড়া হইল; আহার করিতে চায় না, সর্বদা বমন করে, যেখানে-সেখানে শুইয়া থাকে; গায়ের লোমগুলি ঝরিয়া যাইতে লাগিল; পোকার কামড়ানিতে সর্বদা মাটিতে গা ঘসিত, বাড়িসুদ্ধ সকলের অসুখ। পেমা আগে বুঝিতে পারে নাই, ভাবিয়াছিল বুঝি সুখ করিয়া শুইয়া আছে। কিন্তু শেষে যখন বুঝিল যে ভুলো পীড়িত, তখন কাছ ছাড়ে না, সর্বদা আসিয়া শুইয়া থাকে। মহাবীর বড় অপ্রসন্ন। গৃহস্বামীর তো কথাই নাই. তিনি স্বয়ং স্বহস্তে সাবান দিয়া ভুলোর গা পরিষ্কার করিয়া দেন; তাঁহার কন্যাগণ পোকা বাছিয়া দেয়; তাঁহার গৃহিণী ভুলোর মুখে চুম্বন করেন, বলেন—'বাপধন তোমার কি হয়েছে? অমন করে পড়ে আছ কেন?' যে সময়ে ভুলোর প্রাণবায়ু দেহকে পরিত্যাগ করিল, তখনকার অবস্থা কি ভাব! সমুদায় পশুগুলি বিষণ্ণ বদনে চারিদিক ঘিরিয়া বসিয়াছে, গৃহস্থের চক্ষে জলধারা বহিতেছে, বাটীতে ছেলেমেয়ে মরিলে বাটীর লোক যেমন কাঁদে তেমনি গৃহস্থের পত্নী ও কন্যাগণ কাঁদিতেছেন। স্বার্থপর চন্দ্রমুখীর মরণে কেহ একটি নিশ্বাসও ফেলে নাই, আজ ভুলোর মৃত্যুতে কত লোকের চক্ষে জল পড়িতেছে।

চন্দ্রমুখী ও ভুলো, এই দুইজনের মধ্যে পাঠক-পাঠিকাগণ কাহাকে অধিক ভালোবাসিলেন জানাইলে সুখী হইব।

রানি কঙ্কাবতী

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

নৌকার সহিত কঙ্কাবতী ডুবিয়া গেলেন। কঙ্কাবতী জলের ভিতর ক্রমেই ডুবিতে লাগিলেন। ক্রমেই নিচে যাইতে লাগিলেন। যাইতে-যাইতে অনেক দূর চলিয়া গেলেন। তখন নদীর যত মাছ একত্র হইল। নদীর ভিতর মহাকোলাহল পড়িয়া গেল যে, 'কঙ্কাবতী আসিতেছেন।' রুই বলে, 'কঙ্কাবতী আসিতেছেন।' পুঁটি বলে, 'কঙ্কাবতী আসিতেছেন।' সবাই বলে, 'কঙ্কাবতী আসিতেছেন।' পথপানে একদৃষ্টে চাহিয়া জলচর জীবজন্তু সব যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, ক্রমে কঙ্কাবতী আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। সকলেই কঙ্কাবতীকে আদর করিল। সকলেই বলিল, 'এসো, এসো, কঙ্কাবতী এসো।'

মাছেদের ছেলেমেয়েরা বলিল, —'আমরা কঙ্কাবতীর সঙ্গে খেলা করিব।'

বৃদ্ধা কাতলা মাছ তাহাদিগকে ধমক দিয়া বলিলেন, —'কঙ্কাবতীর এ খেলা করিবার সময় নয়। বাছার বড় গায়ের জ্বালা দেখিয়া আমি কঙ্কাবতীকে ঘাট হইতে ডাকিয়া আনিলাম। আহা, কত পথ আসিতে হইয়াছে। বাছার আমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে! এসো মা, তুমি আমার কাছে এসো। একটু বিশ্রাম করো, তারপর তোমার একটা বিলি করা যাইবে।'

কঙ্কাবতী আস্তে-আস্তে কাতলা মাছের নিকট গিয়া বসিলেন।

এদিকে কঙ্কাবতী বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, ওদিকে জলচর জীব-জন্তুগণ মহাসমারোহে একটি সভা করিলেন। তপস্বী মাছের দাড়ি আছে দেখিয়া, সকলে তাঁহাকে সভাপতিরূপে বরণ করিলেন। 'কঙ্কাবতীকে লইয়া কী করা যায়,' সভায় এই কথা লইয়া বাদানুবাদ হইতে লাগিল।

অনেক বক্তৃতার পর, চতুর বাটা মাছ প্রস্তাব করিলেন, 'এসো ভাই! কঙ্কাবতীকে আমরা আমাদের রানি করো।'

এই কথাটি সকলের মনোনীত হইল। চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল। জলের ভিতর পথে-ঘাটে ঢ্যাঁটরা পড়িল যে, 'কঙ্কাবতী মাছেদের রানি হইবেন।'

মাছেদের আর আনন্দের পরিসীমা নাই। সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল যে, 'ভাই! কঙ্কাবতী আমাদের রানি হইলে আর আমাদের কোনও ভাবনা থাকিবে না। বড়শি দিয়া আমাদিগকে কেহ গাঁথিলে হাত দিয়া কঙ্কাবতী সুতাটি ছিঁড়িয়া দিবেন। জেলেরা জাল ফেলিলে, ছুরি দিয়া কঙ্কাবতী জালটি কাটিয়া দিবেন। কঙ্কাবতী রানি হইলে আর আমাদের কোনও ভয় থাকিবে না। এসো, এখন সকলে কঙ্কাবতীর কাছে যাই, আর কঙ্কাবতীকে গিয়া বলি যে, 'কঙ্কাবতী, তোমাকে আমাদের রানি হইতে হইবে'।'

এইরূপ পরামর্শ করিয়া মাছেরা কঙ্কাবতীর কাছে যাইল, আর সকলে বলিল, —'কঙ্কাবতী! তোমাকে আমাদের রানি হইতে হইবে।'

কঙ্কাবতী বলিলেন, 'এখন আমি তোমাদের রানি হইতে পারিব না। আমার শরীরে সুখ নাই, আমার মনেও বড় অসুখ। তাই এখন আমি তোমাদের রানি হইতে পারিব না।'

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা কাতলানি মৎস্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা সভা তো করিলে, বক্তৃতা তো অনেক করিলে, বিধিমত কঙ্কাবতীকে 'ভোট' দিয়াছ?'

মাছেরা উত্তর করিল, 'না, কই কঙ্কাবতীকে বিধিমতো ভোট দেওয়া হয় নাই। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি।'

কাতলানি বলিলেন, 'তবে? ভোট না পাইলে কঙ্কাবতী রানি হইবে কেন?'

তখন মাছেরা সব বলিল, 'ওহো! বুঝেছি-বুঝেছি! ভোট না পাইলে

কঙ্কাবতী রানি হইবে না। এসো আমরা সকলে কঙ্কাবতীকে ভোট দিই।'

এই বলিয়া যত মাছ কঙ্কাবতীকে ভোট দিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে তাহারা ভোটের হাঁড়িটা কঙ্কাবতীর সম্মুখে লইয়া গেল। হাঁড়ির মুখে যে ন্যাকড়াখানি বাঁধা ছিল, তাহা খুলিয়া বলিল, —'দেখ-দেখ, কঙ্কাবতী! কত ভোট পাইয়াছ! এখন আর বলিতে পারিবে না যে তোমাদের রানি হব না।'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, 'না গো না! ভোটের জন্য নয়। আমি এখন তোমাদের রানি হইতে পারিব না। আমার যা হইয়াছে, তা আমিই জানি।'

তখন কাতলানি পুনরায় বলিলেন, 'তোমরা রাজপোশাক প্রস্তুত করিয়াছ? রাজপোশাক না পাইলে কঙ্কাবতী তোমাদের রানি হইবে কেন?'

এই কথা শুনিয়া মাছেরা সব বলিল, 'ও হো! বুঝেছি! রাজপোশাক না পাইলে কঙ্কাবতী রানি হইবে না। রাঙা কাপড় চাই, মেমের মতো পোশাক চাই, তবে কঙ্কাবতী রানি হইবে।'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, 'না, গো না! রাঙা কাপড়ের জন্য নয়। সাজিবার গুজিবার সাধ আর আমার নাই। একেলা বসিয়া কেবল কাঁদি, এখন আমার এই সাধ।'

তখন কাতলানি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা রাজা ঠিক করিয়াছ? রাজা না পাইলে কঙ্কাবতী রানি কী করিয়া হয়। তাই একেলা বসিয়া কঙ্কাবতীর কাঁদিতে সাধ হইয়াছে।'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, —'তা নয় গো, তা নয়! আমার রাজায় কাজ নাই। আমি দুঃখিনী কঙ্কাবতী। প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে তোমাদের এই জলের ভিতর আসিয়াছি।'

কাতলানি তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'রাজা চাই না বটে? আর যদি খেতুকে রাজা করি?'

চমকিত হইয়া কঙ্কাবতী কাতলানির মুখপানে চাহিলেন। তিনি ভাবিলেন, —'এই নদীর মাঝখানে, এত গভীর জলের ভিতরেও এ সংবাদ আসিয়াছে।'

কাতলানি তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন আর বলিলেন, —'তোমরা মনে কর, মাছেরা কিছু জানে না, মাছেদের কেবল ধরিয়া খাইতে হয়। শুধু তা নয়, কঙ্কাবতী! শুধু তা নয়। আমরাও কিছু-কিছু সংবাদ

রাখিয়া থাকি। ঘাটে যখন চরিতে যাই, যখন তোমাদের মেয়েতে-মেয়েতে কথা হয়, তখন আমরাও এক-আধটা কথা কান পাতিয়া শুনি। যাও মা। এখন উঠ, গিয়া পোশাক পর, রানি হও, কাঁদিও না।'

বৃদ্ধা কাতলা মাছের প্রবোধ বাক্য শুনিয়া কঙ্কাবতীর মন অনেকটা সুস্থ হইল।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, —'ভাল! না হয় আমি তোমাদের রানি হইলাম। এখন আমাকে করিতে হইবে কী?'

মাছেরা উত্তর করিল, —'করিতে হইবে কী? কেন? দরজির বাড়ি যাইতে হইবে, গায়ের মাপ দিতে হইবে, পোশাক পরিতে হইবে।'

সকলে তখন কাঁকড়াকে বলিলেন, —'কাঁকড়া মহাশয়! আপনি জলেও চলিতে পারেন, স্থলেও চলিতে পারেন। আপনি বুদ্ধিমান লোক। চক্ষুদুটি যখন আপনি পিটপিট করেন, বুদ্ধির আভা তখন তাহার ভিতর চিকচিক করিতে থাকে। কঙ্কাবতীকে সঙ্গে লইয়া আপনি দরজির বাড়ি গমন করুন। ঠিক করিয়া কঙ্কাবতীর গায়ের মাপটি দিবেন, দামি কাপড়ের জামা করিতে বলিবেন। কচ্ছপের পিঠে বোঝাই দিয়া টাকা-মোহর লইয়া যান। যত টাকা লাগে ততো টাকা দিয়া, কঙ্কাবতীর ভাল কাপড় করিয়া দিবেন।'

কাঁকড়া মহাশয় উত্তর করিলেন, —'অবশ্যই আমি যাইব। কঙ্কাবতীর ভাল কাপড় হয়, ইহাতে কার না আহ্লাদ? আমাদের রানিকে ভাল করিয়া না সাজাইলে-গুজাইলে, আমাদেরই অখ্যাতি। তোমরা কচ্ছপের পিঠে টাকা-মোহর বোঝাই দাও, আমি ততক্ষণ ঘর হইতে পোশাকি কাপড় পরিয়া আসি, আর মাথার মাঝে সিঁথি কাটিয়া আমার চুলগুলি বেশ ভাল করিয়া ফিরাইয়া আসি।'

কচ্ছপের পিঠে টাকা-মোহর বোঝাই দেওয়া হইল। ততক্ষণ কাঁকড়া মহাশয় ভাল কাপড় পরিয়া মাথা আঁচড়াইয়া ফিট-ফাট হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কঙ্কাবতী করেন কী? সকলের অনুরোধে তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। কাঁকড়া মহাশয় আগে, কঙ্কাবতী মাঝখানে, কচ্ছপ পশ্চাতে, এইরূপে তিনজনে যাইতে লাগিলেন।

প্রথমে অনেক দূর জলপথে যাইলেন, তাহার পর অনেক দূর স্থলপথে যাইলেন। পাহাড়, পর্বত, বন, জঙ্গল অতিক্রম করিয়া অবশেষে বুড়ো দরজির বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

বুড়ো দরজি চশমা নাকে দিয়া কাঁচি হাতে করিয়া কাপড় সেলাই করিতেছিলেন। দূর পাহাড়পানে চাহিয়া দেখিলেন যে, তিনজন কাহারা আসিতেছে। মনে-মনে ভাবিলেন, —'ও কারা আসে?' নিকটে আসিলে চিনিতে পারিলেন।

তখন বুড়ো দরজি বলিলেন, —'কে ও কাঁকড়া ভায়া?'

কাঁকড়া মহাশয় উত্তর করিলেন, —'হ্যাঁ দাদা! কেমন, ভাল আছ তো?'

দরজি বলিলেন, —'আর ভাই! আমাদের আর ভাল থাকা না থাকা! এখন গেলেই হয়। তোমরা সৌখীন পুরুষ, তোমাদের কথা স্বতন্ত্র। এখন কী মনে করিয়া আসিয়াছ, বল দেখি?'

কাঁকড়া উত্তর করিলেন, —'এই কঙ্কাবতীকে আমরা আমাদের রানি করিয়াছি। কঙ্কাবতীর জন্য ভাল জামা চাই, তাই তোমার নিকট আসিয়াছি।'

দরজি বলিলেন, —'বটে! তা আমার নিকট উত্তম-উত্তম জামা আছে। ভাল পাটনাই খেরোর জামা আছে। টকটকে লাল খেরো, রঙ উঠিতে জানে না, ছিঁড়িতে জানে না, আগাগোড়া আমি বখেয়া দিয়া সেলাই করিয়াছি। তোমাদের রানি কঙ্কাবতী যদি শিমুল তুলা হয়, তো পরাও, অতি উত্তম দেখাইবে। দামের জন্য আটকাইবে না। এখন টিপিয়া দেখ দেখি? কঙ্কাবতী শিমুল তুলা কী না?'

দাড়া দিয়া কাঁকড়া মহাশয় কঙ্কাবতীর গা টিপিয়া-টিপিয়া দেখিলেন। তাহার পর দরজির পানে চাহিয়া বলিলেন, —'কই না। সেরূপ নরম তো নয়।'

দরজি বলিলেন, —'তাই তো! আচ্ছা ফুঁ দিয়া দেখ দেখি?'

কাঁকড়া মহাশয় কঙ্কাবতীর গায়ে ফুঁ দিয়া দেখিলেন। তাহার পর দরজির পানে চাহিয়া পুনরায় বলিলেন, —'কই না। উড়িয়া তো গেল না?'

দরজি বলিলেন—'তাই তো! আচ্ছা! দেখ দেখি, যদি ছোবড়া হয়? ছোবড়া হইলেও কাজ চলিবে।'

কঙ্কাবতী বলিলেন, —'খেরোর খোল পরাইয়া তোমরা আমাকে বালিশ করিবে নাকি? এই সকলে মিলিয়া আমাকে রানি করিলে, তবে আবার বালিশ করিবার পরামর্শ করিতেছ কেন?'

দরজি উত্তর করিলেন, —'ঈশ! মেয়ের যে আস্বা ভারি! বালিশ হবে না তো কী তাকিয়া হইতে চাও নাকি?'

দরজির এইরূপ নিষ্ঠুর বচনে কঙ্কাবতীর মনে বড় দুঃখ হইল, কঙ্কাবতী কাঁদিতে লাগিলেন।

কাঁকড়া মহাশয় বলিলেন, —'তুমি ছেলেমানুষ! আমাদের কথায় কথা কও কেন বল দেখি? যা তোমার পক্ষে ভাল তাই আমরা করিতেছি, চুপ করিয়া দেখ। চুপ কর, কাঁদিতে নাই।'

এইরূপ সান্ত্বনা-বাক্য বলিয়া কাঁকড়া মহাশয় আপনার বড় দাড়া দিয়া কঙ্কাবতীর মুখ মুছাইয়া দিলেন। তাহাতে কঙ্কাবতীর মুখ ছড়িয়া গেল।

কঙ্কাবতীর কান্না থামিলে, পুনরায় কাঁকড়া মহাশয় ভাল করিয়া কঙ্কাবতীর গা টিপিয়া-টিপিয়া দেখিলেন ও দেখিয়া দরজিকে বলিলেন, —'না! এ ছোবড়াও নয়।'

বুড়ো দরজি বলিলেন, —'তাই তো। তবে এর গায়ের জামা আমার কাছে নাই। এর জামা আমি কাটিতেও জানি না, সেলাই করিতেও জানি না। যদি তুমি শিমুল তুলা হইতে, অভাবপক্ষে ছোবড়াও হইতে তাহা হইলে কেমন জামা পরাইয়া দিতাম। তা তোমার কপালে নাই, আমি কী করিব?'

কাঁকড়া মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, —'তবে এখন উপায়? ভাল জামা কোথায় পাই?'

বুড়ো দরজি বলিলেন, —'তুমি এক কাজ কর, তুমি খলিফা সাহেবের কাছে যাও। খলিফা সাহেব ভাল কারিগর। খলিফা সাহেবের মতো কারিগর এ পৃথিবীতে নাই, তাহার কাছে নানাবিধ কাপড় আছে, সে কাপড় পরিলে খাঁদারও নাক হয়।'

এই কথায় কাঁকড়া মহাশয়ের রাগ হইল। তিনি বলিলেন, —'তুমি কী আমাকে ঠাট্টা করিতেছ না কি? তোমার না হয় নাকটি একটু বড়, আমার না হয় নাকটি ছোট, তাতে আবার অত ঠাট্টা কীসের?'

বুড়ো দরজি উত্তর করিলেন, —'না না! তা কি কখনও হয়? তোমাকে আমি কি ঠাট্টা করিতে পারি? কেন? তোমার নাকটি মন্দ কী? কেবল দেখিতে পাওয়া যায় না, এই দুঃখের বিষয়।'

বুড়ো দরজির এইরূপ প্রিয় বচনে কাঁকড়া মহাশয়ের রাগ পড়িল। সন্তোষ লাভ করিয়া তিনি উত্তর করিলেন, —'তা বটে! তা বটে! আমার নাকটি ভাল, তবে দোষের মধ্যে এই যে দেখিতে পাওয়া যায় না। কোথায় আছে, আমি নিজেই খুঁজিয়া পাই না। যদি দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আমার নাক দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিত, সকলেই বলিত, 'আহা! কাঁকড়ার কী নাক! যেন বাঁশির মতো।' আর যারা ছড়া বাঁধে, তারা

লিখিত, —'তিল ফুল জিনি নাসা!' কিম্বা 'শুকচঞ্চু মতো নাসা।' যা বলো, যা কও, আমার অতি সুন্দর নাক।'

কঙ্কাবতী ভাবিলেন, —'ব্যাপারখানা কী? আমি দেখিতেছি সব পাগলের হাতে পড়িয়াছি। এ কাঁকড়াটা তো বদ্ধ পাগল। এরে পাগলা গারদে রাখা উচিত।' মুখ ফুটিয়া কিন্তু কঙ্কাবতী কিছু বলিলেন না।

সকলে পুনরায় সেখান হইতে চলিলেন। আগে কাঁকড়া মহাশয়, তাহার পর কঙ্কাবতী, শেষে কচ্ছপ। এইরূপে তিনজনে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে অনেক দূর গিয়া অবশেষে খলিফা সাহেবের ঘরে উপস্থিত হইলেন। খলিফা তখন অন্দরমহলে ছিলেন।

কাঁকড়া মহাশয় বাহির হইতে ডাকিলেন, —'খলিফা সাহেব! খলিফা সাহেব!'

ভিতর হইতে খলিফা উত্তর দিলেন, —'কে হে! কে ডাকাডাকি করে?'

কাঁকড়া মহাশয় উত্তর করিলেন, —'আমি কাঁকড়াচন্দ্র! একবার বাহিরে আসুন, বিশেষ কাজ আছে।'

খলিফা সাহেব বলিলেন, 'আসুন, আসুন, কাঁকড়াবাবু আসুন। আর এই যে কচ্ছপবাবুকেও দেখিতেছি! কচ্ছপ বাবু! আপনি ঐ টুলটিতে বসুন, আর কাঁকড়াবাবু! আপনি ঐ চেয়ারখানি নিন। এ মেয়েটিকে বসিতে দিই কোথায়? দিব্য মেয়েটি। কাঁকড়াবাবু! এ কন্যাটি কি আপনার?'

কাঁকড়াচন্দ্র উত্তর করিলেন, —'না, এ কন্যাটি আমার নয়, আমি বিবাহ করি নাই। ওঁর জন্যই এখানে আসিয়াছি। এঁর জন্য অতি উত্তম রাজপরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে।'

খলিফা উত্তর করিলেন, —'রাজপরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে পারি। আমার কাছে রেশম আছে, পশম আছে, সার্টিন আছে, মায় বারাণসী কিংখাব পর্যন্ত আছে। কিন্তু রাজপোশাক তো আর অমনি হয় না? তাতে হীরা বসাইতে হইবে, মোতি বসাইতে হইবে, জরি-লেস প্রভৃতি ভাল-ভাল দ্রব্য লাগাইতে হইবে। অনেক টাকা খরচ হইবে। টাকা দিতে পারিবেন তো?'

কাঁকড়াচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, —'আমাদের টাকার অভাব কী? যত নৌকা জাহাজডুবি হয়, তাহাতে যে টাকা থাকে, সেসব কোথায় যায়? সে সকল আমাদের প্রাপ্য। এক্ষণে আপনার কত টাকা চাই, তা বলুন?'

খলিফা উত্তর করিলেন, —'যদি দুই তোড়া টাকা দিতে পারেন, তাহা হইলে উত্তম রাজপোশাক প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি।'

কাঁকড়া তৎক্ষণাৎ কচ্ছপের পিঠ হইতে লইয়া দুই তোড়া মোহর খলিফার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। খলিফা অনেক রাজার পোশাক, অনেক বাবুর পোশাক, অনেক বরের পোশাক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু একবারে দুই তোড়া মোহর কেহ কখনও তাঁহাকে দেয় নাই।

মোহর দেখিয়া কঙ্কাবতী ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, —'ও গো! তোমরা এ টাকাগুলি আমাকে দাও না? আমি বাড়ি লইয়া যাই। আমার বাবা বড় টাকা ভালবাসেন, এত টাকা পাইলে বাবা কত আহ্লাদ করিবেন। এই ময়লা কাপড় পরিয়াই আমি না হয় তোমাদের রানি হইব, ভাল কাপড়ে আমার কাজ নাই। তোমাদের পায়ে পড়ি, এই টাকাগুলি আমাকে দাও, আমি বাবাকে গিয়া দিই।'

কাঁকড়া কঙ্কাবতীকে বকিয়া উঠিলেন। কাঁকড়া বলিলেন, —'তুমি তো বড় অবাধ্য মেয়ে দেখিতেছি। একবার তোমাকে মানা করিয়াছি যে, তুমি ছেলেমানুষ আমাদের কথায় কথা কহিও না। চুপ করিয়া দেখ, আমরা কী করি।'

কী করিবেন? কঙ্কাবতী চুপ করিয়া রহিলেন। মোহর পাইয়া খলিফার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি বলিলেন, —'টাকাগুলি বাড়ির ভিতর রাখিয়া আসি, আর ভাল-ভাল কাপড় বাহির করিয়া আনি। এইক্ষণেই তোমাদের রানির রাজবস্ত্র করিয়া দিব।'

বাটীর ভিতর খলিফা দুই তোড়া মোহর লইয়া যাইলেন। আহ্লাদে পুলকিত হইয়া দন্তপাটি করিটা একগাল হাসির সহিত সেই মোহর স্ত্রীকে দেখাইতে লাগিলেন।

স্ত্রী অবাক! কী আশ্চর্য! 'আজ সকালবেলা আমরা কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম?' খলিফানি এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রকাশ্যে খলিফানি বলিলেন, —'এবার কিন্তু আমাকে ডায়মনকাটা তাবিজ গড়াইয়া দিতে হইবে।'

তাহার পর খলিফা কঙ্কাবতীকে বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন। স্ত্রীকে বলিলেন, —'ইনি রানি। এঁর নাম কঙ্কাবতী। এঁর জন্য রাজপরিচ্ছদ প্রস্তুত

করিতে হইবে। অতি সাবধানে তুমি ইঁহার গায়ের মাপ লও।'

খলিফানি কঙ্কাবতীর গায়ের মাপ লইলেন। অনেক লোক নিযুক্ত করিয়া অতি সত্বর খলিফা রাজবস্ত্র প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। খলিফা-রমণী যত্নে সেই পোশাক কঙ্কাবতীকে পরাইয়া দিলেন। রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কঙ্কাবতীর রূপ ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

খলিফা-রমণী বলিলেন, —'আহা! মরি কী রূপ!'

খলিফা বলিলেন, —'মরি, কী রূপ!'

সকলেই বলিলেন, —'মরি, কী রূপ!'

রাজপরিচ্ছদ পরা হইলে কাঁকড়া ও কচ্ছপ, কঙ্কাবতীকে লইয়া পুনরায় গৃহাভিমুখে চলিলেন। অনেক স্থল, অনেক জল অতিক্রম করিয়া তিনজনে পুনরায় নদীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইলে, কঙ্কাবতীর মনোহর রূপ, মনোহর পরিচ্ছদ দেখিয়া, সকলেই চমৎকৃত হইল। সকলেই 'ধন্য ধন্য' করিতে লাগিল। সকলেই বলিল, —'আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা কঙ্কাবতী-হেন রানি পাইলাম।'

এক্ষণে একটি মহা ভাবনার বিষয় উপস্থিত হইল। জলচর জীবগণের এখন এই ভাবনা হইল যে, রানি থাকেন কোথায়? যে সে রানি নয়, কঙ্কাবতী রানি। যেরূপ জগৎসুশোভিনী, মনোমোহিনী কঙ্কাবতী রানি সেইরূপ সুসজ্জিত, অলঙ্কৃত, মনোমোহিত অট্টালিকা চাই। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া অবশেষে সকলে স্থির করিলেন যে, রানি কঙ্কাবতীর নিমিত্ত মোতিমহলই উপযুক্ত স্থান। যাহাকে মোতি বলে, তাহাকেই মুক্তা বলে। মুক্তার যথায় উৎপত্তি মুক্তার যথায় স্থিতি, সেই স্থানকে 'মোতিমহল' বলে।

রুই প্রভৃতি মৎস্যগণ জোড়হাত করিয়া কঙ্কাবতীকে বলিলেন, —'মহারানি! মোতিমহল আপনার বাসের উপযুক্ত স্থান, আপনি ঐ মোতিমহলে গিয়া বাস করুন।'

এইরূপে সসম্ভ্রমে সম্ভাষণ করিয়া মাছেরা কঙ্কাবতীকে একটি ঝিনুক দেখাইয়া দিল। ঝিনুকের ভিতর মুক্তা হয় বলিয়া ঝিনুকের নাম মোতিমহল। কঙ্কাবতী সেই ঝিনুকের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ঝিনুকের ভিতর বাস করিয়া কঙ্কাবতী মাছেদের রানিগিরি করিতে লাগিলেন।

ইচ্ছাপূরণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
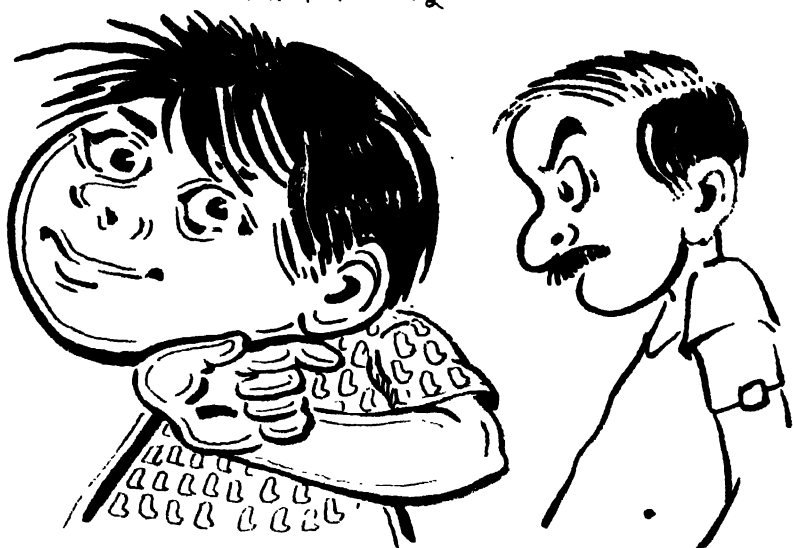
সুবলচন্দ্রের ছেলেটির নাম সুশীলচন্দ্র। কিন্তু সকল সময়ে নামের মতো মানুষটি হয় না। সেই জন্যই সুবলচন্দ্র কিছু দুর্বল ছিলেন এবং সুশীলচন্দ্র বড়ো শান্ত ছিলেন না।

ছেলেটি পাড়াসুদ্ধ লোককে অস্থির করিয়া বেড়াইত, সেইজন্য বাপ মাঝে মাঝে শাসন করিতে ছুটিতেন, কিন্তু বাপের পায়ে ছিল বাত, আর ছেলেটি হরিণের মতো দৌড়িতে পারিত, কাজেই কিল চড় চাপড় সকল সময় ঠিক জায়গায় গিয়া পড়িত না। কিন্তু সুশীলচন্দ্র দৈবাত যেদিন ধরা পড়িতেন সেদিন তাঁহার আর রক্ষা থাকিত না।

আজ শনিবারের দিনে দুটোর সময় স্কুলের ছুটি ছিল, কিন্তু আজ স্কুলে যাইতে সুশীলের কিছুতেই মন উঠিতে ছিল না। তাহার অনেকগুলো কারণ ছিল। একে তো আজ স্কুলে ভূগোলের পরীক্ষা, তাহাতে আবার ও পাড়ার বোসেদের বাড়ি আজ সন্ধ্যার সময় বাজি পোড়ানো হইবে। সকাল হইতে সেখানে ধূমধাম চলিতেছে। সুশীলের ইচ্ছা, সেইখানেই আজ দিনটা কাটাইয়া দেয়।

অনেক ভাবিয়া, শেষকালে স্কুলে যাইবার সময় বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার বাপ সুবল গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী রে, বিছানায় পড়ে আছিস যে! আজ ইস্কুলে যাবি নে?'

সুশীল বলিল, 'আমার পেট কামড়াচ্ছে, আজ আমি স্কুলে যেতে পারব না।'

সুবল তাহার মিথ্যা কথা সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে বলিলেন, রোসো, একে আজ জব্দ করতে হবে। এই বলিয়া কহিলেন, 'পেট কামড়াচ্ছে? তবে তোর কোথাও গিয়ে কাজ নেই। বোসেদের বাড়ি বাজি দেখতে হরিকে একলাই পাঠিয়ে দেব এখন। তোর জন্যে আজ লজঞ্জুস কিনে রেখেছিলুম, সেও আজ খেয়ে কাজ নেই। তুই এখানে চুপ করে পড়ে থাক, আমি খানিকটা পাঁচন তৈরি করে নিয়ে আসি।'

এই বলিয়া তাহার ঘরে শিকল দিয়া সুবলচন্দ্র খুব তিতো পাঁচন তৈয়ার করিয়া আনিতে গেলেন। সুশীল মহা মুশকিলে পড়িয়া গেল। লজঞ্জুস সে যেমন ভালোবাসিত পাঁচন খাইতে হইলে তাহার তেমনি সর্বনাশ বোধ হইত। ও দিকে আবার বোসেদের বাড়ি যাইবার জন্য কাল রাত হইতে তাহার মন ছটফট করিতেছে, তাহাও বুঝি বন্ধ হইল।

সুবলবাবু যখন খুব বড়ো একবাটি পাঁচন লইয়া ঘরে ঢুকিলেন সুশীল বিছানা হইতে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বলিল, 'আমার পেট কামড়ানো একেবারে সেরে গেছে, আমি আজ ইস্কুলে যাব।'

বাবা বলিলেন, 'না না, সে কাজ নেই, তুই পাঁচন খেয়ে এইখানে চুপচাপ শুয়ে থাক।' এই বলিয়া তাহাকে জোর করিয়া পাঁচন খাওয়াইয়া ঘরে তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সুশীল বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত দিন ধরিয়া কেবল মনে করিতে লাগিল যে, 'আহা, যদি কালই আমার বাবার মতো বয়স হয়, আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি, আমাকে কেউ বন্ধ করে রাখতে পারে না।'

তাহার বাপ সুবলচন্দ্র বাহিরে একলা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, আমার বাপ মা আমাকে বড়ো বেশি আদর দিতেন বলেই তো আমার পড়াশুনো কিছু হল না। আহা, আবার যদি সেই ছেলেবেলা ফিরে পাই,

তা হলে আর কিছুতেই সময় নষ্ট না করে কেবল পড়াশুনো করে নিই।

ইচ্ছাঠাকরুন সেই সময় ঘরের বাহির দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বাপের ও ছেলের মনের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, আচ্ছা ভালো, কিছুদিন ইহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াই দেখা যাক।

এই ভাবিয়া বাপকে গিয়া বলিলেন, 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। কাল হইতে তুমি তোমার ছেলের বয়স পাইবে।' ছেলেকে গিয়া বলিলেন, 'সকাল হইতে তুমি তোমার বাপের বয়সী হইবে।' শুনিয়া দুইজনে ভারি খুশি হইয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধ সুবলচন্দ্র রাত্রে ভালো ঘুমাইতে পারিতেন না, ভোরের দিকটায় ঘুমাইতেন। কিন্তু আজ তাঁহার কী হইল, হঠাৎ খুব ভোরে উঠিয়া একেবারে লাফ দিয়া বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, খুব ছোট হইয়া গেছেন, পড়া দাঁত সবগুলি উঠিয়াছে, মুখের গোঁফদাড়ি সমস্ত কোথায় গেছে, তাহার আর চিহ্ন নাই। রাত্রে যে ধুতি এবং জামা পরিয়া শুইয়াছিলেন, সকালবেলায় তাহা এত ঢিলা হইয়া গেছে যে হাতের দুই আস্তিন প্রায় মাটি পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে, জামার গলা বুক পর্যন্ত নামিয়াছে, ধুতির কোঁচাটা এতই লুটাইতেছে যে, পা ফেলিয়া চলাই দায়।

আমাদের সুশীলচন্দ্র অন্যদিন ভোরে উঠিয়া চারিদিকে দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়ান, কিন্তু আজ তাহার ঘুম আর ভাঙে না, যখন তাহার বাপ সুবলচন্দ্রের চেঁচামেচিতে সে জাগিয়া উঠিল তখন দেখিল, কাপড়-চোপড়গুলো গায়ে এমনি আঁটিয়া গেছে যে, ছিঁড়িয়া ফাটিয়া কুটিকুটি হইবার জো হইয়াছে, শরীরটা সমস্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, কাঁচা-পাকা গোঁফে-দাড়িতে অর্ধেকটা মুখ দেখাই যায় না, মাথায় একমাথা চুল ছিল, হাত দিয়া দেখে সামনে চুল নাই—পরিষ্কার টাক তকতক করিতেছে।

আজ সকালে সুশীলচন্দ্র বিছানা ছাড়িয়া উঠিতেই চায় না। অনেকবার তুড়ি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাই তুলিল, অনেকবার এপাশ ওপাশ করিল, শেষকালে বাপ সুবলচন্দ্রের গোলমালে ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল।

দুইজনের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু ভারি মুশকিল বাধিয়া গেল। আগেই বলিয়াছি, সুশীলচন্দ্র মনে করিত যে, সে যদি তাহার বাবা সুবলচন্দ্রের মতো বড়ো এবং স্বাধীন হয়, তবে যেমন ইচ্ছা গাছে চড়িয়া,

জলে ঝাঁপ দিয়া কাঁচা আম খাইয়া পাখির বাচ্চা পাড়িয়া, দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইবে। যখন ইচ্ছা ঘরে আসিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই খাইবে, কেহ বারণ করিবার থাকিবে না। কিন্তু আশ্চর্য এই, সেদিন সকালে উঠিয়া তাহার গাছে চড়িতে ইচ্ছাই হইল না। পানাপুকুরটা দেখিয়া তাহার মনে হইল, ইহাতে ঝাঁপ দিলেই আমার কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসিবে। চুপচাপ করিয়া দাওয়ায় একটা মাদুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

একবার মনে হইল, খেলাধূলাগুলো একেবারেই ছাড়িয়া দেওয়াটা ভালো হয় না, একবার চেষ্টা করিয়াই দেখা যাক। এই ভাবিয়া কাছে একটা আমড়া গাছ ছিল, সেইটাতে উঠিবার জন্য অনেক রকম চেষ্টা করিল। কাল যে গাছটায় কাঠবিড়ালির মতো তর তর করিয়া চড়িতে পারিত আজ বুড়া শরীর লইয়া সে গাছে কিছুতেই উঠিতে পারিল না, নীচেকার একটা কচি ডাল ধরিবামাত্র সেটা তাহার শরীরের ভারে ভাঙিয়া গেল এবং বুড়া সুশীল ধপ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কাছে রাস্তা দিয়া লোক চলিতেছিল, তাহারা বুড়াকে ছেলেমানুষের মতো গাছে চড়িতে ও পড়িতে দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়া গেল। সুশীলচন্দ্র লজ্জায় মুখ নিচু করিয়া আবার সেই দাওয়ায় মাদুরে আসিয়া বসিল, চাকরকে বলিল, 'ওরে বাজার থেকে এক টাকার লজঞ্জুস কিনে আন।

লজঞ্জুসের প্রতি সুশীলচন্দ্রের বড়ো লোভ ছিল। স্কুলের ধারে দোকানে সে রোজ নানা রঙের লজঞ্জুস সাজানো দেখিত; দু-চার পয়সা যাহা পাইত তাহাতেই লজঞ্জুস কিনিয়া খাইত; মনে করিত যখন বাবার মতো টাকা হইবে তখন কেবল পকেট ভরিয়া লজঞ্জুস কিনিবে এবং খাইবে। আজ চাকর এক টাকায় একরাশ লজঞ্জুস কিনিয়া দিল, তাহারই একটা লইয়া সে দন্তহীন মুখের মধ্যে পুরিয়া চুষিতে লাগিল, কিন্তু বুড়ার মুখে ছেলেমানুষের লজঞ্জুস কিছুতেই ভালো লাগিল না। একবার ভাবিল, এগুলো আমার ছেলেমানুষ বাবাকে খাইতে দেওয়া যাক; আবার তখনি মনে হইল, না কাজ নাই, এত লজঞ্জুস খাইলে উহার আবার অসুখ করিবে।

কাল পর্যন্ত যে সকল ছেলে সুশীলচন্দ্রের সঙ্গে কপাটি খেলিয়াছে আজ তাহারা সুশীলের সন্ধানে আসিয়া বুড়ো সুশীলকে দেখিয়া দূরে ছুটিয়া গেল।

সুশীল ভাবিয়াছিল, বাপের মতো স্বাধীন হইয়া তাহার সমস্ত ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে সমস্ত দিন ধরিয়া কেবলই ডুডু ডুডু শব্দে কপাটি খেলিয়া বেড়াইবে; কিন্তু আজ রাখাল, গোপাল, অক্ষয়, নিবারণ, হরিশ এবং নন্দকে দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল, ভাবিল, চুপচাপ করিয়া বসিয়া আছি, এখনি বুঝি ছোঁড়াগুলি গোলমাল বাধাইয়া দিবে।

আগেই বলিয়াছি, বাবা সুবলচন্দ্র প্রতিদিন দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতেন, যখন ছোট ছিলাম তখন দুষ্টুমি করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছি, ছেলেবেলা ফিরিয়া পাইলে সমস্ত দিন শান্তশিষ্ট হইয়া ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া কেবলই বই লইয়া পড়া মুখস্ত করি। এমন কি সন্ধের পরে ঠাকুরমার কাছে গল্প শোনা বন্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত পড়া তৈয়ারি করি।

কিন্তু ছেলেবয়স ফিরিয়া পাইয়া সুবলচন্দ্র কিছুতেই স্কুলমুখো হইতে চাহেন না। সুশীল বিরক্ত হইয়া আসিয়া বলিত, 'বাবা, ইস্কুলে যাবে না?' সুবল মাথা চুলকাইয়া মুখ নিচু করিয়া আস্তে আস্তে বলিতেন, 'আজ আমার পেট কামড়াচ্ছে, আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।' সুশীল রাগ করিয়া বলিত, 'পারবে না বৈকি! ইস্কুলে যাবার সময় আমারও অমন ঢের পেট কামড়েছে, আমি ও সব জানি।'

বাস্তবিক সুশীল এতরকম উপায়ে স্কুল পলাইত এবং সে এত অল্পদিনের কথা যে, তাহাকে ফাঁকি দেওয়া তাহার বাপের কর্ম নহে। সুশীল জোর করিয়া ক্ষুদ্র বাপটিকে স্কুলে পাঠাইতে আরম্ভ করিল। স্কুলের ছুটির পর সুবল বাড়ি আসিয়া খুব একচোট ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িতেন, কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতে বৃদ্ধ সুশীলচন্দ্র চোখে চশমা দিয়া একখানা কৃত্তিবাসের রামায়ণ লইয়া সুর করিয়া করিয়া পড়িত, সুবলের ছুটাছুটি গোলমালে তাহার পড়ার ব্যাঘাত হইত। তাই সে জোর করিয়া সুবলকে ধরিয়া সম্মুখে বসাইয়া হাতে একখানা স্লেট দিয়া আঁক কষিতে দিত। আঁকগুলো এমনি বড়ো বড়ো বাছিয়া দিত যে, তাহার একটা কষিতেই তাহার বাপের একঘণ্টা চলিয়া যাইত। সন্ধ্যাবেলায় বুড়ো সুশীলের ঘরে অনেক বুড়ায় মিলিয়া দাবা খেলিত। সে সময়টায় সুবলকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য সুশীল একজন মাস্টার রাখিয়া দিল। মাস্টার রাত্রি দশটা

পর্যন্ত তাহাকে পড়াইত।

খাওয়ার বিষয়ে সুশীলের বড়ো কড়াক্কড় ছিল। কারণ তাহার বাপ সুবল যখন বৃদ্ধ ছিলেন তখন তাঁহার খাওয়া ভালো হজম হইত না, একটু বেশি খাইলেই অম্বল হইত—সুশীলের সে কথাটা বেশ মনে আছে, সেইজন্য সে তাহার বাপকে কিছুতেই অধিক খাইতে দিত না। কিন্তু হঠাৎ অল্প বয়স হইয়া আজকাল তাঁর এমনি ক্ষুধা হইয়াছে যে, নুড়ি হজম করিয়া ফেলিতে পারিতেন। সুশীল তাঁহাকে যতই অল্প খাইতে দিত পেটের জ্বালায় ততই তিনি অস্থির হইয়া বেড়াইতেন। শেষকালে রোগা হইয়া শুকাইয়া তাঁহার সর্বাঙ্গের হাড় বাহির হইয়া পড়িল। সুশীল ভাবিল, শক্ত ব্যামো হইয়াছে, তাই কেবলই ঔষধ গিলাইতে লাগিল।

বুড়ো সুশীলের বড়ো গোল বাধিল। সে তাহার পূর্বকালের অভ্যাসমতো যাহা করে তাহাই তাহার সহ্য হয় না, পূর্বে সে পাড়ায় কোথাও যাত্রাগানের খবর পাইলেই বাড়ি হইতে পালাইয়া হিমে হোক, বৃষ্টিতে হোক, সেখানে গিয়া হাজির হইত। আজিকার বুড়া সুশীল সেই কাজ করিতে গিয়া, সর্দি হইয়া কাশি হইয়া, গায়ে মাথায় ব্যথা হইয়া তিন হপ্তা শয্যাগত হইয়া পড়িয়া রহিল। চিরকাল সে পুকুরে স্নান করিয়া আসিয়াছে, আজও তাহাই করিতে গিয়া হাতের গাঁট, পায়ের গাঁট ফুলিয়া বিষম বাত উপস্থিত হইল, তাহার চিকিৎসা করিতে ছয়মাস গেল। তাহার পর হইতে দুই দিন অন্তর গরম জলে স্নান করিত এবং সুবলকেও কিছুতেই পুকরে স্নান করিতে দিত না। পূর্বেকার অভ্যাসমত, ভুলিয়া তক্তপোশ হইতে সে লাফ দিয়া নামিতে যায় আর হাড়গুলো টনটন ঝনঝন করিয়া উঠে। মুখের মধ্যে আস্ত পান পুরিয়াই হঠাৎ দেখে দাঁত নাই, পান চিবানো অসাধ্য। ভুলিয়া চিরুনি ব্রুশ লইয়া মাথা আঁচড়াইতে গিয়া দেখে প্রায় সকল মাথাতেই টাক। এক-এক দিন হঠাৎ ভুলিয়া যাইত যে, সে তাহার বাপের বয়সী বুড়ো হইয়াছে এবং ভুলিয়া পূর্বের অভ্যাসমতো দুষ্টামি করিয়া পাড়ার বুড়ি আন্দি পিসির জলের কলসে ঠন করিয়া ঢিল ছুঁড়িয়া মারিত। বুড়োমানুষের এই ছেলেমানুষি দেখিয়া লোকেরা তাহাকে মার মার করিয়া তাড়াইয়া যাইত, সেও লজ্জায় মুখ রাখিবার জায়গা পাইত না।

সুবলচন্দ্রও এক-একদিন দৈবাৎ ভুলিয়া যাইত যে, সে আজকাল

ছেলেমানুষ হইয়াছে। আপনাকে পূর্বের মত বুড়ো মনে করিয়া যেখানে বুড়া মানুষেরা তাশ পাশা খেলিতেছে সেইখানে গিয়া সে বসিত এবং বুড়ার মতো কথা বলিত, শুনিয়া সকলেই তাহাকে 'যা যা খেলা কর গে যা, জ্যাঠামি করতে হবে না' বলিয়া কান ধরিয়া বিদায় করিয়া দিত। হঠাৎ ভুলিয়া মাস্টারকে গিয়া বলিত, 'দাও তো তামাকটা দাও তো, খেয়ে নিই।' শুনিয়া মাস্টার তাহাকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া দিত। নাপিতকে গিয়া বলিত, 'ওরে বেজা, কদিন আমাকে কামাতে আসিস নি কেন।' নাপিত ভাবিত ছেলেটি খুব ঠাট্টা করিতে শিখিয়াছে। সে উত্তর দিত, 'আর বছর দশেক বাদে আসব এখন।' আবার এক-একদিন তাহার পূর্বের অভ্যাসমত তাহার ছেলে সুশীলকে গিয়া মারিত। সুশীল ভারি রাগ করিয়া বলিত, 'পড়াশুনা করে তোমার এই বুদ্ধি হচ্ছে? একরত্তি ছেলে হয়ে বুড়োমানুষের গায়ে হাত তোল!' অমনি চারিদিক হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিয়া কেহ কিল, কেহ চড়, কেহ গালি দিতে আরম্ভ করে।

তখন সুবল একান্তমনে প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, 'আহা যদি আমি আমার ছেলে সুশীলের মতো বড়ো হই, তাহা হইলে বাঁচিয়া যাই।'

সুশীলও প্রতিদিন জোড়হাত করে বলে, 'হে দেবতা, আমার বাপের মতো আমাকে ছোট করিয়া দাও, 'মনের সুখে খেলা করিয়া বেড়াই। বাবা, যেরকম দুষ্টামি আরম্ভ করিয়াছেন উঁহাকে আর আমি সামলাইতে পারি না, সর্বদা ভাবিয়া অস্থির হইলাম।'

তখন ইচ্ছাঠাকরুন আসিয়া বলিলেন, 'কেমন তোমাদের শখ মিটিয়াছে?'

তাঁহারা দুইজনেই গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন, 'দোহাই ঠাকরুন, মিটিয়াছে। এখন আমরা যে যাহা ছিলাম আমাদিগকে তাহাই করিয়া দাও।'

ইচ্ছাঠাকরুন বলিলেন, 'আচ্ছা, কাল সকালে উঠিয়া তাহাই হইবে।'

পরদিন সকালে সুবল পূর্বের মতো বুড়া হইয়া এবং সুশীল ছেলে হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। দুজনেরই মনে হইল যে, স্বপ্ন হইতে জাগিয়াছি। সুবল গলা ভার করিয়া বলিলেন, 'সুশীল, ব্যাকরণ মুখস্থ করবে না?'

সুশীল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, 'বাবা, আমার বই হারিয়ে গেছে।'

সাতমার পালোয়ান

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

এক রাজার দেশে এক কুমার ছিল। তার নাম ছিল কানাই।

কানাই কিছু একটা গড়িতে গেলেই তাহা বাঁকা হইয়া যাইত, কাজেই তাহা কেহ কিনিত না। কিন্তু তাহার স্ত্রী খুব সুন্দর হাঁড়ি-কলসি গড়িতে পারিত। ইহাতে কানাইয়ের বেশ সুবিধা হবারই কথা ছিল। সে সকল মেহন্নত তাহার স্ত্রীর ঘাড়ে ফেলিয়া সুখে বেড়িয়া বেড়াইতে পারিত। কিন্তু তাহার স্ত্রী বড়ই রাগী ছিল, কানাইকে আলস্য করিতে দেখিলেই সে ঝাঁটা লইয়া আসিত। সুতরাং মোটের উপর বেচারার কষ্টই ছিল বলিতে হইবে।

একদিন কানাইয়ের স্ত্রী কতকগুলি হাঁড়ি রোদে দিয়া বলিল, 'দেখ যেন কিছুতে মাড়ায় না।'

কানাই কিছু চিঁড়ে আর ঝোলাগুড় এবং একটা লাঠি লইয়া হাঁড়ি পাহারা দিতে বসিল। এক-একবার চিঁড়ে খায় আর এক-একবার হাঁড়ির পানে তাকাইয়া দেখে, কিছুতে মাড়াইল কিনা।

কানাইয়ের ঝোলাগুড়ের খানিকটা কেমন করিয়া হাঁড়ির উপর পড়িয়াছিল, অনেকগুলি মাছি আসিয়া তাহা খাইতে বসিয়া গেল। কানাই

তাহা দেখিয়া বলিল, 'বটে! হাঁড়ি মাড়াচ্ছ? আচ্ছা, রোসো!' এই বলিয়া সে তাহার লাঠি দিয়া মাছিগুলোকে এমনি এক ঘা লাগাইল যে তাহাতে মাছিও মরিয়া গেল, হাঁড়িও গুঁড়া হইয়া গেল।

কানাই গনিয়া দেখিল যে, সাতটা মাছি মারিয়াছে। তাহাতে সে লাঠি বগলে করিয়া ভারি গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। হাঁড়ি ভাঙার শব্দ শুনিয়া তাহার স্ত্রী ঝাঁটা হাতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'কি হয়েছে?' কানাই কথা কয় না। তাহার স্ত্রী যতই জিজ্ঞাসা করে, সে খালি আরো গম্ভীর হইয়া যায়।

শেষটা যখন তাহার স্ত্রী বাড়াবাড়ি করিল, তখন সে চোখ লাল করিয়া বলিল, 'দে্খ, হিসেব করে কথা কোস। এক ঘায় সাতটা মেরেছি, জানিস?'

শেষে একদিন কানাই একথান মার্কিন দিয়া মাথায় একটা পাগড়ি বাঁধিল। বনের ভিতর হইতে বাঁশ কাটিয়া একটা ভয়ানক মোটা লাঠি তয়ের করিল। তারপর পিরান গায়ে দিয়া কোমর বাঁধিয়া, ঢাল হাতে করিয়া, জুতা পায় দিয়া, রাজার বাড়িতে পালোয়ানগিরি করিতে চলিল। যাইবার সময় তাহার স্ত্রীকে বলিয়া গেল—'আমি তোদের এখানে থাকব না। আমি এক ঘায় সাতটা মারতে পারি।'

পথের লোক জিজ্ঞাসা করে, 'কানাই, কোথায় যাও?' কানাই সে কথার কোন উত্তর দেয় না। সে মনে করিয়াছে যে এখন হইতে আর কানাই বলিয়া ডাকিলে উত্তর দিবে না। সে এক ঘায় সাতটা মারিয়া ফেলিয়াছে! এখন কি আর তাহাকে কানাই ডাকা সাজে? এখন তাহাকে বলিতে হইবে, 'সাতমার পালোয়ান।'

রাজার নিকট গিয়া কানাই জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল। রাজা তাহার সেই একথান মার্কিনের পাগড়ি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নাম কি হে?' কানাই বলিল, 'মহারাজ, আমার নাম সাতমার পালোয়ান। আমি এক ঘায় সাতটাকে মারতে পারি।'

কানাই রাজার বাড়ির পালোয়ান নিযুক্ত হইল। মাইনে পঞ্চাশ টাকা। এখন তার দিন সুখেই যায়।

ইহার মধ্যে একদিন সেই রাজার দেশে এক বাঘ আসিয়া উপস্থিত। সে মানুষ মারিয়া, গরু-বাছুর খাইয়া, দৌরাত্ম্য করিয়া দেশ ছারখার করিবার

জোগাড় করিল। যত শিকারি তাহাকে মারিতে গেল, সবকটাকে সে জলযোগ করিয়া ফেলিল। রাজামহাশয় অবধি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'দেশ আর থাকে না।'

এমন সময় কোথাকার এক দুষ্ট লোক আসিয়া রাজার কানে-কানে বলিল, 'রাজামহাশয়, এত যে ভাবছেন, তবে পঞ্চাশটাকা দিয়ে পালোয়ান রেখেছেন কি করতে? তাকে ডেকে বাঘ মেরে দিতে হুকুম করুন না।'

রাজা বলিলেন, 'আরে তাই তো? ডাক্ পালোয়ানকে!'

রাজার তলব পাইয়া কানাই আসিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইলে রাজা বলিলেন, 'সাতমার পালোয়ান, তোমাকে ঐ বাঘ মেরে দিতে হবে। নইলে তোমার মাথা কাটব।'

কানাই লম্বা সেলাম করিয়া বলিল, 'বহুত আচ্ছা মহারাজ, এখনি যাচ্ছি।'

ঘরে আসিয়া কানাই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। হায়, হায়! এমন সুখের চাকরিটা আর রহিল না, সঙ্গে-সঙ্গে বুঝি প্রাণটাও যায়! কানাই বলিল, 'এখন আর কি? বাঘ মারতে গেলে বাঘে খাবে, না গেলে রাজা মারবে। দূর হোক গে, আমি আর এদেশে থাকব না।'

সেদিন সন্ধ্যার পর কানাই তাহার পাগড়িটা মাথায় জড়াইল, কোমরটা আঁটিয়া বাঁধিল। এক হাতে ঢাল আর-এক হাতে ডাণ্ডা, পিঠে পুঁটুলি, পায়ে নাগরা জুতো। সকলে মনে করিল, সাতমার পালোয়ান বাঘ মারিতে চলিয়াছে। কানাই মনে করিল, এ রাজার দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। যত শীঘ্র যাওয়া যায় ততই ভাল। একটা ঘোড়া হইলে আরো শীঘ্র-শীঘ্র যাওয়া যাইত।

ততক্ষণে বাঘ করিয়াছে কি—এক বুড়ির ঘরের পিছনে চুপ মারিয়া বসিয়া আছে। ইচ্ছাটা, বুড়ি কিংবা তাহার নাতনী একটিবার বাহিরে আসিলেই ধরিয়া খাইবে। বুড়ি ঘরের ভিতরে লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়াছে। তাহার বাহিরে আসিবার ইচ্ছা একেবারেই নাই। এতক্ষণে সে কখন ঘুমাইয়া পড়িত, খালি নাতনীটার জ্বালায় পারিতেছে না। বুড়ি অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহাকে ঘুম পাড়াইতে পারে নাই। শেষে রাগিয়া বলল, 'তোকে বাঘে ধরে নেবে।' নাতনী বলিল, 'আমি বাঘে ভয় করি না।' বুড়ি বলিল, 'তবে তোকে ট্যাঁপায় নেবে।'

বাস্তবিক ট্যাঁপা বলিতে একটা-কিছু নাই, বুড়ি তাহার নাতনীকে ভয় দেখাইবার জন্যই ঐ নামটা তয়ের করিয়াছিল। কিন্তু বাঘ ঘরের পিছন হইতে ট্যাঁপার নাম শুনিয়া ভারি ভয় পাইয়া গেল! সে মনে-মনে বলিল, 'বাপ্‌রে! আমাকে ভয় করে না, কিন্তু ট্যাঁপাকে ভয় করবে! সেটা না জানি তবে কেমন ভয়ঙ্কর জানোয়ার। যদি একবার সেই জানোয়ারটা এইদিক দিয়ে আসে, তা হলেই তো মুশকিল দেখছি।

অন্ধকারে বসিয়া বাঘ এইরূপ ভাবিতেছে, আর ঠিক এমনি সময় কানাই সেই পথে পলায়ন করিতেছে। বাঘকে দেখিয়া কানাই মনে-মনে ভাবিল, 'বাঃ, এই তো একটা ঘোড়া বসে আছে!' এই বলিয়াই সে কোমরের কাপড়টা খুলিয়া বাঘের গলায় বাঁধিল।

অন্ধকারে বাঘকে কানাই ভাল করিয়া চিনিতে পারে নাই। বাঘও কানাইকে তাহার পাগড়ি-টাগড়িসুদ্ধ একটা নিতান্তই অদ্ভুত জন্তুর মতন দেখিল। একটা মানুষ হঠাৎ আসিয়া যে তার মতন জন্তুর সামনে এতটা বেয়াদবি করিয়া বসিবে, এ কথা তাহার মাথায় ঢুকে নাই। সে বেচারা নেহাত ভয় পাইয়া ভাবিতে লাগিল—'এই রে, মাটি করেছে! আমাকে ট্যাঁপায় ধরেছে!'

কানাই ভাবিল, 'ঘোড়া যখন পেয়েছি, তখন আর তাড়াতাড়ি কিসের? ঘরে একটু ঘুমুই, তারপর শেষরাত্রে ঘোড়ায় চড়ে ছুট দেব।' এই ভাবিয়া সে বাঘকে তাহার বাড়ির পানে টানিয়া লইয়া চলিল। বাঘ বেচারা আর কী করে! সে মনে করিল, 'এখন ট্যাঁপার হাতে পড়েছি, এর কথামতনই চলতে হবে।'

বাড়ি আসিয়া কানাই বাঘকে একটা ঘরে বন্ধ করিয়া দরজা আঁটিয়া দিল। তারপর বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিল, 'শেষ রাত্রেই উঠে পালাব।'

কানাইয়ের ঘুম ভাঙিতে ফরসা হইয়া গেল। তখন সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘোড়া আনিতে গিয়া দেখে—সর্বনাশ! বাঘ যে ঘরে বন্ধ আছে! বাহিরে আসিয়া তাহাকে খাইতে পারিবে না, সে কথা তখন তাহার মনেই হইল না। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া দরজায় হুড়কা আঁটিয়া বসিয়া কাঁপিতে লাগিল।

এদিকে সকালবেলা সকলে সাতমার পালোয়ানের বাড়িতে খবর লইতে

আসিয়াছে, বাঘ মারা হইল কিনা। তাহারা আসিয়া দেখিল যে, বাঘ ঘরে বাঁধা রহিয়াছে। তখন সকলে ছুটিয়া গিয়া রাজাকে বলিল, 'রাজামশাই, দেখুন এসে, সাতমার পালোয়ান বাঘকে ধরে এনে ঘরে বেঁধে রেখেছে!'

রাজামহাশয় আশ্চর্য হইয়া সাতমার পালোয়ানের বাড়ি চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন যে সত্যই বাঘ ঘরে বাঁধা। ততক্ষণে কানাই ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া আসিয়া রাজামহাশয়কে সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজা বলিলেন, 'সাতমার, ওটাকে মারল না কেন?'

কানাই বলিল, 'মহারাজ, আমি এক ঘায় সাতটাকে মারি, ও যে শুধু একটা!'

এখন হইতে সাতমার পালোয়ানের নাম দেশ-বিদেশে রাষ্ট্র হইয়া গেল। রাজামহাশয় যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া তাহার মাইনে পাঁচশত টাকা করিয়া দিলেন। কানাইয়ের দিন খুব সুখেই কাটিতে লাগিল।

কিন্তু সুখের দিন কি চিরকাল থাকে? দেখিতে-দেখিতে কানাইয়ের আর-এক নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল।

এবারে বাঘ নয়, আর-একটা রাজা। সে অনেক হাজার সৈন্য লইয়া এই রাজার দেশ লুটিতে আসিয়াছে। এ রাজাটা নাকি বড়ই ভয়ানক লোক, তাহার সঙ্গে কিছুতেই আঁটা যায় না।

রাজামহাশয় বলিলেন, 'সাতমার, এখন উপায়? তুমি না বাঁচালে আমার আর রক্ষে নেই। তোমাকে আমার অর্ধেক রাজ্য দেব, যদি এবার বাঁচিয়ে দিতে পার।'

কানাই বলিল, 'রাজামশাই, কোন চিন্তা করবেন না, এই আমি যাচ্ছি! আমাকে একটা ভাল ঘোড়া দিন।'

রাজার হুকুমে সরকারি আস্তাবলের সকলের চাইতে ভাল যুদ্ধের ঘোড়াটি আনিয়া কানাইকে দেওয়া হইল।

কানাই আজ দুই থান মার্কিন দিয়া পাগড়ি বাঁধিল। পোশাকটাও দস্তুরমতন করিল। মনে-মনে কিন্তু তাহার মতলব এই যে, যুদ্ধে যাইবার ভান করিয়া একবার ঘোড়ার পিঠে চড়িতে পারিলেই পলায়নের সুবিধা হয়।

কিন্তু হায়, সেটা যে যুদ্ধের ঘোড়া কানাই তাহা জানিত না। সে বেচারা যতই ঘোড়াটাকে অন্যদিকে লইয়া যাইতে চায়, ঘোড়া কিছুতে রাজি হয়

না। যুদ্ধের বাজনা শুনিয়া ঘোড়া তখন নাচিতে লাগিল, কানাইয়ের তখন পিঠে থাকা ভার হইল। শেষে ঘোড়া তাহার কথা না শুনিয়া একেবারে যুদ্ধের জায়গায় গিয়া উপস্থিত। পথে কানাই লতাপাতা গাছপালা খড়ের গাদা যাহা কিছু পাইয়াছে, তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঘোড়া থামাইতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই সেই ঘোড়া থামিল না। সেই গাছপালা আর খড়ের গাদা সবসুদ্ধই সে কানাইকে লইয়া ছুটিল।

এদিকে সেই বিদেশী রাজার সৈন্যরা শুনিতে পাইয়াছে যে এদেশে একটা সাতমার পালোয়ান আছে, সে এক ঘায় সাতটাকে মারে— বাঘকে ধরিয়া আনিয়া ঘরে বাঁধিয়া রাখে! এ কথা শুনিয়াই তাহারা বলাবলি করিতেছে, 'ভাই, ওটা আসিলে আর যুদ্ধ-টুদ্ধ করা হইবে না। বাপরে, এক ঘায়ে সাতটাকে মারিবে।'

এমন সময় সাতমারের ঘোড়া সেই দুই থান মার্কিনের পাগড়ি আর সেইসব গাছপালা আর খড়ের গাদাসুদ্ধ সাতমারকে লইয়া আসিয়া দেখা দিল! দূর হইতে বোধ হইতে লাগিল, যেন একটা পাহাড়-পর্বত ছুটিয়া আসিতেছে। বিদেশী রাজার সৈন্যরা তাহা একবার দেখিয়া আর দুবার দেখিবার জন্য দাঁড়াইল না। একজন যেই চেঁচাইয়া বলিল, 'ঐ রে আসছে। এবারে গাছ-পাথর ছুঁড়ে মারবে।' অমনি মুহূর্তের মধ্যে সেই হাজার-হাজার সৈন্য চেঁচাইতে চেঁচাইতে কোথায় ছুটিয়া পলাইল তাহার ঠিকানা নাই।

কানাই দেখিল যে, বিদেশী সৈন্য সব পলাইয়াছে, খালি তাহাদের রাজাটা ছুটিতে পারে নাই বলিয়া ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কানাই মনে-মনে ভাবিল, 'এ তো মন্দ নয়! পালাতে চেয়েছিলুম, মাঝখান থেকে কেমন করে যুদ্ধ জিতে গেলুম! এখন রাজাটাকে বেঁধে নিলেই হয়!'

আর কি! এখন তো সাতমার পালোয়ানের জয়জয়কার! অর্ধেক রাজ্য পাইয়া এখন সে পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

নাসাবতী রাজকন্যা

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
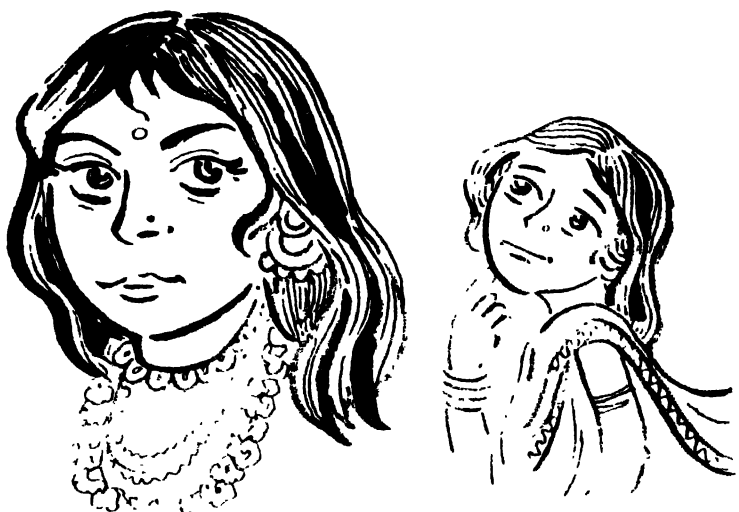
নদীর ধারে এক রাজার বাড়ি। সেই রাজার এক মেয়ে ছিল। তার নাম ফুলকুমারী। ফুলকুমারী একে রাজার মেয়ে, তায় আবার সুন্দরী, গরবে মাটিতে পা পড়ে না। ফুলকুমারীর বয়স আট-নয় বৎসর, কিন্তু পাকা-পাকা কথা। নদীর তীর দিয়া যত লোক যায়, ফুলকুমারী জানালায় দাঁড়াইয়া সকলের খুঁত ধরে। —'মাগো! ও লোকটার দাঁত কি উঁচু! মাগো! ও লোকটার চোখটা কেমন টেরা দেখ! মাগো! মেয়েটা কি কালো, যেন ভাজনা খোলা।' সর্বদাই এইরূপ ঘৃণা প্রকাশ করে। একদিন ফুলকুমারী সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে নদীতে স্নান করিতে যাইতেছে, এমন সময়ে একটি খোঁড়া লোক খোঁড়াইয়া-খোঁড়াইয়া যাইতেছে। ফুলকুমারীর কৌতুকের সীমা নাই। তাহার পিছনে তাহার নকল করিয়া নিজে খোঁড়াইয়া চলিতে লাগিল, আর হাসিতে লাগিল। সঙ্গের একটি মেয়ের ইহা সহ্য হইল না। সে বলিল, 'কেন ভাই অমন কর! ভগবান যদি তোমাকে খোঁড়া করতেন, তাহলে জানতে পারতে। ও কি সাধ করে ওরকম করে চলে?' এ কথা ফুলকুমারীর মনে প্রবেশই করিল না। একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী নিকটে দাঁড়াইয়া

এইসকল কথা শুনিতেছিলেন। তিনি ফুলকুমারীকে বলিলেন--'মা, তুমি রাজার মেয়ে, তোমার স্বভাব-চরিত্র এমন কেন?' ফুলকুমারী কোথায় লজ্জা পাবে, তা না, পিতার বয়সী সেই সন্ন্যাসীকে অবাক্য-কুবাক্য বলিয়া গালাগালি দিল। সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

আর একদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নদীর ধারে বসিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতেছেন। ফুলকুমারী সঙ্গিনীদের সঙ্গে জলকেলি করিতে গিয়াছে। অপরাধের মধ্যে ব্রাহ্মণের নাকটি কিছু বড়; টিয়াপাখির ঠোঁটের মত। ব্রাহ্মণের নাক দেখিয়া ফুলকুমারী সঙ্গিনীদের গা টিপিয়া বলিতে লাগিল, 'নাক দেখ্‌রে ভাই! ওমা কি নাকের ছিরি। মাগো, মানুষের নাক এমন হয়? ও ভাই নাক দিয়ে ঠোকরাবে না তো।' বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কানে সকল কথাই গেল। কি করিবেন, রাজার মেয়ে, বড় মানুষের ঝি। গরীব ব্রাহ্মণ। কিছু বলিবার যো নাই তাহা না হইলে ব্রাহ্মণ যেরূপ রাগী, অন্য কেহ হইলে বোধহয় ঘাড় ধরিয়া মুখ ঘসিয়া দিতেন। গায়ের রাগ গায়ে মাখিয়া ব্রাহ্মণ মানুষ সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতে লাগিলেন। ফুলকুমারীর ঠাট্টা তখনও শেষ হয় নাই। উঠিয়া যাইবার সময় ফুলকুমারী ব্রাহ্মণকে বলিল, 'ব্রাহ্মণ ঠাকুর! নাকটা একটু সরাও, আমরা যাই।' সঙ্গের মেয়েরা হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। ফুলকুমারী দেখে সেই সন্ন্যাসী আবার কোথা হইতে আসিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, 'তুমি এতটুকু মেয়ে, বাপের বয়সী লোককে ঠাট্টা কর।' ফুলকুমারী আবার সন্ন্যাসীকে অনেক গালাগালি দিল। সন্ন্যাসী আবার হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

তাহার পরদিন ফুলকুমারী নিজের সঙ্গিনীদের সঙ্গে খেলা করিতে-করিতে দেখিল একছড়া সুন্দর মালা স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছে। সে অমনি জলে নামিয়া ফুলের মালাটি তুলিয়া গলায় পরিল। ফুলগুলির গন্ধ বড় মিষ্টি। তাই ফুলকুমারী মালাটি শুঁকিতে লাগিল। অমনি তাহার সঙ্গিনীরা বলিয়া উঠিল, 'ও ভাই, তোর নাক-মুখ ফুলে ঢোল হয়ে উঠল যে।' ফুলকুমারী, তাহারা ঠাট্টা করিতেছে মনে করিয়া, তাহাদিগকে মারিতে গেল। কিন্তু তাহার নাক ও মুখ ফুলিয়া সত্য-সত্যই এতবড় হইয়া উঠিল যে ক্ষণেক পরে সে মাথার ভারে মাটিতে বসিয়া পড়িল। তাহার সঙ্গিনীরা রাজাকে খবর দিবামাত্র তিনি পাল্কি করিয়া কন্যাকে গৃহে লইয়া গেলেন।

তাহার নাক ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এখন শহরময় সকলের মুখে 'নাসাবতী' রাজকন্যার কথা।

নাসাবতী রাজকন্যার কি যন্ত্রণা। সে আয়নাতে মুখ দেখিতে যায়, একটি বিভীষণের মুখ, চক্ষুদুটি দেখিবার উপায় নাই, নাকটি যেন নদীর একটি বাঁধ! নাসাবতী আয়নাতে সেই নাক দেখে, ও কাঁদিয়া আকুল হয়, 'ও মা আমার কি হল, একি হল।' ঘরে কেহ ঢুকিলে নাসাবতী নাকটি চাপা দিবার জন্য ব্যগ্র হয়। বাপ-মা মুখ দেখিতে চাহিলে নাকের ভয়ে নাসাবতী মুখ খোলে না। একে সেই বিপর্যয় নাক, তাতে আবার ঘুমাইলে এমনি বিপর্যয় ডাকে, যেন কলুরা ঘানি জুড়িয়াছে। একদিন নাসাবতী ঘুমাইতেছে, এমন সময়ে নাকের বাতাসের টানে একটা আরশোলা নাকের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। নাসাবতীর হাঁচি, সে বিপর্যয় হাঁচি, সেই নাকের মত হাঁচি, চমকিয়া রাজার ঘুম ভাঙিয়া গেল। রাজা ছুটিয়া আসিলেন; রানী ছুটিয়া আসিলেন; দাসদাসী ছুটিয়া আসিল; ব্যাপারটা কি? নাসাবতী হাঁচিয়াছে! নাসাবতীর হাঁচিতে আরশোলা বেচারা বন্দুকের গুলির মত কোথায় ঠিকরিয়া পড়িল। নাসাবতী কাঁদিয়া খোনা স্বরে বলিল, 'বাঁবাঁ সাঁরাইয়া দেঁও।' নাসাবতীর নাক, সে কি সহজে সারে। যত ঔষধ দেয়, ততই মুখ ফুলিয়া ঢোল হয়, ও নাকটা বাড়িয়া যায়। ছোট-ছোট ভাইবোন আসিয়া নাসাবতীকে বলে—'এইবার তোর নাক লতিয়ে যাবে।' নাসাবতী কাঁদিয়া বলে, 'বাঁবাঁ দেঁখ, মাঁ দেঁখ!'

মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল, নাসাবতীর নাক আর সারে না। সে নাকের ভারে উঠিতে পারে না, বিছানাতে পড়িয়াই থাকে। ইহার উপরে আর এক যন্ত্রণা। একদিন নাসাবতীর সাধ হইল আয়ানাতে মুখটা দেখিবে, নাকটা কতদূর গজাইল। নাক দেখিতে উঠিয়া মাথার ভারে পড়িয়া গেল। পড়িয়া একখানি পা ভাঙিল। আগে ছিল নাকের জ্বালা, আবার এল খোঁড়া হওয়ার জ্বালা। নাসাবতী সারিয়া উঠিল বটে কিন্তু একখানি পা খোঁড়া রহিয়া গেল, সে যখন ন্যাঙচাইয়া চলিত, তখন ছোট-ছোট ভাইবোন বলিত, 'খোঁড়া ন্যাং ন্যাং ন্যাং, কার বাড়িতে গিয়েছিলি কে ভেঙেছে ঠ্যাং।' তাহাদের উপহাস শুনিয়া নাসাবতী পড়িয়া-পড়িয়া কাঁদিত।

এইরূপে কয়েক বৎসরে নাসাবতীর রূপের যে দেমাকটুকু ছিল তা

ভেঙে চুরমার হইয়া গেল। শেষে একদিন সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী রাজসভাতে উপস্থিত। রাজা সন্ন্যাসীকে কন্যার রোগের কথা বলিলে নাকের জন্য একপ্রকার নস্য ও পায়ের জন্য প্রলেপ দিয়া বলিলেন, 'এই নস্য নাকে ও এই প্রলেপ পায়ে দিতে হইবে। আর রোগীকে প্রতিদিন প্রাতে রাস্তার ধারে বসিয়া কানা, খোঁড়া, গরিব অন্ধদের পা ধোয়াইয়া দিতে হইবে। এইরকম এক বৎসর করিলে রোগ থাকিবে না।' রাজা নাসাবতীকে সেই নস্য দিলেন।

রোজ সকালে নাসাবতী পথে বসিয়া থাকিত ও কানা, খোঁড়া, আতুর, অন্ধ, গরিবদের পা ধুইয়ে দিত। কি আশ্চর্য! নাসাবতীর নাক ও পা ক্রমে সারিয়া উঠিল। কিন্তু এক বৎসর পথে বসিয়া গরিবদের পা ধোয়াইয়া দিতে দিতে নাসাবতীর মন বদলাইয়া গেল। সে যে রাজার মেয়ে, তাহা যেন ভুলিয়া গেল। গরিবদের উপরে তার বড় ভালবাসা জন্মিল। নাসাবতী সারিয়া উঠিয়া গরিবদের জন্য পান্থশালা, অতিথিশালা করিয়া দিতে লাগিল, ও নিজে গরিবদের সঙ্গে বাস করিয়া তাহাদের উপকার করিতে লাগিল। দেশে, চারিদিকে রব উঠিল—ধন্যা, ধন্যা, দয়াবতী রাজকন্যা। কি আশ্চর্য কৌশলে নাসাবতী রাজকন্যা দয়াবতী রাজকন্যা হইয়া গেল।

রামধন

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

বাল্যকালে রামধন পিতৃহীন হয়। সংসারে মা ছাড়া তাহার আর কেহ ছিল না। রামধনের বয়স তখন বিশ বৎসর, সেই সময় একদিন রাস্তা দিয়া যাইতে-যাইতে সে দেখিল, কয়েকজন পথিক পুকুর-পাড়ে গর্ত খুঁড়িয়া উনান প্রস্তুত করিতেছে। রামধন ভাবিল, ইহারা নিশ্চয়ই চোর, চোর না হইলে ওখানে সিঁদ কাটিবে কেন? ইহারা পুকুর চুরি করিতে আসিয়াছে। রামধন ছুটিয়া গ্রামের দশজনকে গিয়া সংবাদ দিল। পাড়ার লোকেরা তাহার বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া একেবারে অবাক! কয়েকটা বকাটে ছেলে ইহার পর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইলেই ছড়া কাটিয়া ক্ষেপাইত—

বুদ্ধিমান রামধন, সাবধানো থেকো
নাকে মুখে ছিপি এঁটে বুদ্ধি ধরে রেখো।

এই ঘটনার পর একদিন সন্ধ্যাকালে একটা মেয়ে কুয়া হইতে জল তুলিতে-তুলিতে হঠাৎ দেখিল, রামধন আসিতেছে। দেখিয়াই আরম্ভ করিল—

বুদ্ধিমান রামধন, সাবধানো থেকো
নাকে মুখে ছিপি এঁটে বুদ্ধি ধরে রেখো।

সামান্য একটা মেয়ে, সেও ক্ষ্যাপাইবে! রামধনের আর সহ্য হইল না। সে এক ধাক্কা দিয়া, তাহাকে কুয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিল।

সন্ধ্যার পর রামধন বাড়ি আসিলে, তাহার মা বলিল, 'আমি এত মানা করি, তবু তুই বাইরে যাস? লোকে যা তা বলে ক্ষ্যাপায়, —তোর কি লজ্জা নেই?'

রামধন। যা তা বলে ক্ষ্যাপায়! —ক্ষ্যাপান বের কচ্ছি। একটা মেয়েকে আজ কেমন জব্দ করেছি। এতক্ষণে কুয়োর মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে।

'কি সর্বনাশ, কি সর্বনাশ! তবে তো বাছার আমার ফাঁসি হবে'—এই ভাবিতে-ভাবিতে রামধনের মা তখনই কুয়ার নিকট ছুটিয়া গেল এবং অনেক কষ্টে বালিকার মৃতদেহ উঠাইয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিল। সেই নদীর ধারে একটা মরা রামছাগল পড়িয়াছিল। সেটাকে টানিতে-টানিতে আনিয়া কুয়ার মধ্যে ফেলিয়া সে বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

রামধনের মা বাড়ি আসিয়া দেখিল, রামধন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তখন পথ-ঘাট লোকে লোকারণ্য। মেয়েটির খোঁজে সকলেই ব্যস্ত। রামধন ঘুমাইয়াছে, না ভালই হইয়াছে। জাগিয়া থাকিলে এতক্ষণে হয় তো সব কথাই প্রকাশ করিয়া ফেলিত! এই ভাবিতে-ভাবিতে রামধনের মা-ও ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন সকালে উঠিয়া দেখে, সর্বনাশ। রামধন আগেই উঠিয়া বাহিরে গিয়াছে। মা তো ভয়ে একেবারে এতটুকু!

এদিকে রামধন বাহিরে আসিয়াই দেখিল, রাস্তায় বেজায় ভিড়। সে আশ্চর্য হইয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হে, ব্যাপারটা কি?'

তখন পাঁচ-ছয়জনে উত্তর করিল, 'ব্যাপার আর কি! কাল সন্ধ্যাকালে নিমু মোড়লের মেয়ে কুয়োতে জল তুলতে গেছিল, সেই থেকে তার কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না।'

রামধন। এই কথা! তা আগে বল্লেই হত। কাল যেই সে আমাকে দেখে ছড়া কাটতে শুরু করেছে, অমনি দিয়েছি এক ধাক্কা, আর সঙ্গে-সঙ্গেই সে কুয়োতে পড়ে অক্কা। বুঝলে তো? সেখানে খোঁজ কর গে—ঠিক তাকে পাবে।

এ কথায় মেয়ের পিতা কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। তারপর রামধনের হাত ধরিয়া বলিল, 'চল—আমাদের সঙ্গে।'

রামধন সঙ্গে-সঙ্গে চলিল। পথে কেহ-কেহ বলিল, 'একটা বোকার কথায় কুয়ো খুঁজতে যাওয়া মিছে।' কেহ-কেহ বলিল, 'দেখে আসলেই বা ক্ষতি কি!'

কুয়ার কাছে গিয়া রামধন বলিল, 'আমার কোমরে একগাছা দড়ি বেঁধে দাও, এখনি তাকে উঠিয়ে আনছি?'

তখন কয়েকজন তাহাকে কুয়ার ভিতর নামাইয়া দিল।

রামধন একবার এদিক-ওদিক চাহিল, তারপর টুপ করিয়া এক ডুব। একটু পরে ভাসিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁগো, মেয়েটির কি দুটো শিং?'

অমনি সকলে হো হো করে হাসিয়া উঠিল। হাসিল না শুধু মেয়ের পিতা। সে চিৎকার করিয়া বলিল, 'মিছে তামাশা রাখো; শিগ্‌গির আমার মেয়েকে ওঠাও!'

রামধন আবার ডুবিল; কিছু পরে মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁগো, তোমাদের মেয়ের কি চারখানা ঠ্যাং?' তাহার কথায় আবার হাসির ধুম পড়িয়া গেল। মেয়ের বাবা চটিয়া-মটিয়া বলিল, 'যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, তামাশা রাখো। মেয়েটিকে উঠিয়ে আন।'

রামধন আবার ডুবিল, কিন্তু এবারেও সে ভাসিয়া উঠিয়া বলিল, 'হ্যাঁগো, তোমাদের মেয়ের লেজটি কত বড়? আর তার বেশ লম্বা লম্বা দাড়ি আছে কি?'

মেয়ের পিতার আর সহ্য হইল না। সে খুব জোরে এক ধমক দিয়া বলিল, 'এবার যদি উঠিয়ে না আনিস, তোকেও ডুবিয়ে মারবো!'

রামধন ভয় পাইয়া আবার ডুবিল। সে কি উঠাইয়া আনে, দেখিবার জন্য সকলে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। —ও কি! —এ যে একটা মরা রামছাগল। রামধন জিজ্ঞাসা করিল, 'এই কি তোমাদের মেয়ে?'

ইহার পর সেখানে একটা তুমুল গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। কেহ হাসিয়া গড়াগড়ি দেয়! কেহ রাগে চিৎকার করে, কেহ দড়ি কাটিয়া দিয়া রামধনকে কুয়ার মধ্যেই রাখিয়া যাইতে চায়! কিন্তু মেয়ের পিতা বলিল, 'আমার

সর্বনাশ তো হয়েছেই, ওকে মেরে আর লাভ কি!' এই বলিয়া তাহাকে উপরে উঠাইয়া সকলে অন্যত্র চলিয়া গেল। রামধন হাসিতে-হাসিতে বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

ইহার পর আর এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। একদিন রাজবাড়ির চৌকিদার এক কলসি ঘি লইয়া যাইতে-যাইতে, পথে রামধনকে দেখিয়া বলিল, 'কে রে, রামধন নাকি? চল আমার সঙ্গে। একটা আধলা পাবি, এই কলসিটা নিয়ে চল!' আধলার লোভে রামধনের ছুট দেখে কে! সে তো তাড়াতাড়ি ঘিয়ের কলসি মাথায় তুলিয়া লইল! তারপর ভাবিতে লাগিল, কি আমার কপাল জোর রে! একেবারে আস্ত একটা আধলা! না জানি, আজ কার মুখ দেখে উঠেছি। যা হোক—

'আজই আমি আধলা দিয়ে কিনবো জুড়িগাড়ি;
এক্কেবারে ছুটিয়ে দেবো রাজার সদর বাড়ি।
সাত রাজার ধন মানিক, রাজা আমাকে ভাবিয়ে,
জাঁকজমকে মেয়ের সাথে দিবেন আমার বিয়ে।'

রামধনের স্ফুর্তি কত! সে উৎসাহে যেই নাচিয়া উঠিয়াছে, অমনি কলসিটা মাটিতে পড়িয়া চুরমার!

ঘিয়ের দশা দেখিয়া চৌকিদার তো রাগিয়া আগুন! সে কাঁপিতে-কাঁপিতে বলিল, 'হতভাগা, এ ঘি আমি রাজার জন্যে কত কষ্টে জোগাড় করেছি, আর তুই সব মাটি করে দিলি! চল ব্যাটা, রাজার কাছে। পিঠে বেত না পড়লে তুই সিধে হবি না!' এই বলিয়া চৌকিদার তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল।

পথে আর এক বিপদ উপস্থিত! চলিতে-চলিতে তাহারা এক শহরের সিংহ-দরজার কাছে আসিয়া দেখিল, মেলাই লোক জড়ো হইয়াছে, আর মহা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। এত গণ্ডগোলের কারণ কি, জিজ্ঞাসা করায়, প্রহরী বলিল, —'কাল এখানকার এক বড় মানুষের ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে। এ দেশের দস্তুর এই, বিয়ের পরদিন বর-কনে দুজনে হাতি চড়ে, সিংহ দরজা দিয়ে শহরে ঢুকবে। এখন একটা মুশকিল বেধেছে। বরের হাতি ছোট, তাই সহজেই দরজা পার হয়েছে, কিন্তু কনের হাতি উঁচু বলে কিছুতেই ঢুকতে পারছে না। কনের মাথা ছাদে ঠেকে যাচ্ছে। এখন হাতির

পা কেটে ছোট না করলে, আর উপায় নেই। কিন্তু এই হাতিটা যার, সে কিছুতেই এ কথায় রাজি হচ্ছে না। তাই এত গণ্ডগোল।'

প্রহরীর কথা শুনিয়া রামধন বলিল—'এ আর তেমন শক্ত কাজ কি! আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।' এই বলিয়া সে চৌকিদারের কোমর হইতে তলোয়ারখানা টানিয়া লইল এবং একটা ঘোড়ার উপর লাফাইয়া উঠিয়া, কনের গলায় এক কোপ বসাইয়া দিল! তারপর মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, 'এই সামান্য ফিকিরটাও তোমাদের মাথায় জোগাল না—আশ্চর্য! এখন দেখ দেখি, হাতি পার হয় কি না!'

রামধনের কাণ্ড দেখিয়া সকলে অবাক! বর রাগে কাঁপিতে-কাঁপিতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'পাষণ্ড, তোর এই কাজ। আমার সর্বনাশ করলি! চল রাজার কাছে! তোর শ্রাদ্ধের জোগাড় না করে আমি ছাড়বো না!'

কিছুদূর গিয়া তাহারা দেখিল, 'এক কুঁড়ের পাশে দুই বুড়ো-বুড়ি বসিয়া আছে! রামধনকে তাহারা চিনিত। তাহার হাত-পা বাঁধা দেখিয়া বুড়ো মুচকি হাসিয়া কি যেন জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, বুড়ি বাধা দিয়া বলিল, 'মিছে ঠাট্টা রাখো! রামধন কি ঠাট্টার মানুষ? ও যে একজন মস্ত পণ্ডিত—সব শাস্ত্র জানে! বল তো বাপ্ রামধন, রাবণের কথা কি জান? কিরূপে তার মুণ্ডপাত হল! আর কেমন করেই বা লঙ্কা পুড়লো?'

রামধন একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, 'যাও—যাও। এখন তামাশার সময় নয়।'

কিন্তু তাহারা কিছুতেই ছাড়িল না। তখন রামধন চৌকিদারকে বলিল, 'দেখ, তুমি সাক্ষী রইলে, আমার দোষ নেই!' এই বলিয়া সে একখানা কুড়াল লইয়া বুড়োর গলায় এক কোপ বসাইয়া বুড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, 'দেখলে তো, ঠিক এইরকমে রাবণের মুণ্ডপাত হয়েছিল।' আর একটি আঁটি খড় জ্বালিয়া, কুঁড়ে ঘরে লাগাইয়া দিয়া বলিল, 'বুঝলে তো, ঠিক এইরকমে লঙ্কা পুড়েছিল।'

ব্যাপার দেখিয়া বুড়ি তো একেবারে হতভম্ব! শেষে বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, 'হতভাগা, আমার সর্বনাশ করলি! চল, রাজার কাছে—তোকে ফাঁসিতে ঝোলাবো তবে ছাড়বো!' এই বলিয়া বুড়িও

তাহাদের সঙ্গে চলিল।

ইহার পর যখন তাহারা রাজবাড়িতে পৌঁছিল, তখন সভায় বিচার-আচার চলিতেছিল। চৌকিদারের সহিত রামধন প্রভৃতিকে দেখিয়া, রাজা তাহাদের নালিশ শুনিতে চাহিলেন।

চৌকিদার রামধনকে দেখাইয়া বলিল, 'মহারাজ! এই লোকটা ভারি বেয়াদব! আপনার জন্যে ঘি নিয়ে আসছি, বকশিশের লোভে কলসিটা তো মাথায় তুলে নিল। তারপরে বেশ চলে আসছিল, হঠাৎ কি জানি কেন লাফিয়ে উঠল, আর রাস্তায় পড়ে কলসির দফারফা—সমস্ত ঘি টাই মাটি! হুজুর, বেত না খেয়ে এ সিধে হবে না।'

রাজা রামধনের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হে, তোমার নাম কি?'

'আজ্ঞে, আমার নাম রামধন। হুজুর, চৌকিদারের নালিশ শুনলেন, এখন হুকুম হলে আমি কিছু বলি।' রাজা অনুমতি দিলেন। তখন রামধন বলিতে লাগলি, 'হুজুর আপনার চৌকিদার আধ পয়সার লোভ দেখিয়েই তো আমায় মাটি করলে। আমি ভেবেই সারা—এত ধন রাখি কোথা! শেষে ঠিক করলাম—

আজই আমি আধলা দিয়ে কিনবো জুড়িগাড়ি;
এক্কেবারে ছুটিয়ে দেবো রাজার সদর বাড়ি।
সাতরাজার ধন মানিক, রাজা আমাকে ভাবিয়ে,
জাঁকজমকে মেয়ের সাথে দিবেন আমার বিয়ে।

—এখন আপনি বিচার করুন। যে আজ বাদে কাল রাজার জামাই হবে, সামান্য ঘিয়ের কথা কি তার মনে থাকে? আহ্লাদে আটখানা হয়ে যেই নেচে উঠেছি, অমনি মাটিতে পড়ে কলসিটা চুরমার। এ জন্যে আমার ঘাড়ে দোষ চাপান কি উচিত হয়েছে?'

রামধনের বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া রাজা হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, 'আমি দেখছি, এ ব্যাপারে রামধনেরই বেশি লোকসান হয়েছে। আহা! বেচারার বিয়েটা পর্যন্ত মাটি হয়ে গেল! ওকে আমি ক্ষমা করলাম!'

ইহার পর বর হাতজোড় করিয়া বলিল, 'প্রভু, রামধন আমার সর্বনাশ করেছে। আমি বিয়ে করে বৌ নিয়ে আসছি, হতভাগা এককোপে তার

গলা কেটে ফেলেছে। দোহাই হুজুর! বিচার করুন।'

বরের নালিশ শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'রামধন, তোমার কি বলবার আছে? এমন অন্যায় কাজ কেন করলে?'

'হুজুর তবে শুনুন! কনের যে হাতি, সেটা ছিল প্রকাণ্ড—ঐরাবত বললেই হয়! কিছুতেই সিং-দরজায় ঢুকছিল না। আমি গলা কেটে ছোট করে না দিলে, আস্ত কনেটাই বাইরে পড়ে থাকত! কি অকৃতজ্ঞ! কাজ হাসিল করে দিয়েছি, সেজন্যে কোথায় ধন্যবাদ দেবে, না উলটে আবার নালিশ!'

রামধনের যুক্তি শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'ঠিক কথা। কনের সমস্ত শরীর বাইরে পড়ে থাকত, তার চেয়ে বরং শুধু মাথাটাই রইল। এ তো বুদ্ধিরই কাজ। এজন্যে রামধনের প্রশংসা করতে হয়।'

শেষে বুড়ি অগ্রসর হইয়া বলিল, 'হুজুর, এই মুখপোড়া আমার স্বামীকে খুন করে ঘরদোর জ্বালিয়ে দিয়েছে!'

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হে রামধন, ঘর জ্বালানো আবার খুন?'

'আজ্ঞে, বুড়ির কথা মিছে নয়। কিন্তু নিজের দোষেই ওর সর্বনাশ হয়েছে। আমার বিপদে কোথায় আহা বলে দুঃখ প্রকাশ করবে, না, তামাশা জুড়ে দিলে! আর কথা ছিল না, জিজ্ঞেস করলে, 'বল তো বাপ রামধন, রাবণের কথা কি জান! কিরূপে তার মুণ্ডপাত হল! আর কেমন করেই বা লঙ্কা পুড়লো?'

'আপনার চৌকিদার সাক্ষী, বুড়ির হাত ছাড়াতে আমি বিস্তর চেষ্টা করেছি, কিন্তু ও কিছুতেই ছাড়লে না। তখন ভাবলাম, ও কথার উত্তর মুখে না দিয়ে কাজে দেখিয়ে দি! এই ভেবেই বুড়োর গলায় এক কোপ দিয়ে বললাম, 'দেখলে তো, ঠিক এইরকমে রাবণের মুণ্ডপাত হয়েছিল' আর ঘরের চালে আগুন লাগিয়ে দিয়ে বললাম, 'বুঝলে তো, ঠিক এইরকমে লঙ্কা পুড়েছিল।' এখন প্রভু, বিচার করুন!'

রামধনের কথা শুনিয়া রাজা বুড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'তোমার সর্বনাশ হয়েছে বটে, কিন্তু আমি ওকে ক্ষমা করলাম।' এই বলিয়া রাজা রামধনকে ছাড়িয়া দিতে হুকুম করিলেন।

রাজার ন্যায়বিচারে মুক্তিলাভ করিয়া রামধন সবেমাত্র বাহিরে আসিয়াছে, এমন সময় একটা মশা উড়িতে-উড়িতে তাহার মুখে হুল ফুটাইয়া দিল।

ইহাতে বীর রামধনের রাগ কত! সে এক চাপড়ে মশার প্রাণসংহার করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু এরূপ কাজে সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে, রামধনের অদৃষ্টেও তাহা ঘটিল! মশা কোথায় উড়িয়া পলাইল, তাহার ঠিকানা নাই লাভের মধ্যে মশা মারিতে রামধনের গালে চড়! রাজবাড়ির মশার এরূপ বেয়াদবি! রামধনের আর সহ্য হইল না।

সে ছুটিয়া রাজার কাছে গিয়া মশার নামে নালিশ করিল! নালিশ শুনিয়া রাজা হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, 'রামধন, আমি তোমাকে এই অধিকার দিচ্ছি যে, মশা দেখলেই মারতে পারবে।' রাজার কথা শেষ না হইতেই রামধন দেখিল, রাজার ঠিক নাকের উপরে একটা মশা বসিয়াছে। অমনি বিরাশি সিক্কা ওজনের এক কিল! সে এক কিলেই রাজা অজ্ঞান হইয়া সিংহাসন হইতে পড়িয়া গেলেন।

চেতনা হইলে রাজা দেখিলেন, রামধন ভয়ে ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে। তিনি তাহাকে সাহস দিয়া বলিলেন, 'ভয় কি! তুমি ঠিক কাজই করেছ। এখন বাড়ি যাও।'

রাজবাটী হইতে বাহির হইয়া, রামধন ছুটিয়া মায়ের কাছে গিয়া সকল কথা বলিল। রামধনের মা তাহাকে পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। ভাবিল, 'আহা! আমার কি কপাল!'

রামধনের মা ঠিকই ভাবিয়াছিল! এমন বুদ্ধিমান ছেলে কি সহজে মিলে!

প্রেমের জয়

দীনেন্দ্রকুমার রায়

অনেককাল আগে আসাম দেশে এক রাজা ঝিলেন, রাজার নাম শত্রুজিত সিংহ। এই রাজার সুশাসন-গুণে ও দয়ার প্রজাদের সুখের সীমা ছিল না। রাজার মতো রানিও বড়ো দয়াবতী ছিলেন, সকল লোক তাঁহাকে মায়ের মতো ভালোবাসিত এবং ভক্তি ও সম্মান করিত।

রাজা শত্রুজিত ও রানি সুভদ্রার একটিমাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল, ছেলেটি শান্তশিষ্ট ও সুন্দর বলিয়া মা-বাপে তাহার নাম রাখিয়াছিলেন, সুদর্শনকুমার। সুদর্শন যত বড় হইতে লাগিল, তাহার প্রতি পিতা-মাতার ভালোবাসা ততই বাড়িয়া উঠিল, সুদর্শন মা-বাপকে ছাড়িয়া একদণ্ডও অন্য জায়গায় থাকিত না; রাজপুত্রকে দেখিয়া সকলেরই আশা হইয়াছিল, যে সে কালে তাহার পিতার ন্যায় সাহসী, বীর ও পণ্ডিত এবং মায়ের মতো কোমলহৃদয় ও পরদুঃখকাতর হইবে।

রাজা শত্রুজিতের রাজ্যের অদূরে কামরূপ রাজ্য; কামরূপের রাজা দুর্জয় সিং অত্যন্ত অত্যাচারী, প্রজাপীড়ক ও অসচ্চরিত্র ছিল। তাহার কঠোর শাসনে প্রজাগণের কষ্টের সীমা ছিল না, সে কাহাকেও ভালোবাসিত না,

কাহারও ভালো দেখিতে পারিত না; শত্রুজিত সিংহ বড়ো ভালো লোক, তিনি পরোপকারী, প্রজাহিতৈষী রাজা। তাঁহার এ প্রশংসা দুর্জয় সিং অসহ্য বোধ করিত, নানাপ্রকারে তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করিত। একবার দুর্জয় সিং-এর অত্যাচারে বিব্রত হইয়া কতকগুলি প্রজা কামরূপ ছাড়িয়া শত্রুজিতের রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিল, দুর্জয় সিং এই সংবাদ পাইয়া শত্রুজিত সিংহকে কড়া এক পত্র লিখিল; তাহাতে লিখিল, যদি তিনি তাহার প্রজাগণকে অবিলম্বে তাহার রাজ্যে ফেরত পাঠাইয়া না দেন, তাহা হইলে সে শত্রুজিতের সর্বনাশ করিবে, তাঁহার রাজ্য রসাতলে পাঠাইবে।

শত্রুজিত সিংহ সেই পত্র পাইয়া কিছুমাত্র ভীত বা চিন্তিত হইলেন না, দুর্জয় সিংকে লিখিলেন, 'তোমার অত্যাচারে জ্বালাতন হইয়া যাহারা আমার সিংহাসনছায়ায় আশ্রয় লইয়াছে, তাহাদিগকে আমি কোনওমতে পাঠাইয়া দিতে পারি না। ইচ্ছা হইলে তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তোমার বল পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। ক্ষমতা থাকে, সসৈন্যে আমাকে পরাজয় করো, তাহার পর তোমার যাহা খুশি করিও।'

এই পত্র পাইয়া দুর্জয় সিং ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু রাজা শত্রুজিতকে পরাস্ত করিবার মতো সাহস বা সৈন্যবল তাহার ছিল না। তাহার তেমন অর্থও ছিল না যে অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া শত্রুজিতকে আক্রমণ করে নির্দয় লোকই অধিক কাপুরুষ হয়। তাহার ভয় হইল, যদি সে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারে, যদি শত্রুসৈন্য তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দি করিয়া ফেলে, তাহা হইলেই তো সর্বনাশ! সুতরাং সে যুদ্ধের সংকল্প পরিত্যাগ করিল, যুদ্ধের পরিবর্তে কী কৌশলে শত্রুজিতকে শাসন করিতে পারা যায়, সেই কথাই চিন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু কোনও কৌশলই তাহার মাথায় আসিল না। শেষে দুর্জয় সিং অন্য উপায় না দেখিয়া তাহার কুকর্মের সহচর ঘণ্টাকর্ণ নামক এক জাদুকরকে ডাকিয়া বলিল, 'ভাই ঘণ্টাকর্ণ, তুমি ভেলকি লাগাইয়া রাজা শত্রুজিতকে আমার অধীন করিয়া দেও, তাহা হইলে তুমি যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে; আমি তোমার কেনা গোলাম হইয়া থাকিব।' ঘণ্টাকর্ণ তো তাহাই চায়, দুর্জয় সিং-এর কথা শুনিয়া সে ভারি খুশি হইল, সেলাম করিয়া বলিল, 'যে আজ্ঞা মহারাজ, আমি ভেলকির জোরে চন্দ্র-সূর্যকে আকাশ হইতে মাটিতে টানিয়া আনিতে পারি, আর

একটা রাজাকে আপনার বশ করিতে পারিব না? নিশ্চয়ই পারিব, দেখুন আমার বাহাদুরি।' বাহাদুরি দেখাইবার জন্য ঘণ্টাকর্ণ আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিল।

রাজার চর সর্বত্র থাকে। দুর্জয় সিং-এর রাজ্যে রাজা শত্রুজিতেরও চর ছিল; কয়েকদিন পরে রাজা শত্রুজিত গুপ্তচরের মুখে ঘণ্টাকর্ণের প্রতিজ্ঞা শুনিতে পাইলেন, কিন্তু তিনি সে সংবাদে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না· তিনি জানিতেন ভগবান ধার্মিক লোককে সর্বদা রক্ষা করেন, অধার্মিকেরা কখনও-কখনও ধার্মিক লোকের অপকার করিতে সমর্থ হয় বটে, কিন্তু ধার্মিক লোক ঈশ্বরের অনুগ্রহে শীঘ্রই সেই অপকারের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন। রানি সুভদ্রা যখন শুনিলেন, তাঁহাদের সর্বনাশ করিবার জন্য দুর্জয় সিং ঘণ্টাকর্ণের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছে তখন তাঁহার মনে বড়ো ভয় হইল; পাছে পুত্রের কোনও অপকার ঘটে, এই ভয়ে স্নেহময়ী জননী ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন, তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া করজোড়ে বলিলেন, 'হে পরমেশ্বর, হে অগতির গতি; দেখিও, যেন আমার সুদর্শনের কোনও অনিষ্ট না হয়, তুমি তাহাকে সর্বদা নিরাপদে রক্ষা করিও।' রানি আদেশ করিলেন, একজন ভৃত্য সর্বদা সুদর্শনকুমারের সঙ্গে থাকিবে, তাহাকে কোথাও একাকী যাইতে দিবে না।

সুদর্শনের বয়স যখন দশ বৎসর, সেই সময় একদিন সে রাজবাড়ির বাহিরে নদীতে মাছ ধরিতে গেল। রাজবাড়ির অদূরে এই নদী, নদীর তীরে বড়ো-বড়ো গাছ, বাঁশবন, বেতবন; গাছের ছায়া নদীর নির্মল জলে পড়িয়াছে, বেতের অগ্রভাগ নত হইয়া নদীর জল স্পর্শ করিয়াছে, গাছের ডালে বসিয়া কত বনের পাখি মধুরস্বরে গান করিতেছে, নদীকূলে চূর্ণ রৌপ্যের ন্যায় বালিরাশিতে রৌদ্র প্রতিফলিত হইয়া চিকচিক করিতেছে, রাজপুত্র কূলে বসিয়া নদীজলে ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে, মাথার উপর বৃক্ষশাখা, ঘন পল্লব ভেদ করিয়া সূর্যালোক তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, কপালে দুই-এক বিন্দু ঘর্ম দেখা দিয়াছে, ভৃত্য অদূরে একটা বড়ো গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া ঝিমাইতেছে। শীতের মধ্যাহ্নে ঈষৎতপ্ত বাতাসে এবং পাখির গান ও নদীর কলকল শব্দে তাহার চক্ষুদুটি মুদিয়া আসিয়াছিল।

সুদর্শনকুমারের দৃষ্টি সেই ছিপের ফাতনার দিকে, ফাতনাটা ভাসিতেছিল, হঠাৎ সেটা ডুবিয়া গেল, সঙ্গে-সঙ্গে ছিপখানা নড়িয়া উঠিল। সুদর্শন ব্যগ্রভাবে দুই হস্তে ছিপখানি টানিয়া তুলিয়া একটা ঝিঁকে মারিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড বোয়ালমাছ মাথা তুলিয়া আবার তখনই ডুবিয়া গেল এবং মাথা নিচু করিয়া গভীর জলে ছুটিল। ছিপের সুতায় টান লাগিল, ছিপের মাথা নুইয়া গেল; বেশি জোরে টানিলে সুতা ছিঁড়িয়া যাইবে, বা মাছ খুলিয়া যাইবে ভাবিয়া সুদর্শন আর ছিপ ধরিয়া টানিল না, ছিপ হাতে লইয়াই জলে নামিয়া পড়িল; তাহার জরির জুতা, মাথার তাজ তীরে পড়িয়া রহিল। বিশেষ গোলমাল না হওয়ায় ভৃত্যের নিদ্রাভঙ্গ হইল না, পাখিরা আগের মতো গান করিতে লাগিল।

কিন্তু মাছটা যখন ছিপখানা টানিয়া ক্রমে বেশি জলে লইয়া চলিল, তখন সুদর্শনকুমারের মনে বড়ো ভয়ের সঞ্চার হইল। সে ছিপখানি ছাড়িয়া সাঁতার দিয়া কূলের দিকে আসিতে লাগিল। সে তীরের নিকটে আসিয়াছে, এমন সময় সেই বোয়ালমাছটা হঠাৎ একটা কালো প্রকাণ্ড অসুরের মতো দেহ ধারণ করিয়া সুদর্শনকুমারকে দুই হাতে ধরিয়া, কাঁধে তুলিয়া লইয়া নদীর ধার দিয়া, বনের ছায়ায়-ছায়ায়, জঙ্গল পার হইয়া দ্রুতপদে কামরূপের দিকে ধাবিত হইল; সুদর্শনকুমার একবার চিৎকার শব্দে তাহার ভৃত্যকে ডাকিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু চিৎকার করিবার পূর্বেই সেই অসুরটা সুদর্শনের মুখটা চাপিয়া ধরিয়াছিল। সুদর্শন আর একটা কথাও উচ্চারণ করিতে পারিল না, চোরের কাঁধের উপর তাহার মূর্ছা হইল। তোমরা বুঝিয়াছ, এই চোর আর কেহ নহে, দুর্জয় সিং এর বন্ধু ঘণ্টাকর্ণ, এতদিন পরে সে শত্রুজিতকে শাসন করিবার কৌশলে কৃতকার্য হইয়াছে। তাহারই জাদুর বলে চাকরটা গাছের ছায়ায় পড়িয়া তখন নাক ডাকাইতেছিল।

ঘমু ভাঙিয়া চাকরটা একেবারে লাফাইয়া উঠিল, হঠাৎ তাহার মনে হইল, কাজটা বড়োই অন্যায় হইয়া গিয়েছে; দুই হাতে চোখ ডলিয়া সে একবার নদীর দিকে চাহিল, দেখিল সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সুদর্শন যেখানে বসিয়া মাছ ধরিতেছিল, সেখানে নাই। উঠিয়া সে নদীর ধারে আসিল, কাহাকেও দেখিতে পাইল না, কেবল দেখিল সুদর্শনের জরির জুতা ও মাথার তাজ পড়িয়া আছে, ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল,

তাহার ভারি কান্না আসিতে লাগিল, কিন্তু চোখে জল আসিল না; সে একেবারে ঘামিয়া উঠিল, নদীর ধারে খানিকক্ষণ ছুটাছুটি করিল, 'দাদু' 'দাদু' করিয়া কম্পিত কণ্ঠে কতবার ডাকিল, বনজঙ্গল একশত বার করিয়া খুঁজিল, কিন্তু কোথাও সুদর্শনের সন্ধান পাইল না। শেষে সে রাজবাড়িতে আসিয়া রাজার পায়ের কাছে ধড়াস করিয়া পড়িল, রাজাকে বলিল, 'মহারাজ, আমি অপরাধী, আমার প্রাণদণ্ড করুন, কুমার আমার সঙ্গে নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, হঠাৎ জলে পড়িয়া ডুবিয়া গিয়াছেন, আমি তাঁহাকে তুলিতে পারি নাই।'

রাজবাড়িতে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। মুহূর্তমধ্যে এ-সংবাদ রানির কর্ণগোচর হইল। রানি সুভদ্রা পাগলিনীর মতো হইয়া নদীর ধরে ছুটিয়া আসিলেন, দেখিলেন, জলের ধারে সুদর্শনের তাজ ও জুতা পড়িয়া আছে, তিনি তাহা দুইহাতে কুড়াইয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন, তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল; অতিকষ্টে বলিলেন, 'বাবা সুদর্শন, অঞ্চলের নিধি, আমার অন্ধের নয়ন, কোথায় গেলি বাপ, তোকে হারাইয়া আমি যে দশদিক শূন্য দেখিতেছি। সুদর্শন! সুদর্শন!'—রানি নদীতীরে বালুকারাশির উপর বসিয়া পড়িয়া নতমুখে কাঁদিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সূর্য রক্তনেত্র মেলিয়া, নদীর জলে আলো ঢালিয়া পাহাড়ের আড়ালে অস্ত গেল। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত চারিদিকে রাজপুত্রের অনুসন্ধান হইল, কিন্তু কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল না। তখন সে দুর্জয় সিংহের কারাবন্দী, শত্রুজিত তাহাকে কোথায় খুঁজিয়া পাইবেন? সকলেই শ্রান্ত হইয়া রাজবাড়িতে ফিরিয়া গেল। রাজা ও রানির উভয়েই বুঝিলেন, ঘণ্টাকর্ণই তাঁহাদের ননীর পুতলীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।

রাজা পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। সুদর্শনকে যে আনিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে সাত রাজার ধন মানিক দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন, কিন্তু কেহই সুদর্শনকে আনিয়া দিতে পারিল না। রাজা দেশে-দেশে লোক পাঠাইলেন, সকলেই অকৃতকার্য হইয়া নিরাশ হৃদয়ে ফিরিয়া আসিল। রাজার গুপ্তচরেরা নামরূপে সন্ধান করিতে গিয়া সুদর্শনের কোনওই সন্ধান পাইল না। এক-দুই করিয়া বৎসর কাটিতে লাগিল, ক্রমে পাঁচ বৎসর

চলিয়া গেল। রানির সুভদ্রার সোনার অঙ্গে কালি পড়িল, চোখের জল চোখে শুকাইল, কিন্তু মনের আগুন নিবিল না।

পাঁচ বৎসর পরে একদিন সকালবেলা রানি সুভদ্রা অন্দরের ফুলবাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। প্রকাণ্ড বাগান, বাগানে নানা জাতীয় ফুল ফুটিয়া বাগনটি আলো করিয়া রাখিয়াছিল। রানি ঘুরিতে-ঘুরিতে একটি চাঁপা ফুলের গাছের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, ছয় বৎসর পূর্বে এই গাছটি সুদর্শনকুমার নিজের হাতে রোপণ করিয়াছিল; সেই গাছে আজ থোকা-থোকা ফুল ফুটিয়া সুগন্ধে চতুর্দিক পূর্ণ করিতেছে, আর যে গাছটি লাগাইয়াছিল সে কোথায়? এই গাছটি দেখিয়া রানির পুত্রশোক উথলিয়া উঠিল, তিনি সেই বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, 'বাবা সুদর্শনকুমার তুমি এখন কোথায় আছ? স্বর্গে কি এমন দেবতা কেহ নাই, যিনি এই অভাগিনী মায়ের দুঃখ দূর করিতে পারেন, আমার নয়নের মণি আমায় ফিরাইয়া দিতে পারেন?'

রানির কথা শেষ হইবামাত্র সেই চাঁপাগাছের উপর কে শিস দিল! চোখ সবিস্ময়ে রানি ঊর্ধ্বদিকে চাহিলেন, গাছের উপর হইতে কে অতি মিষ্টস্বরে বলিল, 'রমণী, কেঁদ না, আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব।'

রানি দেখিলেন, সেই চাঁপাগাছের একটি উঁচু ডালে আলতাপরা দুখানি ছোটো-ছোটো পা রাখিয়া একটি পরমাসুন্দরী বালিকা হাসিমুখে নতদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিতেছে;তাহার উজ্জ্বল নির্মল চক্ষুদুটিতে করুণা ও সমবেদনা বিকশিত, মুখের প্রসন্ন হাসিটি বড়োই মধুর, সংসারের পাপ-তাপ যেন সে হাসি স্পর্শ করিতে পারে না। বালিকার মাথায় ফুলের মুকুট, কুঞ্চিত ঘন কেশরাশি তাহার পিঠের উপর এলাইয়া পড়িয়াছে, তাহার সর্বাঙ্গ চাঁপা ফুলের রংয়ের পরিচ্ছদে আবৃত, তাহার এক হাতে একটি ছোট বাঁশি, অন্য হস্তে একথোকা চাঁপা ফুল।

রানি আশ্চর্য হইয়া সেই অপরূপ রূপ দেখিতে লাগিলেন. কে এই বালিকা? মানুষের কি এত রূপ হয়? আর এ অন্দরের বাগানে বাহিরের লোকই বা কিরূপে আসিবে? বাগানে এত স্থান থাকিতে বালিকা গাছের উপর উঠিয়াই বা দাঁড়াইয়া আছে কেন? রানি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না,

কিন্তু হঠাৎ তাহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসাও করিতে পারিলেন না।

মেয়েটি পূর্বের মতো মধুর স্বরে রানিকে বলিল, 'রানি, আমাকে দেখে তুমি খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছ কেন? তা আশ্চর্য হবারই কথা, আমি তো আর মানুষ নই, আমি পরী, নাম আমার চম্পকবিলাসিনী। এই চাঁপা ফুলের গাছেই আমার বাস; তুমি অনেকদিন এদিকে আস নাই, আসিলে অনেকদিন আগেই আমাকে দেখিতে পাইতে। রানি, তুমি কাঁদিতেছ কেন, তাহা আমি জানি; তোমার ছেলে হারাইয়াছ, সুদর্শনের অদর্শনে তুমি পাগলের মতো হইয়াছ, কতবার আমি মনে করিয়াছি, তোমার ছেলেকে তোমার কোলে আনিয়া দিয়া তোমার মনের কষ্ট নিবারণ করি, কিন্তু আমি নানা কারণে সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারি নাই। তুমি আর কেঁদ না, তোমার ছেলে ভালো আছে।'

রানি সেই গাছের নিচে জানু অবনত করিয়া বসিয়া পড়িয়া ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে চাহিয়া করজোড়ে বলিলেন, 'মা, তুমি আজ আমার মৃতদেহে প্রাণ দিলে! আমার সুদর্শনকুমার বেঁচে আছে শুনে আমার একটু আশা হল। বাছা আমার কোথায় আছে? আজ পাঁচ বৎসর তাকে দেখিনি, তার মধুর মা ডাক শুনিনি, পাঁচ বৎসর আমি একরকম আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছি। বলো মা, বাছাকে আমার কে ধরে রেখেছে, সে কতদূর? কেমন করে আমি তাকে পাব? তাকে এনে দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচাও। সে যেখানে থাকে, সেখানে গিয়া আমি তাকে বুকে করে নিয়ে আসব। একদণ্ড বাছাকে আমার কোল হতে নামাব না। শুধু বলে দাও, সে কোন জায়গা, কতদূরে, কোন দেশে?'

চম্পকবিলাসিনী বলিলেন, 'রানি, তুমি উতলা হয়ো না। তোমার ছেলে ভালো আছে, কামরূপে সে শত্রুর হাতে পড়েছে! আমি যেমন করে পারি, তাকে উদ্ধার করে এনে তোমাকে দেব। কিন্তু তাকে কামরূপ হতে উদ্ধার করে আনা ভারি শক্ত কাজ। বিখ্যাত জাদুকর ঘণ্টাকর্ণ জাদুর বলে তাকে আটক করে রেখেছে। ঘণ্টাকর্ণের জাদু নষ্ট করা আমার পক্ষেও বড়ো কঠিন কাজ।'

রানি কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে কী হবে মা? বাছা আমার ঘণ্টাকর্ণের হাতে কতই না যাতনা ভোগ করবে। কেমন করে তুমি তাকে

ঘণ্টাকর্ণের হাত হতে উদ্ধার করবে?'

পরী বলিল, 'রানি তুমি হতাশ হয়ো না। তোমার শত্রু বলবান বটে, কিন্তু যারা সর্বদা মন্দ কাজই করে, কখনও তাদের মঙ্গল হয় না। যারা ধর্মপথে চলে, কিছুকাল তাদের কষ্ট পেতে হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তাদের জয় হয়ই হয়। আমরা গায়ের জোরে সুদর্শনকুমারকে উদ্ধার করতে পারব না বটে, কিন্তু বুদ্ধিবলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। আমি ঘণ্টাকর্ণকে এখনও বশ করতে না পারলেও এমন একটা উপায় আছে, যে তাকে আমার হাতে পড়তেই হবে। রানি, তুমি আরও কয়েকদিন ধৈর্য ধরিয়া থাক, আমার কথায় বিশ্বাস করো। তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি পাঁচদিনের মধ্যে তোমার পুত্রকে উদ্ধার করিয়া তোমার কোলে দিয়া যাইব। আমি তোমার ছেলেকে দেখিতে চলিলাম।'

রানি আশ্বস্ত হইয়া পরীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পরী ধীরে-ধীরে চম্পকবৃক্ষ হইতে অদৃশ্য হইল। রানি একবার চারিদিকে চাহিলেন, কোথাও পরীকে দেখিতে পাইলেন না, কেবল ফুলের গন্ধ বায়ুতে ভাসিয়া আসিতে লাগিল, পাখির মিষ্ট গান তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং প্রভাত-সূর্যের সুকোমল স্নিগ্ধ কিরণ আকাশ ও ধরণী প্লাবিত করিতে লাগিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ও চক্ষু মুছিয়া রানি অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

নিবিড় একটি অরণ্যের মধ্যে আসিয়া পরী চম্পকবিলাসিনী তাঁহার বাঁশিতে 'ফুঁ' দিলেন। মৌমাছির রানি ঝঙ্কারিণী সেই অরণ্যে একটি উচ্চ তরুশিরে বাস করিত। চম্পকবিলাসিনীর বাঁশির শব্দ শুনিয়া ঝঙ্কারিণী গুন গুন করিয়া গান গাহিতে-গাহিতে তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কীগো সই, হঠাৎ আমাকে স্মরণ করেছ কেন?'

চম্পকবিলাসিনী সহাস্যে বলিলেন, 'তোমার গান শুনতে, সখি, বড়ো ভালবাসি। তুমি গান গাও, আমি কান ভরে শুনি, তাই ডেকেছি।'

ঝঙ্কারিণী বলিল, 'না, ও তোমার মনের কথা নয়। গান তো চিরদিনই গাচ্ছি, কই, গান শুনবে বলে কখনও যে আমাকে ডেকেছে তা তো মনে পড়ে না। নিশ্চয়ই তোমার কোনও কাজ আছে, বলো তো কাজটা কী শুনি।'

চম্পকবিলাসিনী বলিলেন, 'বিশেষ শক্ত কাজ কিছু নয়;একটু পরোপকার করতে পারবে?'

ঝঙ্কারিণী বলিল, 'পরোপকারের জন্যই তো সাধু লোকের জীবন।'

চম্পকবিলাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কামরূপে দুর্জয় সিংহের অন্দরের বাগান চেনো?'

ঝঙ্কারিণী বলিল, 'খুব চিনি। সেখানে যেতে হবে নাকি?'

'হাঁ, তোমাকে একটু অনধিকার প্রবেশ করতে হবে।'

'সে কাজে আমার খুব দক্ষতা আছে। আমি দলবল নিয়ে সে বাগানে অনেকবার অনধিকার প্রবেশ করেছি। সেখানে চন্দ্র-সূর্যের আলোক প্রবেশ করতে পারে না, কিন্তু আমাদের গতি রোধ করে এত সাধ্য কার? মাসখানেক পূর্বে একদিন আমি সেই বাগানে গিয়েছিলেম, সেই বাগানে এ দেশের রাজপুত্রকে বন্দি করে রেখেছে, রাজপুত্র মা মা করে কাঁদছে। দেখে যে আমার দুঃখ হল। ইচ্ছা হতে লাগল, পাষণ্ড দুর্জন সিংটার নাকের ডগায় হুল ফুটিয়ে তাকে নাস্তানাবুদ করে রেখে আসি—তা সেখানে যেতে বলছ কেন?'

চম্পকবিলাসিনী বলিলেন, 'সেই রাজপুত্রকে আমি উদ্ধার করে আনব, আমি এ দেশের রানির কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, কিন্তু তোমার সাহায্য ভিন্ন তাকে উদ্ধার করতে পারব না।'

ঝঙ্কারিণী বলিল, 'কেমন করে তাকে উদ্ধার করবে? রাজপুত্রের চারিদিকে অসুরের মতো এক একটা প্রকাণ্ড দারোয়ান খোলা তলোয়ার হাতে পাহারা দিচ্ছে।'

চম্পকবিলাসিনী হাসিয়া উত্তর দিলেন, 'তোমার তো আর তলোয়ারের ভয় নেই, তুমি দলবল নিয়ে যাও, সেই বাগানের কোনও গাছের ডালে একখানি চাক বাঁধ, কিন্তু দেখো, সে চাকে যেন পদ্মের মধু ভিন্ন অন্য ফুলের মধু সংগ্রহ করা না হয়। মধুতে চাক পূর্ণ হলে আমার কাছে এসে খবর দিয়ো, কিন্তু তিনদিনের মধ্যে এ কাজ শেষ করতে হবে। আমি রানির কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি পাঁচদিনের মধ্যে আমি তাঁর ছেলেকে তাঁর কোলে এনে দেব। শীঘ্র যাও, পরের জন্য এই কষ্টটুকু স্বীকার করো।'

ঝঙ্কারিণী বলিল, 'তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলেন না। খাঁটি পদ্ম

ফুলের মধু কী কাজে লাগবে? তার সঙ্গে রাজপুত্রের উদ্ধারের কী সম্বন্ধ?'

চম্পকবিলাসিনী বলিলেন, 'সে খবরটা না নিয়ে বুঝি নড়বে না? আচ্ছা শোনো, কামরূপের রাজা দুর্জয় সিংকে আমি ভয় করিনে, কিন্তু ভয় সেই রাজ্যের জাদুকর ঘণ্টাকর্ণটিকে, ঘণ্টাকর্ণকে সহজে বশ করি আমার এমন সাধ্য নাই, কিন্তু সে যদি পদ্মের মধু খায় তাহলে একদিনের জন্যই তাকে আমার বশীভূত হতে হবে। ঘণ্টাকর্ণ বড়ো মধু ভালবাসে, সে কোনওরকমে পদ্মমধু খেলেই কার্যদ্ধার করতে পারব—বুঝেছ সখি?'

ঝঙ্কারিণী আর কোনও কথা না বলিয়া গুনগুন স্বরে গান করিতে-করিতে চলিয়া গেল, তাহার পর তাহার ঝাঁকের সমস্ত মৌমাছি সঙ্গে লইয়া কামরূপের পথে যাত্রা করিল।

সেইদিনই দুর্জয় সিংহের বাগানে, একটা অশোক ফুলের গাছে ঝঙ্কারিণী মৌচাক বাঁধিল।

কামরূপের রাজা দুর্জয় সিংহের যে বাগানবাড়িতে রাজপুত্র সুদর্শন আবদ্ধ ছিল, সে বাগানের চারিদিকে খুব উচ্চ প্রাচীর ছিল, সে প্রাচীর ডিঙাইয়া কেহই বাগানে প্রবেশ করিতে পারিত না; দেউড়ির বাহিরে প্রহরী সর্বদা খোলা তরবারি লইয়া পাহারা দিত। পাছে সুদর্শন কোনওদিক দিয়া লুকাইয়া পলায়ন করে, এই ভয়ে দুর্জয় সিংহ তাহার সঙ্গে দুইজন পাহারাওয়ালা রাখিয়াছিল।

একদিন সকালবেলা এই দুইজন পাহারাওয়ালার সঙ্গে সুদর্শন সেই বাগানের মধ্যে বেড়াইতেছিল, সে অতি চমৎকার দিন; লাল সূর্য পূর্বদিকে গাছের আড়াল হইতে সবে উঁকি দিতেছে, ফুলগাছে শিশিরসিক্ত ফুলরাশি, মধুমক্ষিকাদল নানা ফুলে মধু খাইতে-খাইতে উড়িয়া উড়িয়া গুনগুন শব্দে গান করিতেছিল। পাখিরা গাছের শাখায় সবুজ পাতার মধ্যে বসিয়া কলরব করিতেছিল। এমন দিন কি একা এমন করিয়া বেড়াইতে ভাল লাগে? চারিদিকের এমন সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া মা-বাপের আদর-ভালবাসা, তাঁহাদের হাসিমুখ সুদর্শনের মনে পড়িতে লাগিল। তাহার দুটি চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল। সে একটা গাছের কাছে আসিবামাত্র একটা দোয়েল পুচ্ছ দোলাইয়া মনের আনন্দে শিস দিয়া উঠিল। সুদর্শন বলিল, 'পাখি, যদি

আমি তোমার মতো স্বাধীন হইতাম, তাহা হইলে আজ আমার কতো আনন্দ হইত! তাহা হইলে আমি বাবাকে দেখিতে পাইতাম, মার কোলে উঠিতাম! আমাকে না দেখে মা আমার কতই কাঁদিতেছেন, এজন্মে আর তাঁর চোখের জল মুছাইতে পারিলাম না। এ কারগার হইতে আর কখনও উদ্ধার পাইব না। হে পরমেশ্বর তুমি বিপদের বন্ধু, তুমি দয়ার সাগর, তুমি আমাকে এ বিপদে রক্ষা কর। আর বেশিদিন এখানে থাকিলে আমি মরিয়া যাবি।'

হঠাৎ গুনগুন করিয়া শব্দ হইল, ক্রমেই গুনগুন শব্দ বাড়িতে লাগিল, যেন একপাল মৌমাছি কোনও মৌচাক হইতে উড়িয়া আসিতেছে। একটু পরেই সুদর্শনের রক্ষীদুজন ষাঁড়ের মতো চিৎকার করিতে-করিতে, ঢাল-তলোয়ার ফেলিয়া ব্যাকুলভাবে সর্বাঙ্গ ঝাড়িতে ঝাড়িতে সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল। সুদর্শন দেখিল মৌমাছির দল বনবন শব্দে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া চলিয়াছে। সুদর্শনের মনেও ভয় হইল, সে পলাইবার জোগাড় করিতেছে এমন সময় কে তাহাকে ডাকিয়া মিষ্টস্বরে বলিল, 'সুদর্শনকুমার, তুমি ভয় পাইও না, এ মৌমাছির দল তোমার শত্রু নহে, আমার ভৃত্য. আমি তোমাকে রক্ষা করিব।'

সুদর্শন আশ্চর্য হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইল না। এখানে তো কোনও মানুষের প্রবেশের অধিকার নাই, তবে কে তাহাকে এমন মিষ্টবাক্যে আশ্বাস দান করিল? কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কে, কোথা হইতে কথা কহিতেছেন? আমি তো কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।' 'ওই দিকে দেখো'—বলিতেই সুদর্শন পাশের চাঁপা ফুলের গাছটার দিকে চাহিল, সেই গাছের ডালে একটি সুন্দরী ছোট মেয়েকে দেখিতে পাইল। এ সেই মৌমাছিদের রানির সখী পরী চম্পকবিলাসিনী।

চম্পকবিলাসিনী বলিলেন, 'তুমি পরমেশ্বরের নিকট তোমার দুঃখ জানাইয়াছ, তাই তিনি তোমার উদ্ধারের জন্য আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। দুঃখ ও বিপদে পড়িয়া যাহারা পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করে, তাহাদের সকল দুঃখ-কষ্ট দূর হয়। আমি তোমাকে তোমার মায়ের কোলে দিয়া আসিব, তিনি তোমাকে না দেখিয়া বড়ই কাতর হইয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীতে

যাহারা আপনার সাহায্য আপনি না করে, তাহারা পরমেশ্বরের সাহায্য লাভ করিতে পারে না। তোমাকে উদ্ধার লাভের জন্য নিজে একটু চেষ্টা করিতে হইবে। কি করিয়া চেষ্টা করিতে হইবে, শোনো; ওইদিকে অশোকের একটা ডালে একখানি মৌচাক দেখিতে পাইবে। তুমি কোনওরকমে ওই মৌচাকখানি ভাঙিয়া লইয়া রাজা ও ঘণ্টাকর্ণের সম্মুখে যাইবে, ও তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটু-একটু মধু খাইবে। মৌচাক ভাঙিতে ভয় করিও না, মৌমাছিরা আমার পোষা, তোমাকে কিছু বলিবে না। তোমাকে মধু খাইতে দেখিলেই ঘণ্টাকর্ণ তোমার হাত হইতে মধু কাড়িয়া লইয়া মুখে দিবে, আর তুমি জানালার কাছে ছুটিয়া গিয়া আমার এই পালকটিতে ফুঁ দিয়া তাহা বাতাসে উড়াইয়া দিবে।' পরী তাহার ডানা হইতে একটি পালক খুলিয়া লইয়া তাহা সুদর্শনের হাতে দিয়া সুদর্শনকে খুব সাবধানে এসকল কাজ করিতে বলিলেন।

সুদর্শন বলিল, 'পরী, তোমার বড় দয়া, তুমি আমাকে রক্ষা করো, তুমি যাহা যাহা করিতে বলিতেছ তাহাই করিব।'

পরী বলিলেন, 'তোমার কোনও ভয় নাই। ওই তোমার প্রহরীরা আসিতেছে, আমি চলিলাম।' পরী সবুজ পাতার মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইল, সুবর্ণ বর্ণের পালকটি কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া সুদর্শন প্রহরীদের সঙ্গে চলিল।

পরদিন সকালবেলা সুদর্শন বাগানে বেড়াইতে-বেড়াইতে অশোক গাছের গোড়ায় আসিল, প্রহরী-দুজনকে বলিল, 'ওই ডালে একখান মৌচাক দেখা যাচ্ছে; ওই দেখ কত মাছি উড়ছে; চাকখানি ভেঙে আনি?'

একজন প্রহরী তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, 'মৌচাক থাকে তো থাক, তোর তাতে কী? মৌমাছির হুল বুঝি বড়ো মিষ্ট, নয়? কাল গোটাকতক মৌমাছির তাড়ায় আমাদের দুজনকে প্রায় দেশ ছাড়তে হয়েছিল, আর উনি চাচ্ছেন মৌচাক ভাঙতে! অত সাহস ভালো নয়, আয় এদিকে চলে আয়।'

প্রহরীদের কথা না শুনিয়া সুদর্শন একলাফে গাছে উঠিল এবং যে ডালে মৌচাক ছিল, সেই ডালটা জোরে নাড়া দিল, মৌমাছিগুলি বনবন

শব্দে উড়িতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহারা সুদর্শনকে আক্রমণ করিল না, প্রহরীদুটাকে তাড়া করিয়া ছুটিল। প্রহরীরা পূর্বদিন মৌমাছির হুলে কত জ্বালা তাহা বুঝিয়াছিল, তাহারা প্রাণ লইয়া দৌড়িতে লাগিল। রাজপুত্র মৌচাকখানি ভাঙিয়া কাপড়ে ঢাকিয়া লইয়া রাজা দুর্জয় সিংহের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

দুর্জয় সিংহ ও ঘণ্টাকর্ণ তখন আমোদ করিতেছিল। আমোদ আর কিছু নয়, একটি পথিককে ধরিয়া তাহার মুণ্ডটা কাটিয়া লইয়া তাহা দিয়া ফুটবল খেলিতেছিল।

রাজপুত্রকে দেখিয়া দুর্জয় সিংহ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, 'কিহে ছোকরা, আছ কেমন? তোমার বাবা তোমার জন্য একটি বড়ো ভালো উপহার পাঠাইয়াছেন, নেবে?' সে সুদর্শনের গায়ে সেই রক্ত মাখা নরমুণ্ডটা ফেলিয়া দিয়া বড় আমোদ পাইল।

রাজপুত্র দর্জয় সিংহের এই ব্যবহারে মনে কষ্ট পাইল, তাহার দুই চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। সে মনে-মনে বলিল, 'হে পরমেশ্বর, তোমার রাজ্যে মানুষ মানুষের প্রতি এত অত্যাচার করে কেন? ইহাদের হৃদয় নাই, দয়া-মায়া কিছু নাই, এসকল পশুকে কেন পৃথিবীতে পাঠাইয়াছ?' কিন্তু সে প্রকাশ্যে কোনও কথাই বলিল না। পরীর উপদেশ তাহার মনে পড়িল, সুদর্শন কাপড়ের ভিতর হইতে মৌচাকখানি বাহির করিয়া বলিল, 'আমি তোমাকে এক জিনিস উপহার দিকে পারি খাও, বড়ো মিষ্ট।' সুদর্শন একটু মধু চিপিয়া মুখে পুরিল। ঘণ্টাকর্ণ চিৎকার করিয়া বলিল, 'মহারাজ, দেখো-দেখো ছোঁড়া বাগানের মধু চুরি করে এনেছে, কেড়ে লও এখনই?' —সে একলাফে সুদর্শনের ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহার হাত হইতে মৌচাকখানি কাড়িয়া লইল; তাহার পর দুর্জয় সিংহ ও সে দুইজনে সেই মধু ভাগ করিয়া খাইতে লাগিল। সুদর্শন তখন তাড়াতাড়ি জানালার কাছে আসিয়া পরীর পাখাটা ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিল। পাখাটা দেখিতে-দেখিতে একটা প্রকাণ্ড বাজ হইয়া রাজপুরীর চারিদিকে ঘুরিতে-ঘুরিতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

ঘণ্টাকর্ণ তাহা দেখিতে পাইয়া বলিল, 'মহারাজ, ছোঁড়াটা কার কাছে জাদুবিদ্যা শিখিয়াছে, আমাদের অনিষ্ট করিবে, এখনই ইহাকে মারিয়া ফেল।'

রাজা সুদর্শনকে দুই হাতে শূন্যে তুলিয়া বলিল, 'শীঘ্র বল, কাহার কাছে জাদু শিখিয়াছিস—না বলিলে এখনই এক আছাড়ে—'

ঘণ্টাকর্ণ অধীর হইয়া বলিল, 'দেখিতেছ কী মহারাজ, শীঘ্র উহাকে মারিয়া ফেল, একটু বিলম্ব করিলে মহা বিপদে পড়িবে, এমনকি আমাদের কাহারও প্রাণ রক্ষা হইবে না।'

রাজা সুদর্শনকে মাটিতে আছাড় দিবে, এমন সময় মাথার উপর বনবন করিয়া শব্দ হইল, তাহার পরই চারি-পাঁচশ মৌমাছি রাজা ও ঘণ্টাকর্ণ—দুজনকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাদের সর্বাঙ্গে হুল ফুটাইতে লাগিল। রাজা ও ঘণ্টাকর্ণ অস্থির হইয়া সুদর্শনকে ফেলিয়া দূরে পলাইয়া গেল।

কিন্তু ঘণ্টাকর্ণ সহজে পরাস্ত হইবার লোক নহে; সে দূরে দাঁড়াইয়া মন্ত্র বলে সেখানে এমন নিবিড় গন্ধকের ধূম উৎপন্ন করিল যে, মৌমাছির দল আর সেখানে তিষ্ঠিতে পারিল না, সকলগুলি উড়িয়া পলাইল। এই অবসরে সুদর্শন দৌড়িয়া বাগানের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল, যে গাছে সে পূর্বদিন পরীকে দেখিতে পাইয়াছিল, সে গাছতলায় আসিয়া কাতরভাবে বলিল, 'কোথায় আছ, দয়াময়ী পরী, এসময় দয়া করিয়া আমাকে বাঁচাও, তুমি রক্ষা না করিলে আমার আর উপায় নাই।' ক্রমে মৌমাছির গুনগুন শব্দ সেখানে পর্যন্ত শুনিতে পাওয়া গেল। দেখিতে-দেখিতে ঘণ্টাকর্ণ ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া সেইস্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। সুদর্শনকে বলিল, 'জাদুবিদ্যা আমিও জানি, দেখা যাক কার কত ক্ষমতা।'

'তোর ক্ষমতা আমার জানা আছে, তোর মৃত্যু নিকট!' —এই কথা বলিয়া পরী চাঁপাগাছ হইতে নামিয়া আসিলেন। আজও তাহার রানির মতো বেশ, কেবল হাতে একটি শ্বেতবর্ণ দন্ত। পরী সেই দন্তখানি নাড়িবামাত্র ঘণ্টাকর্ণের চারিদিক হইতে সমস্ত ধূম অদৃশ্য হইয়া গেল, ঘণ্টাকর্ণ অনেকক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া স্থিরভাবে পরীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল;তাহার পরে সক্রোধে গর্জন করিয়া বলিল, 'লাগ ভেলকি লাগ, অমাবস্যার রাত্রি আয়, নরকের অন্ধকার আয়, কোথায় বিষ, চলে আয়, এই পরীর প্রাণ নষ্ট কর।'

পরী ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, 'চুপ কর।' —তাঁহার চক্ষু দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল, তাঁহার উত্তপ্ত নিশ্বাস যেন ঘণ্টাকর্ণের সর্বাঙ্গ দগ্ধ করিতে লাগিল। ঘণ্টাকর্ণ বুঝিল পরীর কাছে তাহার পরাজয় হইয়াছে,

তাহার মন্ত্র আর খাটিবে না। সে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পরী তখন গম্ভীরস্বরে বলিল, 'ঘণ্টাকর্ণ, তুমি জাদুবিদ্যাবলে পৃথিবীতে অনেকেরই সর্বনাশ করিয়াছ, আমি তোমার সে বিদ্যা নষ্ট করিয়াছি। তোমার প্রাণটুকুই তোমার শরীরে আছে, আমি তাহা আর নষ্ট করিতে চাহি না। তুমি একাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাও, মানুষ মানুষকে ভালোবাসুক, ভাই বলিয়া সকলে পরস্পরকে আলিঙ্গন করুক। যদি এ রাজ্য ছাড়িতে না চাও তাহা হইলে আমি চিরদিন তোমাকে লোহার কারাগারে বন্দি করিয়া রাখিব, — যাও।'

ঘণ্টাকর্ণ দুর্জয় সিংহের রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেল। দুর্জয় সিংহ পরীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল, রাজা শত্রুজিত সিংহ পরীর অনুরোধে তাহাকে ক্ষমা করিলেন।

রাজপুত্র সুদর্শন পাঁচ বৎসর পরে আবার মায়ের কোলে ফিরিয়া আসিল, রানি হারানিধি পুত্রকে কোলে পাইয়া চুম্বনে ও অশ্রুতে তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিলেন। রাজ্যে আনন্দোৎসব উপস্থিত হইল, প্রজারা তাহাদের রাজাকে দীর্ঘকাল পরে সুখী হইতে দেখিয়া বড় আনন্দ লাভ করিল। রাজা ও রানি পরীর কাছে দাঁড়াইয়া করজোড়ে বলিলেন, 'তুমি আমাদের বড়ো উপকার করিয়াছ, তোমার দয়ার ঋণ শোধ করি আমাদের এরূপ সাধ্য নাই।'

পরী হাসিয়া বলিলেন, 'আমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হইবে না। তোমরা তোমাদের সৎকর্মের পুরস্কার লাভ করিয়াছ। তুমি প্রেম দিয়া হিংসাকে জয় করিয়াছ, প্রেমের কাছে পাপ বাস করিতে পারে না, তাই সে পলাইয়া গিয়াছে। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দেও, চিরকাল প্রেমের জয় হউক।'

কানকাটা রাজার দেশ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক ছিল রাজা আর তাঁর ছিল এক মস্ত বড় দেশ তার নাম হল কান কাটার দেশ। সেই দেশের সকলেরই কান কাটা। হাতি, ঘোড়া, ছাগল, গরু, মেয়ে, পুরুষ, গরিব, বড় মানুষ সকলেরই কান কাটা। বড়লোকদের এক কান, মেয়েদের এক কানের আধখানা, আর যত জীব-জন্তু, গরিব-দুঃখীদের দুটি কানই কাটা থাকতো। সে দেশে এমন কেউ ছিল না যার মাথায় দুটি আস্ত কান, কেবল সেই কান কাটা দেশের রাজার মাথায় একজোড়া আস্ত কান ছিল। আর সকলেই লম্বা চুল দিয়ে, কেউ চাপ দাড়ি দিয়ে কেউ বা বিশ গজ মলমলের পাগড়ি দিয়ে, কাটা কান ঢেকে রাখত, কিন্তু সেই রাজা মাথা একেবারে ন্যাড়া করে সেই ন্যাড়া মাথায় জরির তাজ চাপিয়ে গজমোতির বীরবৌলিতে দুখানা কান সাজিয়ে সোনার রাজ-সিংহাসনে বসে থাকতেন।

একদিন সেই রাজা এক কান মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কান কাটা ঘোড়ায় চেপে শিকারে বের হলেন। শিকার আর কিছুই নয়, কেবল জন্তু-জানোয়ারের কান কাটা। রাজ্যের বাইরে এক বন ছিল, সেই বনে কান কাটা দেশের রাজা আর

এক কান মন্ত্রী কান শিকার করে বেড়াতে লাগলেন। এমনি শিকার করতে করতে বেলা যখন অনেক হল, সূর্যদেব মাথার উপর উঠলেন, তখন রাজা আর মন্ত্রী এক প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় ঘোড়া বেঁধে, শুকনো কাঠে আগুন করে যত জীবজন্তুর শিকার করা কান রাঁধতে লাগলেন। মন্ত্রী রাঁধতে লাগলেন আর রাজা খেতে লাগলেন, মন্ত্রীকেও দু-একটা দিতে লাগলেন। এমনি করে দুজনে খাওয়া শেষ করে সেই গাছের তলায় শুয়ে আরাম করছেন, রাজার চোখ বুজে এসেছে, মন্ত্রীর বেশ নাক ডাকছে, এমন সময় একটা বীর হনুমান সেই গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে রাজাকে বললে, 'রাজা তুই বড় দুষ্ট, সকলের কান কেটে বেড়াস, আজ সকালে আমার কান কেটেছিস, তার শাস্তি ভোগ কর।' এই বলে রাজার দুই গালে দুটো চড় মেরে একটা কান ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল। রাজা যাতনায় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ পরে যখন জ্ঞান হল, তখন রাজা চারদিকে চেয়ে দেখলেন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, হনুমানটা কোথাও নেই, মন্ত্রীবর পড়ে নাক ডাকাচ্ছেন। রাজার এমনি রাগ হল যে তখনি মন্ত্রীর কানটা এক টানে ছিঁড়ে দেন, কিন্তু অমনি নিজের কানের কথা মনে পড়লো, রাজা দেখলেন ছেঁড়া কানটা ধূলায় পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি সেটিকে তুলে নিয়ে সযত্নে পাতায় মুড়ে পকেটে রেখে, তাজ টুপির সোনার জরির ঝালর কাটা-কানের উপর হেলিয়ে দিলেন যাতে কেউ কাটা-কান দেখতে না পায়। তারপর মন্ত্রীর পেটে গুঁতো মেরে বললেন, ঘোড়া আনো। এক গুঁতোয় মন্ত্রীর নাকডাকা হঠাৎ বন্ধ হল, আর এক গুঁতোয় মন্ত্রী লাফিয়ে উঠে রাজার সামনে ঘোড়া হাজির করলেন। রাজা কোনো কথা না বলে একটি লাফে ঘোড়ার পিঠে চড়ে একদম ঘোড়া ছুটিয়ে রাজবাড়িতে হাজির। সেখানে তাড়াতাড়ি সহিসের হাতে ঘোড়া দিয়েই একেবারে শয়নঘরে খিল দিয়ে পালঙ্কে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

সকাল হয়ে গেল, রাজবাড়ির সকলের ঘুম ভাঙল রাজা তখনও ঘুমিয়ে আছেন। রাজার নিয়ম ছিল রাজা ঘুমিয়ে থাকতেন আর নাপিত এসে দাড়ি কামিয়ে দিত, সেই নিয়মমতো সকালবেলায় নাপিত এসে দাড়ি কামাতে আরম্ভ করল। এক গাল কামিয়ে যেই আর এক গাল কামাতে যাবে এমন সময় রাজা 'দুর্গা-দুর্গা' বলে জেগে উঠলেন। নজর পড়ল নাপিতের দিকে, দেখলেন নাপিত ক্ষুর হাতে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ কানে হাত দিয়ে

দেখলেন, কান নেই। রাজা আপসোসে কেঁদে উঠলেন। কাঁদতে-কাঁদতে নাপিতের হাত ধরে বললেন, 'নাপিত ভায়া, একথা প্রকাশ করো না। তোমাকে অনেক ধনরত্ন দেব।' নাপিত বললে, 'কার মাথায় দুটো কান যে একথা প্রকাশ করবে।' শুনে রাজা খুশি হলেন। নাপিতের কাছে আর আধখানা দাড়ি কামিয়ে তাকে দু-হাতে দু-মুঠো মোহর দিয়ে বিদায় করলেন। নাপিত মোহর নিয়ে বিদায় হল বটে কিন্তু তার মন সেই কাটা কানের দিকে পড়ে রইল। কাজে-কর্মে, ঘুমিয়ে-জেগে কি লোকের দাড়ি কামাবার সময়, কি সকালে কি সন্ধ্যে মনে হতে লাগল, রাজার কান কাটা, রাজার কান কাটা। কিন্তু কারুর কাছে একথা মুখ ফুটে বলতে পারে না—মাথা কাটা যাবে। নাপিত জাত সহজেই একটু বেশিকথা কয়, কিন্তু পাছে অন্য কথার সঙ্গে কানের কথা বেরিয়ে পড়ে সেই ভয়ে তার মুখ একেবারে বন্ধ হল। কথা কইতে না পেরে পেট ফুলে তার প্রাণ যায় আর কি?

এমন সময় একদিন রাজা নাপিতের কাছে দাড়ি কামিয়ে সোনার কৌটো খুলে কাটা কানটি নেড়ে-চেড়ে দেখছেন আর অমনি কোত্থেকে একটা কাক ফস্ করে এসে ছোঁ মেরে রাজার হাত থেকে কানটি নিয়ে উড়ে পালাল। রাজা বললেন, 'হাঁ হাঁ হাঁ ধরো ধরো। কাক কান নিয়ে গেল।' তারপর রাজা মাথা ঘুরে সেইখানে বসে পড়লেন। ভাবতে লাগলেন, প্রজাদের কাছে কী করে মুখ দেখাব।

এদিকে নাপিত ক্ষুর ভাঁড় ফেলে দৌড়। পড়ে—তো—মরে এমন দৌড়। শহরের লোক বলতে লাগল, 'নাপিত ভায়া নাপিত ভায়া, হল কী? পাগলের মত ছুটছ কেন?'

নাপিত না রাম না গঙ্গা, কাকের সঙ্গে ছুটতে ছুটতে একেবারে অজগর বনে গিয়ে হাজির। কাকটা একটা অশ্বত্থ গাছে বসে আবার উড়ে চলল, কিন্তু নাপিত আর এক পা চলতে পারলে না, সেই গাছের তলায় বসে পড়ে হাঁফাতে লাগল, আর ভাবতে লাগল, 'এখন কী করি? রাজার কান কাটা ছিল, তখন অনেক কষ্টে সে কথা চেপে রেখেছিলুম, এখন সেই কান কাকে নিলে একথাও যদি আবার চাপতে হয় তাহলে আমার একদম রফা! ফোলা পেট এবারে ফেঁসে যাবে। এখন করি কী?' নাপিত এই কথা ভাবছে, এমন সময় গাছ বললে, 'নাপিত ভায়া ভাবছ কী?'

নাপিত বললে, 'রাজার কথা।'

গাছ বললে, 'সে কেমন?'

তখন নাপিত চারিদিকে চেয়ে চুপি চুপি বললে—

'রাজার কান কাটা।
তাই নিলে কাক ব্যাটা।'

এই কথা বলতেই নাপিতের ফোলা পেট একেবারে কমে আগেকার মত হয়ে গেল, বেচারা বড়ই আরাম পেল, এক আরামের নিঃশ্বাস ফেলে মনের ফূর্তিতে রাজবাড়িতে ফিরে চলল।

নাপিত চলে গেলে বিদেশী একঢুলি সেই গাছের তলায় এল। এসে দেখলে গাছটা যেন আস্তে আস্তে দুলছে, তার সমস্ত পাতা থর থর করে কাঁপছে, সমস্ত ডাল মড় মড় করছে আর মাঝে মাঝে বলছে—

'রাজার কান কাটা।
তাই নিলে কাক ব্যাটা।'

ঢুলি ভাবলে, এত বড় মজার গাছ, এরই কাঠ দিয়ে একটা ঢোল তৈরি করি। এই বলে একখানা কুড়ুল নিয়ে সেই গাছ কাটতে আরম্ভ করলে।

গাছ বললে, 'ঢুলি, ঢুলি, আমায় কাটিসনে।'

আর কাটিসনে! এক, দুই, তিন কোপে ডাল কেটে নিয়ে, ঢোল তৈরি করে। 'রাজার কান কাটা' 'রাজার কান কাটা' বাজাতে বাজাতে ঢুলি কান কাটা শহরের দিকে চলে গেল।

এদিকে কান কাটা শহরের রাজা কান হারিয়ে মলিন মুখে বসে আছেন আর নাপিতকে বলছেন, 'নাপিত ভায়া একথা যেন প্রকাশ না হয়।' নাপিত বলছে, 'মহারাজ কার মাথায় দুটো কান যে একথা প্রকাশ করবে।' এমন সময় রাস্তায় ঢোল বেজে উঠল—

'রাজার কান কাটা।
তাই নিলে কাক ব্যাটা।'

রাজা রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে নাপিতের চুলের মুঠি এক হাতে আর অন্য হাতে খাপ-খোলা তরোয়াল ধরে বললেন, 'তবে রে পাজি! তুই নাকি একথা প্রকাশ করিসনি? শোন্ দেখি ঢোলে কী বাজছে। নাপিত

শুনলে ঢোলে বাজছে—

'রাজার কান কাটা।
তাই নিলে কাক ব্যাটা।'

নাপিত কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'দোহাই মহারাজ, একথা আমি কাউকে বলিনি, কেবল বনের ভিতর গাছকে বলেছি। তা নইলে হুজুর, পেটটা ফেটে মরে যেতুম! আর আমি মরে গেলে আপনার দাড়ি কে কামিয়ে দিত বলুন?'

রাজা বললেন, 'চল ব্যাটা গাছের কাছে।' বলে নাপিতকে নিয়ে রাজা মুড়ি-সুড়ি দিয়ে গাছের কাছে গেলেন।

নাপিত বললে, 'গাছ আমি তোমায় কী বলেছি? সত্য কথা বলবে।'

গাছ বললে—

'রাজার কান কাটা।
তাই নিলে কাক ব্যাটা।'

রাজা বললেন, 'আর কারো কাছে নাপিত বলেছে কি?'

গাছ বললে, 'না।'

রাজা বললেন, 'তবে ঢুলি জানলে কেমন করে?'

গাছ বললে, 'আমার ডাল কেটে ঢুলি ঢোল করেছে তাই ঢোল বাজছে— রাজার কান কাটা। আমি তাকে অনেকবার ডাল কাটতে বারণ করেছিলাম কিন্তু সে শোনেনি।'

রাজা বললেন, 'গাছ এ দোষ তোমার। আমি তোমায় কেটে উনুনে পোড়াবো।'

গাছ বললে, 'মহারাজ' এমন কাজ করো না। যেই ঢুলি আমার ডাল কেটেছে আমি তাকে শাস্তি দেব। তুমি কাল সকালে তাকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এস।'

রাজা বললেন, 'আমার কাটা কানের কথা প্রকাশ হল তার উপায়? প্রজারা যে আমার রাজত্ব কেড়ে নেবে।'

গাছ বললে, 'তোমার সে ভয় নেই, আমি কাল তোমার কাটা কান জোড়া দেব।

শুনে রাজা খুশি হয়ে রাজ্যে ফিরলেন। রাজা ফিরে আসতেই রাজার

রানী রাজার মন্ত্রী, রাজার যত প্রজা রাজাকে ঘিরে বললে, 'রাজামশাই তোমার কান দেখি।'

রাজা দেখালেন—এক কান কাটা। তখন কেউ বললে, 'ছি ছি', কেউ বললে, 'হায় হায়', কেউ বললে, 'এমন রাজার প্রজা হবো না।' তখন রাজা বললেন, 'বাছারা কাল আমার কাটা কান জোড়া যাবে। তোমরা এখন সেই ঢুলিকে বন্দী কর। কাল সকালে তাকে নিয়ে বনে যে অশ্বত্থ গাছ আছে তারই তলায় যেও!'

রাজার কথা শুনে প্রজারা ঢুলিকে বন্দী করার জন্য ছুটল।

তারপর দিন সকালে রাজা, মন্ত্রী, নাপিত, রাজ্যের যত প্রজা সেই ঢুলিকে নিয়ে ধূমধাম করে সেই অশ্বত্থ তলায় হাজির হলেন।

রাজা বললেন, 'অশ্বত্থ ঠাকুর ঢুলির বিচার করো।'

অশ্বত্থ ঠাকুর নাপিতকে বললেন, 'নাপিত, ঢুলির একটা কান কেটে রাজার কানে জুড়ে দাও।' নাপিত ঢুলির একটা কান কেটে রাজার কানে জুড়ে দিল। চারদিকে ঢাক-ঢোল বেজে উঠল রাজার কান জোড়া লেগে গেল। এমন সময় যে হনুমান রাজার কান ছিঁড়েছিল সে এসে বললে, 'অশ্বত্থ ঠাকুর বিচার করো, রাজামশায় আমার কান কেটেছে, আমার কান চাই।'

অশ্বত্থ ঠাকুর বললেন, 'রাজা, ঢুলির অন্য কান কেটে হনুকে দাও। একটা কান কাটা থাকলে বেচারির বড় অসুবিধা হত—দেশের বাইরে দিয়ে যেতে হত। এইবার ঢুলির দু'কান কাটা হল। সে এখন দেশের ভিতর দিয়ে যেতে পারবে।'

রাজা এককোপে ঢুলির আর এক কান কেটে হনুর কান জুড়ে দিলেন। তখন অশ্বত্থ ঠাকুর বললেন, 'ঢুলি এইবার ঢোল বাজাও।'

ঢুলি লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে ঢোল বাজাতে লাগলো—ঢোল বাজছে—

'ঢুলির কান কাটা।
ঢুলির কান কাটা।'

রাজা ফুল-চন্দনে অশ্বত্থ ঠাকুরের পুজো দিয়ে ঘরে ফিরলেন। রানী, রাজার কান দেখে বললেন, 'একটি কান কিন্তু কালো হল।'

রাজা বললেন," তা হোক, কাটা কানের চেয়ে কালো কান ভাল।

নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

কনকচাঁপা

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

রাজপুত্র মৃত্যুশয্যায়। যে দেশের কথা বলিতেছি, সে দেশের লোক রাজাকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে—রাজারও পুরুষানুক্রমে ঐ কথায় আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস জন্মিয়াছে। সেই দেশের রাজপুত্র মৃত্যুশয্যায়। রাজপুত্র কেবল রাজপুত্র নহে—রাজার একমাত্র সন্তান—রাজ্যের উত্তরাধিকারী।

রাজ্যের সব বড়-বড় চিকিৎসক আসিয়া চিকিৎসা করিয়া শেষে বলিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদিগের করিবার আর কিছুই নাই। রাজা তাঁহাদিগকে কারাগারে বন্দী করিয়াছেন, পরদিন তাঁহাদিগকে হত্যা করা হইবে।

তাহার পরে রাজা অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। ঔষধে যাহা হয় নাই, মন্ত্রে তাহা হইতে পারে মনে করিয়া রাজ্যের সকল তীর্থস্থানে লোক পাঠাইয়াছেন। সকল তীর্থস্থান হইতে সাধু, সন্ন্যাসী, পুরোহিতদিগকে রাজধানীতে আনা হইয়াছে। তাঁহারা শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, মন্ত্রপাঠ, পূজা করিয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা রোগ কী তাহা বুঝিতে পারিলেন না। রোগ স্থির না

হইলে কীরূপে চিকিৎসা করিবেন? রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মাথা মুড়াইয়া—তাহাতে ঘোল ঢালিয়া উলটা গাধায় চড়াইয়া শহর ঘুরানো হইবে। নকীবরা বলিতে-বলিতে যাইবে, ঐ সকল সাধু-সন্ন্যাসী-পুরোহিত লোককে ঠকায়, উহাদিগের এতটুকু শক্তিও নাই, উহারা ঈশ্বরের পুত্রকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। উহাদিগকে মারিয়া ফেলা হইবে। তেমন অপমান কেহ পূর্বে কখনও সাধু-সন্ন্যাসী-পুরোহিতকে করিতে সাহস করে নাই। রাজা স্বয়ং ঈশ্বর—তাঁহার ভয় কী?

রাজা তাঁহার স্বর্ণে নির্মিত বর্মে সজ্জিত হইয়া, মস্তকে রত্নখচিত মুকুট পরিধান করিয়া, বাম হস্তে মুক্ত তরবারি লইয়া, দক্ষিণ হস্তে পুত্রের শীর্ণ হস্ত ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, তিনি রাজা ও ঈশ্বর—তিনি প্রভু। তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার পুত্রকে লইয়া যাইবে—এমন সাধ্য মৃত্যুর হইবে না।

মুক্ত তরবারি লইয়া সৈনিকরা পীড়িত রাজপুত্রের শয্যা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃত্যু আসিলে বাধা দিবে। সম্মুখে দর্পণের মতো মসৃণ করা মর্মরের সোপানশ্রেণী। তাহাতে বহু ঝাড়ে পিতলের বকের মুখে দীপ জ্বলিতেছে। অশ্বারোহী সৈনিকরা বর্শা লইয়া প্রাসাদ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ছাতের উপর ধনুকধারীরা আকাশে তীর ছুড়িতেছে। আর বাদ্যকররা ঢাক, করতাল প্রভৃতি বাজাইতেছে। তাহার বিশ্রাম নাই। সকলের বিশ্বাস, মৃত্যু যদি সেদিকে আসিবার চেষ্টা করে, তবে আলোক, তীর, বর্শা, বাদ্য—এইসকলে ভয় পাইয়া পলাইয়া যাইবে।

রাজা পুত্রের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার চক্ষুতে অশ্রু নাই—তিনি কাহারও কাছে নত হইতেছেন না। কেননা তিনি আপনাকে ঈশ্বর মনে করেন।

রাজধানীতে স্তব্ধ ভাব। দোকান বন্ধ, পথে লোক নাই, বাড়িতে লোক মৃদুস্বরে ব্যতীত কথা বলিতেছে না—নদীতে নৌকাগুলি কূলে বদ্ধ। কেবল বহু লোক, নরনারী, মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রণত অবস্থায় রাজপুত্রের জীবনভিক্ষা করিতেছে।

প্রাসাদে স্বর্ণসূত্রের চাঁদোয়ার নিম্নে রেশমের শয্যায় রাজপুত্র যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। মধ্যে-মধ্যে তাহার দেহ কম্পিত হইতেছে। মধ্যে-মধ্যে

সে যন্ত্রণায় হাত মুষ্টিবদ্ধ করিতেছে। তাহার মনে হইতেছে, তাহার বুকের উপর গুরুভার। তাহার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে।

পার্শ্বের ঘরে রানি মেঝেয় হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। তাহাকে ঘিরিয়া তাঁহার পরিচারিকারাও কাঁদিতেছিলেন। তাঁহার ক্রন্দনের শব্দ তাঁহার পীড়িত পুত্রের কর্ণগোচর হইতেছিল। সে তাহার দৃষ্টি পিতার মুখে ন্যস্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তাহার মা কেন তাহার কাছে নাই, কেনই বা তিনি কাঁদিতেছেন, আর ঐ সৈনিকরা কী করিতেছে?'

রাজা কী উত্তর দিবেন? তিনি বলিলেন, 'তুমি ঘুমাও। সৈনিকরা তোমাকে পাহারা দিতেছে।'

রাজপুত্র কিন্তু ঘুমাইতে পারিল না। সে যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল। তাহার চক্ষুতে অস্বাভাবিক দীপ্তি। তাহার শ্বাস ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল।

এদিকে ধনুকধারীরা আকাশে তীর ছুড়িতে লাগিল। বাদ্যকররা বাজনা বাজাইতে লাগিল। অশ্বারোহীরা বর্শা আস্ফালন করিতে লাগিল। যেন তাহারা মৃত্যুর গতিরোধ করিতে পারিবে। রাজপুত্রের মৃত্যু হইবে না!

সহসা সোপানে কথা-কাটাকাটি হইল। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া সেইদিকে চাহিলেন। এ-সময় তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কেহ সেই ঘরের দিকে আসিতে সাহস করে? আর প্রহরীরাই বা কেন লোকটিকে আসিতে দিল? তিনি পুত্রের হস্তত্যাগ করিয়া তরবারি তুলিবার উদ্যোগ করিলেন। সেইসময়ে একজন সৈনিক আসিয়া প্রণত হইয়া রহিল।

রাজা বলিলেন, 'কী বলিবে,বলো। কে আজ আমার নিকটে আসিতে সাহস করিতেছে?'

সৈনিক কম্পিত কলেবরে বলিল, 'এক বৃদ্ধ।'

'বৃদ্ধের কী প্রয়োজন?'

'আপনাকে তিনি কী বলিবেন।'

'এইসময় আমাকে কী বলিবেন! তোমাদিগের মতো তাঁহারও প্রাণদণ্ড দিব। দূর হও তো!'

সৈনিক উঠিয়া পলাইয়া গেল। অন্য সৈনিকরা নিশ্চল মূর্তির মতো

দাঁড়াইয়া রহিল। সকলেই বুঝিল, তাহাদিগকে মরিতে হইবে।

এমন সময় এক বৃদ্ধ তথায় উপনীত হইলেন। তিনি বাঁশের লাঠিতে ভর দিয়া আসিলেন। তাঁহার শ্বেতবর্ণ দীর্ঘ শ্মশ্রু কোমর পর্যন্ত আসিয়াছে। তাঁহার পরিধানে গৈরিক আবরণ—কালে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একটি কনকচাঁপা ফুল। সেই ফুলের সৌরভে ঘর আমোদিত হইল।

রাজা ক্রোধবশে প্রহরীদিগকে কী বলিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু তিনি কিছু বলিবার পূর্বেই বৃদ্ধ বলিলেন, 'আমি তোমার পুত্রকে বাঁচাইতে আসিতেছি বলায় প্রহরীরা আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। উহাদিগের কোন দোষ নাই।'

রাজা ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, 'চিকিৎসক, সাধু, সন্ন্যাসী—সকলে যাহাকে রোগমুক্ত করিতে পারে নাই, তুমি তাহাকে বাঁচাইবে! আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।'

'আমিই বাঁচাইব', বলিয়া বৃদ্ধ সৈনিকদিগের মধ্য দিয়া পীড়িত রাজপুত্রের শয্যার দিকে অগ্রসর হইলেন।

রাজা বলিলেন, 'কিন্তু জানিয়া রাখ, যদি তোমার কথা মিথ্যা হয়, তবে যে সকল প্রহরী তোমাকে আসিতে দিয়াছে, তাহারা কেহই রক্ষা পাইবে না। আর তুমি, তোমার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিব। যতদূর নিষ্ঠুরভাবে মানুষকে হত্যা করা সম্ভব, ততদূর নিষ্ঠুরভাবে তোমার জীবননাশ করা হইবে।'

বৃদ্ধ মৃদু হাস্য করিলেন। সে হাসি মধুর। তিনি রাজাকে বলিলেন, 'মানুষ যখন আমার মতো বৃদ্ধ হয়, তখন যে-সূত্রে প্রাণ দেহে বদ্ধ থাকে তাহা জীর্ণ হইয়া যায়। তাহা কাটিতে তোমার ঘাতকদিগের কোনও কষ্টই হইবে না।'

রাজার নির্দেশে প্রহরীরা বৃদ্ধকে শয্যার নিকটে যাইবার পথ করিয়া দিল।

তখন রাজপুত্র অজ্ঞান ও অচঞ্চল। তাহাকে দেখিয়া বৃদ্ধ রাজাকে বলিলেন 'আমি যথাসময়ে আসিয়াছি, তোমার প্রহরীরা যদি আমাকে আসিতে না দিত, তবে এতক্ষণ তোমার পুত্র মরিয়া যাইত। মৃতকে বাঁচানো যায় না।'

রাজার সর্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার ঔষধ কোথায়?'

বৃদ্ধ তাঁহার কনকচাঁপা ফুলটি দেখাইয়া বলিলেন, 'এই যে। এই ফুল তোমার পুত্রের বুকের উপর রাখিলেই উহার দেহে আবার জীবন সঞ্চারিত হইবে, তোমার পুত্র নবজীবন লাভ করিবে।'

'তাহাই হউক।'

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি তোমার পুত্রের জীবনের বিনিময়ে কী দিবে?'

বৃদ্ধের কথায় রাজা উগ্র হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, 'হতভাগ্য! যখন বিপদের আর বিলম্ব নাই, তখনও তুমি মূল্য লইয়া বিলম্ব করিতেছ? তুমি কি জান না, আমি রাজা, আমি প্রভু?'

বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'তুমি আমাদিগের জীবনের প্রভু হইতে পার, কিন্তু মনের প্রভু নহ।'

'ঐ শয্যায় যে রহিয়াছে ও আমার পুত্র। রাজার পুত্র যিনি বিশ্বপতি তাঁহার সন্তান। একথাও মনে রাখিও।'

'মানুষের সন্তানমাত্রই ভগবানের সন্তান। তুমি যদি ঈশ্বর হইতে, তবে তোমার পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য এই বৃদ্ধের সাহায্যের প্রয়োজন হইত না। ভুল বুঝিও না।'

'আমি তোমাকে এখনই হত্যা করিতে আদেশ করিব—তাহা হইলেই তোমার ঐ ফুল পাইব।'

'আমি তো তোমাকে বলিয়াছি—মত্যুকে আমি ভয় করি না। আমি দীর্ঘকাল জীবিত আছি—এখন অনন্ত-নিদ্রাই আমার বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমি ঔষধ না দিলে আমার ঔষধে ফল হইবে না।'

'তুমি কত টাকা চাহ, বল—এখনই তাহা দেওয়া হইবে।'

'অর্থ বৃথা। আমি কখনও অর্থ চাহি নাই, কখনও চাহিব না। তোমার অনেক স্বর্ণ, অনেক হীরক প্রভৃতি আছে বটে, কিন্তু আমি মনে করি, পর্বতের গুহায় বাস করিয়া, ঝরনার জল পান করিয়া, বনের বৃক্ষের ফল আহার করিয়া আমি তোমার তুলনায় অধিক ধনী।'

'তবে কি তুমি মান চাহ?'

'কেন তাহা চাহিব? মান—তরুণের পক্ষে প্রীতিপদ, আমার মতো বৃদ্ধের তাহাতে কোনও আকর্ষণ নাই।'

'তবে শুন, আমি তোমার জন্য একটি বিরাট মন্দির করাইয়া দিব। তাহার ছাত একশত স্বর্ণখচিত তাম্রস্তম্ভের উপর থাকিবে। সহস্র স্বর্ণ-দীপে তাহাতে দিবারাত্রি আলোক জ্বলিবে। সেই মন্দিরে বেদীর উপর তোমার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে—নিত্য তাহার পূজা হইবে। কেহ সেই মূর্তি পূজা করিতে অস্বীকার করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।'

বৃদ্ধ ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'মন্দিরে দেবতার মূর্তি থাকে। মানুষকে পূজা করিতে কোনও মানুষ বাধ্য নহে। তাহাকে বাধ্য করা পাপ।'

রাজা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে তুমি কি চাহ? যাহা চাহ বল—আমি তোমার আদেশ পালন করিব।'

এই কথা বলিবার সঙ্গে-সঙ্গে রাজা জীবনে প্রথম মস্তক নত করিলেন। তিনি বলিলেন, 'তুমি কি আমার রাজ্যের অর্ধাংশ—আমার এই প্রাসাদ, আমার সৈনিক, এই সকল লইয়া তুষ্ট হইবে?'

বৃদ্ধ বলিলেন, 'ঐ সকলে আমার কোনও প্রয়োজন নাই।'

পীড়িত রাজপুত্র একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল, তাহার হস্ত কঠিন হইয়া আসিল, ও তাহার মুখ মুক্ত হইল। সে কোনও শব্দ করিল না।

'রাজপুত্রের মৃত্যু হইয়াছে।'

রাজা তাঁহার মুকুট বৃদ্ধের চরণে অর্পণ করিয়া বলিলেন, 'আমার মুকুট লও। আমি যখন আমার পুত্রকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারি না, তখন উহাতে আমার কী প্রয়োজন? আমি দুর্বল আমি অসহায়।'

রাজা জানু পাতিয়া বসিয়া পুত্রের শীর্ণ শীতল হস্ত চুম্বন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

সৈনিকরা পূর্বে কখনও রাজার ক্রন্দন কল্পনাও করিতে পারে নাই। তাহারা ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া জানু পাতিয়া বসিল। বাহিরে বাদ্যধ্বনি বন্ধ হইল। ধনুকধারীরা তীর ছুড়িতে বিরত হইল। কক্ষমধ্যে নিস্তব্ধতা। কেবল সেই বৃদ্ধ দণ্ডায়মান। বাতায়ন-পথে সূর্যালোক সেই স্তব্ধ কক্ষ প্লাবিত করিল। বাহিরে বাগান হইতে পাখির কলরব শ্রুত হইতে

লাগিল। আর কোনও শব্দ শুনা গেল না।

বৃদ্ধ কনকচাঁপা ফুলটি রাজপুত্রের ললাটে ও ওষ্ঠাধারে স্পর্শ করাইয়া বক্ষের উপর রক্ষা করিলেন। সহসা সেই বক্ষে আবার স্পন্দন হইল। ওষ্ঠাধরে রক্ত আসিল। রাজপুত্র মাথা তুলিয়া সকলকে তাহার কক্ষে জানু পাতিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল। রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমার কি শিক্ষকের সঙ্গে বাগানে বেড়াইতে যাইবার সময় হয় নাই?'

রাজা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, 'অঘটন ঘটিয়াছে। রাজপুত্র জীবিত!' তিনি পুত্রকে তুলিয়া বক্ষে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। তাহার পরে তিনি প্রহরীদিগকে বলিলেন, 'যাও, রানিকে ডাকিয়া আনো। তাহার পরে যাইয়া ঘোষণা কর, রাজপুত্র রক্ষা পাইয়াছেন। নগরে আজ আনন্দোৎসব হইবে। মন্দিরে-মন্দিরে পূজা হইবে। আমার সঞ্চিত অর্থ বিতরণ করা হইবে।'

রাজা বৃদ্ধকে বলিলেন, 'আপনার ঋণ আমি পরিশোধ করিতে পারি না। আজ হইতে আপনি সিংহাসনে আমার দক্ষিণ দিকে উপবেশন করিবেন। আপনার ইচ্ছা পালিত হইবে।'

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, 'আমার কিছুই প্রয়োজন নাই। আমার এক প্রার্থনা, আমি যে গুহায় সাধনা করি; তথায় ফিরিয়া যাইব। তথায় কেহ যেন আমাকে বিরক্ত না করে। আমার জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে। তবে একটি কথা জানিয়া রাখ, আমি তোমার পুত্রকে রক্ষা করি নাই। তুমিই দুইটি কার্যের দ্বারা ঈশ্বরকে তুষ্ট করায় সে রক্ষা পাইয়াছে। তুমি গর্ব বর্জন করিয়া নতজানু হইয়াছ—তুমি অশ্রুবর্ষণ করিয়াছ।'

বৃদ্ধ প্রহরীদিগের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া চলিলেন, যাইবার সময় বলিলেন, 'কখনও ভুলিও না, মানুষ ঈশ্বর নহে। ভগবানের নিকট তোমার ধনসম্পদ, সৈনিকদল, মুকুট—এ-সকল অপেক্ষা একবিন্দু অশ্রুর মূল্য অধিক। গর্ব মানুষের অনিষ্ট করে!'

রাজা দীনভাবে বলিলেন, 'আপনার চরণে প্রণাম।'

রাজকন্যা

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার
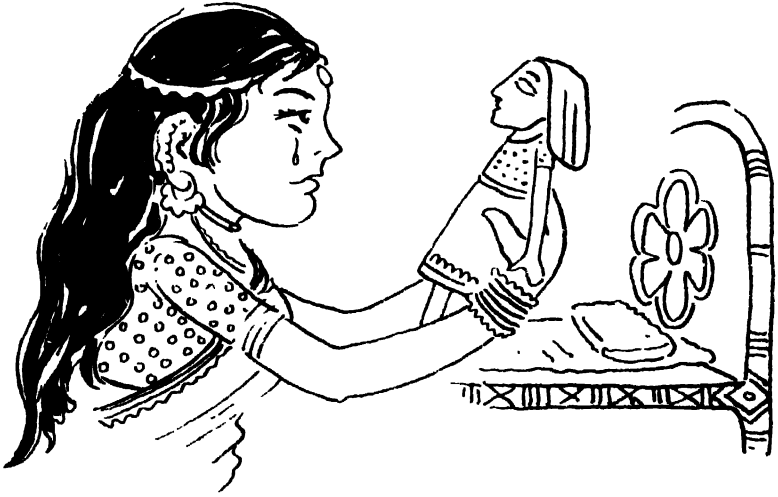
এক যে রাজা। রাজার সাত রানী। কিন্তু তাহলে কি হবে?

রাজার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ভাণ্ডারে মানিক, ঘরে ঘরে মোতি-মোহরের হাট, সান্ত্রী-সিপাই সৈন্যে-সামন্তে পুব-দক্ষিণ উত্তর-পশ্চিম জুড়ে রাজার রাজত্ব।

কিন্তু রাজার না আছে রাজপুত্র, না রাজকন্যা।

রাজার মন অন্ধকার। সাত রানীর মুখ কালি। পাত্র-মিত্র সান্ত্রী-সামন্ত, জন-প্রজার দিনে-রাতে চোখ খালি।

রাজপুরীতে দীপ জ্বলতে-জ্বলতে নেভে। রাজপুরীর শাঁখ বাজতে-বাজতে থামে। পিঞ্জরে শুকসারী গাইতে-গাইতে চুপ।

মাস যায়। বছর যায়। যুগ যায়। কত যাগ-যজ্ঞ, পূজা-আর্চা, মন্ত্র-তন্ত্র —সব বৃথা।

কি করেন...রাজত্বের দক্ষিণে নীল সমুদ্র, পায়ের সোনার নূপুর, মাথার হীরের মুকুট, ফেলে দিয়ে নীল সমুদ্রের ঢেউয়ে নেয়ে, রানীরা ধর্ণা দিলেন।

নীল সমুদ্রের তপ্ত বালু। সাতদিন যেতে না যেতে রানীরা মর-মর।

উঠলেন না। না, উঠেন না। রোদে-তাপে, রানীরা অঙ্গার হয়ে যান

দেখে পাখা মেলে এক নীল পাখি বললে,

'নীল আকাশে তারার বন,
গায়ে মাখা চন্দন,
চন্দনে চাঁদমুখ,
রাজকন্যা অনুপম।'

তারায় ঝিকিমিকি রাত।

সাত রানী চন্দন মাখেন। এ বছর যায় ও বছর যায়। হাওয়ায় ঠি-ঠি করে কাঁপেন।

কিচ্ছু না। চাঁদমুখ রাজকন্যা কোথায়, তারামুখ রাজকন্যাও না। সাতমহলের আঙিনা ভাসে সাত রানীর চন্দনগলা চোখের জলে।

যায়-যায়-যায় রাত।

এক রাত্রে, এক চন্দন পাখির ডাক।

রাজার কাছে খবর এল, ছোটরানী যে আঁতুড়ে!

রাজপুরী জুড়ে শাঁখ-দামামা, দীপের সার মশালের কাতার, শূল-তরোয়াল ঝন-ঝন...সিপাই-সান্ত্রী খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। মন্দিরের ঘণ্টা বাজে। ফুরায় না।

ছয় রানী যে ছোটরানীর আঁতুড় ঘরে।

কী? কী?

ধাই-দাসীরা সরে বসে। ছয় রানী মাথা হেঁট করেন।

না—'ওঙা ওঙা,' না—চাঁদমুখ তারামুখ, এক কাঠের পুতুল!

বিচ্ছিরি কালো কাজল লেপা কাঠের পুতুল।

বাদ্য-বাজনা থেমে যায়। লোকের মুখ নেমে যায়। ওষ্ঠে আঙুল দিয়ে রাজা ফিরে যান।

রাজসভায় বসেন না, জ্যোতিষীর সভায় বসে রাজা বলেন, 'এ কি?'

আঙুলে গনেন, কাটিতে গনেন, গনেন পেতে জ্যোতিষীরা বললেন, — 'মহারাজ, নীল পাখির কথা মিথ্যে হয় না, যাইহোক রাজকন্যা, কালো কালুটি হোক, কাঠের হোক, এই রাজকন্যা একদিন না একদিন জীয়োবে। ছোট রানীমার মহল ঘিরে ফুলের মালা দিন।'

রাজা বসে থাকেন, কি করেন, রাজা তাই দেন।

কাঠের কন্যা, না জীয়োলেই কি, জীয়োলেই বা কি? পুতুল তো পুতুল। মানুষ তো আর হবে না!

মনের দুঃখে রাজার রাজত্বের বাদ্য-বাজনা আর বাজল না। পুরীর পঞ্চদীপ আর জ্বলল না। সাত রানী—শুকসারী উড়িয়ে দিলেন।

তা, কোন যুগে কোন জন্মে যে কাঠের পুতুল আবার জীয়োবে! কেই বা জানে!

কেবল, ছোটরানীর মহলে কাঠের রাজকন্যাকে ঘিরে রইল ফুলের মালা। আর, রাজা দেশে-দেশে দূত পাঠালেন, যে রাজপুত্র জীয়োবে এই রাজকন্যা, রাজকন্যা আর রাজার রাজত্ব সে-ই পাবে।

দূত যায়। যায় তো যায়।

রাজত্ব শুনে রাজপুত্রেরা এগোয়, কাঠের রাজকন্যা শুনে কেউ-ই আসে না।

দূত হয়রান।

এক ময়ূরপঙ্খীতে বাঁশি বাজিয়ে ভাসে এক রাজপুত্র।

দূতের কথা শুনে সেই রাজপুত্র বাঁশি নামাল।

রাজপুত্রের ধন-ঐশ্বর্যের সীমা নেই, কিন্তু না আছে তার রাজত্ব পুবে না উত্তরে।

রাজপুত্র বললে—'আচ্ছা।'

ভাণ্ডার ভেঙে রাজপুত্র ধনরত্ন বার করে, —'কোথায় আছে ওষুধ-বিষুধ, কোথায় মন্ত্র-তন্ত্র, মণি চাও হীরে চাও, দেব, কাঠের রাজকন্যাকে জীয়িয়ে দাও।'

ময়ূরপঙ্খী ভরে ওষুধ নিয়ে, দশ দল যোগী-জ্যোতিষী নিয়ে রাজপুত্র গেল।

ওষুধ মেখে একহাতে কাঠের পুতুল দুই হাত উঁচু হল, মন্ত্রের শব্দে পশুপাখি দেশ ছাড়ল, রাজা-রানী জন-পরিজন কালা হয়ে গেল।

তা তো হল। তিন বছর তেত্রিশ দিনে কাঠের পুতুল হাঁ-ও করলে না। না-ও করলে না।

'ধ্যেৎ!' বলে রাজপুত্র সব ফেলে-টেলে ময়ূরপঙ্খী ভাসিয়ে দিলে।

দূত তবু যায় দেশের পর দেশ।

শান-তরোয়াল পরখ করে এক রাজপুত্র...দাঁড়িয়ে এক পাহাড়ের উপরে।

রাজপুত্রের তেজে, চারিদিকের রাজ্য থরথর।

দূতের মুখে শুনে রাজপুত্র আশ্চর্য হয়ে বললে, 'আচ্ছা!'

সব রাজা-রাজপুত্রকে জড়ো করে রাজপুত্র বললে, 'কত মানুষ জীয়ে মরে আমার কথায়, কাঠের রাজকন্যা কিসে জীয়োবে, সন্ধান দাও।'

এক রাজা বললেন, 'শুনেছি, চম্পকবনে এক রাজহাঁস আছে। তার কপালে এক তিলক। সেই তিলকে তিলক দিলে কাঠের কন্যা জীয়োয়।'

যত রাজা-রাজপুত্র সৈন্য-সামন্ত দলবল নিয়ে রাজপুত্র চলে, কোথায় চম্পক বন। সাত বৎসর সাত মাসে কত রাজার রাজত্ব উজাড় গেল, চম্পক বন থাকে তো হাঁস থাকে না, হাঁস থাকে তো চম্পক বন নেই।

শেষে এক বনের হাঁস কেটে নিয়ে রাজপুত্র দলেবলে এল রাজকন্যার দেশে।

ভয়ে রাজা অস্থির। কন্যার ঘরের ফুলের মালা খুলে ফেললেন।

খুললেই কি?

হাঁসের ঠোঁট কেটে রাজপুত্র, দলবল সঙ্গে তিলক পরিয়ে দেন রাজকন্যার কপালে।

সাত সাত তিন-সাত দিন। বায়ান্ন রাত। আছে আর থাকে। যে কাঠ সে কাঠ।

'হঠ!' —বলে রেগে গিয়ে রাজপুত্র, পুরীর সাত চূড়া ভেঙে ফেলে পুকুর সায়র বুজিয়ে, তার উপর দিয়ে ফিরে চললে দলেবলে।

চুপি চুপি যায় দূত।

ছোট্ট ফুলের বন। ফুল হাতে এক রাজপুত্র, বেড়ায় ঘুরে। ফুলবনে আর রাজপুরী জুড়ে পাখির গান, লোকজনের কলরব।

দূত মাথা নোয়ায়।

দূতের কাছে সব শুনে-টুনে, রাজপুত্র বলে, 'আচ্ছা!'

রাজ্যের লোকজন পাখ-পাখালি খায়-দায়, হাসে-খেলে গান গায়।

রাজপুত্র বলে, 'আহা, কাঠকন্যার রাজ্য কাঠ হয়ে থাকবে?'

রাজপুত্র সাথী ডাকে, বন্ধু ডাকে।

সাথীরা বলে, 'গাছের ফুল গাছের ফল ধান-শস্য বিলিয়ে দাও।'

বন্ধুরা বলে, 'রাজভাণ্ডার বিলিয়ে দাও।'

বলে রাজপুত্র, 'গায়ের রক্ত বিলোলে যদি জীয়ে তাও দি।'

চলে রাজপুত্র কাঠকন্যার দেশে।

তিন তেরো ছত্রিশ বছর যায়। সে দেশের লোক তখন খায়-দায়-ঘুমায়, গান গায়।

গান গায়। কাঠকন্যা জীয়ে না।

পদ্ম-পাপড়ি ভরে বুকের রক্ত চিরে দেয় রাজপুত্র, কাঠকন্যাকে স্নান করায়।

স্নান আর টান। গ্রীষ্ম আসে, বর্ষা আসে। যায় শরৎ, যায় শীত। কাঠকন্যা, কাঠকন্যা।

'যা-ক!' ...নিশ্বাস ছেড়ে মুকুট নুইয়ে, সাথী-বন্ধুর সাথে রাজপুত্র ফিরে গেল আপন রাজ্যে।

দূত চলে।

এক সাদা ঘোড়া, টগবগ। ঘুরিয়ে ঘোড়া, রাজপুত্র থামে, 'কে তুমি?'

মাটি ছুঁয়ে, দূত আথি-বিঁথি মুখ খোলে।

শুনে সব, রাজপুত্র মুকুট হাতে নামিয়ে বলে, 'এই?'

রাজপুরী থাক, রাজত্ব থাক, শেষে রাজপুত্র বলে, 'চল।'

দূত তা কি উঠতে চায়?

রাজপুত্র তাকে ঘোড়ায় তুলে, ঘোড়া ছুটালে কাঠকন্যার রাজ্যে।

রাজপুত্র না রাজপুত্র। সে রাজ্যের লোকে দেখে বলে, 'কোনও হয়তো সিপাই!'

রাজা বলেন, 'মুকুট দেখি।'

মুকুট দেখে রাজা তার হাত ধরে নিলেন রাজপুরীতে।

রানীরা বলাবলি করেন, 'সৈন্য নাই, কিসের রাজপুত্র?'

জন-পরিজন লস্করে বলে, 'এ...কেমন রাজপুত্র?'

রাজপুত্র দিনের বেলায় হাঁটাপথে মাঠে বেড়ায়, ঘোড়ার পিঠে পাহাড়ে যায়, আর নদীর ধারে গাছের ছায়ায় বসে।

রাজপুত্র ঢেউয়ের কাছে বাঁশি বাজায়। না কারুর কাছে যায়, না কথা না বার্তা।

রাতের জ্যোৎস্নায়-আঁধারে রাজপুত্র কাঠকন্যার ঘর পাহারা দেয় তরোয়াল খুলে।

জ্বলে চার সারি দীপ।

কাঠকন্যার ঘরে কাঠকন্যা আর ফুলের মালা।

রাজপুত্রের চোখে—ঘুম আছে কি নেই কে জানে?

এক বছর যায়, দু'বছর যায়, তিন বছর যায়, পাঁচ বছর যায়।

যেতে, না ডাকতে ভোরের পাখি, তিন সারি দীপ হাওয়ায় নিভে যায়।

পাহারা ঘুরে রাজপুত্র দেখে, বাতি নেভে।

রাজপুত্র বাতি জ্বালে।

রোজ জোর হাওয়ায় বাতি নেভে। রোজ বাতি জ্বালে রাজপুত্র। বাতি জ্বেলে, রুপোর কপাট রাজপুত্র আড়াল করে দেয়। তবু নেভে।

বাতি নেভে আর দু'সারি চন্দন গাছের হাওয়া সরসর, সরসর করে।

নিশ্চুপ থাকে রাজপুত্র।

দুই নতুন তরোয়াল খাপে তুলে রাজপুত্র পাহারায় চলে পরদিন।

চাঁদ ঢলে পড়ে। ভোরের ফুল কুঁড়ি না দিতেই এক সারি বাতি নিভে যায়।

তরোয়াল হেলে।

আ-স্তে পাহারায় থাকে রাজপুত্র।

ঘরে আসতেই। ঘিয়ের পঞ্চদীপ নেভায় কে?

টুকটুকে একখানা হাত!...

'রাজকন্যা!'

খাপের তরোয়াল ঝন-ঝন রাজপুত্রের ডাকে, ঘরে ফুলের মালা দোল-দোল, কাঠের পুতুলের গলার মালায় নুয়ে পড়ে ফুরফুরে হাত, চন্দন পাখি গেয়ে উঠে শ্বেত চন্দনের ডালে, রাজপুরীতে শাঁখ, কাঁসর, ঝাঁঝর, বাঁশি বেজে উঠে পোহানো রাতের!

কাঠের পুতুল তুলে ফেলে দিয়ে, রাজপুত্র ডঙ্কায় ঘা দেয়। রাজা উঠে আসেন, রানীরা ছুটে আসেন, রাজপুরী ভেঙেচুরে লোক ছুটে আসে, রাজার আঙিনায়—জীয়ন্ত রাজকন্যা।

আর কিসের কাঠের পুতুল? শিশির ধোয়া ফুলের—চাঁদ জ্বলজ্বল মুখে রাঙা রোদ গালে পড়ে রাজকন্যার।

ডাকে পাখি, ফোটে ফুল, সোনার রঙে আকাশ ভরে, গন্ধ-বাতাস থৈ-থৈ করে, সৈন্য-সামন্তের নিশান ওড়ে।

সমুদ্দুরের নীল পাখি সুর দেয়—

'রাজকন্যা হাসে কোথায়
নীল কাজল কেশ?
কে গিয়েছে
রাজপুত্র
অরুণ আলোর
দেশ?'
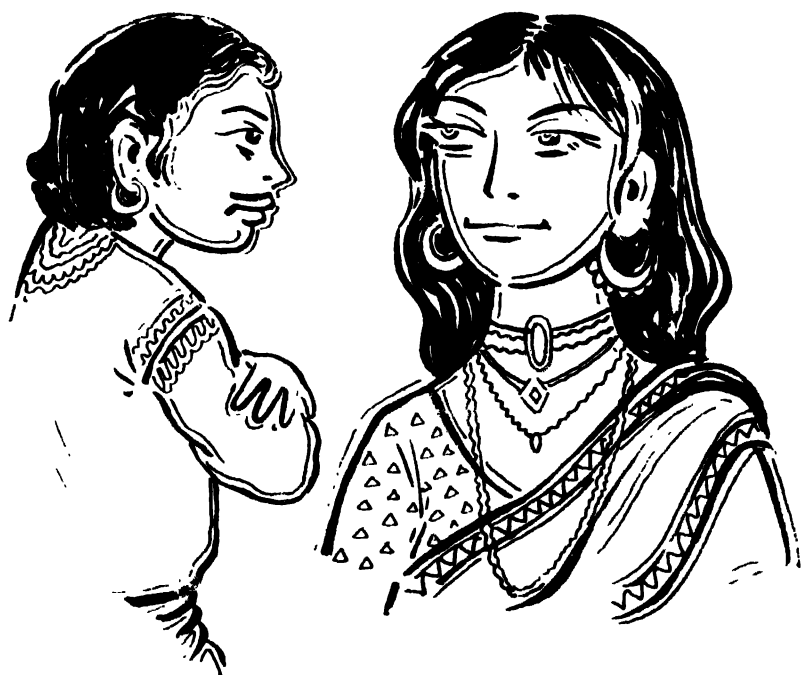
রাজামশাই হ্যাঁচ্চো

কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

এক জেলে। একদিন জাল ফেলতেই প্রথমে তার জালে পড়ল একটা কোলাব্যাঙ। জেলে বিরক্ত হয়ে জাল থেকে তাকে ছাড়িয়ে আছাড় মারতে যাবে, কোলাব্যাঙ ঘ্যাঙর-ঘ্যাং করে কেঁদে বলল—'মেরো না, আমাকে মেরো না। আমি তোমাকে একঘড়া মোহর দেবো।'

জেলে ভাবল, একি! ব্যাঙ দেখি কথা বলে! আবার বলে কি না মোহর দেবে! ভাল, দেখাই যাক না, ব্যাপার কি! এই না ভেবে জেলে ব্যাঙটাকে মাছের চুবড়ির ভেতর পুরে রেখে দিল।

রাতে খেয়ে-দেয়ে জেলে-জেলেনী ঘুমোতে যাবে, হঠাৎ চুবড়ির ভেতর থেকে কে বলে উঠল—'জেলেনী-মাসী, জেলেনী-মাসী, আমাকে খেতে দেবে না?'

জেলেনী জেলেকে বলল—'ও কে গা, চুবড়ির ভেতর অমন করে কথা বলে?'

জেলে ব্যাঙের কথা ভুলেই গেছিল। জেলেনীর কথা শুনে তার সব মনে পড়ল। তখন জেলে-জেলেনী মিলে ব্যাঙকে বাইরে এনে খাবার দিল।

শেষরাতে কোলাব্যাঙ ঘ্যাঙর-ঘ্যাং করে জেলেকে ডাকতে লাগল—'জেলে-মেসো, ওঠো। রাত পোহালো বলে। সোনার মোহর চাও তো, ফরসা না হতে আমাকে রাজার বাড়ির দেউড়ির কাছে রেখে এসো।'

ডাক শুনে জেলে বিছানা ছেড়ে উঠল। তারপর ব্যাঙের কথামতো তাকে নিয়ে রাজার বাড়ির দেউড়িতে রেখে এলো। ব্যাঙ থপ-থপ করে আনাচ-কানাচ ঘুরে রাজার শোবার ঘরের জানালার নিচে লুকিয়ে রইল।

সকালবেলা রাজা উঠে খাটের নিচে পা দিয়েছেন, অমনি শোনেন হাঁচির শব্দ। আর সঙ্গে-সঙ্গে কে যেন বলে উঠল—'রাজামশাই, হ্যাঁচ্চো!'... যাঃ! ঘুম থেকে উঠতেই বাধা! রাজা বিরক্ত হয়ে নাক-মুখ সিঁটকে খাটের ওপর ফের পা তুলে নিলেন। তারপর এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন—হাঁচল কে? কিন্তু...কোথাও কাউকে নজরে পড়ল না।

দুপুরবেলা রাজা রাজসভায় যাবেন, রাজপোশাক পরে চৌকাঠের বাইরে পা দিয়েছেন, অমনি শোনেন হাঁচির শব্দ। আর সঙ্গে-সঙ্গে কে যেন বলে উঠল—'রাজামশাই, হ্যাঁচ্চো।'

শুনে রাজা মহাখাপ্পা। বারবার এমন হাঁচে কে রে? ঘরের ভেতর ফিরে গিয়ে তিনি কোটালকে ডেকে হুকুম দিলেন—'দ্যাখো দেখি, কে আমাকে আজ দু-দুবার বাধা দিল? যে এমন করেছে, তাকে ধরে এনে নাক কেটে দাও।'

কোটাল চারদিকে খুঁজতে লাগল—রাজাকে বাধা দিল কে। কিন্তু এক দুপুর যায়—কেউ আর হাঁচে না, কোটাল কাউকে ধরতেও পারে না।

বিকেলবেলা রাজা বেড়াতে যাবেন, পাট-হাতির হাওদার ওপর পা দিয়েছেন, অমনি শোনেন হাঁচির শব্দ। আর সঙ্গে-সঙ্গে কে যেন বলে উঠল—'রাজামশাই, হ্যাঁচ্চো!'

'দুত্তোর!' বলে রাজা হাতির পিঠ থেকে নেমে পড়লেন। তারপর কোটালকে ডেকে চোখ-মুখ লাল করে বললেন—'বুড়ো হয়ে তুমি কুড়ের বাদশা হয়ে উঠেছ। কে আমাকে বারবার বাধা দিচ্ছে, ধরতে পারলে না।

কাল সকালের মধ্যে আসামিকে হাজির করা চাই। নইলে, তোমারই নাক কেটে দূর করে দেবো।'

রাজার হুকুম শুনে কোটাল ভয়ে অস্থির। তক্ষুণি রাজবাড়ির আশেপাশে সামনে-পিছনে ঘাঁটিতে পাহারা বসল। চারদিকে হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড— লোক-লস্কর সেপাই-সান্ত্রীর ছুটাছুটি! কিন্তু কই, আর তো হাঁচি পড়ে না, কে যে রাজাকে বাধা দিল তারও খোঁজ মেলে না।

নিরাশ হয়ে কোটাল দুপুররাতে একলা দেউড়ির পাশে বসে ভাবছে, হঠাৎ শোনে তার পেছনে কে ঘ্যাঙর-ঘ্যাং করে বলে উঠল—'কোটালমশাই, হ্যাঁচ্চো!'

'হ্যাঁচ্চো!' শুনে কোটাল লাফিয়ে উঠল! একি রে! এখানেও আবার হ্যাঁচ্চো করে কে রে? কোটাল উঠে এদিক-ওদিক চায়। চাইতে-চাইতে দেখে, দেউড়ির একপাশে ফাটলের মধ্যে একাট কোলাব্যাঙ।

ব্যাঙ বলল—'কোটালমশাই, কার হাঁচিতে বারবার রাজার বাধা পড়ল, এখনও তো তাকে ধরতে পারলেন না। কাল সকালেই যে আপনার নাক কাটা যাবে। আচ্ছা, আমি যদি আপনাকে হ্যাঁচ্চোওলার খবর দিতে পারি, তাহলে আমাকে একঘড়া মোহর দেবেন?'

কোটাল শুনে অবাক! কোথাকার কোন কোলাব্যাঙ—এ বলে কি রে! আর রাজবাড়ির এতসব খবর তাই বা এ জানল কেমন করে! যাক, দেখাই যাক না ব্যাপার কি! এই না ভেবে কোলাব্যাঙকে বলল—'আচ্ছা, সে খবর তুমি সত্যই দিতে পার তো তোমাকে একঘড়া মোহর দেব।'

ব্যাঙ বলল—'কোটালমশাই, দুপুররাতে আকাশের তলে বসে কথা দিলেন—মনে রাখবেন। হ্যাঁচ্চো-হ্যাঁচ্চো করে হেঁচে রাজাকে কে বাধা দিয়েছে আমি তা জানি। কাল সকালে আমাকে রাজার কাছে নিয়ে যাবেন, সেখানে গিয়ে সব কথা খুলে বলব। আপনার নাক খোয়া যাবার ভয় নেই—ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন।'

রাত ভোর হতে-না-হতে কোটাল ব্যাঙকে হাতে করে নিয়ে রাজার ঘরের দুয়ারে হাজির।

রাজা ঘুম থেকে উঠে দেখেন, ঘরের দুয়ারে কোটাল, আর তার হাতে একটা কোলাব্যাঙ। রাজা বললেন—'এ কী, কোটাল?'

কোটাল বলল—'মহারাজ, কাল হ্যাঁচ্চো-হ্যাঁচ্চো করে হেঁচে আপনাকে যে বাধা দিয়েছে, এ ব্যাঙ নাকি তার খবর জানে। আর, তাই বলতে সে আপনার কাছে এসেছে।'

রাজা বললেন—'বটে!' তারপর ব্যাঙের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'ব্যাপার কী হে বাপু?'

ব্যাঙ বলল—'মহারাজ, আগে ভরসা দিন—ভয়ে বলি, না, নির্ভয়ে বলি?'

রাজা বললেন—'নির্ভয়ে বলো।'

ব্যাঙ বলল—'তবে শুনুন মহারাজ। কাল হ্যাঁচ্চো-হ্যাঁচ্চো করে হেঁচে আপনাকে আমিই বাধা দিয়েছি। আমি ঘাট মানছি—আমাকে মাপ করুন। কিন্তু মহারাজ, প্রাণের দায়েই আমাকে ওরকম করতে হয়েছে।'

রাজা বললেন—'সেকি! তুমি হলে কোলাব্যাঙ, আর আমি হলুম মানুষ—আমাকে বাধা দেওয়ার সঙ্গে তোমার বাঁচা-মরার সম্পর্ক কি?'

ব্যাঙ বলল—'সে সম্পর্ক আছে বলেই তো এ কাজ করেছি। মহারাজ, আগে আমার সকল কথা শুনুন। শুনলেই বুঝবেন, কেন আমি এ সাহস করেছি।'

রাজা বললেন—'আচ্ছা বেশ, তোমার সকল কথা খুলে বলো।'

ব্যাঙ বলল—'পরশু আমি এক জেলের জালে পড়েছিলুম। জেলে আমাকে দেখেই আছড়ে মারতে চাইল। তাকে অনেক বলে-কয়ে, একঘড়া মোহর কবলে, তবে আমি রেহাই পাই। কিন্তু রেহাই তো পেলুম—মোহর পাই কোথা? ভেবে-ভেবে ঠিক করলুম, রাজবাড়ি ছাড়া যখন এ মোহর মিলবে না তখন রাজাকে রাগিয়ে তাঁর আমলা-ফামলার কাছ থেকে তা বের করা চাই। কিন্তু রাগবেন রাজামশাই, আর মোহর ঢালবে তাঁর আমলারা, এমন সুবিধা হয় কিসে? ঐ যা আমি করেছি মহারাজ, তাতেই। সক্কালবেলা ঘুম থেকে ওঠার সময় বাধা পড়লে চটে না কে? আপনি রাজা, আপনি ওরকম বাধা পেয়ে যে-চটা চটবেন তার তাল সামলাতে অনেক কত্তার ঢের-ঢের মোহর ঢালতে হবে, এ আমি বেশ বুঝেছিলুম।

তার ওপর আমার মতো আসামি যে ধরা পড়বে না তাও তো ঠিকই। আমি সত্যি আঁচ করেছিলুম কি না, জিজ্ঞেস করুন কোটাল মশাইকে। আপনার বাড়িতে লুকিয়ে থেকে ঠিক-ঠিক সময় বুঝে আমি তিন সন্ধে হেঁচেছি। আর তার ফেরে পড়ে কোটালমশাই আমাকে একঘড়া মোহর কবলেছেন। সত্যি কি না, উনিই বলুন।'

ব্যাঙের কথা শুনে রাজা হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন—'কোটাল, সত্যি নাকি? এতবড় রাজ্যের কোটাল হয়ে শেষে কিনা তুমি ঘুষ কবলালে একটা কোলাব্যাঙকে!'

কোটাল বলল—'মহারাজ, নইলে যে আপনি আমার নাক কাটার হুকুম দিয়েছিলেন।'

রাজা বললেন—'সেও যে ছিল ভাল হে। এ যে ব্যাঙের কাছে নাকমলা খেয়ে ঘরের টাকা বের করতে হলো। যাও, তোমাদের দু'জনারই কসুর মাফ। এখন ব্যাঙের দেনা শোধো গে কোটাল!'

লজ্জা পেয়ে কোটাল ঘাড় নিচু করে ঘরে ফিরে গেল। তারপর তাকে গুনে গুনে একঘড়া মোহর ব্যাঙকে দিতে হলো।

মোহর পেয়ে ব্যাঙ মহাখুশি। ঘ্যাঙর-ঘ্যাং করতে-করতে তিন লাফে সে জেলের বাড়ি গিয়ে হাজির। সেখানে গিয়ে জেলেকে সব মোহর দিয়ে আর এক লাফে জলে পড়ে নিজে ডুব মারল।

কালো ফড়িং

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
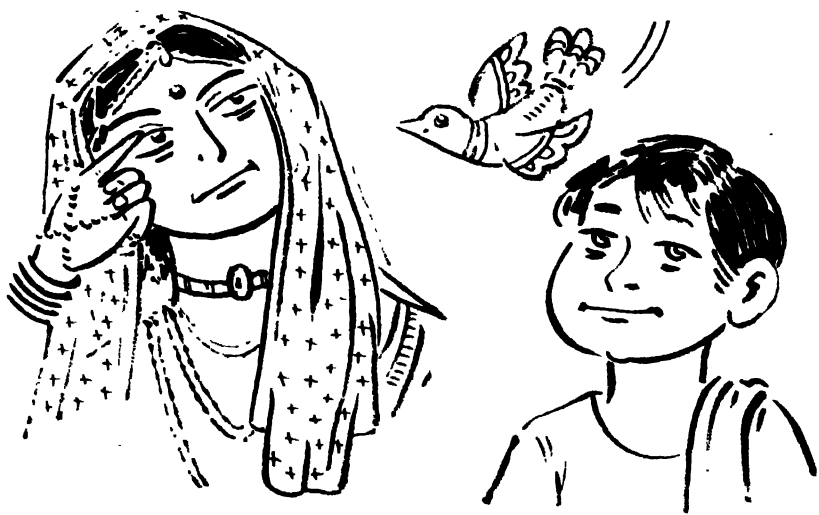
এক রাজা...মহাপ্রতাপশালী রাজা। রাজার এক কন্যা...পরমাসুন্দরী। কন্যা ডাগর হয়েছে, কন্যার বিবাহ দিতে হবে, —দেশবিদেশের কত রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, সওদাগর-পুত্রের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ আসছে—তা রাজার কোনো পাত্র পছন্দ হয় না। পাত্রের সন্ধানে এক বছর কেটে গেল—তবু পাত্র মিললো না!

রাজা খুব চিন্তিত হলেন, —তিনি হুকুম দিলেন তাঁর লোকজনকে—রাজ্যের ঘাটে যত সদাগরী জাহাজ এসে লাগে—সে-সব জাহাজে সদাগররা আসে—সেইসব সদাগরদের মধ্যে পাত্রের সন্ধান করো। লোকজন সন্ধান নেয়—কিন্তু তাতেও মনের মতো পাত্র জোটে না। রাজা রাগে জ্বলে উঠলেন, বললেন, —যত সব অপদার্থ! একটা পাত্র আনতে পারে না!... দুদিন সময় দিলুম—দুদিনের মধ্যে পাত্র আনতে না পারো, তোমাদের গর্দান যাবে!

সন্ধানীরা ভয়ে কাঁটা! তারা ঘাট ছেড়ে আঘাটায় সন্ধান করতে লাগলো—হঠাৎ দেখে আঘাটায় একটি গাছতলায় বসে জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী—

তাঁর সামনে একটি ঝোলা—সেই ঝোলার ভিতর থেকে সন্ন্যাসী এক-এক টুকরো তুলোট কাগজ বার করছেন...বার করে তুলোট কাগজে খাগড়ার কলম দিয়ে কি লিখছেন...লিখে কাগজগুলো মুড়ে-মুড়ে সাগরের জলে ফেলছেন। রাজার লোকজন এসে সন্ন্যাসীকে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করলো, —আপনি কে? এবং এ আপনি কি লিখছেন প্রভু—জানতে পারি?

সন্ন্যাসী বললেন, —আমি কে, জানো না? আমি হলুম প্রজাপতি দেবতার চেলা...আমি বিবাহের পাত্রপাত্রী ঠিক করে এক-এক টুকরো কাগজে বর আর কন্যার নাম লিখে কাগজগুলো মুড়ে কালস্রোতে ভাসিয়ে দিচ্ছি।

রাজার লোকজন বললে, —আপনি যেমন যেমন নাম লিখলেন, তেমনি ভাবেই এদের বিবাহ হবে? কারো বিবাহ বাকি থাকবে না?

সন্ন্যাসী বললেন, —না!

রাজার লোকজন তখনি এসে রাজাকে এ খবর জানালো। রাজা নিজে তখন ঘোড়ায় চড়ে লোকজন নিয়ে আঘাটায় এলেন...এসে সন্ন্যাসীকে বললেন, —প্রভু আমার কন্যার জন্য পাত্র স্থির করেছেন?

সন্ন্যাসী বললেন, —নিশ্চয়।

রাজা বললেন, —কোথায় সে পাত্র? তার নাম? কোন রাজ্যের রাজপুত্র?

সন্ন্যাসী বললেন, —রাজপুত্র নয়—পাত্র তোমার রাজ্যেই থাকে—তার নাম কালো-ফড়িং।

—কালো-ফড়িং! ...রাজা চমকে উঠলেন, বললেন, —মানুষ? না, আর কিছু?

সন্ন্যাসী বললেন, —মানুষ...মানুষ! অল্প বয়স। কালো-ফড়িং নামেই তার পরিচয়—সন্ধান করো—তোমার রাজ্যেই তাকে পাবে। এখন যাও, আমাকে আর বিরক্ত কোরো না, আমাকে এখনো অনেক নাম লিখতে হবে!

কথাটি বলে সন্ন্যাসী কটমট চোখে রাজার পানে চাইলেন।

রাজার ভয় হলো—সন্ন্যাসী মানুষ—যদি ভস্ম করে দেন। তিনি পুরীতে ফিরলেন—ফিরেই হুকুম-জারি—কালো-ফড়িংকে নিয়ে এসো!

দিকে দিকে ঘোড়সওয়ার ছুটলো কালো-ফড়িংয়ের সন্ধানে! যে মানুষের

এমন অদ্ভুত নাম, তার সন্ধান পেতে দেরি হলো না। পথে যাকে জিজ্ঞাসা করে, সেই বলে, —ও, কালো-ফড়িং...ওই মিসকালো রঙের ছোকরা—সে ওই দক্ষিণপাড়ার কালীমন্দিরের সামনে বসে ভিক্ষা করে!

শুনে লোকজনের চক্ষুস্থির। মিসকালো রং, তার উপর ট্যানাপরা ভিখারি! পরমাসুন্দরী রাজকন্যার পাত্র সে। তা ভিখারি হোক আর জানোয়ারই হোক, রাজার হুকুম—কাজেই তারা কালীবাড়ি থেকে তাকে নিয়ে এলো রাজপুরীতে। মজা দেখবার জন্য পথ থেকে বহু লোক এলো সঙ্গে।

লোকজন বললে রাজাকে প্রণাম করে, —মহারাজ, এই হলো কালো-ফড়িং!

রাজা হতভম্ব! এর গায়ের কালো রঙের চেয়ে জুতোর কালো রংও মনে হলো হালকা! আর রোগা লিকলিক করছে...যেন লতা! এত ঝড় হয়—সে ঝড়ে-জলে না মরে বেঁচে আছে কি করে!

সন্ন্যাসীর উপর রাগ হলো—বুজরুক ভণ্ড! এর সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ স্থির করেছে। ভস্ম হতে হয় হবো, তার আগে তার গর্দান চাই। ...রাজা হুকুম দিলেন—সেই ভণ্ড সন্ন্যাসীকে ধরে আনো।

সেপাই-সান্ত্রী ছুটলো সন্ন্যাসীর সন্ধানে...কিন্তু কোনোখানে তাকে পাওয়া গেল না। তারা এসে খবর জানালো রাজাকে। রাজা তখন কালো-ফড়িংকে গারদে আটক রাখিয়ে মন্ত্রীকে ডেকে নির্জন মন্ত্রণাকক্ষে ঢুকলেন। মন্ত্রীকে বললেন, —সন্ন্যাসীর এ ব্যবস্থা আমি পণ্ড করবো, মন্ত্রী! ওর সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ হবে না—হতে পারে না।

মন্ত্রী বললেন, —কিন্তু মহারাজ, কথায় বলে, জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে...বিধাতার বিধান—মানুষ তার কিছু করতে পারে না।

রাজা বললেন, —বিধাতার এ বিধান আমি পালটে দেবো, মন্ত্রী!

মন্ত্রী বললেন, —কি করে মহারাজ?

রাজা বললেন, —সেনাপতিকে ডাকো।

মন্ত্রী গিয়ে সেনাপতিকে নিয়ে এলেন—তখন রাজা বললেন, —শোনো সেনাপতি, আমার চাকরিতে তুমি চুল পাকিয়েছো—তোমাকে আমি খুব বিশ্বাস করি—তাই তোমাকে খুব গুরুতর কাজের ভার দেবো।

সেনাপতি বললেন, —আদেশ করুন মহারাজ।

রাজা বললেন, —ওই কালো-ফড়িংকে দেখেছো তো! ভণ্ড সন্ন্যাসী বলে গেছে, ওর সঙ্গে হবে রাজকন্যার বিবাহ! আমি এ বিবাহ হতে দেবো না। ওর মুণ্ড বা রক্ত এনে আমাকে দেখাতে হবে না। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি—আমি জানি, তুমি প্রভুভক্ত...আমার এ আদেশ তুমি নিশ্চয় পালন করবে!

সেনাপতি নিশ্বাস ফেললেন। নিরীহ, নিরপরাধ মানুষ—তাকে তিনি করবেন হত্যা—নীচ জল্লাদের মতো! একি কাপুরুষতা! কিন্তু নিরুপায়—তিনি রাজার ভৃত্য...রাজার আদেশ পালন তাঁর কর্তব্য! নিশ্বাস ফেলে সেনাপতি বললেন, —তাই হবে মহারাজ!

কালো-ফড়িংকে নিজের ঘোড়ায় পিঠে তুলে ঘোড়া ছুটিয়ে সেনাপতি এলেন রাজ্য ছেড়ে, রাজ্যের পরে দু-চারখানা শহর আর গ্রাম পার হয়ে গভীর অরণ্যে। অরণ্যের মুখে ঘোড়া থেকে নেমে বড় একটা গাছে ঘোড়া বেঁধে কালো-ফড়িংকে নিয়ে তিনি ঢুকলেন অরণ্যে। অরণ্যের গাছে-গাছে আম-জাম কত ফল...কালো-ফড়িং তো জানে না, এখানে কেন তাকে আনা হয়েছে—সে মনের আনন্দে ফল পেড়ে খেতে খেতে চলেছে...সেনাপতির মনে দুশ্চিন্তা। কালো-ফড়িংয়ের উপর মমতায় মন ভরে আছে—বেচারা...তার কোনো অপরাধ নেই—সে যেচে রাজকন্যাকে বিবাহ করতে আসেনি—বিবাহের কথা সে জানে না—আর তাকে দস্যুর মতো হত্যা করতে হবে—এতবড় পাপ! অথচ রাজার হুকুম মানা তাঁর কর্তব্য! কি করে এ দায় থেকে মুক্তি পাবেন! ভাবতে-ভাবতে উপায় স্থির হলো। তিনি বললেন কালো-ফড়িংকে, —তোমাকে একটি কাজ করতে হবে বাপু!

কালো-ফড়িং বললে, —বলুন, কি কাজ?

সেনাপতি বললেন, —এই বনের পরে একটি পাহাড় আছে—নিচে পাহাড়, পাহাড়ের মাথায় আছে ঝিল, সেই ঝিলে হীরা চুনী মুক্তা পান্না—নানা মণিরত্ন থিকথিক করছে...তোমাকে আমি মখমলের থলি দিচ্ছি, সেই পাহাড়ের ঝিল থেকে আমার এই থলি ভরতি করে মণিমুক্তা নিয়ে এসো। আমি এইখানে তোমার জন্য বসে থাকবো। সে পাহাড় এখান থেকে দুদিনের পথ! কিন্তু সাবধান, এ থলি হারিও না—এ থলি তোমার হাতে

দেখলে, তবেই তোমাকে আমি চিনতে পারবো, তারপর তুমি ফিরে এলে, দুজনে রাজ্যে ফিরবো।

সেনাপতি তাকে দিলেন একটি সোনার মোহর...বললেন, —কাজের জন্য বকশিশ!

কালো-ফড়িং খুশি মনে থলি নিয়ে চললো নীল পাহাড়ের উদ্দেশে।

এখন নীল পাহাড়ের ওই নিচের তলায় দৈত্যপুরী—সেখানে থাকে ভীষণ এক জলদৈত্য! সেনাপতি ভাবলেন, নিচে নেমে মণিমুক্তা কুড়ানোর সময় দৈত্য ওকে ধরে খাবে—কালো-ফড়িংয়ের নিপাত হবে, তিনিও নিজের হাতে ওকে হত্যা করার দায় থেকে মুক্তি পাবেন। তিনি তখন রাজ্যে ফিরলেন—ফিরে রাজাকে খবর দিলেন, —কালো-ফড়িংয়ের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ!

কালো-ফড়িং ওদিকে সেনাপতির সেই মখমলের থলি নিয়ে হেঁটে-হেঁটে দুদিন পরে এলো নীল পাহাড়ে...পাহাড়ের মাথায় উঠে দেখে মস্ত ঝিল, —চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ—বাতাসে গাছের পাতা নড়ে না...কাক-পাখির ডাক শোনা যায় না—কোনোদিকে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।

তখন বেলা দুপুর—গ্রীষ্মকাল—রোদের কী তাপ! তেষ্টায় কালো-ফড়িংয়ের গলা জ্বালা করছে। ঝিলে স্ফটিকের মতো জল। মখমলের থলি ডাঙায় রেখে সে নামলো ঝিলে...মুখ-হাত ধুলো—আঁচলা ভরে জল খেলো...খেয়ে দেখে, আশ্চর্য ব্যাপার. তার হাত-পায়ের কাজল-কালো রং ঝিলের জলে ধুয়ে দুধে-আলতা রং ফুটেছে! বুঝলো, জলের গুণ। তখন বেশ করে স্নান করলো...যখন স্নান করে উঠলো, তখন তাকে দেখে কে বলবে, এ সেই মিসকালো রং ফড়িং! পরনের ট্যানা দিব্যি ভালো পোশাক হয়েছে। ঝিলের জলে মণিমুক্তা থিকথিক করছে—কুড়িয়ে থলি ভরতি করলো—তারপর পাহাড় থেকে নামলো নিরাপদে—এখন রাজার সেই ঘোড়সওয়ারের কাছে গিয়ে তাকে দেবে মণিমুক্তা ভরা থলি।

জলদৈত্য তখন জলের অতলতলে আরামে ঘুমোচ্ছিল—সে টের পেলে না কালো-ফড়িংয়ের ঝিলে নামা—আর ঝিল থেকে মণিরত্ন কুড়োনোর ব্যাপার!

পাহাড় থেকে নেমে কালো-ফড়িং এলো সেই অরণ্যে—মণিরত্নের থলি দেবে রাজার সওয়ারকে (সেনাপতি বলে সে তাকে জানে না—সে জানে, রাজার সওয়ার) কিন্তু কোথায় সে সওয়ার? তাকে খুঁজলো এদিকে-ওদিকে, কোথাও পেলো না। অরণ্য পার হয়ে এসে যে-গাছে সওয়ার তার ঘোড়া বেঁধে রেখেছিল—সে গাছ আছে, কিন্তু ঘোড়া নেই গাছতলায় ঘোড়ার খুরের দাগ রয়েছে। কালো-ফড়িং ভাবলো—তার দেরি দেখে সওয়ার তার ঘোড়া নিয়ে রাজ্যে ফিরে গিয়েছে। তাকে এখন রাজ্যে ফিরতে হবে—ফিরে সে—সওয়ারকে খুঁজে, তার হাতে দিতে হবে এই মণি-ভরতি থলি। এ থলি দিলে সওয়ার তাকে নিশ্চয় কতকগুলো মোহর দেবে!

কিন্তু হেঁটে রাজ্যে ফেরা সহজ নয়। অরণ্য থেকে বেরিয়ে সে দেখলো একটা চটি—খিদে পেয়েছে খুব—ভাবলো—চটিতে গিয়ে কিছু খাবে কিন্তু খাবারের দাম দিতে সোনার মোহর বার করলে যদি চটিওয়ালা তাকে চোর ভেবে সান্ত্রীর হাতে ধরিয়ে দেয়! ভাবলো, দেয় দেবে—খিদে যা পেয়েছে কিছু না খেলে চলতে পারবে না। সে এলো সরাইয়ে। এখন তার চেহারা সুপুরুষ রাজপুত্রের মতো—কালো-ফড়িং তা জানে না—তাকে দেখে চটিওয়ালা ভাবলো—নিশ্চয় কোনো দেশের রাজপুত্র। খাতির-যত্ন করে তাকে খাওয়ালো—কালো-ফড়িং চটিওয়ালাকে মোহর দিলে—রাত্রে চটিতে থেকে পরের দিন সকালে কালো-ফড়িং বেরুলো নিজের দেশের রাজ্যের উদ্দেশে।

কিন্তু রাজ্যের পথ ঠাহর করতে পারলো না, এ পথ ও পথ ঘুরে সে এলো এক অজানা শহরে—তখন বেলা পড়ে এসেছে। বুঝলো এ আর এক শহর—এখানে কোথায় পাবে রাজার সে-সওয়ারকে, ভেবেছিল, দেশে ফিরে সেই সওয়ারকে পেয়ে তার হাতে দেবে মণি-রত্নের থলি—দিয়ে দু-দশখানা মোহর পাবে বখশিশ—সেই মোহরের দৌলতে খেতে পাবে! কিন্তু সে আশা নেই! কাছে পয়সা নেই যে সে পয়সায় খাবার কিনে খাবে! উপায়! ভাবলো, মণিরত্ন অনেকে কেনে—থলি থেকে ছোট একটা মণি-পাথর নিয়ে বেচে যে পয়সা পাবে, তাই দিয়ে খাবার কিনে খাবে! এই কথা ভেবে ছোট একটা মণি-পাথর থলি থেকে বার করে সে ঢুকলো

বড় একটি দোকানে! দোকানিকে মণি-পাথর দেখিয়ে বললে, —এটা আমি বিক্রি করবো—তুমি কত টাকা দাম দেবে?

দোকানদার মণি-পাথর দেখে পরখ করে বললে, —তিনশো টাকা।

তিনশো টাকা! ওরে বাবা, সে যে অনেক টাকা! শুনে কালো-ফড়িংয়ের চোখ কপালে ওঠবার জো। সে বললে, —তিনশো টাকা!

দোকানদার ভাবলো—আরও বেশি টাকা চায়? দোকানদার বললে, —বেশ, বেশ, পাঁচশো টাকা দেবো।

কালো-ফড়িং তখন বুঝলো, এসব মণি-রত্নের অনেক দাম। পাঁচশো টাকা দাম নিয়ে মণি-রত্নটি সে দিলে দোকানদারকে।

তারপর সেই টাকায় সে এলো ভালো এক সরাইয়ে—ভালো খাবার খাওয়া, ভালো ঘরে থাকা—ভালো পোশাক-আশাক কেনা—তার বরাত গেলো ফিরে!

তারপর একটি-একটি করে মণি-রত্ন বেচে কালো-ফড়িংয়ের হলো অগাধ ঐশ্বর্য—সে হলো এ শহরে বেশ মান্যগণ্য ধনী মানুষ! সর্বত্র তার খ্যাতি, সর্বত্র তার খাতির-আদর!

এই শহরেই কালো-ফড়িং তৈরি করলো প্রকাণ্ড পুরী—পুরীর সঙ্গে লাগাও বাগান, ঝিল—বাড়িতে দাসদাসী, ফটকে দরোয়ান—আস্তাবলে গাড়ি-ঘোড়া...মানে, তার এখন বিপুল ঐশ্বর্য! দয়াদাক্ষিণ্য খুব—নিজে সেদিন পর্যন্ত ট্যানা পরে ভিক্ষা করেছে—ভিখারির দুঃখ বোঝে—তাই গরিব-দুঃখী ভিখারিদের জন্য তার দ্বার অবারিত—তাদের অন্ন দান, বস্ত্র দান করে। পাশাপাশি কটা রাজ্যে তার খ্যাতি রটলো।

পরমাসুন্দরী কন্যার বাবা সেই রাজা—তিনিও শুনলেন, এর রূপের খ্যাতি, ঐশ্বর্যের খ্যাতি, গুণের খ্যাতি। তিনি বললেন মন্ত্রীকে, —খবর নাও, মন্ত্রী—এর বয়স শুনছি বেশি নয়—বিবাহ হয়েছে কি না। যদি বিবাহ না হয়ে থাকে তাহলে আমার কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ দেবার ব্যবস্থা করো।

মন্ত্রী চললেন সে শহরে খবর নিতে, —খবর নিয়ে জানলেন—রূপবান গুণবান এমন ধনীর এখনও বিবাহ হয়নি। তখনি কালো-ফড়িংয়ের সঙ্গে মন্ত্রী দেখা করলেন। বললেন, —আমাদের মহারাজের পরমাসুন্দরী কন্যা

আছে—আপনি যদি তাঁকে বিবাহ করেন, তাহলে মহারাজ খুব খুশি হবেন। মহারাজ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন বিবাহের প্রস্তাব জানাতে।

কালো-ফড়িং বললে, —মহারাজ যদি খুশি হন, বিবাহ করবো।

কালো-ফড়িং তখন নিজের তোষাখানা থেকে এত বড় মুক্তার মালা, পান্নার আংটি বার করে মন্ত্রীর হাতে দিয়ে বললেন, —এ বিবাহে আমি রাজি—তাই রাজিনামার চিহ্নস্বরূপ রাজকন্যার জন্য এগুলি পাঠালুম নজরানা।

মন্ত্রী গহনা নিয়ে রাজ্যে ফিরলেন, তখন রাজা হাতিঘোড়া-লোকজন পাঠালেন কালো-ফড়িংকে বরণ করে নিয়ে যাবার জন্য এবং রাজ্যে বিবাহের আয়োজন শুরু হলো।

সভাপণ্ডিতকে ডাকিয়ে যত চটপট হয়—বিবাহের দিন স্থির করে রাজা পাঠালেন পাত্রকে নিমন্ত্রণ—ওই তারিখে বিবাহের দিন ধার্য—তুমি বরযাত্রীদের নিয়ে এ রাজ্যে এসে রাজকন্যাকে বিবাহ করবে। রাজা পাঠাবেন চতুর্দোলা!

নির্দিষ্ট তারিখে আলো-বাজি-বাদ্যের সমারোহ নিয়ে বর এলো বিবাহ করতে। রাজ্যে মহা ধুম—পাত্র দেখে কারো চোখে পলক পড়ে না, যেমন সুন্দরী রাজকন্যা—তেমনি তার যোগ্য পরম রূপবান পাত্র! এ বলে আমায় দ্যাখো—ও বলে আমায় দ্যাখো।

বিবাহ হলো—বিবাহের পর বিরাট ভোজ।

তারপর রাত্রে বাসর এবং সমান তালে শঙ্খঘণ্টা বাদ্যের রোল তুলে বর চললো বউ নিয়ে নিজের বাড়ি।

বর-কনে বিদায় হয়ে গেলে রাজা বসলেন সভায় মন্ত্রী আর পাত্রমিত্রদের নিয়ে। সকলে মহাখুশি...খাসা পাত্র! রাজা বললেন, —আমার সবচেয়ে আনন্দ যে, সেই ভণ্ড সন্ন্যাসীর কথা পণ্ড করতে পেয়েছি! বুজরুক যা বলেছিল—কালো-ফড়িংয়ের সঙ্গে বিয়ে—সেই কালির মতো কালো রং, হাড় জিরজিরে রোগা ভিখিরি—তার হাতে যে কন্যাকে দিতে হলো না—এ কম আনন্দ!

পাত্রমিত্ররা বলে উঠলো, —ঠিক কথা মহারাজ—বলে, জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে বিধাতার লিখন—আপনি বিধাতার সে লিখন মুছে দিয়েছেন—

আশ্চর্য আপনার শক্তি

সভার মধ্যে এমনি আস্ফালন চলেছে, হঠাৎ রানী এলেন, এসে ডাকলেন, —মহারাজ...

রাজা বললেন, —কি বলছো রানী?

রানী বললেন, —বিয়ে হলো, বরকনে চলে গেল কিন্তু জামাইয়ের নাম কি তা তো জানা হলো না! নাম না জানলে তাকে ডাকবো কি বলে? জামাই জামাই বলে ডাকতে হবে নাকি?

রানীর কথা শুনে সকলের চোখ হলো এতবড়। রাজা বললেন, —এহেহে, তাই তো—সব হলো, আর জামাইয়ের নামটা জানা হলো না। কি জানো রানী, আমি সেই ভণ্ড সন্ন্যাসীর কথা ভাবছিলুম—তার জন্য এ কথাটা একদম আমার মনে আসেনি।

রানী বললেন, —এখন উপায়?

রাজা বললেন, —তার জন্য ভাবনা কি? সেনাপতিমশাইকে আমি এখনি পাঠাচ্ছি—তিনি গিয়ে জামাইয়ের নাম জেনে আসবেন।

সেনাপতির উপর হুকুম হলো—এখনি গিয়ে জামাইয়ের নাম জেনে আসতে হবে।

রাজার আদেশ। সেনাপতিকে তখনি যেতে হলো বরের মুল্লুকে।

সেখানে কালো-ফড়িং খুব খাতির-অভ্যর্থনা করলো, বললে, —হঠাৎ আপনি?

সেনাপতি বললেন, —হ্যাঁ, মহারাজ আর মহারানী পাঠালেন। আপনার নাম কি তাই জানতে...বিয়ের তাড়াহুড়ো আর গোলমালে আপনার নাম জানা হয়নি কিনা—তাই।

হাসতে-হাসতে কালো-ফড়িং বললে—আমার নাম কালো-ফড়িং...আপনাদের রাজ্যেই আমি থাকতুম—সেখানেই আমার জন্ম।

সেনাপতির মনে হলো, তিনি বুঝি স্বপ্ন দেখছেন। তিনি বললেন, —কালো-ফড়িং! কিন্তু তার রং ছিল কালো আর দেহ খ্যাংরা-কাঠির মতো লিকলিকে। আপনি এমন সুপুরুষ।

কালো-ফড়িং বললে, —হ্যাঁ—আমি তাই ছিলুম! আমাকে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—তারপর রাজার এক সওয়ার তাঁর ঘোড়ার পিঠে আমাকে তুলে গভীর অরণ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে অরণ্যে ঢুকে তিনি আমাকে একটি সোনার মোহর আর মখমলের থলি দিয়ে বলেন, নীল পাহাড়ে গিয়ে সেই পাহাড়ের মাথায় যে ঝিল আছে সেই ঝিল থেকে মণিরত্ন নিয়ে থলি বোঝাই করে আসবার জন্য...তারপর...

কালো-ফড়িং সব বৃত্তান্ত খুলে বললে। সে আরও বললে, —ঝিলের জলে স্নান করলে তার গায়ের কালো রং ধুয়ে এমন দুধে-আলতা রং হয়েছে—

সেনাপতি বললেন, —মখমলের থলি?

—আছে আমার কাছে। কালো-ফড়িং বললে, —তার দৌলতেই আমার এমন চেহারা—এমন সৌভাগ্য!

—দেখি সে থলি।

কালো-ফড়িং মখমলের থলি এনে সেনাপতির হাতে দিলে। সেনাপতি তখন বললেন, —তিনিই সেই সওয়ার! কেন অরণ্যে কালো-ফড়িংকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কেনই বা নীল পাহাড়ে তাকে পাঠিয়েছিলেন সেনাপতি—তা আর তিনি বললেন না।

সেনাপতি এলেন রাজ্যে...তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। রাজা আর রানী উদ্যানে বিশ্রাম করছেন। সেনাপতি এসে রাজাকে প্রণাম করে বললেন,

—নাম জেনে এসেছি মহারাজ!

—কি নাম? রাজা-রানী একসঙ্গে প্রশ্ন করলেন।

সেনাপতি বললেন—ওঁর নাম কালো-ফড়িং...ওঁকে আপনি...

রাজা চমকে উঠলেন। তিনি বললেন, —তাকে তাহলে হত্যা করোনি?

করজোড়ে সেনাপতি বললেন, —না মহারাজ, আপনার আজ্ঞা অমান্য করে আমি মহা-অপরাধ করেছি, —আমাকে শাস্তি দিন মহারাজ।

রাজা বললেন, —শাস্তির কথা পরে। কিন্তু তার রং ছিল মিসকালো আর সে ছিল ফড়িংয়ে মতো রোগা। এ তো পরম সুন্দর জোয়ান ছেলে।

সেনাপতি বললেন, —আমার মমতা হয়েছিল মহারাজ। নিজের হাতে হত্যা না করে তাকে পাঠিয়েছিলুম নীল পাহাড়ে—সেই পাহাড়ের মাথায় মস্ত ঝিল...সেই ঝিলে মণিমুক্তা থিকথিক করছে, —তার হাতে মখমলের থলি দিয়ে বলেছিলুম মণি-রত্ন বোঝাই করে আনতে। সে ঝিলে আছে জলদৈত্য—ভেবেছিলুম, ঝিলে জলদৈত্য তাকে মারবে—আমাকে এ হত্যার দায় লাগবে না। কিন্তু মহারাজ, দৈত্য মারেনি। উপরন্তু, ঝিলের জলে স্নান করে ওর এমন দিব্যকান্তি লাভ!

সেনাপতি দেখালেন তাঁর সেই মখমলের থলি!

রাজা চুপ করে কি ভাবতে লাগলেন...রানী বললেন, —জামাই তো এসব কথা জানে না?

—না মহারানী! সেনাপতি বললেন।

রানী বললেন, —সাবধান, সে যেন জানতে না পারে। কি ভাবছেন মহারাজ—ভাবনার কি আছে! অমন সুপুরুষ জামাই, এত তার ঐশ্বর্য...

রাজা বললেন, —কিন্তু সেই ভণ্ড সন্ন্যাসীর কথাই সত্য হলো।

রানী বললেন, —ভণ্ড বল—প্রজাপতি দেবতার চ্যালা তিনি। তিনি মঙ্গলই করেছেন, দেখছি!

রাজা বললেন, —ওর নামটা যদি বদলে দি?

রানী বললেন, —না। প্রজাপতি দেবতার কোপ হবে, তাহলে। দেবতার উপর শক্তি ফলাবেন না—তিনি দেবতা.. আপনি ক্ষুদ্র মানুষ;চুপচাপ থাকুন।

রাজা বললেন, —বেশ, তাই থাকবো। সাবধান সেনাপতি, এ কথা যেন প্রকাশ পায় না ঘুণাক্ষরেও কোনোদিন!

আলি-ভুলির দেশে

সুখলতা রাও

একটা মেয়ে আছে তার নাম হচ্ছে ননু। আর তার দুই বন্ধু আছে, তাদের নাম হচ্ছে আলি আর ভুঁলি। কিন্তু তার সেই আলি আর ভুলি বন্ধুদের আজ পর্যন্ত আমরা কেউ দেখিনি। সে যখন একলা বসে খেলা করে, বকর-বকর করে কত কথাই বলে। যদি জিজ্ঞাসা কর, 'কার সঙ্গে কথা বলছিস?' বলবে, 'আলি-ভুলির সঙ্গে।' খাবার সময়ে তাকে ডেকে-ডেকে পাওয়া যায় না, যদি বল, 'কোথায় গিয়েছিলি?' বলবে, 'আলি-ভুলির দেশে গিয়েছিলাম, তাদের সঙ্গে খেলা করতে-করতে দেরি হয়ে গেল।' একদিন সে আমাকে বলল, 'দেখ, ঐ যে ঘাসের মধ্যে দিয়ে সরু রাস্তা দেখা যাচ্ছে, ঐখান দিয়ে, ঐ ছোট্ট ঢিপি পার হয়ে, ঐ গাছের পিছন দিয়ে আলি-ভুলির দেশে যেতে হয়।' তাদের দেশে নাকি কুড়িতলা, পঁচিশতলা বাড়ি আছে। সেই বাড়িতে কত আশ্চর্য-আশ্চর্য জিনিস আছে। আলি-ভুলি যখন এসে ননুকে তাদের দেশে ডেকে নিয়ে যায়, ভাত খেতে-খেতে যদি আলি-ভুলি আসে তবু ননু-ভাত খাওয়া ভুলে তাদের সঙ্গে চলে যায়। আমরা দেখি সে ভাতের গ্রাস হাতে নিয়ে কোনদিকে চেয়ে বসে

আছে। কাজেই বুঝতে পার এই আলি-ভুলি বড় সব্বনেশে বন্ধু। তোমরা যেন তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিও না। আলি-ভুলির দেশ থেকে একদিন ননুর নিমন্ত্রণ এল—

উকুনে বুড়ির বিয়ে হবে পায়েস হবে বেশ
উকুনে বুড়ির মাটির কড়া, পায়েস হবে তাতে ভরা
পাড়ার লোকে পায়েস খাবে, পায়েস হবে শেষ।

তখন সন্ধে বেলা। ননু বই নিয়ে পড়তে বসেছে, তার মা বলেছেন, "ভালো করে পড়বে আলি-ভুলির দেশে চলে যাবে না।" কিন্তু নিমন্ত্রণ পেয়ে ননু মায়ের কথা ভুলে আলি-ভুলির দেশে চলে গেল। উকুনে বুড়ির বিয়ে হবে। সেই কুড়িতলা-পঁচিশতলা কত আলো দিয়ে সাজান হয়েছে, দূর থেকে যেন ঠিক কালীপুজোর দেয়ালির মত দেখাচ্ছে। বাগানে মস্ত উনুনে মাটির কড়া ভরে পায়েস রান্না হচ্ছে। পায়েসের গন্ধে কত দেয়ালি পোকা, ঘুরঘুরে পোকা, ফড়ফড়ে ফড়িং, ডোরা কাটা ফড়িং সব সেখানে জড় হয়েছে। জোনাকি পোকারা গাছের মাথায় দেয়ালির আলো জ্বেলেছে। ননু সেখানে যেতেই আলি-ভুলি কত আদর করে তাকে ডেকে নিয়ে গেল। কিন্তু সেদিন তারা ভারি ব্যস্ত, কাজেই তারা ননুকে তেলি-বেলি-ফেলিদের কাছে রেখে চলে গেল। ননুর সেখানে ভাল লাগল না। খানিক বসে-বসে সে ভাবল, "যাই দেখে আসি কেমন পায়েস রান্না হচ্ছে।"

এর মধ্যে হয়েছে কি একটা মস্ত বড় চার পাখাওয়ালা ফড়িং পায়েসের গন্ধে মাথা ঘুরে কড়ার মধ্যে পড়ে গিয়েছে। ননু ছুটে গিয়ে আঙুল দিয়ে ফড়িংটাকে তুলে ফেলল। বেচারার একপায়ে একেবারে ফোস্কা পড়ে গিয়েছে। তখনি আরও দু'চারটা ফড়িং এসে ঘাস দিয়ে খাটিয়ার মত বানিয়ে সেই চার পাখাওয়ালা ফড়িংকে তাতে তুলে নিল, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। একটা জোনাকি পোকা আগে-আগে লণ্ঠন দেখিয়ে চলল। ননুও তাদের সঙ্গে চলল।

একটা চামেলি ফুলের ঝোপের নিচে হাসপাতাল। সেখানে আরও অনেক ফড়িং রয়েছে। কারো হাত ভাঙা, কারো পা ভাঙা, কারো ডানা ছেঁড়া। ননু দেখল কতগুলো ছোট্ট-ছোট্ট সাদা-সাদা ফড়িং তাদের সেবা করছে, ওষুধ দিচ্ছে। আর একটু ভাল করে দেখে ননু বুঝল, সেগুলো

ফড়িং নয়, ছোট্ট-ছোট্ট পরী। তাই তো। এরকম সাদা ফড়িং তো তাদের বাগানে অনেক আছে, সে তো মোটেই জানত না যে তারা ফড়িং নয় পরী। তাদের বাগানেও চামেলি ফুলের ঝোপ আছে। সে ভাবল, এবার থেকে যত ডানা ভাঙা পোকা দেখবে চামেলি গাছের নিচে রেখে দেবে।

রোগীদের ঘুম পাড়িয়ে ফড়িং পরীরা ঘাসের ওপর নেমে এল। চারদিকে চাঁদের আলো ফুটফুট করছে। ঘাসের মাঝে কত ছোট-ছোট সাদা-নীল ফুল ফুটেছে। পরীরা সে ফুল তুলে মাথায় পরল, তারপর হাত ধরাধরি করে ঘুরে-ঘুরে নাচতে লাগল। তাই তো! ননুদের বাগানে যে আলো জ্বলে, তার চারধারে যে এমনি করে কারা ঘুরে-ঘুরে নাচে। এক-এক সময় এমন তাড়াতাড়ি ঘোরেও যে মনে হয় যেন আলোর চারধারে একটা আলোর চাকা ঘুরছে। ননু ভাবছে, "এবার একদিন রাত্তিরবেলা বাগানে গিয়ে দেখতে হবে।" এমন সময়ে ঘাসের মধ্যে কি যেন সড়সড় করে উঠল। সে চমকিয়ে গিয়ে যেই সরতে যাবে অমনি একটা গর্তের ভিতর পা পড়ে পাটা ভীষণ মচকিয়ে গেল। সে মাটিতে বসে পায়ে হাত বুলোচ্ছে, হঠাৎ কে যেন চিৎকার করে বলে উঠল, "তোর ঠ্যাং, তোর ঠ্যাং।" সে আওয়াজ শুনে পরীরা যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। ননু দেখল, তার সামনে প্রকাণ্ড বড় একটা গিরগিটির মত জন্তু বড়-বড় চোখ বার করে তার দিকে চেয়ে আছে। আর 'তোর ঠ্যাং, তোর ঠ্যাং' করে চেঁচাচ্ছে।

আর ঠিক সেই সময়ে আলি-ভুলি এসে পড়ল। তারা ননুকে বলল, তুমি এখানে বসে আছ? কই পায়েস খেতে যাবে না? চল। সে বলল, "না, ভাই আমার বড় ঘুম পাচ্ছে। আমি বাড়ি যাব।" বলতে-বলতেই সে তার বাড়ি এসে পড়ল। তার সামনে বই খোলা পড়ে আছে। ঐ যাঃ! নিমন্ত্রণ তো খাওয়াই হল না, না পড়াও হল, মা কত রাগ করবেন। সেদিন ননুর মা তার ওপর খুব রাগ করলেন। রাত্রে তাকে আলাদা বিছানায় শুতে হল, মার কাছে শুতে পেল না। সেই থেকে ননু মনে করেছে, এবার থেকে পড়ার সময় যদি আলি-ভুলিরা ডাকতে আসে তাদের সঙ্গে যাবে না, খালি খেলার সময় যাবে।

অস্তপাহাড়ে মানুষের মেয়ে

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

এক যে ছিল রাজা—নাম তাঁর বীরবাহু।

অমন ভাল রাজা আর হয় না। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। আবার এদিকে নামেও যেমন বীরবাহু কাজেও তেমনি মস্ত বীর। সারা পৃথিবী জুড়ে রাজার বীরত্বের খুব খ্যাতি। বহু দূর দেশের আর এক রাজা তাঁর কাছে দূত পাঠালেন।

চিঠিতে লিখলেন, 'বন্ধু! তোমার সাহায্য চাই। এক রাক্ষস এসে আমার রাজ্যটা ছারখার করে ফেললে। কিছুতেই তাকে এঁটে উঠতে পারিনে। তুমি এসে পাষণ্ড রাক্ষসের হাত থেকে আমায় রক্ষা কর।'

সাহায্য চাইলে সাহায্য করতেই হয়। রাজার ধর্মই তাই। কাজেই এ-রাজা তখুনি ছুটলেন মারবার জন্য সেই সুদূর দেশে। সৈন্য-সেনাপতি কিছুই নিলেন না। নিজের বাহুবলই সম্বল। বুকে সাহস, আর হাতে তরোয়াল—এমন কে শত্রু আছে যে বীরবাহুর বশ না মানবে?

সেই দূর দেশে সে কী ভয়ানক যুদ্ধ! রাজা মারেন ঝাঁকে-ঝাঁকে বাণ, রাক্ষস ছোঁড়ে গাছ আর পাথর! সাত দিন সাত রাত লড়াই চলল। চন্দ্র-

সূর্য ঢাকা পড়ে গেল বাণে-বাণে আর গাছে-গাছে। অবশেষে হার মেনে পালাল দুষ্ট রাক্ষস।

ও-দেশের রাজা একেবারে থ। বীরবাহুর মতো বীর তিনি কখনও দেখেননি। আদরে-আপ্যায়নে নিজের রাজ্যে তাঁকে ধরে রাখলেন অনেকদিন। শেষকালে নিজের মেয়েটিকে সঁপে দিলেন বীরবাহুর হাতে।

বৌ নিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন বীরবাহু। খুব ধুমধাম হল। সারা দেশে আনন্দের তুফান বয়ে গেল যেন! কোনও বাড়িতে আর রান্না চড়ে না এক মাসের মধ্যে। ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ সবাইয়ের ঢালাও নেমন্তন্ন রাজবাড়িতে। মণ্ডা-মিঠাইয়ের পাহাড় খাড়া আছে, যে যত চাও, আপন হাতে তুলে নিয়ে খাও। বড়-বড় পুকুর কেটে তাই ভরে রাখা হয়েছে ক্ষীর-দই আর পায়েস দিয়ে, গামছা পরে নেমে যাও, সেই পুকুরে, আর আঁজলা ভরে খাও। উৎসবের চরম করে ছাড়লেন বীরবাহু।

দিন যায়। রানির ছেলে হবে।

রাজা-রানির তো কথাই নেই, দেশের লোকও আনন্দে আটখানা। 'যেমন আমাদের রাজা, তেমনি আমাদের একটি রাজপুত্তুর হোক!' —লোকের মুখে-মুখে শুধু ঐ একই কথা।

অবশেষে—ধাই একদিন রাজাকে বললে—'মহারাজ, আজ রাত্তিরেই রানিমায়ের ছেলে হবে। আপনি গুরু, পুরুত, বদ্যি, গনৎকার, সবাইকে ডেকে এনে তৈরি রাখুন।'

তা তো আনতেই হবে! গুরু বসবেন মন্তরে-মন্তরে রক্ষা-বাঁধন বাঁধবার জন্যে, যাতে ভূত, পেত্নী, রাক্ষস, খোক্কসে শিশুর কোনও ক্ষতি করতে না পারে। পুরুত বসবেন মা-ষষ্ঠীর পুজোয়, বদ্যি থাকবেন ওষুধপত্তর বেটে তৈরি হয়ে। আর গনৎকার? —সবচেয়ে বড় কাজ তো তাঁরই। জন্মক্ষণটির চুলচেরা হিসাব করে রাখতে হবে, তাই দিয়ে পরে তৈরি হবে রাজপুত্তুরের ঠিকুজি।

সবই তো হল! কিন্তু কী মুশকিল দেখ—সন্ধে হতে না হতেই আকাশ আঁধার হয়ে এল অকালের কালো মেঘে। এ কেমন হল? তিন মাসের মধ্যে মেঘ-বৃষ্টির দেখা নেই, আর আজই তাদের যত গড়-গড় গুড়-গুড় করে ঘটা না দেখালে চলত না? রাজা থেকে শুরু করে চাকর-দাসী

সবাইয়েরই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

সবাই যখন বিরক্ত হয়ে গজ-গজ করছে গুরুঠাকুর তখন ব্যস্ত হয়ে রাজাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'ব্যাপারটা সাধারণ নয় বাপু! এ মেঘ-বৃষ্টি স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে না আমার। মন্তর-তন্তরে রক্ষা-বাঁধন আমি বাঁধতে পারছি না। খুব দারুণ রকমের মায়াবী কেউ আড়ালে থেকে কাটান-মন্তর ঝাড়ছে। তারই জোরে এইসব উৎপাত ঘটছে রাজপুরীতে। শিশুর অনিষ্ট করবার চেষ্টা করছে কোনও দৈত্যে বা রাক্ষস।'

রাজা তো ভেবে পান না—দৈত্য-রাক্ষসেরা কেন তাঁর সন্তানের অনিষ্ট করতে চাইবে। চিন্তিত হয়ে তিনি বললেন, 'তাহলে এখন উপায় কী গুরুদেব?'

'সাবধানে থাকো! আর কী করবে?' গুরু হতাশভাবে বললেন, 'আমি তন্তর-মন্তর যতটুকু জানি, তাতে এ মায়াবীর মায়াকে রুখতে পারব বলে ভরসা নেই। সময় থাকলে হিমালয় থেকে, আমারও যিনি গুরু, তাঁকে আনিয়ে নিতাম। রাক্ষস হোক, পিশাচ হোক, তাঁর কাছে টাঁ্যা-ফোঁ করবার শক্তি কারও নেই। কিন্তু সে সময় তো এখন নেই। অস্ত্র হাতে করে বসে থাকো সূতিকাগারের দরজায়। আমি এদিকে যথাশক্তি মন্ত্র পড়ি। তারপর যা থাকে ভাগ্যে!'

রাত যত গভীর হয়, ঝড়বৃষ্টি তত বেড়ে চলে। পৃথিবীটা যেন রসাতলে যেতে বসেছে আজ। রাজা ধনুকে বাণ জুড়ে বসে আছেন সূতিকাঘরের দরজায়, মায়াবীর সাড়া পাওয়ামাত্র এফোঁড়-ওফোঁড় করে বিঁধে ফেলবেন তাকে।

কিন্তু তা আর তিনি পেরে উঠলেন না। ঠিক মধ্যরাত্রে দারুণ একটা ঘুমের আবেশ এসে জুড়ে বসল তাঁর দুচক্ষুতে। অস্ত্র হাতে করেই তিনি দেওয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। সেইমুহূর্তে রাক্ষুসে নিদালিতে রাজপুরীর ঘরে-বাইরে মেয়ে-পুরুষ সবাই ঘুমে অজ্ঞান হয়ে গেল। ঘরের ভিতর রানি ঘুমোন, তাঁর আশেপাশে ঘুমোয় ধাইয়েরা। ঘরের দরজায় ঘুমোন রাজা, চণ্ডীমণ্ডপে ঘুমোন পুরুত-ঠাকুর। সভাঘরে ঘুমোন বদ্যি, গনৎকার। দাসদাসী, পশুপাখি, জন্তুজানোয়ার, এমনকি পুজোঘরে গুরুদেব পর্যন্ত ঘুমে অচেতন। গুরুদেবের মন্তর-তন্তর হার মেনেছে।

প্রলয়বেগে ঝড় বইছে। মুষলধারে ঝরছে বৃষ্টি। মেঘ ডাকছে যেন একসাথে গর্জাচ্ছে একশোটা বজ্র। তারই মাঝে কখন ঘুমন্ত রানি এক সন্তান প্রসব করলেন, রানি নিজেও জানলেন না। আর সেই মুহূর্তে কোথা থেকে আচমকা এক যোজনজোড়া নিকষকালো ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে সে হানা দিল রাজপুরীতে। নিঃশব্দ তার গতি, নিঃশব্দ হাসি তার মুখে, জয়ের আনন্দ নিঃশব্দে জ্বলজ্বল করছে তার ভাঁটার মতো গোল-গোল দুটি চক্ষুতে।

এ হচ্ছে সেই রাক্ষস—রানির বাপের বাড়ির দেশে বীরবাহু যাকে সাতদিন সাত রাত্তির যুদ্ধের পর পরাস্ত করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বাহুবলে বীরবাহুর সঙ্গে সে আঁটতে পারেনি, তাই মনের ঝাল ঝাড়বার জন্য সে এতদিন মায়ামন্তরের সাধনা করেছে। সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়েছে এতদিনে। তাই সাহসে ভর করে সে বীরবাহুর অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে শত্রুতা সাধন করবার জন্য।

কেউ কিছু জানল না। রানির কোল থেকে নবজাত শিশুটিকে তুলে নিয়ে রাক্ষস, হাওয়ার রাজ্যে উঠে গেল। ঘরের ভিতর রানি হঠাৎ জেগে উঠে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন, তাই শুনে তাঁর চারপাশে কেঁদে উঠল ধাই-ধরুনীর দল। ঘরের বাইরে ধড়মড় করে জেগে উঠলেন বীরবাহু। পুজোঘরে চোখ কচলাতে-কচলাতে উঠে বসে গুরুঠাকুর মন্তর আওড়ালেন, 'ওঁ আপদ-বারণায় স্বাহা!'

আর মন্তর! আপদ যা ঘটবার তা ঘটে গিয়েছে। রানির কোল থেকে সন্তান চুরি গিয়েছে। বীরবাহুর বীরত্ব ব্যর্থ। ব্যর্থ গুরুদেবের মন্তরের শক্তি! সারারাত হা-হুতাশ কান্নাকাটি চলল রাজপুরীতে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখবার কথা মনেও হল না কারও। আকাশের মেঘ কখন কেটে গিয়েছে, নির্মল নীলের বুকে ঝকমক করছে হিরের টুকরোর মতো তারার মালা।

রাক্ষস ততক্ষণে শিশুকে নিয়ে একেবারে সাত-সমুদ্দুর-পারে চলে গেছে।

অস্তপাহাড়ের মাথার উপর এক পাষাণপুরী, তাইতে বাস করে এই মায়াবী রাক্ষস। পাহাড়ের কোলে এক কালো জলের সরোবর, বড়-বড় শ্বেতপদ্ম ফুটে আছে সেই কালো জলে। রাক্ষস হাতের কাছে বড় পদ্মটার উপরে শিশুটিকে শুইয়ে রেখে নিজে জলে নামল হাত-মুখ ধোবার জন্য।

রাক্ষসের কোলে বাচ্চাটা বেশ ছিল গরমে-গরমে। হঠাৎ পদ্মের পাপড়ির

ঠাণ্ডা পরশ পেয়ে সে ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল।

মুখ-হাত ধুতে-ধুতে রাক্ষস এতক্ষণ ভাবছিল—ওটাকে কীভাবে শেষ করে দেওয়া যায়। পুকুরের জলে ছুঁড়ে দেওয়া? না, ঐ পদ্মের উপর যেভাবে শোয়ানো আছে ঐভাবেই শুইয়ে রেখে যাওয়া? বাজপাখিতে ছোঁ মেরেও নিয়ে যেতে পারে, না-হয় তো আপনা থেকে গড়িয়ে জলেও পড়ে যেতে পারে!

কোনটা করা যায়, সেই চিন্তাই তোলপাড় করছে মনে-মনে—হঠাৎ বাচ্চার কান্না শুনে সে হকচকিয়ে গেল। কিছু ভেবে ঠিক করার আগেই সে তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে পড়ল, আর পদ্মের উপর থেকে বাচ্চাটাকে তুলে নিল হাতে। এতক্ষণে তার খেয়াল হল যে চোরাই বাচ্চাটা ছেলে নয় মেয়ে। নিজের মনেই সে জিভ কামড়ে পড়ল। আরে ছিঃ! মেয়েকে কখনও মারতে আছে? থাকুক এটা বেঁচে। রাক্ষসের নিঃসঙ্গ জীবনে তবু সঙ্গী আসুক একটা!

তাই হল শেষপর্যন্ত। রাজার মেয়েটি সেই থেকে রাক্ষসের কাছেই থাকতে লাগল।

কয়েক বছর যায়, মায়াবলে রাক্ষস জানল—বীরবাহুর রানির আবারও ছেলে হবে। সেবারের মতো এবারও সে মেঘ-বৃষ্টি সাজিয়ে, নিদালি নামিয়ে রাজপুরীকে অচেতন করে ফেলবার চেষ্টা করল। কিন্তু কী আশ্চর্য! এবার আর রাজবাড়ির ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারল না রাক্ষস। বীরবাহুর গুরু এবারে সতর্ক হয়েছেন। নিজের গুরুকে হিমালয় থেকে আনিয়ে বসিয়ে রেখেছেন পুরীর ভিতরে। তিনি মহাতপস্বী সিদ্ধপুরুষ। রাক্ষসের মায়া তাঁর ত্রিসীমায় ঢুকতে পারে না। রাক্ষসকে ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হল এবার। নির্বিঘ্নে পুত্র হল রানির।

বীরবাহুর পুত্রের নাম হল বজ্রবাহু।

দিনে-দিনে বেড়ে ওঠে বজ্রবাহু। বীরত্বে সে বুঝি তার পিতাকেও ছাড়িয়ে যায়। তার উপর—বীরবাহুর গুরুর গুরু সেই যে সিদ্ধপুরুষ—তিনি এক-রক্ষাকবচ বেঁধে দিয়ে গেছেন তার গায়ে, যার প্রভাবে রাক্ষস খোক্কস দৈত্য-দানো কোনওদিন কোনও অনিষ্ট করতে পারবে না তাঁর।

ছেলেবেলা থেকেই বজ্রবাহু শুনেছে—তার আগে এক ভাই বা বোন

হয়েছিল তার। রাক্ষসে তাকে নিয়ে গিয়েছিল চুরি করে। বজ্রবাহুর রক্ত টগবগ করে ফোটে সেকথা মনে হলে। পৃথিবী থেকে রাক্ষসবংশ নির্মূল করে দেবে বজ্রবাহু। তার ভাইকে চুরি করা? ভাই না বোন? বজ্রবাহুর যেন মনে হয়—হারিয়ে-যাওয়া সেই শিশুটি ভাই না হয়ে বোন হলেই ভাল। বোনেরা যেমন আদর করতে জানে, ভাইয়েরা তা জানে না।

মা তার কথা শুনে চোখের জল ফেলেন। বলেন, 'ভাই হোক, বোন হোক, সে তো আর বেঁচে নেই। কবে তাকে মেরে ফেলেছে রাক্ষসে!'

বজ্রবাহু দাঁত কিড়মিড় করে বলে, 'মেরে যদি ফেলেই থাকে, আমি রাক্ষসদের দেখে নেব! সমুদ্দুরে ডুবিয়ে মারব! জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব আগুনে! পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে মাটির ঢ্যালার মতো তাদের ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারব আকাশের বুকে। লাট্টুর মতো তারা বনবন করে ঘুরতে থাকবে হাওয়ার রাজ্যে!' বড়-বড় রাক্ষসের লাট্টুর মতো অসহায় অবস্থা কল্পনা করে, অত রাগের মাথায় হসি সামলাতে পারে না বজ্রবাহু।

সবে বারো-তেরো বছরের ছেলেটি তখন বজ্রবাহু। একদিন সে শিকারে গেল একা-একাই। গভীর বনের মাঝখানে একখানি খোলা মাঠ, তাইতে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে এক বাচ্চা ঘোড়া। বজ্রবাহু তাকে তাক করে ধনুকে তীর জুড়তে যাচ্ছে এমন সময় ঘোড়ার বাচ্চাটা চিঁহি-চিঁহি করে ডেকে উঠল। আর কী আশ্চর্য! বজ্রবাহু তার ভাষা পরিষ্কার বুঝতে পারল। ঘোড়াটা যেন বলছে, 'আরে কর কী রাজপুত্তুর! আমি যে তোমার জন্যেই এসে অপেক্ষা করছি এই বনে! আমি পক্ষিরাজ ঘোড়া, আমার সাহায্য না পেলে তো তুমি রাক্ষসের দেশে পৌঁছুতেই পারবে না।'

বজ্রবাহু চমকে উঠল। তারপর তূণের তীর তূণে রেখে দুই বাহু মেলে ছুটে গেল সেই পক্ষিরাজের দিকে। বললে, 'তুমি আমায় নিয়ে যাবে রাক্ষসের দেশে? তা যদি যাও, তাহলে বুঝব তুমিই এ-পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে সেরা বন্ধু! চল বন্ধু, আমার বাড়ি চল।'

দুজনে মহানন্দে চলল রাজবাড়ির দিকে। দুজনেই দুজনকে পেয়ে খুব খুশি।

তারপর কিছুদিন কেটে গেল, রাজপুত্তুর এখন বড় হয়েছেন। এবার আর একদিন।

সেদিনও শিকারে গেছেন রাজপুত্তুর। পক্ষিরাজের পিঠে চেপেই গেছেন। হঠাৎ তেপান্তরের মাঠে দেখলেন—মাথার উপরে চক্কোর দিচ্ছে এক বাজের বাচ্চা। বজ্রবাহু ধনুকে তীর জুড়তে যাচ্ছেন, এমন সময় হল কী—সেই বাজ 'কুরর-ক্যু' শব্দে কান-ফাটান ডাক ডেকে উঠল। আর কী আশ্চর্য! বজ্রবাহু স্পষ্ট বুঝতে পারলেন বাজপাখির ভাষা। বাজ যেন ডেকে বলছে, 'আরে কর কী কর কী রাজপুত্তুর! আমি যে তোমায় সাহায্য করতেই এসেছি। আমি হচ্ছি গুরুড় মহারাজের নাতির নাতি। দেবাংশে আমার জন্ম। আমার সাহায্য না পেলে সাধ্য কী রাক্ষস-যুদ্ধে তুমি জিতবে।'

বজ্রবাহু বাজকেও বন্ধু বলে ডেকে নিলেন। তারপর সেই তেপান্তর মাঠ থেকেই পক্ষিরাজকে ছুটিয়ে দিলেন আকাশপথে। আর দেরি নয়! আর দেরি নয়! আজই! এক্ষুনি! সাত সমুদ্দুর পারে রাক্ষসের পুরীতে হানা দিতে হবে। উদ্ধার করে আনতে হবে হারানো ভাইকে! ভাই না বোন? বজ্রবাহু আবারও মনে-মনে বলেন, 'বোন হলেই ভাল! আমার একটি দিদির বড় শখ! দিদির মতো আদর দাদারা করতে পারে না।'

আকাশে উড়ে চলে পক্ষিরাজ, বজ্রবাহুকে পিঠে নিয়ে। আকাশে উড়ে চলে বাজপাখি, বজ্রবাহুকে পথ দেখিয়ে। দিনের পর দিন। মেঘলোক পেরিয়ে কত, কত উঁচু দিয়ে তাদের গতি! এইটে পেরুলেই ব্যস—

দিনের পর দিন! উড়তেই থাকে পক্ষিরাজ! উড়তেই থাকে দেবাংশী বাজপাখি! শেষে একদিন অস্তপাহাড়ের চুড়োয় এসে নামল বজ্রবাহুর পক্ষিরাজ।

বজ্রবাহুর ধনুকে উঠল পৃথিবী কাঁপানো টংকার। পক্ষিরাজ চিঁ-হিঁ শব্দে এমন চেঁচিয়ে উঠল যে, আকাশের মেঘগুলো খান-খান হয়ে ছিঁড়ে গুঁড়িয়ে গেল বাতাসের ঝাপটায়। বাজপাখির গলা থেকে বেরুল এমন 'কুরর-ক্যু' আওয়াজ যে চরা থেকে আলুথালু হয়ে ছুটতে-ছুটতে ফিরে এল রাক্ষসরাজা। যত দূরেই সে থাক, এক কান সে আজকাল অস্তপাহাড়ের দিকে খাড়া করেই রাখে—সেখানে তার মেয়ে রয়েছে যে। কখন মেয়েটার কী বিপদ ঘটে, ঠিক কী!

ঝড়ের বেগে এসে পড়ল রাক্ষস। অবাক হল বজ্রবাহুকে দেখে। মানুষের বাচ্চাটা কী করে সাত সমুদ্দুর পারের এই অস্তপাহাড়ে এসে হাজির হল?

এ পাহাড়ের চারদিকে যে রাক্ষুসে গণ্ডি টানা রয়েছে! কোনও শত্রুর তো সাধ্যি নেই এখানে হানা দেওয়ার! বোকা রাক্ষস তো জানে না যে বীরবাহুর গুরুর গুরু রক্ষাকবচ বেঁধে দিয়েছেন কুমারের হাতে! সেই রক্ষাকবচের বলেই আজ বজ্রবাহু পেরিয়ে এসেছেন রাক্ষুসে গণ্ডি।

যুদ্ধ বেধে গেল। পাহাড়ের চুড়োর আধখানা ভেঙে নিয়ে বজ্রবাহুকে তাড়া করে এল মহারাক্ষস। কিন্তু বজ্রবাহুর গদা বজ্রের বেগে এসে তার উপর পড়তেই পাহাড়চুড়োটা ভেঙে শতখান হয়ে পড়ল রাক্ষসের হাত থেকে। আর সেই মুহূর্তে দেবাংশী বাজপাখি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাক্ষসের মাথার উপরে। দুই পায়ের ধারালো নখ দিয়ে উপড়ে নিল তার দুটি চোখ।

দারুণ যাতনায় চিৎকার করে রাক্ষস মাটিতে বসে পড়ল। দুই হাতে চোখদুটি চেপে ধরে। পক্ষিরাজ উড়ে এসে পড়ল তার সমুখে। আর বজ্রবাহু তরোয়াল তুললেন— রাক্ষসের মাথা কেটে ফেলবার জন্য।

কিন্তু তরোয়াল নামাবার শক্তি আর বজ্রবাহুর হল না। তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে পরমাসুন্দরী এক মানুষের মেয়ে বিদ্যুতের বেগে ছুটে এসে আগলে দাঁড়াল রাক্ষসকে!

'দিদি? আমার দিদি?' —চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল বজ্রবাহুর।

'আমি তোমার দিদি?' —বীণার ধ্বনির মতো মধুরস্বরে মেয়েটি বলল, 'আমি যদি তোমার দিদি হই, তবে আমার মিনতি রাখো। এ-রাক্ষসকে তুমি মের না! ইনি আমার বাবার মতো!'

মায়া আয়না

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
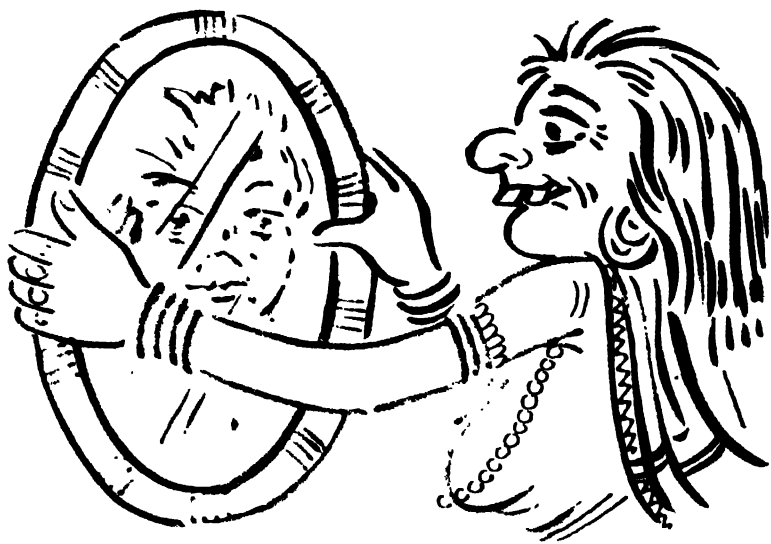
লখিমপুরের রাজকন্যা উত্তরা। লোকের মুখে-মুখে, বাতাসের আগে আগে তার রূপের খ্যাতি ছোটে।

সবাই বলে, এমন রূপ নাকি দুনিয়ায় নেই। সবাই বলে, এ রাজকন্যার যোগ্য বর দুনিয়ায় মিলবে না;

প্রশংসা শুনে-শুনে রাজকন্যাও গর্বে ফুলে উঠেছে, সমস্ত দুনিয়াকে সে পায়ের তলায় রাখতে চায়। রাজার বড় আদরের মেয়ে, সে যখন যা চায়, রাজা তখনই তা যেমন করে হোক এনে দেন। রাজকন্যার খেয়াল মেটাতে কত লোককে মরতে হয়েছে, কত লোককে হাত-পা খোঁড়া হয়ে চির-অকর্মণ্যভাবে বসে থাকতে হয়েছে, তার ইয়ত্তা নাই।

এমন নিষ্ঠুর মন। রাজাও কন্যাস্নেহে অন্ধ।

রানি কেবল ভাবেন, তাঁরই কেবল চোখের জল পড়ে। মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে তিনি শিউরে ওঠেন।

রাজাকে বলেন, 'মেয়ে পাগল বলে তুমিও পাগল হলে, রাজা?'

রাজা বলেন, 'কিন্তু উত্তরা কাঁদবে, রানি।'

মেয়ের চোখে জল পড়বে, এ কল্পনাও রাজার কাছে অসহ্য লাগে।

রানি হতাশ হয়ে দেবতার কাছে প্রার্থনা করেন ও মেয়ে বরং মরে যাক— সেও ভালো। দেশের লোক বাঁচবে। তিনিও বাঁচবেন।

পথ দিয়ে একজন লোক হেঁকে যাচ্ছিল, 'আশ্চর্য আয়না নেবে গো— আশ্চর্য আয়না—' রাজকন্যা উত্তরা ছুটে জানলার কাছে এল।

একটা লোক, হাতে তার একটা আয়না।

রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করলে, 'এ আয়নায় কী হয় গো?'

লোকটি উত্তর দিলে, 'এ আয়নায় মুখ দেখলে সবচেয়ে বেশি সুন্দর হওয়া যায়, মুখে যদি এতটুকু খুঁত থাকে, সে খুঁতও সেরে যায়।'

রাজকন্যার গালে ছিল একটা মস্ত বড় কালো তিল। অমন সুন্দর মুখখানা মস্ত বড় চিহ্ন, যেন চাঁদে কলঙ্ক।

রাজকন্যা উৎসুক হয়ে বললে, 'কই, দেখি তোমার আয়না।'

লোকটি মাথা নেড়ে বললে, 'না, দাম দিয়ে কিনতে হয়, তারপর মুখ দেখতে হয়।'

রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করলে, 'তারপর দাম নিয়ে তুমি যদি পালাও?'

লোকটি হেসে বললে, 'না গো, আমি পালাব না, এইখানে দাঁড়িয়ে থাকব।'

রাজকন্যা তখনই দাম দিয়ে আয়না নিলে।

লোকটি বললে, 'এখনই যেন মুখ দেখ না। আগে স্নান করো, ভাল কাপড়-জামা-গহনাপত্র পর, তারপর একলা একটা ঘরে এই আয়নাতে মুখ দেখ। ভয় নেই, এইখানে তোমার সিপাইদের কাছে বসে থাকছি। আয়নার মুখ দেখে এসে আমায় দেখতে পাবে।'

রাজকন্যা তাড়াতাড়ি আয়নাখানা বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে স্নান করতে গেল।

সেদিন কী তাড়াতাড়ি!

মা ভাবেন, দাসীরা, সহচরীরা ভাবে, আজ ব্যাপার কী? যাকে স্নান করিয়ে দিতে হয়, সে আজ কারও সাহায্য না নিয়ে নিজে চলেছে স্নান করতে, এর মানে?

রাজকন্যা স্নান করে এসে সবচেয়ে দামি শাড়ি-জামা পরলে, বেছে বেছে ভাল গহনা গায়ে দিলে, তারপর বাক্স খুলে আয়না বার করলে।

তার বুক তখন কাঁপছে!

কী জানি, আয়না কী বলে! রাজকন্যা চমকে ওঠে!

প্রবল উৎসাহ ও আনন্দ নিয়ে আয়নায় সে মুখ দেখলে।

এ কী! ওমা একী?

ছিল একটা তিল, এ যে সারামুখে অসংখ্য কালো তিল বার হয়ে পড়েছে।

দেখতে-দেখতে একী পরিবর্তন!

রাজকন্যার মাথার চুলগুলো হয়ে উঠলো কটা, একেবারে ছোট, কাঁধের উপর লুটোপুটি খায়। নাকটা যেন কেমন চেপ্টা হয়ে গেছে, দাঁতগুলো বড় হয়ে গেছে। অমন যে কাঁচা সোনার মতো রং দেখতে-দেখতে হয়ে উঠল কালো। আর সেই কালো তিলগুলো আঁচিলের মতো ঝুলতে লাগল।

হাত থেকে আয়না খসে পড়ল।

দৃষ্টি পড়ল হাতে-পায়ের দিকে।

সব কালো। অমন যে গোল-গোল হাত-পা, হয়ে গেছে শীর্ণ শির-ওঠা।

তবু বিশ্বাস হয় না।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে রাজকন্যা দেয়ালে নিজের বড় আয়নার পানে চাইল।

কী কদর্য আকৃতি!

এই কী সেই রাজকন্যা?

রাজকন্যা আছড়ে পড়ল।

এ তার কী হল? কী করে কোন্ জাদুমন্ত্রে তার চেহারা এমন বদলে গেল? এখন সে কী করবে, কাকে বলবে, কে বিশ্বাস করবে, সে সেই রাজকন্যা। দর্পে যে ধরাকে সরা জ্ঞান করত?

সর্বনাশ, তার মা-বাপ পর্যন্ত বিশ্বাস করবেন না। তাকে চিনতে পারবেন না। এখন উপায়?

রাজকন্যা চিৎকার করে কাঁদতে গেল! হায়-হায়, গলায় সে সুর কই! এ যে বিশ্রী গোঁ-গোঁ শব্দই বার হয়।

রাজকন্যা সারাদিন না খেয়ে সেই ঘরে বন্ধ হয়ে রইল।

রানি এসে দরজায় ঘা দেন। সহচরী-দাসীরা ডাকে, 'ও রাজকন্যা, ওঠো, ওঠো।'

সাড়া নেই।

রাজবাড়ির মিস্ত্রি আসে, দরজা ভেঙে ফেলা হল।

কী সর্বনাশ, এ ডাইনিবুড়ি কে?

আঁতকে উঠে রানি ছুটে পালান, দাসী-সহচারীরা ছুটে পালায়।

রাজবাড়িময় হুলস্থূল কাণ্ড, রাজকন্যা ঘরে নাই, এক ডাইনিবুড়ি রাজকন্যার ঘরে বসে।

রাজার আদেশে প্রহরীরা বুড়িকে তখনই বেঁধে ফেলল।

বুড়ির চোখ দিয়ে ঝরে অজস্র জলধারা। মুখে শুধু হাঁউ-মাউ শব্দ।

রাজারানি কেঁদে লুটিয়ে পড়েন, এই রাক্ষসীবুড়ি তাঁদের একমাত্র মেয়েকে খেয়ে ফেলেছে।

রানি তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লেন।

'তোমার পায়ে পড়ি, আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দাও, তুমি যা চাও তোমায় তাই দেব।'

বুড়ি সঙ্গে-সঙ্গে হাঁউমাউ করে কাঁদে।

রাজা হুকুম দিলেন, 'ডাইনিবুড়িকে শূলে দেওয়া হোক।'

রাজ্যের লোক দলে দলে ডাইনিবুড়িকে দেখতে আসতে লাগল।

যতদিন না শূলে দেওয়া হয়, ততদিনের জন্য ডাইনিবুড়িকে একটা খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। ডাইনিবুড়ি সেই খাঁচার মধ্যে গোঁ-গোঁ করে বেড়াত। নিজের কথা বলবার জন্য ছট্‌ফট্ করত।

যারা দলে-দলে আসত, তারা বলাবলি করত।

'বেশ করেছে বুড়ি, সুন্দরী রাজকন্যাকে খেয়ে ফেলেছে। রাজকন্যা সুন্দরী হলে কী হবে, অমন রাক্ষসী আর দুনিয়ায় ছিল না। গর্বে কাউকে তোয়াক্কা করত না। তার খেয়াল মেটাতে বহু লোক মরেছে। কত লোকের হাত-পা খোঁড়া করে, চোখ তুলে দিয়ে মজা দেখেছে। ভগবান তাদের চোখের জলে দয়া করে বুড়িকে পাঠিয়েছেন।'

বুড়ি-বেশিনী রাজকন্যা সব বুঝতে পারে। অনুতাপে সে জর্জর হয়ে ওঠে। ভাবে, সে যদি আবার নিজের চেহারা ফিরে পায়, প্রতিজ্ঞা করবে আর কখনও অমন সব পৈশাচিক কাজ করবে না। এবার সে লক্ষ্মী-শান্ত হবে।

এত লোক আসে, সেই আয়না-বিক্রেতা লোকটাকে দেখা যায় না।

তাকে দেখতে পেলে অনুনয়-বিনয় করেও যদি চেহারা ফেরানো যেত!

শূলে যাওয়ার দিন এদিকে কাছে এল।

মস্ত বড় ময়দান।

লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। ডাইনিবুড়ির শূল হবে। রাজা নিজেও উপস্থিত। ডাইনিবুড়ির চোখ দিয়ে জল পড়ছে, সে দুইহাত জোড় করে কী যেন বলতে চায়, শুধু গোঁ-গোঁ শব্দ হয়।

শূলে তাকে উঠানো হবে।

জনতার মধ্যে থেকে কেন যেন চিৎকার করে বলল, 'থাম থাম, আমার একটা কথা আছে।'

ডাইনিবুড়ি চমকে উঠল।

এই না সেই, যে বলেছিল আয়না নেবে?

সেই লোকটিই এসে দাঁড়াল।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী চাও?'

সে লোকটি বললে, 'আমি আপনার মেয়েকে ফিরিয়ে দিতে পারি, বলুন আমায় কী দেবেন।'

'আমার মেয়েকে—?'

রাজা যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

'তুমি যা চাইবে, আমি তাই দেব। অজস্র অর্থ, সোনা, রুপা, গহনা, এমনকী আমার অর্ধেক রাজত্ব।'

লোকটি মাথা নাড়লে, 'আমি ওসব কিছুই চাইনে রাজা, আমি চাই আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে। বলুন, আপনি বিয়ে দেবেন কী না। যদি দেন, তাহলে আপনার মেয়েকে আমি ফিরিয়ে দেব।'

মন্ত্রী বললেন, "কিন্তু তুমি দীন-দরিদ্র, তোমার হাতে মেয়ে দেওয়া—

বাধা দিয়ে লোকটি বললে, 'বেশ, আমি চলে যাচ্ছি।'

রাজা বাধা দিলেন, 'আমি তোমার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেব, তুমি আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দাও।'

লোকটি বললে, 'আপনি সকলের সামনে এ কথাটা বলুন।'

মেয়েকে ফিরে পাওয়ার আশায় রাজা সকলের সামনে চিৎকার করে বললেন, 'যদি এই লোকটির দয়ায় আমার মেয়েকে ফিরে পাই, তাহলে এই লোকটির সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব।'

লোকটি আস্তে-আস্তে ডাইনিবুড়ির খাঁচার পাশে দাঁড়িয়ে একখানা ছোট আয়না খাঁচার ফাঁক দিয়ে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'নাও রাজকন্যা, মরে আবার জন্ম পেলে, মনে করে আমার গলায় মালা দিয়ো।'

রাজা ও আর সকলের দিকে ফিরে সে বললে, 'আপনারা সকলে চোখ বন্ধ করুন।'

সকলে চোখ বন্ধ করলেন।

প্রথমেই চোখ খুললেন রাজা—এ কী, খাঁচার মধ্যে কোথায় গেল ডাইনিবুড়ি? রাজকন্যা খাঁচার মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রণাম করছেন।

'উত্তরা—মা—'

সেই লোকটির কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'প্রতিজ্ঞা মনে রাখবেন মহারাজ।'

রাজ্যময় সমারোহ। রাজকন্যার বিবাহ।

রাজকন্যার মুখ মলিন। দরিদ্র ভিক্ষুকের সঙ্গে বিবাহ, কিন্তু উপায় নেই। পিতাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পাপে তিনি ডুবতে দিতে পারেন না।

বিবাহ হয়ে গেল, রাজকন্যা রাগ করে স্বামীর পানে চাননি।

'রাজকন্যা—একবার চাও আমার দিকে।'

'রাজকন্যা চোখ তুলে চাইলেন। রাজপুত্র—তুমি—'

কত রাজপুত্রই বিবাহ করতে এসে গর্বিতা রাজকুমারীর গর্বিত কথায় আহত হয়ে ফিরে গেছেন। রাজপুত্র তাদেরই একজন।

রাজপুত্র উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমিই। তোমার অহঙ্কার আমায় ভারি কষ্ট দিয়েছিল! তোমার এখান থেকে ফিরে আমি আর রাজ্যে যাইনি। এক কাপালিকের শিষ্য হয়েছিলুম। তাঁকে সেবায় তুষ্ট করে তাঁর কাছে দুখানা আয়না পেয়েছিলুম। এক আয়নায় চেহারা রাক্ষসীর মতো হবে, আর এক আয়নার মুখ দেখলে স্বাভাবিক চেহারা ফিরে আসবে। তোমায় বিকৃত অবস্থায় ফেলে অনেক কষ্ট দিয়েছি রাজকন্যা, আমায় মাপ করো।'

রাজকন্যা বললেন, 'আমিও তোমায় আগে অনেক কটুকথা বলেছি, আমায় মাপ করো।'

রাজা, রানি পরদিন যখন শুনতে পেলেন তাঁদের জামাই ভিখারি নয়—রাজপুত্র, তখন তাঁদের আনন্দের সীমা রইল না।

ব্যাঙের রাজা

সুকুমার রায়
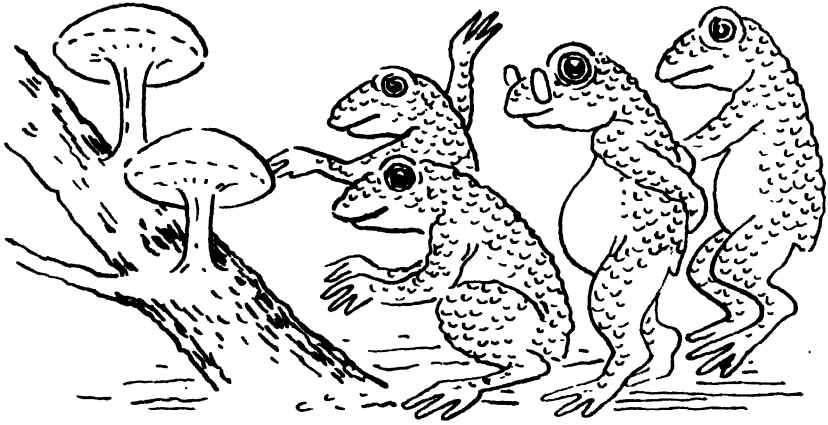
রাজবাড়িতে যাবার যে পথ, সেই পথের ধারে প্রকাণ্ড দেয়াল, সেই দেয়ালের পাশে ব্যাঙেদের পুকুর। সোনাব্যাঙ, কোলাব্যাঙ, গেছোব্যাঙ, মেঠোব্যাঙ—সকলেরই বাড়ি সেই পুকুরের ধারে। ব্যাঙেদের সর্দার যে বুড়ো ব্যাঙ, সে থাকে দেয়ালের ধারে, একটা মরা গাছের ফাটলের মধ্যে, আর ভোর হলে সবাইকে ডাক দিয়ে জাগায়—"আয় আয় আয়—গ্যাঁক্ গ্যাঁক্ গ্যাঁক্— দেখ দেখ দেখ—ব্যাঙ ব্যাঙ ব্যাঙ—ব্যাঙাচি।"এই বলে সে অহংকারে গাল ফুলিয়ে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, আর ব্যাঙগুলো সব "যাই যাই যাই—থাক থাক থাক' ব'লে ঘুম ভেঙে মুখ ধুয়ে দাঁত মেজে, পুকুরপাড়ের সভায় বসে।

একদিন হয়েছে কি, সর্দার ব্যাঙ ফুর্তির চোটে লাফ দিয়েছে উলটোমুখে ডিগবাজি খেয়ে— আর পড়বি তো পড়, একেবারে দেয়াল টপকে রাজপথের মধ্যিখানে। রাজা তখন সভায় চলেছেন, সিপাইশান্ত্রী লোকলস্কর দলবল সব সঙ্গে চলছে। মোটা-মোটা সব নাগরাই জুতো, খটমট ঘ্যাঁচম্যাঁচ করে ব্যাঙ বুড়োর মাথার ওপর দিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পিছে এমনি

রোখ করে চলতে লেগেছে, যে ভয়ে ব্যাঙের প্রাণ তো যায়-যায়! হঠাৎ কোত্থেকে কার একটা লাঠি না ছাতা না কিসের গুঁতো এসে এমনি ধাঁই করে ব্যাঙের গায়ে লেগেছে যে সে বেচারা ঠিকরে গিয়ে পথের ধারে ঘাসের ওপর চিৎপাত হয়ে পড়েছে।

ব্যাঙ বুড়োর খুব লেগেছিল, কিন্তু হাতও ভাঙেনি, পাও ভাঙেনি, সে আস্তে-আস্তে উঠে বসল—আর চারিদিকে তাকিয়ে, দেয়ালের গায়ে একটা ফাটল দেখে, তাড়াতাড়ি তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। সেখান থেকে খুব সাবধানে মুখ বার করে সে চেয়ে দেখল, মাথায় মুকুট রঙিন-পোশাক রাজা, আলো ঝলমল চতুর্দোলায় চড়ে সভায় যাচ্ছেন। লোকেরা সব "রাজা, রাজা" বলে নমস্কার করছে, নাচছে, গাইছে আর ছুটোছুটি করছে। আর রাজামশাই চতুর্দোলায় বসে খুশি হয়ে, এর দিকে তাকাচ্ছেন, ওর দিকে তাকাচ্ছেন, আর কেবলি হাসছেন। তাই দেখে ব্যাঙের বড় ভালো লাগল, সেও দুহাত তুলে নমস্কার করতে লাগল আর বলতে লাগল, "রাজা রাজা রাজা—রাজা রাজা রাজা!" তার মনে হল রাজামশাই ঠিক যেন তার দিকে তাকিয়ে ফিক্ করে হেসে ফেললেন! ব্যাঙ তখন কাঁদ-কাঁদ হয়ে নিশ্বাস ফেলে ভাবল, 'আহা! আমাদের যদি একটা রাজা থাকত!'

তারপর ঘুরে-ঘুরে পথ খুঁজে-খুঁজে ব্যাঙ যখন বাসায় ফিরল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সবাই বলল, "সর্দার বুড়ো সারাদিন তুমি কোথায় ছিলে? আমরা যে কত ডাকলাম, কত খুঁজলাম, তুমি তো কই সাড়াও দিলে না।" সর্দার বলল—"চোপ্ চোপ্ চোপ্‌রাও! রাজা দেখতে গিয়েছিলাম।" তাই শুনে ব্যাঙেরা সব একসঙ্গে "রাজা কে ভাই?" "রাজা কে ভাই?" "রাজা কে ভাই?" বলে চেঁচিয়ে উঠল। বুড়ো তখন গাল ফুলিয়ে, বুক ফুলিয়ে, দুচোখ বুজে, দুহাত তুলে লাফিয়ে বলল, "রাজা হচ্ছে এই এত্তো বড়ো উঁচু, আর ধবধবে সাদা আর ঝক্‌ঝকে আলোর মতো—আর তাকে দেখলেই সবাই মিলে ডাকতে থাকে—"রাজা রাজা রাজা রাজা।" তাই শুনে ব্যাঙেরা সবাই বলতে লাগল, "আহা! আহা! আমাদের যদি একটা রাজা থাকত!" তাদের যে রাজা নেই এই কথা ভাবতে-ভাবতে তাদের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল। বুড়ো ব্যাঙ বলল, "ভাইসকল, এসো আমরা রাজার জন্য দরখাস্ত করি।" তখন

সবাই মিলে গোল হয়ে বসে, আকাশের দিকে চোখ তুলে, নানান সুরে ডাকতে লাগল—"রাজা রাজা রাজা রাজা—রাজা রাজা রাজা রাজা —রাজা চাই রাজা চাই—রাজা চাই রাজা চাই।"

ব্যাঙ-পুকুরের ব্যাঙ-দেবতা—যিনি বাদলা দিনে বর্ষা মেঘের ঝাঁঝরি দিয়ে পুকুর ভরে জল ঢালেন—তিনি তখন আকাশতলায় চাদর মেলে ঘুমোচ্ছিলেন। হঠাৎ ব্যাঙেদের চিৎকারে তাঁর ঘুম ভাঙল। তিনি চারদিকে তাকিয়ে বললেন, "বৃষ্টিও নেই, বাদলাও নেই, মেঘের কোন চিহ্নও নেই, বাছারা সব চেঁচাও কেন?" ব্যাঙেরা বলল, "আমাদের রাজা নেই, রাজা চাই।" দেবতা বললেন, "এই নে রাজা।" বলে মরা গাছের একখানা ডাল ভেঙে তাদের সামনে ফেলে দিলেন।

ভাঙা ডাল পুকুরপাড়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল—তার মাথার ওপর মস্ত মস্ত ব্যাঙের ছাতা জোছনায় চক্‌চক্ করতে লাগল। তাই দেখে ব্যাঙেদের ফুর্তি আর ধরে না। তারা গোল হয়ে ঘিরে বসে মনের সুখে গাল ফুলিয়ে গাইতে লাগল—"রাজা রাজা রাজা রাজা—রাজা রাজা রাজা রাজা—"

এমনি করে দুদিন যায়, দশদিন যায়, শেষটায় একদিন সর্দার ব্যাঙের গিন্নি বললেন, "ছাই রাজা! কর্তা যে সেদিন রাজা দেখলেন, এর চেয়ে সে অনেক ভালো। এ রাজা নড়েও না চড়েও না, এদিকেও দেখে না ওদিকেও দেখে না—ছাই রাজা! তাই শুনে সবাই বলল, "ছাই রাজা! ছাই রাজা! —নড়েও না চড়েও না, দেখেও না শোনেও না—ছাই রাজা!" তখন আবার বুড়ো ব্যাঙ গাছের উপর চড়ে বলল, "ভাইসকল এসো আমরা দরখাস্ত করি—আমাদের ভালো রাজা চাই।" আবার সবাই গোল হয়ে বসে আকাশপানে চোখ তাকিয়ে নানান সুরে ডাকতে লাগল—"রাজা চাই! রাজা চাই! ভালো রাজা—নতুন রাজা।" তাই শুনে ব্যাঙ-দেবতা জেগে বললেন, "ব্যাপারখানা কী? এই তো সেদিন তোদের রাজা দিলাম, এর মধ্যে আবার নতুন কী হল? ব্যাঙেরা বলল, "ও রাজা ছাই রাজা! ও রাজা বিশ্রী রাজা—ও রাজা নড়েও না চড়েও না—ও রাজা চাই না চাই না চাই না চাই না চাই না চাই না—" ব্যাঙ-দেবতা বললেন, "থাম্ তোরা থাম্—নতুন রাজা দিচ্ছি।" এই ব'লে, একটা বককে সেই পুকুরের ধারে নামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "এই নে তোদের নতুন রাজা।"

তাই না দেখে, ব্যাঙেরা সব অবাক হয়ে বলতে লাগল, "বাপ্‌রে বাপ! কি প্রকাণ্ড রাজা, চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে ধবধবে সাদা! ভালো রাজা! সুন্দর রাজা! রাজা রাজা রাজা রাজা" বকের তখন খিদে ছিল না, মাছ খেয়ে পেট ভরা ছিল, তা সে কিছু বলল না; খালি চোখ মিটমিট করে একবার এদিকে তাকাল, একবার ওদিকে তাকাল, তারপর এক পা তুলে চুপচাপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তাই দেখে ব্যাঙেদের উৎসাহ আর ধরে না, তারা প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে গাইতে লাগল। সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকেল হল, সন্ধে হল—তারপর ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রি এল—তখন ব্যাঙেদের গান গাওয়া বন্ধ হল।

তার পরের দিন সকালবেলায় উঠে যেমনি তারা গান ধরেছে, অমনি বক রাজা এসে একটা গোব্‌দা মোটা ব্যাঙকে টপাস্‌ করে মুখের মধ্যে পুরে দিয়েছে! তাই দেখে ব্যাঙেরা সব হঠাৎ কেমন মুষড়ে গেল—তাদের 'রাজা রাজা' গান একেবারে পাঁচ সুর নেমে গেল। বকরাজা ব্যাঙটিকে দিয়ে জলযোগ করে একটি ঠ্যাঙ মুড়ে ধ্যান করতে লাগলেন।

এমনি করে এক-এক বেলায় এক-একটি ব্যাঙ বকরাজার পেটের মধ্যে যায়। ব্যাঙমহলে হৈচৈ লেগে গেল। সবাই মিলে সভায় ব'সে যুক্তি করে বলল, "এটা বড় অন্যায় হচ্ছে। রাজাকে বুঝিয়ে বলা দরকার, সে হল আমাদের রাজা, সে এমন করলে আমরা পালাই কোথা? কিন্তু বুঝিয়ে বলবে কে? সর্দার গিন্নি বললেন, "তার জন্য ভাবছিস কেন? এতে আর মুশকিল কিসের? এই দেখ না, আমিই গিয়ে বলে আসছি।"

সর্দার গিন্নি বকরাজার পায়ের সামনে গ্যাঁট হয়ে বসে, হাতমুখ নেড়ে কড়কড়ে গলায় বলতে লাগলেন, "ও রাজা, তোর ভাগ্যি ভালো, তুই আমাদের রাজা হলি। তোর চোখ ভালো, মুখ ভালো, ঝক্‌ঝকে রঙ ভালো, তোর এক পা-ও ভালো, দুই পা-ও ভালো, কেবল ঐটি তোর ভালো নয়—তুই আমাদের খাস কেন? শামুক আছে শামুক খা না, পোকা-মাকড় প্রজাপতি তাও তো তুই খেতে পারিস। রাজা হয়ে আমাদের খেতে চাস? ছ্যা ছ্যা ছ্যা ছ্যা—রাম রাম রাম রাম—অমন আর কক্ষনো করিস নে।" বক দেখলে তার পায়ের কাছে দিব্যি একটা নাদুস্‌নুদুস্‌ ব্যাঙ, তার নরম-নরম গোলগাল চেহারা! টপ্‌ করে বকরাজার জিভ দিয়ে এক ফোঁটা জল

গড়িয়ে পড়ল আর খপ্ করে সর্দার গিন্নি তার মুখের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন!

ব্যাঙেদের মুখে আর কথাটি নেই। সবাই তাড়াতাড়ি চট্‌পট্ সরে বসে বড়-বড় হাঁ করে তাকিয়ে রইল। পরে সর্দার ব্যাঙ রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলল, "পাজি রাজা! লক্ষ্মীছাড়া দুষ্টু রাজা!—চাই না চাই না চাই না চাই না—রাজা চাই না, রাজা চাই না।"

ব্যাঙ-দেবতা জেগে বললেন, 'দূরছাই! আবার কি হল?" ব্যাঙেরা বলল, "বাপরে বাপ্! বাপরে বাপ্! কি দুষ্টু রাজা! নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও!"

তখন ব্যাঙ-দেবতা হুশ্ করে তাড়া দিতেই বকরাজা পাখা মেলে উড়ে পালাল। আর ব্যাঙেরা সব বাসায় গিয়ে বলতে লাগল, "গ্যাঁক্ গ্যাঁক্ গ্যাঁক্—বাপ্ বাপ্ বাপ্—ছ্যা ছ্যা ছ্যা—রাজাটাজা আর কক্ষনো চাইব না।"
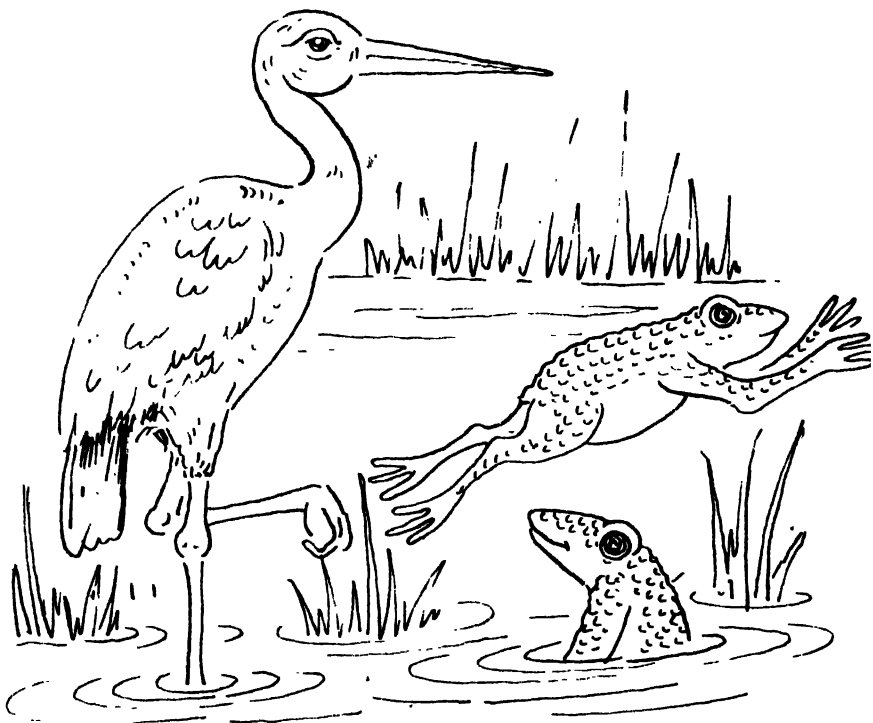
পদ্মের জন্মকথা

হেমেন্দ্রলাল রায়
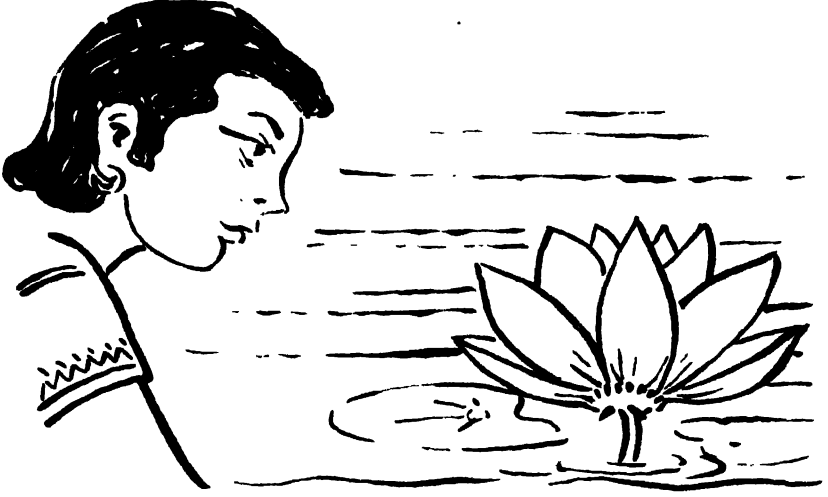
সাগরপারের রাজপুত্র—হেসে-খেলে শিকার নিয়ে মত্ত ছিলেন—এমনি সময় হঠাৎ একদিন চোখ পড়ল তাঁর, একখানা ছবির উপরে। ছবি তো নয় যেন জ্যোৎস্নার ধারায় লেখা একটা হাসির দীপ্তি। রাজপুত্র বলে বসলেন—ও ছবি যার, তাকেই আমি চাই।

মন্ত্রী বললেন—সে তো হবার জো নেই রাজকুমার। ও ছবি যার, মানুষের পক্ষে তাকে দুর্লভ বললেই হয়। কারণ, সাগর ডিঙিয়ে পাহাড়, পাহাড় পেরিয়ে মরু, মরুর ওপারে বরফের দেশ—ও সেই দেশের রাজকন্যা। সে দেশে যাওয়া দুঃসাধ্য এবং গেলেও সে রাজকন্যাকে এখানে আনা অসম্ভব। কারণ সে দেশের নিয়ম—তাদের রাজ্যের মেয়ে, কখনও রাজ্যের বাইরের কারও গলায় মালা পরাতে পারবে না।

রাজপুত্র বললেন—আমার অভিধানে অসম্ভব বলে কোনও কথা নেই। আমি ঐ মেয়েকেই বরণ করা জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করলুম।

রাজপুত্র সাগরের জলে জাহাজ ভাসালেন। আকাশ-ছোঁয়া ঢেউয়ের দল এসে তাঁর পথরোধ করল, জাহাজ-ডোবানো ঝড় এসে তাঁকে বাধা

দিলে। কিন্তু রাজপুত্রের পণ অটল। ঢেউয়ের সঙ্গে তিনি লড়লেন, ঝড়ের সঙ্গে তিনি যুঝলেন। অবশেষে তাঁর জাহাজ এসে ভিড়ল সমুদ্রের পরপারে সেই পাহাড়ের গায়ে—যে পাহাড়ের পথ বেয়ে রাজকন্যার দেশে যাওয়া যায়।

এইবার শুরু হল তাঁর পাহাড় ডিঙিয়ে পথ চলবার পালা। পথে কত চড়াই-উৎরাই, কত গহ্বর! কোথাও বা পথ সোজা উপরের দিকে উঠে গেছে, কোথাও বা সোজা নেমে গেছে একেবারে পাতালপুরীর প্রায় কাছটাতে। মরণকে হাতে নিয়ে এ পথও তিনি পেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু পাহাড় শেষ হতেই দেখা গেল—সামনে ধু-ধু মরুভূমি, তার যেন কূল নেই—শেষ নেই। রোদের ঝাঁঝে বালিগুলো তার জ্বলছে—নেই তার কোথাও এতটুকু ছায়া, নেই তার কোথাও একটু শ্যামলতা!

রাজপুত্র এবার সেই বালির সমুদ্রের ভিতরেই নেমে পড়লেন। একমনে চলেছেন রাজপুত্র সেই মরুভূমির ভিতর দিয়ে। মরুভূমি তো নয়—যেন আগুনের পাথার! মুহুর্মুহুঃ তার হলকা এসে লাগছে তাঁর গায়ে। দেহ তাঁর ঝলসে গেল, তৃষ্ণায় বুকের ছাতিটা ফেটে যাবার মতো হল। অবশেষে জীবন্মৃতের মতো হয়েই এ মরুটা পার হয়ে তিনি এসে পৌঁছলেন সেই বরফের দেশে, যেখানকার রাজকন্যার ছবি তাঁকে ঘর থেকে পথের পরে টেনে এনেছে।

বরফের দেশ—স্বপ্নরাজ্যের মতো সুন্দর—অপরূপ। সূর্যের আলোয় তার টুকরোগুলো জ্বলে ঠিক যেন হীরকের টুকরো। চাঁদের আলো তার বুকে রামধনুকের রঙ ফলায়। এই বরফের স্তূপের উপরে বরফের দেশের রাজকন্যা হরিণের গাড়িতে চড়ে বেড়িয়ে বেড়ায়, বরফের তাল নিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে ছুটে-ছুটে খেলা করে। বরফের সঙ্গে রক্ত মিশলে যে রঙের সৃষ্টি হয়, তারই মতো তার গায়ের রং, যে হরিণ তাঁর গাড়ি টেনে নিয়ে বেড়ায় তার মতো তাঁর দুটো চঞ্চল চোখ।

সেদিনও রাজকন্যা হরিণের গাড়িতে চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন, হঠাৎ কী দেখে তাঁর গাড়ি-টানা হরিণটা ভয় পেয়ে গেল এবং ভয় পেয়েই সে ছুটতে শুরু করে দিলে। হরিণের ছোটা—তাও আবার ভয় পেয়ে। এক মুহূর্তেই পায়ে যেন তার বিদ্যুতের বেগ জেগে উঠল। রাজকন্যা প্রাণপণে

রাশ টেনে ধরলেন। কিন্তু তাতেও তার গতি ফিরল না। অবশেষে টানতে-টানতে হাতের ভিতরে রাশটাও ছিঁড়ে গেল। ভয়ে রাজকন্যার শরীরের রক্তও যেন জমে বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে উঠল। এই অবস্থায় হরিণ-টানা গাড়িখানা ছুটতে-ছুটতে এসে পড়ল এমন একটা জায়গায়—যার পরেই প্রকাণ্ড একটা খাদ, যে খাদের তলা কোথায়—এ পর্যন্ত কেউ তা খুঁজে বার করতে পারেনি।

আর একমুহূর্ত—তার পরেই অজানা অন্ধকারের মধ্যে নিঃসংশয়ে মৃত্যু। ভয়ে-বিহ্বলতায় রাজকন্যা চোখ বন্ধ করলেন। হঠাৎ এমনি সময় একটা প্রকাণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়িখানা থেমে গেল, হরিণটা আর এক পাও সামনের দিকে এগুতে পারলে না।

রাজকন্যা বিস্মিত হয়ে চোখ মেলতেই রাজপুত্র বললেন—নামো, রাজকুমারী, নামো—শিগগির গাড়ির উপর থেকে নেমে পড়ো। পারছিনে আমি আর গাড়িখানাকে আটকে রাখতে। সামনেই প্রকাণ্ড খাদ, দেরি করলে আমাদের নিয়ে হরিণটা এখনই খাদের ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

রাজকন্যা গাড়ির উপর থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন, সঙ্গে-সঙ্গেই হরিণের শিংটাও রাজপুত্রের হাত হতে ছিটকে বেরিয়ে গেল। হরিণটা শুধু একটা লাফ দিলে। তারপরেই একটা ভীষণ শব্দ করে গাড়িসুদ্ধ সে যে কোথায় হারিয়ে গেল—আর তার চিহ্ন রইল না কোনওখানে।

খানিকটা বাতাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুকের ভিতর টেনে নিয়ে রাজকন্যা রাজপুত্রের রক্তাক্ত হাতদুটো নিজের হাতের ভিতর তুলে নিলেন, তারপর ওড়নাখানি টেনে ছিঁড়ে ফেলে তাই দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হাতদুটো বেঁধে দিতে-দিতে বললেন—কে তুমি বন্ধু, আমার প্রাণ বাঁচালে—নিজের প্রাণটাকে এমনি করে বিপন্ন করে?

রাজপুত্র বললেন—আমার প্রাণের চেয়ে তোমার প্রাণের দাম ঢের বেশি রাজকন্যা, তাই তো তোমাকে বাঁচাবার জন্য নিজের প্রাণের দিকে তাকাবারও আমার অবসর হয়নি!

কথাটা শুনে রাজকন্যার অধরে যে হাসির রেখাটা ফুটে উঠল, তাই দেখে রাজপুত্র মনে-মনে ভাবলেন, —আজ যদি রাজকন্যাকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হত, তবে সে মৃত্যুও তাঁর অনর্থক হত না।

রাজকন্যার সঙ্গে রাজপুত্রের ভারি ভাব হয়ে গেছে। এখন সুযোগ পেলেই দুজনে এসে মিলিত হন, আগে থেকে ঠিক করা একটা জায়গাতে। তারপর কত হাসি-গানে, গল্প-আনন্দে ভরে উঠে তাঁদের দণ্ডগুলো।

এমনি করেই হাস্যামোদের ভিতর দিয়ে তাঁদের প্রতিদিনের মেলামেশা চলছিল। কিন্তু হঠাৎ সেদিন রাজকন্যা এসেই দেখলেন—রাজপুত্রের মুখের সেই প্রস্ফুটিত ফুলের মতো হাসিটি মিলিয়ে গেছে, আর তার জায়গায় ঘন হয়ে জেগে উঠেছে একটা গভীর চিন্তার কালো ছায়া।

রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করলেন—সেকি রাজপুত্র! তোমার মুখে মেঘের ছায়া পড়েছে কেন?

রাজপুত্র বললেন—কারণ, কানের কাছে আমার বিদায়ের বাঁশি বেজে উঠেছে, আমার রাজ্যে ফিরে যাবার সময় হয়েছে। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে গেলে যে আমার সমস্ত জীবনই ব্যর্থ হয়ে যাবে রাজকন্যা। তাই তো বুকের ভিতর আমার জ্বলে উঠেছে ব্যথার আগুন, আর তারই আঁচে পুড়ে কালো হয়ে উঠেছে আমার বাইরের চেহারাটা।

রাজকন্যার মুখেও সেই আগুনের আঁচ লাগল। ধরা গলাটা কোনওরকমে সাফ করে নিয়ে তিনি বলে উঠলেন—তোমাকে ছেড়ে আমিও তো বেঁচে থাকতে পারব না বন্ধু। তারপরেই ঝরঝর করে তাঁর চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এল।

তাঁর চোখের জল মুছিয়ে দিতে-দিতে রাজপুত্র বললেন—এতই যদি তোমার ব্যথা, তবে তুমিও চল না কেন আমার সঙ্গে—আমার রাজ্যে? তোমার ছোঁয়ায় আমার অন্ধকার রাজপুরী আনন্দের আলোকে ভরে উঠবে।

রাজকন্যা বললেন—সে কী করে হবে বন্ধু! তুমি তো এ রাজ্যের নিয়ম জান না। আমাদের বাইরের কারও গলায় মালা দিতে নেই। আমি যদি সে নিয়মের ব্যতিক্রম করি, তবে এ রাজ্যের যাঁরা প্রধান, তাঁরা কখনও আমাকে মাফ করবেন না। যেমন করেই হোক তাঁরা আমাকে দণ্ড দেবেনই, আমার এই অপরাধের জন্য।

রাজপুত্র ম্লান হাসি হেসে বললেন—রাজকন্যা! একবার যদি আমরা আমাদের রাজ্যে পা দিতে পারি, তবে তো আমাদের কোন শঙ্কা নেই। তুমি পালিয়ে চলো আমার সঙ্গে—আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে

যাব। রাতারাতি যদি আমরা এই মরুভূমিটা পাড়ি দিয়ে একবার পাহাড়ের ভিতর আশ্রয় নিতে পারি, তবে হাজার চেষ্টা করলেও কেউ আমাদের ধরতে পারবে না।

কথাটা নিয়ে অল্প-বিস্তর আলোচনা হল—তারপর স্থির হল যে, সেইদিন রাত্রেই রাজকুমারীকে নিয়ে রাজপুত্র বরফের দেশ ছেড়ে যাত্রা করবেন—তাঁর নিজের দেশের অভিমুখে। জ্যোৎস্নার আলো তাঁদের পথ দেখাবে, আর মরুপথে তারার ভাতি হবে তাঁদের পথ-প্রান্তের সাথী।

আকাশ ছাপিয়ে জ্যোৎস্নার আলো উছলে উঠে পৃথিবীর বুকে লুটিয়ে পড়েছে। আকাশ-বাতাস সব যেন মায়ার জালে ঘেরা। এই মায়ালোকের মাঝখান নিয়ে একটা স্বপ্নে-ভরা মন নিয়ে রাজকুমার এসে দাঁড়ালেন সেই সঙ্কেতস্থানে—যেখানে রাজকুমারী এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন।

বেশিক্ষণ তাঁকে অপেক্ষা করতে হল না। একটু বাদেই রাজকুমারীও এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। রাজপুত্র, রাজকন্যার হাতদুটো নিজের হাতের মুঠোর ভিতরে তুলে নিয়ে বললেন—এইবার তবে রাজকুমারী, তুমি অনুমতি করো, আমরা যাত্রা শুরু করি।

কিন্তু হাতের ভিতর দিয়ে রাজকুমারের কাছে আনন্দের বদলে রাজকন্যার দেহের কাঁপুনিটাই ধরা পড়ল। হঠাৎ একটা চাবুকের ঘা খেলে মানুষ যেমন করে উঠে, তেমনি করে চমকে উঠে রাজপুত্র বললেন—তোমার দেহ কাঁপছে রাজকন্যা! মুখের ভিতরেও তো তোমার খুশির আভাস ধরা পড়ছে না। যদি আমার সঙ্গে যেতে তোমার দ্বিধা থাকে, আমি তোমাকে সেজন্য পীড়ন করব না। তোমার মুখের হাসি কেড়ে নিয়ে তো তোমাকে আমি পেতে চাইনে।

রাজকন্যা ধীরে-ধীরে তাঁর বুকের উপরে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে বললেন—তা নয় রাজকুমার। তোমার সঙ্গে যেতে আমার কোনও দ্বিধা নেই। কিন্তু কেন জানিনে, একটা অকারণ ভয়ে আমার সব শরীর কেঁপে-কেঁপে উঠছে। —কেবলই মনে হচ্ছে, এ জীবনে তোমাকে লাভ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হবে না। আমাদের এই যাত্রা শুরু হবার আগেই শেষ হয়ে যাবে।

রাজকুমার হেসে উঠে বললেন—কল্পনা মাঝে-মাঝে মানুষের মনকে

অমন ভয় দেখিয়েই থাকে, কিন্তু তাই বলে তা যদি সত্য হত, তবে পৃথিবীর বেশিরভাগ কাজই অসমাপ্ত থেকে যেত। কোনও ভয় নেই তোমার, আমার ভরসা আছে—পথ আমরা নিরাপদেই পাড়ি দিতে পারব।

কিন্তু তাঁর কথা শেষ হবার আগেই—পিছনে—দূরে 'হোঃ-হোঃ' করে কে একটা বিকট হাসি হেসে উঠল। চমকে উঠে রাজকুমারী রাজকুমারের বুকের কাছে আরও ঘেঁসে এসে বললেন—সর্বনাশ হয়েছে রাজকুমার! আমি যা ভয় করেছিলুম শেষে তাই ঠিক হল। আমাদের পলায়নের কথা হয়তো আর গোপন নেই। ঐ যে হাসি শুনছ, ও হাসি এ রাজ্যের পুরোহিতের! শাস্ত্র-পুঁথি খুলে উনিই পাঁতি দেন—বাইরের রক্তের সঙ্গে এ দেশের কারও রক্ত মিশতে পারবে না, আবার কেউ অপরাধ করলে উনিই তার দণ্ডবিধান করেন। এ দেশের রাজারও শক্তি নেই যে, ওঁর বিধানকে পালটে দিতে পারেন। উনি যখন টের পেয়েছেন, তখন মুক্তির আর কোনও উপায়ই তো আমার চোখে পড়ছে না। তবু তুমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখ। আমার অদৃষ্টে যাই থাক, এখানে উনি পৌঁছবার আগেই তুমি পালাও—তুমি পালাও—দোহাই তোমার—আর একমুহূর্তও দেরি কর না।

কিন্তু যুবরাজ একবারও পিছনের দিকে ফিরে চাইলেন না। বরং তলোয়ারখানা খাপ থেকে খুলে নিয়ে রাজকন্যাকে আরও বুকের কাছে টেনে নিলেন।

লোকটা এসেই আবার হিঃ-হিঃ করে হেসে উঠল। তারপর রাজকন্যার দিকে তাকিয়ে বললে—'রাজকুমারী! এ দেশের নিয়ম তুমি জান। তা সত্ত্বেও তুমি যে অন্য দেশের লোকের সঙ্গে পালাবার ব্যবস্থা করছিলে, সে অপরাধের তো মার্জনা নেই। আমি তোমাকে কঠিন শাস্তি দেব, কিন্তু তার আগে শাস্তি দেব এই লোকটাকে, যে তোমাকে ভুলিয়ে নিশীথ রাত্রে এই নির্জন স্থানে টেনে এনেছে। ওকে আমি আর মানুষের দেহেই রাখব না।' বলেই একটা বরফের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে লোকটা নিজের মনে-মনেই কি যেন বললে, তারপর তাই ছুঁড়ে মারলে রাজকুমারের দেহখানাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু ঢিলটা রাজপুত্রের গায়ে এসে লাগবার আগেই রাজকুমারী বিদ্যুতের বেগে সামনে এগিয়ে এসে সেটা নিজের দেহে গ্রহণ করলেন।

চোখের পলক পড়তে না পড়তেই রাজকন্যার আলোর ঝরনার মতো সেই তনুখানি বাতাসের ভিতরেই মিলিয়ে গেল—আর তার পরমুহূর্তেই রাজপুত্রের তলোয়ারখানা ঝকমক করে উঠে তেমনি বিদ্যুৎবেগেই নেমে এল বিস্ময়-বিহ্বল সেই পুরোহিতের মাথার উপরে। সঙ্গে-সঙ্গে মাথাটা তার দেহের বোঁটা হতে খসে দূরে ছিটকে পড়ল। আর তারপরেই রাজপুত্রের দেহটাও মূর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়ল, রাজকন্যা যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন তারই পাশে—বরফের একটা স্তূপের উপরে।

রাজপুত্রের যখন জ্ঞান হল, জ্যোৎস্না তখনও তেমনই করে হাসছে, আর সেই হাসির সঙ্গে হাসি মিলিয়ে হাসছে, মৃণালবৃন্তের উপরে একটি আধফোটা পুষ্পের দীপ্তি। রাজপুত্র ফুলটার দিকে তাকাতেই সে যেন মাথা নেড়ে বললে—তোমার জন্য আমি যে আপনাকে উৎসর্গ করতে পেরেছি বন্ধু, তারই আনন্দে আমি সার্থক হয়েছি। আমার কোথাও কোনও ক্ষোভ বা দুঃখ নেই।

চোখের জল দিয়ে ফুলটাকে ধুয়ে দিয়ে রাজপুত্র ধীরে-ধীরে সেটিকে মাটি হতে কুড়িয়ে বুকের উপরে তুলে নিলেন তারপর বরফের দেশের রাজকুমারীর সেই রূপান্তরিত দেহখানা নিয়ে তিনি নেমে পড়লেন মরু-প্রান্তরের মাঝখানে।

দেশে ফিরেই রাজকুমার সকলের আগে তৈরি করলেন একটা শ্বেতপাথরের চৌবাচ্চা। তারপর তারই ভিতরে তিনি রোপণ করলেন, মূলসুদ্ধ সেই ফুলটাকে। দিনের আলোকে, রাতের জ্যোৎস্নায় রাজপুত্র তারই মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকতেন, আর বাতাসের বেগে ফুলটা একটু দুলে উঠলেই ভাবতেন—রাজকন্যা বুঝি তাঁকে ডাকছেন। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর চোখ হতে ঝরঝর করে জল ঝরে ঝরনা গড়ে তুলত।

আর সরোবরে-সরোবরে আমরা যে হাজারো পদ্মফুল দেখতে পাই, বরফের দেশের রাজকন্যার দেহ থেকেই তো তাদের জন্ম। তাইতো তাদের হাসিতে চোখ ভোলে, রূপে মন দোলে, গন্ধে হৃদয় আপনাকে একেবারে হারিয়ে ফেলে।

তাঁতির বরাত

সুধীন্দ্রনাথ রাহা

অজ-পাড়াগাঁ। চাষী-মজুরই বেশি সেখানে, দুচার ঘর ভদ্রলোক যাঁরা আছেন, তাঁরাও খুবই গরিব।

সেই গাঁয়ে বাস করে এক তাঁতি।

সার্থক তাঁত বুনতে শিখেছিল সে। হাতের কাজ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এমন সব বুটি তোলে, কলকা বুনে তোলে এমন চমৎকার—কাপড় যেন ঝলমল করে ওঠে।

কিন্তু কী বরাত! গরিব গাঁয়ে সৌখীন কাপড়ের দাম দেবে কে? অন্য তাঁতিদের বোনা মোটা মামুলি কাপড়ই হাটে বিকোয়, আমাদের সোমিলকের কাপড় সবাই একবার করে নাড়ে বটে, কেনে না কেউ। এমনকি, দাম পর্যন্ত জানতে চায় না, ভাবে—'এ তো রাজার ঘরের জন্য বোনা, আমরা আদার ব্যাপারি জাহাজের খোঁজ নিয়ে করব কী?'

হাট ভাঙবার মুখে সোমিলকই খোশামোদ করে চেনা লোকেদের। 'নিয়ে যা ভাই, চাইনে বেশি দাম; মুড়ি-মুড়কি একদামেই বিকিয়ে যাক! যা হোক কিছু পয়সা না এলে যে খেতেই পাব না।'

বাড়ি গিয়ে দিব্যি গালে যে, এবার থেকে অন্য তাঁতিদের মত বাজে জিনিসই বুনবে সে। কিন্তু কী গেরো! তাঁতে বসলে সে কথা তার মনে থাকে না। কখন যে ভালো-ভালো নক্‌শা ফুটতে শুরু করে তার টানা-পোড়েনে, নিজেও তা সে জানতে পারে না। ভালো কাজ করবার জন্যই জন্ম তার, চেষ্টা করেও সে খেলো কাজ করতে পারে না।

দুঃখ তার ঘোচে না।

বামুনবাড়ির এক ছেলে বহু দূরদেশে মস্ত কোন পণ্ডিতের কাছে পড়ে। সে একবার বাড়ি এল বাপ-মাকে দেখতে। সোমিলকের দুর্দশা দেখে সে বললে—'খুড়ো, একটা কথা বলি। আমি শহরে থাকি, সেখানকার হাল-চাল জানি। তোমার হাতের এ কাপড়—এ জিনিসের বাজার হল শহরে। সেখানে লোকের শখও আছে, পয়সাও আছে। তুমি যদি কোন বড় জায়গায় গিয়ে কাজ কর, সোনাদানায় ঘর ভরে যাবে তোমার।'

কথাটা মনে লাগল সোমিলকের।

শহরেই সে যাবে।

কিন্তু সবচাইতে নিকটের যে শহর, সেও তো দিন সাতেকের পথ! গেলে সেইখানেই পাকাপাকিভাবে থাকতে হয়, ঘন-ঘন যাওয়া-আসা চলে না।

কিন্তু তাঁতিনীর তাতে ঘোর আপত্তি। বাপ-পিতামহের ভিটেতে সন্ধে জ্বলবে না, এও কখনো হয় নাকি?

তার উপর তাঁতিনীর বুদ্ধিও কী রকম যেন উলটো। সে বলে—'শোন তাঁতি, বরাত ছাড়া পথ নেই। আমাদের ভাগ্যে যদি পয়সা থাকত, এই গাঁয়ে বসেই পেতাম। শহরে গেলেই যে হা-ভাতের ঘরে কাঁড়ি-কাঁড়ি পয়সা আসবে, আমার তো তা মনে হয় না।'

তর্কাতর্কি অনেক হল। শেষপর্যন্ত সোমিলকের যাওয়াও তাঁতিনী বন্ধ করতে পারল না, বাপ-পিতামহের ভিটে থেকে তাঁতিনীকে নড়াবার সাধ্যও সোমিলকের হল না।

যাওয়ার আগে সোমিলক বন্দোবস্ত করে ফেলল—তাঁতিনী সুতো কেটে অন্য তাঁতিদের দেবে, তার একবেলা খাওয়ার মত দু'মুঠো চাল যা হোক করে তা থেকেই জোগাড় হবে হয়ত।

অবশেষে ভট্‌চাজ মশাইকে দিয়ে শুভ দিন দেখান হল। সওয়া পাঁচ গণ্ডা গাঁয়ের দেবস্থলীতে প্রণাম করে এল সোমিলক। তারপর 'কেন কাঁদছিস তাঁতিনী, এই তো দু'দিন বাদে আমি ফিরে এলাম বলে'—এই কথা বলতে-বলতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। 'শ্রীদুর্গা! শ্রীদুর্গা'! —রাস্তায় বেরিয়ে তার নিজের চোখের জল আর থামে না!

ক্রমাগত সাতদিন হাঁটছে সোমিলক। যেদিন সন্ধ্যার মুখে কোন গ্রামের কাছে এসে পড়ে, গাঁয়ের লোকে আদর করে ঘরে ডেকে নেয়। অপরিচিত অতিথিকে ভাল করে খাওয়ায়, চণ্ডীমণ্ডপের ভাল জায়গাটিতে বিছানা করে দেয়। আর যেদিন গ্রাম চোখে পড়ে না, আঁধার ঘনিয়ে আসবার আগেই সে পোঁটলা থেকে চিঁড়ে বার করে, তাই চিবিয়ে রাস্তার ধারের দিঘি বা নদীর জল পেট ভরে খেয়ে উঁচু দেখে একটা গাছের মগডালে উঠে পড়ে। তারপর চাদর দিয়ে নিজেকে শক্ত করে ডালের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে সেই তিন-শূন্যেই নাক ডাকিয়ে ঘুম!

অবশেষে শহর, বর্ধমানপুর!

প্রকাণ্ড শহর! তাক লেগে যায় সোমিলকের। ভয় পায়—এর ভেতর হারিয়ে যাবে না তো! এক-একবার মনে হয় দূর হোক গে, কাজ নেই বড়মানুষ হয়ে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই, সেখানে যা হোক করে একমুঠো জুটছিল তো! এ বিদেশ-বিভূঁয়ে একটা চেনা মুখ চোখে পড়ে না—এখানে বাঁচব কি করে।

কিন্তু তারপরই মনকে শক্ত করে সোমিলক। সে গুণীলোক। ভগবান তাকে গুণ দিয়েছিলেন কি তা গোপন করে রাখবার জন্য? সেই গুণ দিয়ে মানুষের কাজ করবে সে। মানুষও পালটা তাকে কিছু দেবে। দেবে পয়সা, দেবে মান। সেই আশাতেই সে সাতদিনের পথ ভেঙে বর্ধমানপুরে এসেছে। এখন ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলে লোকেই বা বলবে কী, নিজের মনের কাছেই বা সে কী বলে জবাবদিহি করবে?

একবার লড়ে দেখা যাক।

সোমিলক মন খাঁটি করে কাজে লেগে গেল।

তাঁত বেচে সে টাকা এনেছিল সঙ্গে। তাই দিয়ে, সে নতুন তাঁত কিনল। জিনিসপত্র জোগাড় করে নিয়ে ভগবানকে স্মরণ করে কাজ শুরু করল

সোমিলক। প্রথম কাপড় যখন সে জুড়ছে, শহরের তাঁতিরা মজা দেখতে এল। সেই যে কথায় বলে—কামারপাড়ায় সুঁচ বেচতে আসা, এই গেঁয়ো লোকটা সত্যিই তাই করছে। যেখানে ওস্তাদ তাঁতিদের কারবার চলছে শত-শত, সেখানে কাপড় চালাতে এল কিনা ধাপধাড়া-গোবিন্দপুরের এই হাবাগোবা সোমিলক। এ ওর গা টেপাটেপি করে হাসে তারা।

কিন্তু মুখের হাসি মিলিয়ে গেল তাদের। ক্রমে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে উঠল। এ লোকটা গুণ জানে কিছু। এমন কাপড় মানুষে বুনতে পারে কখনো? মিহি, যেন রেশমি কাপড়। কলকায় যেন তাজা ফুল ফুটেছে। সোমিলকের পায়ের ধুলো নিয়ে ঘরে গেল তারা।

বাজারে নাম ছড়িয়ে পড়ল। আড়তদারেরা বায়না দিয়ে গেল। কারও বিশখানা কাপড় চাই, কারও পঞ্চাশখানা। টাকা আর টাকা। সোমিলকের কেবল এক আক্ষেপ—তাঁতিনী—তার এ পসার চোখে দেখল না। বোকা মেয়েমানুষ—সে কিনা সোমিলককে পরামর্শ দিতে এসেছিল—'বরাতে থাকলে গাঁয়েতেই পয়সা হত, মিছে তুমি শহরে যেও না।'

কিন্তু মনকে বোঝায় সোমিলক—তাঁতিনী আজ না দেখুক, একদিন দেখবেই। বছরখানেক এইভাবে কেটে গেলে মোটা টাকা জমবে যখন, তখন সে গাঁয়ে যাবে একবার। ঝনঝন করে মোহর বৃষ্টি করবে তাঁতিনীর সম্মুখে। তাঁতিনী বুঝবে—তার স্বামী তুচ্ছ লোক নয়, গাঁয়ে বসে যে সে পয়সা রোজগার করতে পারেনি—সেটা গাঁয়ের লোকেরই দোষ, সোমিলকের দোষ নয়।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস গড়িয়ে যায়। বছর শেষ হয়ে এল। সোমিলক একদিন গুণে দেখল—পাঁচশো মোহর জমেছে তার। করকরে ঝকঝকে সব মোহর। টুং করে আওয়াজ হয় টোকা দিলে, কী মিষ্টি সে আওয়াজ! সোমিলকের কান জুড়িয়ে যায়। এক-এক সময় চোখ বুজে সে শুধু হাত বুলিয়ে যায় মোহরের গাদার উপরে, আঃ, কী মোলায়েম লাগে এই শক্ত ধাতুখণ্ডগুলো।

সোমিলক কিন্তু লোভীও নয়, হিসেবিও নয়। টাকা জমাবার জন্য সে টাকা চায়নি, চেয়েছে ব্যবহারের জন্য। নিজে ভাল খাবে ভাল পরবে, তাঁতিনীকে ভাল খাওয়াবে ভাল পরাবে, আত্মীয়কুটুম্ব-প্রতিবেশীকে মাঝে

মাঝে নিমন্ত্রণ করবে বাড়িতে—এইগুলিই তার মনের সাধ। এই সাধগুলি পূর্ণ করবার জন্যই সে অর্থ চেয়েছে চিরদিন। এখন, এই মোহরের স্তূপ হাতে পেয়েও সেই কামনাই আবার প্রবল হয়ে উঠেছে তার মনে, আগ্রহে সে দিন গুনছে—কবে ঘরে ফিরবে, কবে তাঁতিনীকে গয়নায় মুড়ে দেবে, কবে ভাল ঘর বেঁধে পালঙ্কের উপর শোবে আরাম করে।

অবশেষে একদিন সত্যিই সে ঘরে ফিরল। তাঁতশালা বন্ধ করে শহরের নতুন আলাপীদের কাছে বিদায় নিল দু'এক মাসের জন্য। আবার সে আসবে, কথা দিয়ে গেল সবাইকে।

সোমিলক দেশে চলেছে—কী আনন্দ তার মনে! সার্থক হয়েছে তার দুঃসাহস। সাতদিনের হাঁটা-পথ পেরিয়ে বর্ধমানপুরে আসতে তার গাঁয়ের কোন তাঁতিই রাজি হতে নাও পারে। সেই জন্যে সে নিজেই এসেছে এবং সেখান থেকে পয়সা রোজগার করে নিয়ে যাচ্ছে। একটা যুদ্ধ জয় করে বিজয়মাল্য মাথায় পরে ফিরছে সোমিলক। গাঁয়ের লোক এখন তাকে বাহবা দিক!

ধার্মিক রাজার দেশ, চোর-ডাকাত নেই। মোহর কেউ কেড়ে নেবে, এমন ভয় নেই। ভয় কেবল বাঘ-ভালুকের আর সাপের। দূরে দূরে গ্রাম, রোজ যে রাত্রে মাথা গুঁজবার ঠাঁই পাওয়া যায়, তা নয়। একদিন এক গভীর বনের ভিতর দিয়ে চলতে-চলতেই সে দেখল—সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

এবারেও তার পোঁটলায় চিঁড়ে আছে; তবে শুকনো চিঁড়ে শুধু নয়, তার সঙ্গে আছে বর্ধমানপুরের সুস্বাদু সীতাভোগ। তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিয়ে সে এক গাছে উঠে পড়ল এবং মগডালের সাথে নিজেকে চাদর দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল নিশ্চিন্ত মনে।

সকালে উঠে পথ চলতে গিয়ে তার মনে হল—কোমরটা কেমন হালকা লাগছে যেন। পাঁচশো মোহর গেঁজেতে ভরে কোমরে বেঁধে রেখেছিল সে, তার ওজনটা তো কম নয়! সে ওজন আজ কমল কিসে?

কোমরের হাত মাথায় উঠল চোখের পলকে। ধপাস করে সেই বনের পথে বসে পড়ল সোমিলক। গেঁজে ঠিকই আছে কোমরে, কিন্তু একেবারে খালি।

এ কী এ? রাত্রে মোহর কোমরে বেঁধে গাছের মগডালে সে ঘুমিয়েছে

সেখানে উঠে তার কোমর থেকে মোহর নিলে কে? যেভাবে গেঁজে বাঁধা ছিল, ঠিক সেইভাবেই বাঁধা রয়েছে, শুধু তার ভিতরকার মোহরগুলিই নেই। একি কাণ্ড! কে নিলে? কেমন করে নিলে? কেন নিলে?

হতবুদ্ধি হতচৈতন্যের মত একভাবে এক জায়গায় বহু, বহুক্ষণ বসে রইল হতভাগ্য সোমিলক। তার মাথায় আবছা-ভাবে একটা কথা ঘোরাফেরা করছিল কেবল—তাঁতিনীর সেই কথা—'ভাগ্যে যদি পয়সা থাকত, গাঁয়ে বসেই পেতাম।'

মাথার উপর একটা বটফল টুপ করে পড়ল। চমকে উঠে উপরপানে তাকিয়ে সোমিলক দেখল—কোথা দিয়ে গোটা দিনটাই কেটে গিয়েছে, আবার সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসছে বনের ভিতর।

সোমিলক কী করবে? ঘরের দিকে যাবে? গিয়ে তাঁতিনীকে বলবে—'আমি পয়সা পেয়েছিলাম, কিন্তু ভোগে লাগল না?' কিংবা আবার বর্ধমানপুরে যাবে নতুন করে কাজ শুরু করবার জন্য? কী ফল তাতে? পয়সা আবারও আসবে হয়ত, কিন্তু আসবে তো শুধু কর্পূরের মত উবে যাওয়ার জন্য?

বাঘের ডাক শোনা যায় অরণ্যে। গাছে ওঠা দরকার। তাই উঠল সোমিলক। কিন্তু মগডাল পর্যন্ত গেল না। একটা শক্ত লতা জড়িয়েছিল গাছটায়। সেই লতার একপ্রান্ত ছুরি দিয়ে কেটে নিজের গলায় শক্ত করে বাঁধল, তারপর ঝাঁপ দিল গাছ থেকে।

লতার ফাঁস গলায় আটকে যখন তার শ্বাসরোধ হতে যাচ্ছে, তখন কে যেন তার পায়ের তলায় হাত দিয়ে উঁচু করে তুলল। ভয়ে-বিস্ময়ে নিচু পানে তাকিয়েই সে দেখল—গাছের তলায় দাঁড়িয়ে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ।

সোমিলক গলার ফাঁস খুলে ফেলে গাছ থেকে নেমে এল। প্রণাম করল জ্যোতির্ময় পুরুষকে।

স্নিগ্ধস্বরে সেই পুরুষ বললেন, 'ভোগ তোমার ভাগ্যে নেই সোমিলক। আমি বিধাতা পুরুষ, আঁতুড় ঘরে আমিই তোমার কপালে লিখে দিয়েছি, —মোটা ভাত মোটা কাপড় ছাড়া কোনদিন কিছু জুটবে না তোমার।'

মনের দুঃখে বিধাতা পুরুষেরও সম্মান রেখে কথা কইতে পারল না সোমিলক। 'আমার মোহরগুলো হল কি? ভোগ না হয় না-ই করতাম,

উপার্জন যখন করেছি—তখন মোহরগুলো আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া আপনার উচিত হয়নি।'

বিধাতা পুরুষের মুখখানি সমবেদনায় করুণ হয়ে এল। 'ভোগই যখন করতে পারবে না, তখন অর্থ দিয়ে হবে কি? যখের মত আগলাবে সারাজীবন? সে যে মানুষের চরম দুর্গতি! তুমি লোক ভাল, তাই সে দুর্গতি থেকে তোমায় রক্ষা করবার জন্যই আমি মোহরগুলো সরিয়ে নিয়েছি তোমার।'

সোমিলক মরিয়া হয়ে উঠেছিল মনে-মনে। ক্রুদ্ধভাবে বলল—'ভোগ আর যখের মত আগলানো—এছাড়া কি আর অন্যভাবে অর্থের ব্যবহার করা যায় না? আমি বিলিয়ে দেব আমার টাকা! যেখানে যত দীন-দুঃখী-আতুর আছে—'

হঠাৎ যেন মাথাটা ঘুরে উঠল সোমিলকের। মাটিতে বসে পড়ে সে চোখ বুজল।

চোখ মেলে আবার চাইল যখন, তখন ভোরের আলোয় বনভূমি হেসে উঠেছে! অবাক হয়ে সোমিলক দেখল—গাছতলায় সে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে, আর ততোধিক অবাক হয়ে সে অনুভব করল—কোমরের গেঁজে আগের মতই মোহরে ভর্তি।

আঙুর-পরী ডালিম-পরী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

এক রাজা। প্রকাণ্ড তাঁর রাজ্য। হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ভাণ্ডারে সোনা-দানা হীরা-মুক্তার ছড়াছড়ি। রাজার প্রতাপে রাজ্য গমগম। রাজ্যটি কিন্তু রাজার নিজের নয়, অপর এক রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়েছেন—পুরনো রাজা-রানিকে কেটে, তাঁদের রাজ্য নিষ্কণ্টকে ভোগ করছেন।

চাঁপার কলির মতো পুরনো রাজার দুটি কচি মেয়ে ছিল, নতুন রাজা এক ডাইনি-বুড়ির হাতে তাদের দিয়ে বলেছিলেন, 'বনের মধ্যে এদের পুঁতে রেখে আয়।'

রাজ্যের সীমানায় মায়া-বন। ডাইনি-বুড়ি চাঁপার কলির মত মেয়েদুটিকে নিয়ে সেই যে মায়া বনে ঢুকেছিল আর ফিরে আসেনি।

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। পুরনো রাজা-রানি আর রাজকন্যাদের কথা কারও মনে নেই। নতুন রাজা রাজত্ব করেন। তাঁর দুই ছেলে বড় হয়ে উঠেছেন, তাঁদের ন[illegible]—বড় কুমার আর ছোট কুমার। সোনার কার্তিকের মত তাঁদের চেহারা, ফুলের মতো তাঁদের মন। রাজা-রানি তাঁদের দেখেন—

আর চোখ জুড়িয়ে যায়।

রাজা ভাবেন, আহা পুরনো রাজার মেয়েদুটি যদি থাকত এদের সঙ্গে বিয়ে দিতুম। রাজার মনে দুঃখ হয়।

রানি ভাবেন, আহা, অন্য কোনও রাজা এসে যদি আমাদের রাজ্য কেড়ে নিয়ে আমার সোনার চাঁদ ছেলেদুটিকে বনে পুঁতে রেখে আসে। আতঙ্কে তাঁর গা কাঁপে।

রাজা-রানি কারও মনে সুখ নেই।

একদিন রাজা একলা মায়া-বনে মৃগয়া করতে গেলেন। প্রকাণ্ড বন। গাছে-লতায় আলো-ছায়ায় জড়াজড়ি। হাতি শুঁড় দুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়, হরিণ শিংয়ের বাহার নিয়ে ছুটোছুটি করে, আরও কত জন্তু-জানোয়ার বনে থাকে। কিন্তু সেদিন রাজা ঘোড়ায় চড়ে শিকার খুঁজে বেড়ালেন, মায়া-বনের হরিণ চোখের সামনে বাতাসে মিলিয়ে গেল, মারতে পারলেন না, মায়া-বনের ময়ূর পেখমের ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে অন্ধকারে মিশিয়ে গেল, রাজা ধরতে পারলেন না।

সারাদিন ঘুরে-ঘুরে রাজা শেষে এক লতার ঝোপের কাছে গিয়ে ঘোড়া থামালেন। পিপাসায় তাঁর বুক শুকিয়ে গেছে—কিন্তু জল কোথায়? ক্ষুধায় নাড়ি চুঁইয়ে গেছে—কিন্তু কী খাবেন? রাজার ক্লান্ত হাত থেকে বল্লম খসে পড়ল।

ঘোড়া থেকে নেমে রাজা এদিকে-ওদিকে চাইলেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, একটি আঙুরের লতা, একটি ডালিম গাছকে জড়িয়ে-জড়িয়ে উঠেছে। আঙুর-লতায় এক-থোলো পাকা আঙুর ঝুলছে, আর ডালিম ফলে আছে একটা।

রাজা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন, লতা থেকে আঙুর পেড়ে খেয়ে ফেললেন। তৃষ্ণা নিবারণ হল, ক্ষুধাও মিটল। তারপর ডালিম ফলটি পেড়ে ঘোড়ায় চড়ে, রাজা রাজপুরীতে ফিরে চললেন।

সন্ধেবেলা রাজা পুরীতে ফিরে গেলেন। রাজার হাতে মায়াবনের রাঙা টুকটুকে ডালিম দেখে রানি বললেন, 'ওমা! অত সুন্দর ডালিম কোথায় পেলে?'

রাজা বললেন, 'তোমার জন্যে বন থেকে এনেছি।'

রানি ভারি খুশি হয়ে ডালিমটি ভেঙে খেলেন।

দিন কাটতে লাগল। ক্রমে রাজার শরীর খারাপ, রানির শরীরে বল নেই। কবিরাজ এলেন। কিন্তু রাজা-রানির কী রোগ হয়েছে কেউ বলতে পারে না। রাজা ও রানি রাত্রিবেলা অকাতরে ঘুমোন, কিন্তু দিনের বেলা তাঁদের শরীরে স্বস্তি নেই। কী যেন তাঁদের শরীরের মধ্যে বসে গুমরে-গুমরে কেঁদে বলে, 'মুক্তি দাও। কেন আমাদের বন থেকে ধরে নিয়ে এলে!'

রাজা-রানির আহার নেই, দিন-দিন তাঁরা শুকিয়ে যেতে লাগলেন। রাজ্যময় সবার দুশ্চিন্তা রাজা-রানি আর বাঁচবেন না।

রাজা বললেন, 'রানি কোন পাপে আমাদের এমন হল?'

রানি বললেন, 'মনে নেই? পরের রাজ্য কেড়ে নিয়ে—পরের মেয়ে দুটিকে বনে পুঁততে পাঠিয়েছিল? সেই পাপে আমাদের এই দশা! কিন্তু আমরা মরি সে ভালো, আমাদের ছেলেরা যেন সুখে থাকে!'

ক্রমে রাজা-রানির অবস্থা যায় যায়, বিছানা ছেড়ে আর উঠতে পারেন না। তাই দেখে রাজকুমারদের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। ছোট কুমার বললেন, 'দাদা, মা-বাবা তো চললেন। এসো, দু'জনে বাপ-মায়ের সেবা করি।'

বড় কুমার বললেন, 'হ্যাঁ ভাই, এসো তাই করি। প্রাণ দিয়েও যদি বাবা-মাকে বাঁচাতে পারি, তাও করব।'

দুই কুমার প্রাণপণে রাজা-রানির সেবা করেন। রাত্রে রাজা-রানি পালঙ্কে শুয়ে ঘুমোন, দুই ভাই জেগে পাহারা দেন। ক্রমে রাত্রি গভীর হয়, রাজপুরী নিশুতি হয়ে আসে। রাজকুমারদের চোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে আসে, তাঁরা পালঙ্কের শিথানে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন।

এমনিভাবে রাত কাটে। দুপুর রাত্রে রাজার ঘরে কী ঘটে কেউ জানতে পারে না। হঠাৎ একদিন নিঝুম রাত্রে রাজকুমারদের ঘুম ভেঙে গেল। তাঁরা চোখ মেলে দেখেন—ঘুমন্ত রাজার নাক থেকে বেরিয়ে এল সবুজ রঙের একটি ছোট্ট পরী, আর রানির নাক থেকে বেরিয়ে এল ডালিম-ফুলের মত রাঙা একরত্তি একটি পরী। রাজপুত্রেরা মিটিমিটি চেয়ে দেখলেন, ছোট্ট পরীদুটি মেঝেয় নেমে খেলা করতে লাগল। হাত ধরাধরি করে

মনের আনন্দে নাচতে লাগল। দুই রাজকুমার তখন চুপি-চুপি উঠে পরীদের ধরে ফেললেন, তারা আর পালাতে পারল না।

বড় রাজকুমার বললেন, 'তোমরা কে?'

সবুজ-পরী বললে, 'আমি আঙুর-পরী।'

রাঙা পরী বললেন, 'আমি ডালিম পরী।'

ছোট কুমার বললেন, 'তোমরা কোথায় থাক?'

সবুজ-পরী বললে, 'আমি রাজার পেটের মধ্যে থাকি।'

রাঙা-পরী বললে, 'আমি রানির পেটের মধ্যে থাকি। আমরা দুই বোন। দিনের বেলা রাজা-রানি জেগে থাকেন তাই বেরুতে পারি না, রাত্রে তাঁরা ঘুমোলে, দু'জনে বেরিয়ে খেলা করি।'

বড় কুমার বললেন, 'বুঝেছি। তোমাদের জন্যেই মা-বাবার অসুখ। তোমাদের মেরে ফেলব।'

আঙুর-পরী আর ডালিম-পরী তখন কাঁদতে লাগল, বললে, 'আমাদের মেরো না, আমরা কোনও দোষ করিনি। মায়া-বনে আমরা আঙুর আর ডালিম হয়ে ফলেছিলুম। বাতাস এসে আমাদের দোলা দিত—আমরা মনের সুখে খেলা করতুম। রাত্রে লতায়-পাতায় জড়াজড়ি করে ঘুমিয়ে থাকতুম। একদিন রাজা মৃগয়া করতে গিয়ে আঙুর পেড়ে খেলেন আর ডালিমটি রানির জন্যে নিয়ে এলেন। সেই থেকে আমরা তাঁদের পেটের মধ্যে আছি।'

বড় কুমার বললেন, 'তবে উপায়?'

দুই কুমার গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন।

তারপর ছোট কুমার বললেন, 'চলো দাদা, ওদের চুপি-চুপি মায়াবনে রেখে আসি।'

বড় কুমার বললেন, 'সেই ভালো।'

দুই রাজপুত্র তখনই ঘোড়ায় চড়ে বেরুলেন। বড় কুমার আঙুর-পরীকে নিজের পাগড়ির মধ্যে বেঁধে নিলেন, ছোট কুমার ডালিম পরীকে কোমরবন্ধে লুকিয়ে নিলেন। মায়াবন অনেক দূর; যেতে-যেতে সকাল হয়ে গেল।

সকালবেলা ঘুম ভেঙে উঠে রাজা-রানি দেখেন রাজকুমারেরা নেই, ঘোড়ায় চড়ে মায়াবনে চলে গেছেন। তাঁরা ভাবলেন, কুমারেরা তাঁদের

পাপের কথা জানতে পেরেছেন, তাই রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন। রাজা বুক চাপড়াতে লাগলেন, রানি কপালে কঙ্কণ মারলেন। রাজ্যে কারও প্রাণে সুখ রইল না, রাজকুমারদের সকলেই ভালবাসতেন। দুঃখে-শোকে সকলে হায়-হায় করতে লাগলেন।

এদিকে দুই রাজপুত্র মায়াবনে গিয়ে পৌঁছুলেন। কিন্তু কোথায় ডালিম গাছ? কোথায় আঙুর-লতা? খুঁজতে-খুঁজতে তাঁরা সেই জায়গায় গেলেন। দেখলেন, ডালিম-গাছ, আঙুর-লতা কিছুই নেই, বনের হাতি আঙুর-লতা উপড়ে ফেলে দিয়েছে, বনের শজারু ডালিমগাছের শিকড় খেয়ে গেছে। চারদিক শূন্য, কেউ কোথাও নেই! একটা ফড়িং কি ভোমরা পর্যন্ত নেই। কাকে জিজ্ঞাসা করেন?

এদিকে-ওদিকে চাইতে-চাইতে ছোট কুমার দেখলেন, তুঁত গাছের ডালে রেশমের একটি গুটি ঝুলছে। তিনি গুটির কাছে গিয়ে বললেন, 'গুটিপোকা, গুটিপোকা, বলতে পারো, আঙুর-লতা কোথায়? ডালিমগাছ কোথায়?'

গুটির ভেতর থেকে পোকা বললে, 'আঙুর-লতা নেই, ডালিমগাছ নেই, হাতিতে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে, সজারু গোড়া খেয়ে গেছে।'

বড় কুমার বললেন, 'তবে উপায়? আঙুর-পরী ডালিম-পরীকে তাহলে রাখি কোথায়?'

রাজকুমারদের ভারি ভাবনা হল। কোথায় রাখেন পরীদের? বনে ছেড়ে দিলে হয়তো ইঁদুরে-বাঁদরে ভ:ড়া করবে নয়তো চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। তখন কী হবে? রাজকুমারদের বড় দয়া হল। আহা, ছোট্ট পরীদুটিকে কী করে এই বনে ফেলে যাবেন!

তাঁরা ভাবতে লাগলেন।

তখন গুটিপোকা বললে, 'রাজকুমার, আমি তোমাদের চিনি, পরীদেরও চিনি। আমারই পাপে ওরা একরত্তি পরী হয়ে বনে লুকিয়েছিল। তোমরা ওদের উদ্ধার করো।'

রাজকুমারেরা অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি কে?'

গুটিপোকা বললে, 'আমি ডাইনি-বুড়ি। তোমাদের বাবার হুকুমে আমি পুরনো রাজার দুই মেয়েকে এনে মাটিতে পুঁতেছিলাম তাই আমি গুটিপোকা হয়ে নিজের জালে জড়িয়ে বন্ধ হয়ে আছি। আর যাদের মাটিতে পুঁতেছিলুম

তারা আঙুর আর ডালিমগাছের ফল হয়েছিল। তোমরা ওদের উদ্ধার করো।'

দুই কুমার বললেন, 'কী করে উদ্ধার করব?'

গুটিপোকা বললে, 'রক্ত দিয়ে...বুকের রক্ত দিয়ে। রাজার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করো, তবেই রাজকন্যারা উদ্ধার পাবে।'

বড় কুমার কোমর থেকে তলোয়ার বার করে নিজরে বুকে মারলেন... একঝলক রক্ত মাটিতে পড়ল। অমনি দেখতে-দেখতে আঙুর-পরী পরমাসুন্দরী রাজকন্যা হয়ে সামনে দাঁড়াল!

ছোট কুমার কোমর থেকে তলোয়ার নিয়ে নিজের বুকে মারলেন... একঝলক রক্ত মাটিতে পড়ল। অমনি ডালিম-পরী রাঙা টুকটুকে রাজকুমারী হয়ে তাঁর পানে চেয়ে হাসতে লাগল।

বড় কুমার বললেন, 'এ কী আশ্চর্য ব্যাপার!'

ছোট কুমার বললেন, 'এত সুন্দর রাজকুমারী তো কখনও দেখিনি!'

আঙুর-কুমারী হাসতে-হাসতে নিজের গলা থেকে মুক্তার মালা নিয়ে বড় কুমারের গলায় পরিয়ে দিল। ডালিম-কুমারী লজ্জায় রাঙা হয়ে নিজের গলার মালা ছোট কুমারের গলায় দিল।

তখন দুই রাজপুত্র দুই রাজকন্যাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে রাজ্যে ফিরে গেলেন।

নিরানন্দ রাজ্য আবার হেসে উঠল।

রাজপুরীতে শানাই বাজল।

রাজার আর অসুখ রইল না। তিনি ছুটতে-ছুটতে এসে ছেলেদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রাজকন্যাদের দেখে বললেন, 'আহা, কী সুন্দর মেয়ে! এরা কারা?'

কুমারেরা বললেন, 'ওরা পুরনো রাজার কন্যা। মায়াবন থেকে উদ্ধার করে এনেছি।'

শুনে আনন্দে রাজার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

রানি-মা অন্দরমহল থেকে কাঁদতে-কাঁদতে ছুটে এসে ছেলেদের বুকে নিলেন, দুটি ফুলের মত রাজকন্যাকে দেখে বললেন, 'এ কাদের এনেছিস বাবা?'

কুমারেরা হেসে বললেন, ‘তোমার জন্যে দাসী এনেছি।’

রানি দুই বৌকে কোলে নিয়ে চুমু খেলেন! রাজ্যে জয়ডঙ্কা বেজে উঠল। রাজা-রানির বুকে আহ্লাদ ধরে না। দুই রাজকুমার দুই পরমাসুন্দরী রাজকন্যা নিয়ে আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন। রাজ্যে কারও মনে দুঃখ রইল না।

তারপর একদিন রাজ্য দুই ভাগ করে দুই কুমারকে দিয়ে রাজা বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন, রানিকে নিয়ে মায়াবনে কুটীর বেঁধে শান্তিতে বাস করতে লাগলেন।

ডাইনি-বুড়ি গুটিপোকা হয়ে আরও অনেকদিন গাছে ঝুলে রইল। যেদিন তার পাপ ক্ষয় হল সেদিন সে গুটি কেটে একটি কালো প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেল।

মহারাজ মহীপতি

বনফুল

তোমরা গল্প শুনতে চাও?

গল্প একটা বলতে পারি, কিন্তু সেটা তোমরা বিশ্বাস করবে না বোধহয়। তোমরা আজকালকার ছেলেমেয়েরা, বড্ড বেশি চালাক-চতুর হয়ে গেছ! তোমরা বলবে এ অসম্ভব, এরকম হয় নাকি?

অসম্ভব গল্পই বলতে হবে? বেশ, শোনো তবে।

অনেক-অনেকদিন আগে মহীপতি নামে এক রাজা ছিলেন। বিরাট তাঁর সাম্রাজ্য। প্রচণ্ড তাঁর প্রতাপ। তাঁর বিশাল প্রাসাদ অপরূপ স্ফটিক দিয়ে তৈরি। দিনের আলোয় তার এক রূপ, রাতের অন্ধকারে আর এক রূপ। তাঁর মহীসাগর দিঘি সাগরেরই মতো। কূল দেখা যায় না। অসংখ্য তাঁর কর্মচারী, পাত্র, মিত্র, সেনাপতি, উপমন্ত্রী, মন্ত্রী—তাঁর ভয়ে তটস্থ। যখন কাউকে দণ্ড দেন, তখন তাকে প্রাণদণ্ড দেন। দিনের বেলায় যখন বিচারাসনে বসেন তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপে অপরাধীরা। কারণ তারা জানে অপরাধ প্রমাণ হলেই শূলে চড়তে হবে। মিথ্যাবাদী, চোর, প্রতারক, চরিত্রহীন—সকলেরই এক দণ্ড। তিনি বলতেন, মন্দকে মুছে ফেলো। ওর

সঙ্গে আপোস করো না। এই মহীপতি রাত্রে কিন্তু অন্যরকম মানুষ হয়ে যেতেন। সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার সঙ্গে-সঙ্গে এই দোর্দণ্ডপ্রতাপ নিষ্ঠুর রাজা করুণাময় কবি হয়ে যেতেন। তখন তিনি নিজের বাগানবাড়িতে একা বসে থাকতেন। কখনও গান করতেন, কখনও কবিতা লিখতেন, কখনও চুপ করে বসে থাকতেন। বিয়ে করেননি। দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনেই পূর্ণ ছিল রাজপুরী। তাদের খাওয়া-পরার সমস্ত খরচ তিনিই দিতেন, রাজকোষে অর্থের অভাব ছিল না। তিনি কারও সঙ্গে মিশতেন না। নিরাপদ একক জীবন-যাপন করতে ভালবাসতেন তিনি। বেশিরভাগ সময়ই থাকতেন তাঁর বাগানবাড়িতে প্রভাত বর্মার তত্ত্বাবধানে। প্রভাত বর্মা ছিলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী।

সেদিন পূর্ণিমা।

জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে দিগদিগন্ত। গভীর রাত্রি। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। উদ্যানের বেলিকুঞ্জে এক মর্মর আসনের ওপর চুপ করে বসে আছেন মহীপতি আকাশের দিকে চেয়ে। প্রকাণ্ড একটা সাদা স্তূপমেঘ বিরাট মহিমায় রূপায়িত হয়েছে তাঁর চোখের সামনে। মেঘের সর্বাঙ্গে জ্যোৎস্না লুটিয়ে পড়েছে, মনে হচ্ছে যেন বেলফুলের পর্বত একটা। মহীপতির মনের নেপথ্যে একটা বাসনা জাগল, আহা, আমি যদি মেঘ হতে পারতাম। তন্ময় হয়ে চেয়েছিলেন তিনি মেঘের দিকে। এমন সময় এক তীক্ষ্ণ -তীব্র চিৎকার বিঘ্নিত করল সেই নিস্তব্ধতাকে। মহীপতি উঠে পড়লেন। দৌবারিককে ডেকে বললেন, দেখে এসো কে চিৎকার করছে। যদি তার দেখা পাও, ডেকে নিয়ে এসো এখানে।

একটু পরে দৌবারিক যাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল তাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন মহীপতি। ছেঁড়া-ময়লা কাপড় পরা জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার একটি বৃদ্ধা। মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে, চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ, মাথার চুল রুক্ষ।

কে তুমি?

ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল বৃদ্ধা।

তারপর প্রশ্ন করল, আপনি কে?

আমি মহীপতি।

ও—আপনিই মহারাজ মহীপতি। আমি আপনার কাছেই এক আর্জি নিয়ে এসেছি, মহারাজ।

কী আর্জি?

আমাকে শূলে দিন। আমার স্বামীকে আপনি শূলে দিয়েছেন, তিন ছেলেকেও শূলে দিয়েছেন। আমাকেও শূলে দিন। আমি আর এ কষ্ট সহ্য করতে পারছি না—

আমি নিরপরাধকে শাস্তি দিই না।

আমি গরিব। এইটাই আমার অপরাধ। আমার স্বামীও গরিব ছিল, মুর্খ ছিল, সৎপথে থেকে সে আমাদের গ্রাসাচ্ছাদন জোটাতে পারেনি। তাই ডাকাতি করত। আমার ছেলেরাও ডাকাত হয়েছিল। আমাদের মতো গরিবরা আপনার রাজত্বে সৎপথে থেকে উপার্জন করতে পারে না। সবাই অসৎ, কেউ ধরা পড়ে, কেউ ধরা পড়ে না। আমি অসমর্থ, তাই চুরি, ডাকাতি করতে পারি না। তবু আপনি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিন মহারাজ, আমি এ কষ্ট সহ্য করতে পারছি না।

মহীপতি বললেন, তোমাকে আমি প্রচুর ধনসম্পত্তি দিচ্ছি। তোমার কোনও কষ্ট থাকবে না।

কিন্তু আপনার প্রচুর ধনসম্পত্তি কী আমার মনের আগুন নেভাতে পারবে? অশান্তির আগুন জ্বলছে আমার মনে। এখন বেঁচে থাকা মানেই কষ্ট ভোগ করা, আমাকে আপনি মৃত্যুদণ্ড দিন মহারাজ। দোহাই আপনার—

মহীপতির পায়ের ওপর মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল বুড়িটা।

মহীপতি বললেন, —না, আমি কিছুতেই নির্দোষকে শাস্তি দিতে পারব না।

তাহলে আমি আপনার সামনেই আত্মঘাতী হব। এই বলে বুড়ি সেই মর্মরবেদীর ওপর ক্রমাগত মাথা ঠুকতে লাগল।

মহীপতি দৌবারিককে আদেশ দিলেন, এই বুড়িকে সরিয়ে নিয়ে যাও এখান থেকে।

বুড়ি কিন্তু এত জোরে-জোরে মাথা ঠুকছিল যে তার মাথা ফেটে গেল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মৃত্যু হল তার। একটু পরেই লোকজন এসে সরিয়ে নিয়ে গেল তার মৃতদেহটা।

মহীপতি নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন।

নির্নিমেষ চেয়ে দেখছিলেন আকাশের সেই বিরাট স্তূপ মেঘটার দিকে। সেটা আর সাদা ছিল না, কুচকুচে কালো হয়ে গিয়েছিল। আর তার ভিতর থেকে ক্ষণে-ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। তারা যেন মহীপতিকে বলছিল, মহীপতি, তুমিও পাপী। তোমারও শাস্তি দরকার।

প্রস্তরমূর্তিবৎ বসেছিলেন মহীপতি।

তাঁর মনে হচ্ছিল—তিনি শুধু পাপী নন, মহাপাপী। তিনি প্রজাদের

সুখী করতে পারেননি, কেবল শোষণ ও শাসন করেছেন। তাঁর মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্য।

ঠিক করে ফেললেন, তিনিও আত্মঘাতী হবেন। তিনি মহা অপরাধী। নিজের মৃত্যুদণ্ড নিজেই দেবেন।

মহীসাগরের যে অঞ্চলে প্রচুর কুমুদ ফুল ফোটে সেই অঞ্চলে জলের ধারে কতকগুলো পাথর পড়ে আছে ইতস্তত। মহীপতি একটা থলি নিয়ে সেইখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ঠিক করেছিলেন একটা বড় পাথর থলিতে পুরে গলায় বাঁধবেন সেটা, তারপর জলের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। মহীসাগরের জলে ডুবে মরবেন তিনি। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল সাতরঙের সাতটা মেয়ে মহীসাগরের কুমুদবনে জলকেলি করছে। কেউ লাল, কেউ নীল, কেউ হলুদ, কেউ সবুজ, কেউ শ্যামলা, কেউ বেগুনি। অপরূপ সুন্দরী সাতটি কিশোরী। মহীপতিকে দেখেই এগিয়ে এল তারা।

একি মহারাজ, আপনিও এসেছেন। আসুন, আসুন। ও কি, আপনার হাতে থলি কেন?

মহীপতি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কে?

আমরা সাতটা রঙ। দিনের বেলা সূর্যালোকের মধ্যে লুকিয়ে থাকি, জ্যোৎস্না রাত্রে মাঝে-মাঝে আপনার এই দিঘির কুমুদবনে চলে আসি। চমৎকার এ জায়গাটা। আপনি থলি নিয়ে এসেছেন কেন, ফুল তুলবেন?

মহীপতি তখন সব কথা খুলে বললেন তাদের।

তারা সমস্বরে বলে উঠল, আত্মহত্যা করবেন, সে কী! কেন?

আমি মহাপাপী।

আপনার যখন অনুতাপ হয়েছে, তখন পাপ তো আর নেই। মিছিমিছি আত্মহত্যা করবেন কেন? বরং আপনি বেঁচে থেকে প্রজাদের মঙ্গল করুন।

প্রজাদের মঙ্গল করা শক্ত। কারণ আমার কর্মচারীরা বেশির ভাগই অসাধু। তারাই আমার রাজ্য শাসনের যন্ত্র। এদের নিয়ে প্রজাদের মঙ্গল করা যায় না।

এদের তাহলে দূর করে দিন। ভাল লোক বহাল করুন।

তাতে বড় হাঙ্গামা। অত ঝক্কি পোয়াতে আমি পারব না। তবে তোমরা যদি আমার সঙ্গে যাও, আমার শাসনভার তোমাদের হাতে দেব। যাবে?

আমরা? আমরা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছি। আমরা কি আপনার রাজপুরীতে আটক থাকতে পারি?

মহারাজ আবার অনুরোধ করলেন।

না, না, চলো তোমরা। আমার মেয়ের মতো থাকবে আমার কাছে।

কিন্তু গেল না তারা। হঠাৎ সাতটি রঙিন পাখিতে রূপান্তরিত হয়ে উড়ে গেল তারা আকাশের দিকে।

মহীপতি ঊর্ধ্বমুখ হয়ে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর থলিটা গলায় বেঁধে একটি বড় পাথর তারা ভিতর পুরে জলে নামতে যাচ্ছেন, এমন সময় দেখলেন, একটি দিব্যকান্তি পুরষ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

মহীপতি, তুমি মরতে যাচ্ছ কেন?

আপনি কে?

আমি বরুণদেব। তোমার মহীসাগরে আমি প্রতি পূর্ণিমা রাত্রে আসি। কিন্তু তুমি এ কী করছ?

আমার সংসারে থাকার ইচ্ছে নেই। রাজ্যশাসনে অপারগ। এখুনি সাতটি পরী দেখলাম, তাদের সাহচর্যে ভারি আনন্দ পেয়েছিলাম আমি। কিন্তু তারা রইল না।

বরুণদেব বললেন, তারা তো সাতটি রঙ। মহাশিল্পী ভগবানের চিত্রশালায় তাদের অহরহ দরকার। তারা তোমার কাছে থাকবে কী করে? তুমি যাও, ভালভাবে রাজ্যশাসন করো গিয়ে—

আমি পারব না। আমার মনে হয় প্রজারা নিজেরাই নিজেদের মঙ্গলের ব্যবস্থা করবে ভবিষ্যতে। আমি সরে থাকতে চাই। আমাকে একটি বর দিন প্রভু।

কী বর চাও?

আমি ঐ সাতটি রঙের কাছে থাকতে চাই—

বেশ তাহলে আকাশের খানিকটা অংশ হও। ওরা যখন রামধনু হয়ে ফুটবে, তুমি ওদের কাছে থেকো।

সেদিন থেকে মহীপতি আকাশের সঙ্গে মিশে গেলেন। রামধনুর ঠিক পিছনে যে আকাশ আছে—সেই মহীপতি। মহারাজ মহীপতি এখন মহাশূন্যের একটা অংশ।

কচিকিশলয়ের কাহিনী

স্বপনবুড়ো

সে এক অপরূপ মেঘের রাজ্যি।

রুপোলি-সোনালি মেঘের আভায় সারা মেঘরাজ্যি যেন ঝলমল করছে।

কত রঙের কত অপরূপ মেঘ থরে থরে সাজানো। নীল-সবুজ-হলদে-লাল-বেগুনি-জাফরানি...আর তারই ফাঁকে-ফাঁকে শ্বেত-শুভ্র মেঘগুলি যেন দুলছে।

সেই নরম তুলতুলে মেঘের সবার ওপরকার স্তরে একান্ত নিভৃতে বিধাতাপুরুষ ধ্যানমগ্ন ছিলেন।

কিন্তু সুরলোক ছেড়ে বহু নিচে ধরার কোলাহল ভেদ করে একটা তপ্ত বায়ু বারে-বারে এসে বিধাতাপুরুষের চরণ স্পর্শ করছিল। সেই উত্তপ্ত অশুচি বায়ুর ছোঁয়া লেগে বিধাতাপুরুষের ধ্যান ভেঙে গেল।

অনেকদিন পর বিধাতাপুরুষ তাঁর কুসুম-কোমল মেঘের নিভৃত আসনে উঠে বসলেন।

দীর্ঘকাল ধরে আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তিনি সপ্তলোকের যে কাহিনী রচনা করেছেন—সৃষ্টির সেই অপরূপ কাহিনীর সূত্র কি ছিন্ন হয়ে গেল?

তাঁর অপরূপ সৃজনের মাঝে অশুচি বায়ু কোথা থেকে প্রবেশ করল?

সত্য-শিব-সুন্দরের অনবদ্য মালিকা দিয়েই তো তিনি এই ভুবন রচনা করেছেন।

বিধাতাপুরুষ ভেবে পেলেন না, —সেই অম্লান কুসুম-মালিকার মধ্যে কীট কী করে প্রবেশ করল।

অসময়ে ধ্যান ভেঙে যাওয়ায় বিধাতাপুরুষ চিন্তিত হলেন। তাঁর এই সত্য-শিব-সুন্দরের সৃজন-খেলায় কি ছন্দপতন ঘটল?

বিধাতাপুরুষের ললাট কুঞ্চিত হল।

সুরলোক থেকে বহু নিচে ধরণীর বুকে কি নতুন কাহিনী রচিত হচ্ছে তাঁকে জানতে হবে। এই তপ্ত বায়ু কোথা থেকে এসে তাঁর চরণ স্পর্শ করল—সে সন্ধান তাঁকে অবশ্যই করতে হবে।

এবার বিশ্বের বার্তা নেবার জন্যে তিনি নারদকে ডাকলেন না। স্মরণ করলেন গল্পবুড়োকে।

গল্পবুড়ো এসে শুধোলেন, বিধাতাপুরুষ, আপনি অসময়ে আমায় স্মরণ করেছেন কেন বুঝতে পারছি না।

বিধাতাপুরুষ উত্তর দিলেন, এই যে গল্পবুড়ো, তুমি এসে গেছ। সুরলোকের কাহিনী রচনা বন্ধ রেখে তোমায় যেতে হবে ধরাধামে।

গল্পবুড়ো শুধোলেন, ধরাধমে কেন বিধাতা? আমি সম্প্রতি সুরলোকে মন্দাকিনী ধারার ছন্দে সুর মিলিয়ে নতুন কাহিনী রচনায় ব্রতী হয়েছি—

বিধাতাপুরুষ বললেন, সুরলোকের কাহিনীর এখন প্রয়োজন নেই। আমি এখন জানতে চাইছি ধরাধামের নতুন গল্প। সেখানে মানুষের দল আমার সৃজনের মালাকে কি ম্লান করে দিতে চাইছে? তাদের জীবন দিয়ে কী নতুন কাহিনী তারা রচনা করছে—সে কথা জানবার জন্যে আমি উৎসুক হয়ে উঠেছি। ধরাধামের সেরা গল্প কী সে কথাও তুমি এসে আমায় জানাবে গল্পবুড়ো।

গল্পবুড়ো বিধাতাপুরুষকে প্রণাম জানিয়ে বললে, তোমার বাসনাতেই আমি ধরাধামে চললাম। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করাই আমার জীবনের ব্রত হোক।

ভিন্ন রঙের মেঘের স্তর ভেদ করে ধীরে-ধীরে গল্পবুড়ো নেমে এলো—

নিচে—নিচে—আরো নিচে—ধরার পানে। গলায় তার দলুছে মন্দার মালিকা, —মন্দ-মন্দ সমীরণ বইছে।

গল্পবুড়ো ভাবছে, সুরলোকের অসমাপ্ত কাহিনী রেখে ধরাধামে চলে যাচ্ছে। সেখানে গিয়ে কোন কাহিনী অবলোকন করবে—তার জানা নেই। সেই ধরাধাম থেকে কোন নতুন কাহিনীর বীজ সংগ্রহ করবে তার জন্যে অদম্য কৌতূহল নিয়ে গল্পবুড়ো মেঘলোকের বিচিত্র সব রঙিন স্তর ভেদ করে নিম্নগামী হয়েছে।

যতই মেদিনীর নিকটবর্তী হচ্ছে ততই একটা উত্তাপ অনুভব করছে দেহে আর মনে। কোথা থেকে আসে এই উত্তাপ আর জ্বালা?

সুরলোকের জলবায়ুতে অভ্যস্ত গল্পবুড়ো দারুণ অসুবিধে অনুভব করে। কিন্তু যে দায়িত্ব পালন করবে বলে বুড়ো বিধাতাপুরুষকে কথা দিয়ে এসেছে—তার মর্যাদা তাকে রক্ষা করতেই হবে।

উত্তাপকে অগ্রাহ্য করে ধীরে-ধীরে সবার অলক্ষে একটি সাধারণ পরিবারের উঠোনে এসে অবতরণ করলো। উঠোনের একপাশে একটি পুরোনো নিমগাছ। সেই গাছতলায় গিয়ে গল্পবুড়ো দাঁড়ালো।

উঠোনের মাঝখানে একদল উলঙ্গ শিশু কাদামাটি মেখে খেলা করছে। ওদের মা সেই কাদামাটির মধ্যেই কতকগুলি খাবার ছড়িয়ে দিয়ে গেল।

কুকুরছানার মতো কামড়াকামড়ি করে ওরা সেই খাবার কাদামাটি থেকে তুলে-তুলে পরম তৃপ্তির সঙ্গে মুখে পুরে দিতে লাগল।

গল্পবুড়ো ভাবলে, মানবশিশু হয়েও এদের খাদ্যাখাদ্য বিচার নেই। এদের মা শিশুদের সম্পর্কে উদাসীন। এদের নিয়ে কি কাহিনী রচনা করবে গল্পবুড়ো?

উলঙ্গ শিশুগুলির দিকে তাকিয়ে গল্পবুড়ো শিউরে উঠল। অতি অপুষ্ট দেহ, শিশুতনুর সাধারণ লাবণ্য ওরা হারিয়ে ফেলেছে। কেন্নো আর ক্রিমি-কীটের মতো কাদায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। মুখ দেখে মনে হয় না, এতে ওদের কোনো অসোয়াস্তি হচ্ছে। কাদামাখা খাদ্য ওরা অমৃতজ্ঞানে মুখে তুলে দিয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করছে বলেই মনে হল।

গল্পবুড়ো মানবশিশুর এই মালিন্য দেখে অন্তরে বেদনা অনুভব করল। নীরবে সেই প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করে অন্যদিকে অগ্রসর হল।

গল্পবুড়ো একটি শিক্ষায়তনে এসে উপস্থিত হল। অবাক হয়ে দেখলে, ছাত্রদল পাঠ্যপুস্তকের পাতা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ঘুড়ি তৈরি করছে। নানা রঙের সেই ল্যাজওয়ালা ঘুড়ি আকাশে উড়িয়ে ছাত্রদল দারুণ উল্লাসে চারিদিক মাতিয়ে তুলছে। শিক্ষকগণ পড়াতে এলে ছাত্রদল জানিয়ে দিচ্ছে—সবকিছু জ্ঞান তারা লাভ করেছে। পরীক্ষাদানের ব্যাপারে সকলকেই পাস করিয়ে দিতে হবে। এইটেই হচ্ছে ছাত্র-সমাজের প্রকৃত দাবি।

ছাত্রদল শিক্ষকবৃন্দকে সম্মান দেখাচ্ছে না বলে—তাঁরাও উদাসীন হয়ে শিক্ষাদান স্থগিত রেখে অর্থ উপার্জনের দিকে মনোনিবেশ করেছেন। শিক্ষালয়ের পবিত্রতা কোথায়ও রক্ষা করা সম্ভবপর হচ্ছে না। ছাত্রদল মিছিল করে তাদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া জানাচ্ছে। আর সেই আবদার রক্ষা করা না হলে—তারা দলবদ্ধভাবে শিক্ষকবৃন্দকে ঘেরাও করে রাখছে।

বিদ্যালয়ের জন্যে বড়-বড় আর উঁচু-উঁচু দালান তৈরি হচ্ছে। ছাত্রেরা সেই দালানের ভেতর বসে পড়বে তাদের সময় কই? একটা নতুন খেলায় মেতেছে ছেলের দল। ভালো কিছু দেখলেই সেটা ভেঙে ফেলছে। যেটা ওদের রোজকার জীবনে দরকার তাতেই আগুন লাগিয়ে দিয়ে হি-হি করে হাসছে।

এই ঝামেলা, ঝঞ্ঝাট আর ঝগড়া-বিবাদ গল্পবুড়োর আদপেই ভালো লাগল না। বিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গন ছেড়ে ছাত্রদল পথে-পথে মিছিল করে সবকিছু তচনচ করে দিক—এটা দেখতে কারই বা ভালো লাগে?

গল্পবুড়ো তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলে, যেসব নামকরা শিক্ষাবিদের ছবি দেওয়ালে টানানো ছিল—সেগুলো বেমালুম সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বিদেশী লোকের অজানা ছবি তার জায়গা দখল করে আছে।

এইসব দেখে গল্পবুড়ো যেন কেমন হতাশা বোধ করল। ধীরে-ধীরে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে সরে এলো।

এদেশের মায়েরা কী করছে দেখবার ভারি ইচ্ছে হল গল্পবুড়োর।

দেখলো, দলে-দলে মায়েরা দামি শাড়ি, প্রসাধনদ্রব্য নিয়ে মেতে আছে।

ছেলেদের খাবার খরচ কমিয়ে মায়েরা উন্মাদ হয়ে নানারকম বিদেশী প্রসাধন কিনে নিজের ঘর সাজাচ্ছে।

কোনো ছেলে যদি এসে বলে, মা, ইস্কুলে টিফিন কী খাবো? মা বিরক্ত

হচ্ছে ছেলের ওপর। না হয় তার হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে বলছে, এই নে চারটে পয়সা, রাস্তা থেকে কিছু কিনে খেয়ে নিস—

ছেলেরা তাতেই খুশি।

গল্পবুড়ো চারদিকে ঘুরে-ঘুরে দেখল, অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে ছেলের দল স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলছে। একটা দিন ওরা ভালো থাকছে না। ওদের দেহে নানারকম রোগ জন্মাচ্ছে। মাথা উঁচু করে ওরা দাঁড়াতে পারছে না। হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছে।

কিন্তু তাতে কী হল?

দেশের বিদ্বান ব্যক্তিরা মোটা-মোটা আর ভারী-ভারী কেতাব লিখছে, ছাত্রদল পড়ে জ্ঞানী হবে। ছাত্রদের দেহের তুলনায় সেই কেতাবগুলো কিন্তু বেশি ভারী আর ওজনদার হয়ে উঠছে। দল বেঁধে সারে সারে ওরা যখন বিদ্যালয়ে যাচ্ছে, —কেতাবের ভারে ওদের মেরুদণ্ড যাচ্ছে বেঁকে। কিন্তু মুখে ওদের হাজার রকম বুলি। সে বুলি কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যে থামছে না।

ফলে অল্প বয়সেই ওদের নানারকম রোগ ধরছে। চোখের রোগ, বদহজমের রোগ, অপুষ্টির জন্যে রোগ, অনিদ্রা রোগ, জ্বর, কাশি, হাঁপানি, বাত, হৃদ্‌রোগ কত নাম করা যাবে?

গোটা দেশটাই যেন রোগের ডিপো হয়ে উঠেছে।

গল্পবুড়ো মনে মনে ঠিক করলে, —এইসব ছেলেদের কোথায় চিকিৎসা হয় দেখতে হবে।

শহরের মাঝখানে বিরাট হাসপাতাল।

গল্পবুড়ো অদৃশ্য হয়ে সেই আরোগ্যনিকেতনে ঢুকে গেল।

যত রোগী সেই তুলনায় 'শয্যা'র সংখ্যা অনেক কম। ফলে বহু রোগীকে অযত্নে মেঝের ওপর ফেলে রেখেছে।

একটা ঘরে শিশুর দল কান্নাকাটি করছে। তাদের সেবা করবার, সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই। অনেক শিশু—কিন্তু ধাত্রী হয়তো একজন—দুজন। কারো প্রতি যত্ন নেয়া সম্ভবপর হয় না, —শুধু ছুটোছুটিই সার।

গল্পবুড়ো যত দেখে তত অবাক হয়।

নীরবে এগিয়ে যায় গল্পবুড়ো।

একটা অন্ধকার ঘরে গিয়ে দেখে, —শিশুদের জন্য যে দুধ বরাদ্দ করা আছে, —হাসপাতালের লোকেরা তা থেকে অনেক দুধ সরিয়ে ফেলছে।

ফলে, যাদের সত্যি প্রয়োজন, তারা রোজ বঞ্চিত হচ্ছে। অসুখ সারবে কী করে?

দেখা গেল, এই ভাবে রোগীর খাদ্যের অনেকখানিই বাইরে চালান হয়ে যাচ্ছে।

গল্পবুড়োর মন বেদনায় ভরে উঠল।

শিশু আর রোগীদের বঞ্চিত করে এইভাবে দিনের পর দিন অন্যায় আর অনিয়ম চলছে।

গল্পবুড়ো একসময় নিজের গলার মন্দার-মালিকার দিকে তাকালো। বিষ-বাষ্পে সুরলোকের সেই মন্দার-মালিকা আস্তে-আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে।

বুকের ব্যথা নীরবে চেপে গল্পবুড়ো হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলো।

রাজপথ দিয়ে চলেছে, —পথ জনাকীর্ণ, কিন্তু সেই পথের দুপাশে জঞ্জাল জমে আছে। সেই জঞ্জাল সাফ করবার কেউ নেই, আবার কারো মনে তা নিয়ে অস্বস্তিও নেই।

এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ যেন সবাইকার সহ্য হয়ে গেছে। ক্রমে রাত্রি গভীর হতে থাকল।

গল্পবুড়ো পথের দুই পাশে তাকিয়ে দেখলে—কত মানুষের থাকবার ঘর নেই। তারা পথের দুপাশেই চাদর বিছিয়ে মশা, মাছি আর আবর্জনার মধ্যে শুয়ে পড়তে লাগল।

রাত্রি ক্রমে আরো গভীর হতে থাকল।

পথের কুকুর আর মানুষ একই আবর্জনার মধ্যে ঘুমে ঢলে পড়ল। তাদের মনে কোনো বিকার নেই।

গল্পবুড়ো তবু এগিয়ে চলে।

নিশির ডাকে সে যেন অজানা পথে পাড়ি জমাতে চায়।

পথের পাশে একটা আঁধার ঘরে ফিসফিস কথা শোনা যায়।

গল্পবুড়ো সেই ঘরে ঢুকে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

একদল লোক ভেজাল ওষুধ তৈরি করছে।

আসল ওষুধ সরিয়ে নিয়ে ভেজাল ওষুধ শিশিতে ভরতি করে সারা

দেশময় ছড়িয়ে দেবে।

লোভ আর লালসা ওদের শয়তান করে তুলেছে। ওরা দেশের কথা ভাবছে না, মানুষের কথা ভাবছে না, শিশুদের কথা চিন্তা করছে না!

ওরা শুধু বলছে, দাও—আরো দাও—

কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা নিয়েও ওরা খুশি নয়।

রাত্রি আরো গভীর হল—

অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা চাপা কান্না শোনা যাচ্ছে না?

কার বুভুক্ষু আত্মা কেঁদে-কেঁদে ফিরছে—কেউ বলতে পারে না।

গল্পবুড়ো একবার আকাশের দিকে তাকালো।

সুরলোক থেকে কত দূর এসে পড়েছে? ধূলিমলিন আকাশে আজ কি তারাদলও লজ্জায় মুখ লুকিয়েছে? মনে হচ্ছে একটা কালো মাকড়সা জাল বুনে-বুনে সারা দেশটা ঘিরে ফেলেছে।

এই বন্দী-জীবন থেকে বেরুবার আর যেন কোনো উপায় নেই।

হঠাৎ গল্পবুড়োর মনে হল—

সারা দেশটা যেন ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেছে—

কোথায়ও আর একফোঁটা আলো নেই—

আবার সেই সূচিভেদ্য আঁধারের ভেতর থেকে দুই দলের আক্রোশ আর গর্জন শোনা যেতে লাগল—

একদল বললে, আরো দাও—আরো চাই—

আর একদল যেন ক্রন্দনের সুরে বললে—

নেই—নেই কিছু নেই।

ধীরে ধীরে সেই দুটি দলের আর্তনাদ সারা আকাশ-বাতাস ছেয়ে ফেলল।

সেই অন্ধকারের ভেতর দিয়েই কারা যেন রাশি-রাশি মারণাস্ত্র এনে স্তূপাকার করল।

তারপর আরো একটা আর্তনাদের সঙ্গে-সঙ্গে দুইটি দল মরণ-যুদ্ধে মেতে উঠল।

অকস্মাৎ লেলিহান অগ্নিশিখা জ্বলে উঠল। কে যে কাকে আক্রমণ করছে কিছুই বোঝা গেল না—

বিষবাষ্পে পূর্ণ হয়ে গেল সারাটা মেদিনী—

অগ্নিদাহ—
বিষবাষ্প—
ঝঞ্ঝা—
বিস্ফোরণ—
বন্যা—

সবকিছু মিলে সুন্দর ধরণীকে এক বিরাট ভগ্নস্তূপে পরিণত করল।

নির্বাক পাথরের মূর্তির মতো গল্পবুড়ো সেই ধ্বংসলীলা অবলোকন করল।

অবশেষে সেই কালরাত্রি প্রভাত হল।

বিধাতার সৃষ্টি সেই সুন্দর ধরণীর আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই।

এই কাহিনী শোনাতেই কি গল্পবুড়ো আবার সুরলোকে ফিরে যাবে?

স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল গল্পবুড়ো।

হঠাৎ তার চোখে পড়ল, পূর্ব-গগনে তরুণ তপনের উদয় হচ্ছে। আর সেই ধ্বংসস্তূপের এক নিভৃত কোণে একটি কচি কিশলয় একান্ত অসহায়ের মতো সূর্যকিরণের আশায় তার ছোট্ট হাতটি বাড়িয়ে দিয়েছে।

ধরণীর এই দারুণ দুর্দিনেও গল্পবুড়োর মনে আশার সঞ্চার হল।

মনে-মনে বললে গল্পবুড়ো—

এই কচি কিশলয়ের কাহিনীই আমি বিধাতাপুরুষকে গিয়ে জানাবো। আর তাঁর কাছেই আছে নতুন ধরণী সৃজনের সঞ্জীবনী মন্ত্র!

কচি কিশলয়ের কচি পাতা তখন রবির কিরণে দুলছে!

এক যে ছিল রাজা

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

এক যে ছিল রাজা।

কোথায় বল তো?

আজ যেমন রাজার অভাব ঘটেছে, সমস্ত পৃথিবীতে কটি রাজা আছে আঙুলে গোনা যায়, সেদিন তো তা ছিল না। ছোট-ছোট রাজ্যে ছোট-ছোট রাজা দেশময় ছড়িয়ে ছিল। রাজ্য ছোট হলে কি হয়, রাজাদের দম্ভ ছোট ছিল না। যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। অনেক সময় বেশ ভারী ভারী যুদ্ধ।

এ কাহিনী সেই সময়কার। এবং যে রাজার কাহিনী বলতে যাচ্ছি তিনি ছিলেন বৈশাখীর রাজা সুরসেন।

ছোট রাজ্য, কিন্তু বড় রাজা। সৈন্যসামন্তের দিক দিয়ে নয়, হৃদয়ের দিক দিয়ে। প্রজারা তাঁকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করত।

সেই রাজার একটি মেয়ে ছিল। গোপা তার নাম।

পরমাসুন্দরী মেয়ে। যেমন রূপ, তেমনি গুণ, তেমনি বিদ্যা।

গুণ, বিদ্যা নয়। গুণ, বিদ্য' কে চায় বল? রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল দূর-দূরান্তরে। শুনে সমস্ত রাজাই গোপাকে বিয়ে করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে

পড়লেন।

কাছের রাজ্য মগধ। তার রাজধানী পাটলীপুত্র। সেখানকার রাজা ছিলেন ইন্দ্রগুপ্ত। যেমন বীর, তেমনি নিষ্ঠুর। সবাই তাঁকে ভয় করত। তাঁর সৈন্যবাহিনী ছিল বিপুল, যার খরচ চালাতে প্রজারা হিমশিম খেয়ে যেত।

অথচ না চালিয়েও উপায় নেই। সবাই মগধকে ভয় করে, এই ছিল রাজা-প্রজা সবারই অহংকার। দেশে দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকত। তাতে কি হয়েছে? প্রতিবেশিরা যে তাদের সমীহ করে এইটেই তো মস্ত বড় কথা। তারা পেটে কিল মারে আর বিপুল সৈন্যবাহিনীর খরচ জোগায়।

বৈশালীর নিকট-প্রতিবেশি হচ্ছে মগধ। তার লোভ বেশি, দম্ভও বেশি। সুতরাং বৈশালীর রাজসভায় মগধরাজ ইন্দ্রগুপ্তের দূত সবচেয়ে আগে এসে পৌঁছুলেন।

রাজা সুরসেন ইন্দ্রগুপ্তের দূতকে সসম্মানে রাজসভায় আহ্বান করলেন। জানতে চাইলেন, মগধরাজের অভিপ্রায় কি?

দূত সবিনয়ে জানালেন, মহারাজের জন্যে পরম ভট্টারক পরমসৌগত পঞ্চশ্রী মগধরাজ কিছু উপঢৌকন পাঠিয়েছেন। আর একখানি পত্র দিয়েছেন।

মূল্যবান উপঢৌকন ঃ সুসজ্জিত হস্তী, অশ্ব, মণিমাণিক্যখচিত তরবারি, আরও অনেক কিছু।

সুরসেন প্রকাশ্যে প্রসন্ন হাস্যে উপঢৌকন গ্রহণ করলেন। কিন্তু মনের মধ্যে চিন্তার প্রবল ঝড় বইছে। কেন এই উপঢৌকন? ইন্দ্রগুপ্তকে তিনি ভালো করেই চেনেন। এই মূল্যবান উপঢৌকনের পিছনে গূঢ় অভিসন্ধি কিছু একটা আছেই। তা পাওয়া যাবে তাঁর প্রেরিত পত্রে। উপঢৌকনের চেয়ে পত্রের জন্যেই তাঁর আগ্রহ বেশি।

সব শেষে একখানি স্বর্ণপাত্র দূত মগধরাজের পত্র সুরসেনের হাতে অর্পণ করলেন।

সুরসেন যেমন সন্দেহ করেছিলেন, তাই। মগধরাজ গোপার পাণিপ্রার্থনা করেছেন। ভাষা ভদ্র এবং বিনীত। কিন্তু তাতেও ইন্দ্রগুপ্তের ঔদ্ধত্য এবং দর্প ঢাকা পড়েনি।

সুরসেনের ললাটে ভ্রূকুটি ঈষৎ খেলে গেল, কি গেল না বোঝা গেল না।

স্বাভাবিক প্রসন্ন হাস্যে দূতকে বললেন, আজ আপনারা রাজ্যের

অতিথিশালায় বিশ্রাম করুন। পথশ্রমে আপনারা ক্লান্ত। কাল এ বিষয়ে আলোচনা হবে।

পরদিন সন্ধ্যায় যখন রাজসভা বসল, তখন দূতকে সসম্মানে নিয়ে আসা হল।

সুরসেন তাঁর হাতে পত্র দিয়ে বললেন, এই পত্র মগধরাজকে দেবেন। আর বলবেন যে, আমার কন্যাকে মহারাজের হাতে সম্প্রদান করতে পারলে গৌরবান্বিত বোধ করতাম। কিন্তু তা হবার নয়। তার বিবাহ অন্যত্র স্থির হয়ে গেছে।

দূত করজোড়ে বললেন, মহারাজ যদি অভয় দেন তাহলে আরও একটি কথা নিবেদন করি।

সুরসেন বললেন, নির্ভয়ে বলুন।

দূত বললেন, মহারাজ আপনার কন্যাকে বিবাহের জন্যে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। তাঁর ইচ্ছা, অন্য প্রস্তাব ভেঙে দিয়ে আপনি তাঁকেই কন্যা সম্প্রদান করে সম্মানিত করুন।

রাজা বললেন, তা সম্ভব নয়।

—কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে দুটি বন্ধুরাজ্যের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ বাঁধানো কি সমীচীন হবে?

—না। কিন্তু সে তো আমার উপর নির্ভর করে না। আপনি ও কথা মগধরাজকেই বলবেন।

দূত চলে গেলেন।

সবাই বুঝলে যুদ্ধ আসন্ন। মগধরাজ যে প্রকৃতির লোক, তিনি সহজে ছাড়বেন না। এবং এই যুদ্ধের পরিণাম কি, তাও অনুমান করতে কারও কষ্ট হল না।

মগধের যুদ্ধকুশল বিপুল সৈন্যবাহিনী। অন্যদিকে বৈশালী সমরশক্তিতে দুর্বল। রাজকরের অধিকাংশ তিনি প্রজার হিতার্থে ব্যয় করেন। রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে যে পরিমাণ সৈন্যবল নিতান্তই দরকার, সেই পরিমাণই তাঁর সৈন্যবল। মগধরাজের বিপুল বাহিনীর কাছে তা কিছুই নয়।

মন্ত্রীরা বললেন, কাজটা ভালো হল না মহারাজ!

সুরসেন বললেন, না। কিন্তু তা ছাড়া উপায় ছিল না।

মন্ত্রীরা বললেন, তা সে যা হবার হয়েছে। এখন খুব তাড়াতাড়ি আমাদের সৈন্যবৃদ্ধি করতে হবে।

—কেন?

—যুদ্ধ আসন্ন, সে কি বুঝতে পারছেন না?

—পারছি। কিন্তু আমার কন্যার বিবাহ একটা সামাজিক ব্যাপার। তার সঙ্গে রাজ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। যুদ্ধ মানেই ক্ষয়-ক্ষতি। আমার কন্যার বিবাহের জন্যে রাজ্য কেন ক্ষয়-ক্ষতি সহ্য করবে?

মন্ত্রীরা অবাক, তাহলে কি করবেন স্থির করেছেন?

রাজা বললেন, এখন থেকে স্থির করার কি আছে? মগধ-বাহিনী আক্রমণ করতে আসুক তো।

মন্ত্রীরা বুঝলেন, এই দুর্বল রাজার মূর্খতায় বৈশালীর সর্বনাশ আসন্ন। অথচ রাজা যদি আদেশ না দেন, তাঁরা কিইবা করতে পারেন?

মন্ত্রীরা যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই হল। ঝড়ের বেগে মগধ-সৈন্য বৈশালীর সীমান্তে এসে উপস্থিত হল।

শুনে বৈশালীর সৈন্যেরা মরিচা-ধরা তলোয়ারে শান দিতে লাগল। কিন্তু তাতে প্রজারা আশ্বস্ত হতে পারল না। রাজসভার মন্ত্রীরাও না।

সবাই কাঁপতে-কাঁপতে রাজসভায় ভিড় করল।

—মহারাজ!

সুরসেন হেসে বললেন, তোমরা নিশ্চিন্তে, নিজের-নিজের কাজে যাও। আমার মেয়ের বিবাহ নিয়ে যদি যুদ্ধ বাদে, তাতে বৈশালীর একটি লোককেও আমি মরতে দোব না।

পরদিন প্রত্যূষে।

দুটি-একটি পাখি জাগছে। তখনও চারদিকে পাতলা অন্ধকার রয়েছে। বৈশালীর প্রজারা ঘরের মধ্যে। সেই সময় মহারাজ সুরসেন তাঁর প্রকাণ্ড বড় ঘোড়ায় চড়ে সিংহদ্বার পার হলেন।

প্রজারা দেখতে পেলে না। কিন্তু মগধের সৈন্যেরা দেখলে, এক দীর্ঘদেহ, গৌরকান্তি বীর প্রকাণ্ড বড় ঘোড়ায় চড়ে তাদের শিবিরের দিকে আসছেন।

একা। নিরস্ত্র।

শিবিরের বাইরে এসে দেখলেন স্বয়ং মহারাজ ইন্দ্রগুপ্ত।

প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন কোনো দূত বোধহয় বৈশালীরাজের পত্র নিয়ে আসছেন। কিন্তু তাঁর যে দূত বৈশালীরাজের কাছে পত্র নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি বললেন, উনি স্বয়ং বৈশালীরাজ।

ইন্দ্রগুপ্ত হতচকিত, বৈশালীরাজ স্বয়ং! তিনি আসছেন শত্রুশিবিরে! একা, নিরস্ত্র।

সুরসেনকে সসম্মানে তিনি শিবিরে এনে বসালেন। বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, কি উদ্দেশ্যে এইভাবে একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় শত্রুশিবিরে মহারাজের আগমন, জানিয়ে আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করবেন কি?

সুরসেন হেসে উত্তর দিলেন, শত্রুশিবির আপনি কাকে বলেন মহারাজ? পৃথিবীতে আমার কোনো শত্রু নেই।

—আমাকে আপনি ভয় করেন না?

—না মহারাজ। কোনো মানুষকেই আমি ভয় করি না। সকল মানুষ আমার বন্ধু, আমার ভাই।

ইন্দ্রগুপ্ত অবাক। সুরসেনের চোখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই।

সুরসেন বললেন, যাক সে কথা। আমার আসার উদ্দেশ্য অকারণ রক্তপাত থেকে আপনাকে নিবৃত্ত করা। আমার কন্যা বিবাহিতা।

ইন্দ্রগুপ্ত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, একথা তো শুনিনি!

—না শোনারই কথা মহারাজ। আমি, আমার মহারানী এবং রাজকন্যার অতি বিশ্বস্ত কয়েকজন সহচরী ছাড়া কেউ জানে না।

—রাজকন্যার স্বামী কে, বলবেন?

—বলার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বলতেই হচ্ছে। রাজকন্যার স্বামী পশুপতিনাথ।

—তিনি কি কোনো রাজা?

সুরসেন হাসলেন, তাঁকে রাজা বললে রাজা, ভিখারি বললে ভিখারি।

—কোথায় তাঁর রাজ্য?

—সমস্ত স্থানই তাঁর রাজ্য। আবার সমস্ত হৃদয়ের কাছে তাঁর অঞ্জলি পাতা। ভিক্ষা চান।

ইন্দ্রগুপ্তের বুঝতে দেরি হচ্ছিল। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ভগবান পশুপতিনাথের কথা বলছেন?

—হ্যাঁ মহারাজ।

—এ কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে?

—পারে না বলেই তো গোপন রাখা হয়েছে। কিন্তু সত্য।

—আমাকে দেখাতে পারেন?

সুরসেন কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, পারি, যদি আজ গভীর রাত্রে আমারই মতো একা এবং নিরস্ত্র আমার প্রাসাদে আপনি আসতে পারেন।

শক্ত।

ইন্দ্রগুপ্ত বললেন, আপনি প্রাসাদে ফিরে যান মহারাজ। আজকের দিনটা আমাকে ভাবতে সময় দিন। সন্ধ্যার পূর্বে আপনার কাছে খবর পাঠাব।

সেই রাত্রে ইন্দ্রগুপ্ত বৈশালী প্রাসাদসংলগ্ন পশুপতিনাথের মন্দিরে গিয়েছিলেন। একা এবং নিরস্ত্র। সমস্ত দিনের ঐকান্তিকতায় ভয়কে তিনি জয় করে ফেললেন।

মন্দিরে কি দেখেছিলেন, কাউকে কখনও বলেননি। বাইরে থেকে এইটুকু শুধু বোঝা যেত, এই দুর্দান্ত মানুষটির বুকের মধ্যে সমস্তক্ষণ যে ভূমিকম্প চলত, তা স্তব্ধ হয়ে গেছে।

তাঁর নিজের মধ্যেকার ভয় গেছে কেটে। তাই অবশিষ্ট জীবন কাউকে আর ভয় দেখাবার চেষ্টা করেননি।

ঠক বাছাই

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

রাজামশাই আজ দারুণ চটিয়া গিয়াছেন। চাকর মহীপাল সিং বেচারি তামাক দিতে দেরি করিয়া ফেলায় প্রচণ্ড ধমক খাইয়াছে, তরকারিতে নুন বেশি দিয়া ফেলায় পাচক বেচারির চাকরি যাইবার যো হইয়াছে। কাহারও একটু দোষ বাহির হইলেই অমনি রাজামশাই ধমকাইয়া সারা করিতেছেন। সকলে অবাক—ব্যাপারখানা কি? অমন যে শান্তশিষ্ট রাজামশাই, তিনি আজ এত রাগারাগি করিতেছেন কেন?

ব্যাপারখানা কি তবে শুনিবে? রাজকোষে যে ট্যাকস আদায় করিয়া জমা দেয়, গোল বাধিয়াছে সেই লোকটাকে লইয়া। যাহাকেই সে-কাজের ভার দেওয়া যায়, শেষটায় দেখা যায়, সেই ট্যাকস হইতে কিছু না কিছু সরাইয়াছে। রাজা কত লোককে বরখাস্ত করিলেন, কত লোকের পিছনে গোয়েন্দা লাগাইলেন, কত লোককে জেলে পাঠাইলেন, কিন্তু ব্যাপার যে সেই-ই। খাঁটি মানুষ আর একটিও মেলে না। আজও একটি নূতন লোকের চুরি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। সেই হইতে রাজামশাই বেজায় খাপ্পা হইয়াছেন। তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে যে, তাঁর রাজ্যসুদ্ধ সকলেই ভণ্ড-জুয়াচোর। কাজেই

এত কাণ্ড!

এদিকে রাজা কাছে রোজই খবর আসিতেছে, অমুক জায়গায় জল-প্লাবনে সমস্ত ভাসিয়া গিয়াছে, টাকার বিশেষ প্রয়োজন, অমুক জায়গায় দুর্ভিক্ষের জ্বালায় মানুষ গাছের পাতা খাইতেছে, অবিলম্বে টাকা না পাঠাইলে দেশ শ্মশান হইয়া যাইবে।

বুড়া মন্ত্রী আর থাকিতে না পারিয়া শেষে একদিন ছদ্মবেশে নগর-ভ্রমণে বাহির হইলেন, এবং কোথা হইতে যেন একটি ফকির সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ফকিরকে অবিলম্বে রাজার নিকট লইয়া যাওয়া হইল। রাজা বলিলেন, "ফকির সাহেব, বড়ই মুশকিলে পড়িয়াছি এই ট্যাকস আদায় করা লইয়া। যাকেই সে কাজের ভার দেওয়া যায়, সেই আমার ঘাড় ভাঙে। সারা দুনিয়া খুঁজিয়া এ কাজের জন্য একটিও সাধু লোক মিলিল না। দিন না আমাকে বেশ একটি সাধু লোক বাছিয়া!"

ফকির বেশ একগাল হাসিয়া, ভরসা দিয়া রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, সেজন্য আর ভাবনা কি? আজই আপনি ঢেঁড়ি পিটাইয়া দিন যে রাজস্ব আদায়ের জন্য একজন সুদক্ষ কর্মচারী দরকার। আর দেখুন, মাহিনাটা একটু বেশি করিয়াই বলিবেন। তারপর লোকজন দেখা করিতে আসিলে আমাকে খবর দিবেন, আমি ঠিক বাছিয়া দিব কে ভাল, কে মন্দ!"

সেইদিনই রাজ্যময় ঢেঁড়ি পিটাইয়া দেওয়া হইল—সুদক্ষ লোক চাই, মোটা মাহিনা, থাকিবার জন্য ভাল কোঠাগাড়ি দেওয়া হইবে, আর প্রতি মাসে রাজবাড়ি হইতে একটি করিয়া সিধা মিলিবে।

ঢেঁড়ি শুনিয়া পরদিনই তো দশবার জন উমেদার আসিয়া হাজির। ফকিরের তলব পড়িল। ফকির আসিয়া রাজাকে একধারে ডাকিয়া লইয়া পরামর্শ দিলেন, "আজ নয়, আগামী শনিবার, রাত আটটার সময় সব উমেদারকে হাজির হইতে হুকুম দিন, ঐদিন আমি ভাল লোক বাছিয়া দিব।" ফকিরের পরামর্শমত রাজা সেইরকমই হুকুম দিয়া দিলেন।

চাকরির গরজ, —বড় সোজা জিনিস তো নয়, কাজেই নির্দিষ্ট দিনে ছয়টা বাজিবার সঙ্গে-সঙ্গেই উমেদারের দল আসিয়া আবার উপস্থিত।

কিন্তু আসিলে কি হইবে, আটটার আগে রাজামশাই মোটে নিচেই নামিবেন না! সেকেন্ডের পর মিনিট, —এমন করিয়া মানুষের সমস্ত জীবনটাই কাটিয়া যায়, দু'ঘণ্টা কাল আর কাটিবে না? কাজেই শেষে দু'ঘণ্টা কালও কাটিয়া গেল, আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে উমেদারদেরও ডাক পড়িল। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার একটা সরু ঢাকা বারান্দা দিয়া উমেদারদের রাজার বসিবার ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। রাজামশাই ভারি প্রফুল্লচিত্তে বসিয়া আছেন; পাশেই ফকির। সকলে রাজাকে প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন "আপনাদের ভিতর হইতে বেশ একজন পাক্কা লোক আমি আজই বাছিয়া লইব। কিন্তু তার আগে আপনারা কে কেমন নাচিতে পারেন, নাচুন দেখি।"

রাজামশায়ের মুখে একি কথা? নাচিতে বলেন কেন? চাকরি মিলিলে তাহারা তো রাজার পরওয়ানা দেখাইয়াই লোকের নিকট হইতে ট্যাকস আদায় করিবে—বানরের মত নাচ দেখাইয়া তো আর পয়সা আদায় হইবে না! তবে রাজা তাহাদের নাচ দেখিতে চান কেন? একজন জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ কি আমাদের নাচিতে আদেশ করিলেন?" রাজা জবাব দিলেন "হাঁ, আমি যখন বলিতেছি, তখন তাহাতে আর কোন লজ্জা নাই।"

কিন্তু কি জানি কেন, নাচিতে কেহই রাজি হয় না। কেউ বলে তাহার পায়ে ব্যথা হইয়াছে, নাচিলে খোঁড়া হইয়া যাইবে; কেউ বলে তার মাজায় বাত হইয়াছে, নাচিলে পক্ষাঘাত হইবে। সকলেই একটা না একটা ওজর দেখায়। কেবলমাত্র একজন লোক, কোনরকম ওজর-আপত্তি না তুলিয়া, হঠাৎ একেবারে দারুণ নাচ শুরু করিয়া দিল। ওঃ, সে কি নাচের বহর! মাজা দোলাইয়া, হাত কাঁপাইয়া, ঘরময় এমনি নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল, যে রাজা পর্যন্ত অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া রহিলেন।

ফকির তখন উঠিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি লোকটার নাচন বন্ধ করিয়া দিলেন এবং রাজার নিকট তাহাকে লইয়া গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমার লোক আমি চিনিয়া লইয়াছি। এই এতগুলি লোকের মধ্যে যদি সাধুপুরুষ কেউ থাকে তো, সে এই একটি। বাদবাকি সব কয়টাই চোর—আগাগোড়া ভণ্ডের দল।"

এখন বল তো ফকির অতগুলি লোককে ভণ্ড সাব্যস্ত করিয়া ফেলিল কি করিয়া? সেই যে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার সরু বারান্দা দিয়া উমেদারদের

রাজার কাছে লইয়া আসা হইয়াছিল, সেটা ছিল মোহরের বস্তায় ভরা। অন্ধকারে কেউই টের পাইবে না মনে করিয়া উমেদারের দল যত পারিয়াছে পকেটে মোহর বোঝাই করিয়াছে। তারপর যখন নাচের হুকুম হইল, তখন তো তাহাদের চক্ষু স্থির! নাচিতে গেলেই তো পকেট হইতে মোহর বাহির হইয়া মেঝেতে ছড়াইয়া পড়িবে, আর তাহাদের সাধুপনাও প্রকাশ হইয়া পড়িবে! যে লোকটি নাচিতেছিল, সেই শুধু রাজার মোহর স্পর্শ করে নাই; কাজেই তার আর নাচিতে ভয় কিসের? দেখ দেখি, ফকিরের কৌশলে কেমন চমৎকার ঠক বাছাই হইয়া গেল!

বন্দিনী রাজকন্যার গল্প

রাধারানী দেবী

এক দেশে এক রাজপুত্তুর দেশ-ভ্রমণে

দেশ-ভ্রমণে বেরিয়ে কত রাজ্য—কত শহর-গ্রাম—কত পাহাড়—পর্বত অরণ্য ঘুরে-ঘুরে শেষকালে নীল সমুদ্দুরের ধারে এক দেশে গিয়ে পৌঁছুলেন। সেখানে সঙ্গের লোক-লস্কর সব্বাইকে বিদায় দিয়ে একা চলতে শুরু করলেন পায়ে হেঁটে।

রাজপুত্তুর ভ্রমণে বেরিয়েছেন সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে। মাথায় নেই সোনার রাজছত্তর, সোনার পাগড়ি। গায়ে নেই ইস্পাতের ওপর সোনার ফুলতোলা ঝকঝকে উজ্জ্বল বর্ম! হাতে নেই রুপোর মতন চকচকে ইস্পাতের বল্লম। হীরেমানিক বসানো কোষে নেই ধারালো তরোয়াল। রাজপুত্তুর চলেছেন সাদাসিধে পোশাকে, কোমরে আর হাতে লাঠি নিয়ে।

নীল সমুদ্দুরের ধারে একটি দেশ দেখে রাজপুত্তুরের খু-উ-ব পছন্দ হল। কী সুন্দর নতুন রকমের গাছপালা আর নতুন ধরনের সুন্দর-সুন্দর গড়নের ঘর-বাড়ি। রাজপুত্তুর খুশি হয়ে চারিদিক দেখতে-দেখতে একটি নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন, এমন সময় কানে এলো মানুষের কান্না!

কে কাঁদে? কান্না শুনে রাজপুত্তুর ব্যস্ত হয়ে সেইদিকে এগিয়ে চললেন। কিছুক্ষণ পরে দেখতে পেলেন একটি বুড়ি এক প্রকাণ্ড বটগাছের নিচে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে।

রাজপুত্তুরকে দেখতে পেয়েই বুড়ি কাঁদতে-কাঁদতে বললে—বাবা, সর্বনাশ হয়েছে! রাজকন্যে ময়না-পাখির খোঁজে বেরিয়েছিল, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কী হবে?

রাজপুত্তুর আশ্চর্য হয়ে বললেন—ময়না-পাখির খোঁজে রাজকন্যা এসেছে এখানে?

বুড়ি বললে—হ্যাঁ। শোনো বাবা, রাক্ষসেরা আমাদের রাজ্যে এসে ভীষণ উৎপাত করছিল। রাজামশাই গেছেন রাজ্যের সমস্ত পুরুষমানুষ নিয়ে যুদ্ধ করতে রাক্ষসদের সঙ্গে।

রাজপুত্তুর ব্যস্ত হয়ে বললেন—তারপর?

—তারপর আর কি! আমাদের মা-মরা রাজকন্যে। তাকে আমিই আঁতুড়-ঘর থেকে মানুষ করেছি বাবা! তার আদরের পোষা ময়না-পাখিটা উড়ে এই বটগাছটার উপরে গিয়ে বসেছিল। রাজকন্যে পাখির পিছু-পিছু ছুটে বেরিয়ে এলো, আমিও তার পিছু-পিছু ছুটলুম। কিন্তু রাজকন্যের আর দেখা পেলাম না। এই দ্যাখো না, এই গাছের তলা পর্যন্ত তার পদ্মপায়ের ছাপ পড়েছে। তারপর আর তার পায়ের ছাপ পাচ্ছিনে—কি হবে বাবা? তুমি জোয়ান ছেলে! তুমি এই বটগাছের কোটরে একবার উঁকি দিয়ে দেখো না...পাখি ধরতে গিয়ে রাজকন্যে ঐ কোটরের মধ্যে পড়ে গেছে কি না!

রাজপুত্তুর মালকোঁচা বেঁধে তরতর করে বটগাছে উঠে পড়লেন। উপরে উঠে কোটরের কাছে পৌঁছে উঁকি দিয়ে দেখলেন. —কোটরের মধ্যে এক বিরাট গহ্বর! অবাক কাণ্ড! সেই গহ্বরের ভিতরে দিব্যি থাক্ থাক্ সিঁড়ি কাটা রয়েছে গাছের গায়ে।

বুড়ি নিচে থেকে ব্যাকুল হয়ে বললে—আমার কলাবতী কি ওর ভেতরে আছে?

রাজপুত্তুর কোটরের ভিতর দিকে ঝুঁকে দেখতে-দেখতে বললেন—কই, না তো?

বুড়ি কাঁদতে-কাঁদতে বললে—কিন্তু তার পায়ের ছাপ যে এইখানে

এসেই শেষ হয়েছে, বাবা! ওমা, এখন কী করি আমি! মহারাজ ফিরে এলে তাঁকে কী বলবো গো?

বুড়িকে ডেকে রাজপুত্তুর বললেন—কিছু ভয় নেই বুড়িমা! গাছের ভেতর নামবার চমৎকার সিঁড়ি আছে। এর মধ্যে নেমে আমি রাজকন্যের খোঁজ নিয়ে আসি। যতক্ষণ আমি না ফিরি তুমি ঐখানে বসে থেকো!

রাজপুত্তুর তরতর করে নেমে গেলেন গাছের কোটরের দেওয়ালে খাঁজ-কাটা ধাপ বেয়ে। নামতে-নামতে—শেষকালে যেখানে সিঁড়ির খাঁজ শেষ হয়ে অনেক সবুজ পাতা ছড়ানো রয়েছে, রাজপুত্তুর লাফ দিয়ে সেই জমির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যেই না পড়া—সঙ্গে-সঙ্গে সবুজ জমিটা নড়ে গিয়ে হু-হু করে নিচের পানে তলিয়ে গেল। যেখানে এসে সেই জমি থামলো, রাজপুত্তুর বুঝতে পারলেন যে, একটা বহু যুগের পুরনো পাথরের কেল্লার মধ্যে এসে পড়েছেন তিনি।

যে-জায়গাটিতে তিনি পড়েছিলেন, তার একদিকে একটা ছোট দরজা দেখতে পেলেন। দরজাটায় হাত দেওয়ামাত্তর সেটি খুলে গেল। রাজপুত্তুর দেখলেন, খু-উ-ব সরু একটা পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে। উঁচু সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগলেন রাজপুত্তুর। অনেক সিঁড়ি উঠবার পর দেখতে পেলেন, উপরের সুন্দর জমিতে একটি বাগান।

সেই বাগানে কিছুক্ষণ জিরিয়ে, বাগানের দক্ষিণদিক আন্দাজ করে এগুতে-এগুতে কিছু দূরে নীল সমুদ্দুর দেখতে পেলেন। সমুদ্দুর দেখে রাজপুত্তুরের আনন্দ আর ধরে না। যাক আর ভয় নেই। সমুদ্দুর যখন দেখতে পাওয়া গেছে তখন যেমন করেই হোক এখান থেকে পালাতে পারবেন। কিন্তু, আকাশে সূয্যি নেই কেন? তবে কি—পাতালপুরীতে এসে পড়েছেন নাকি? রাজপুত্তুর ভাবছেন, এমন সময়ে একটি সুন্দর ময়না-পাখি উড়ে এসে তাঁর কাঁধের ওপর বসে, মিষ্টি স্বরে বলে উঠল—তুমি কে গো?

রাজপুত্তুর বললেন—আমি রাজপুত্তুর। তুমিই কি সেই ময়না-পাখি, যার খোঁজে রাজকুমারী কলাবতী হারিয়ে গেছেন?

ময়না বললে—হ্যাঁ। আমি কলাবতীর পোষা ময়না। কলাবতীর বাবা যে রাক্ষসরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেছেন, সেই রাক্ষসরাজা যুদ্ধে হেরে

গিয়ে তার এই পাতালপুরীর বাড়িতে এসে লুকিয়ে আছে। যুদ্ধে হেরে পালিয়ে আসার সময় সে ফাঁদ পেতে ভুলিয়ে বোধহয় কলাবতীকেও এখানে ধরে এনেছে। কলাবতীর খোঁজেই আমি আছি এখানে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাকে খুঁজে পাইনি। তবে রাক্ষসরাজের সঙ্গে আমি ভাব জমিয়ে নিয়েছি। কলাবতীকে খুঁজে ঠিক বের করবো।

এমন সময় একটা ভীষণ শব্দ শোনা গেল। ময়না বললে—তুমি শিগগির ঐ পাথরের ঢিবিগুলোর আড়ালে লুকোও, রাক্ষসরাজ এইদিকেই আসছে। এরপর আমি একসময়ে এসে তোমার সঙ্গে ভাব করবো।

রাজপুত্তুর তাড়াতাড়ি আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন।

একটু পারেই এক বিরাটকায় রাক্ষস এসে পড়ল! তার গায়ের চামড়া উঁচু-কাঁটা-ওঠা কাঁঠালের মতন, কানদুটি হাতির কানের মতন। চেহারা তার মানুষের মতন, আর চোখদুটো বাঘের মতন। ময়না তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে গিয়ে ঘাড় দুলিয়ে নমস্কার করে বললে—কাল থেকে আপনাকে দেখতে পাইনি। শরীর বেশ ভাল আছে তো, মহারাজ।

রাক্ষসরাজ মোটা কর্কশ গলায় বললে—মোটেই না। পাতালপুরীতে এসে অবধি ভাল খাবার পাচ্ছিনে! পরশু হাঙরের চচ্চড়ি আর তিমির তরকারি খেয়ে কাল সারাদিন পেটের ব্যথায় উঠতে পারিনি। মনিষ্যির কচি-মাংসের ঝোল না খেলে বোধকরি সুস্থ হবো না।

ময়না বললে—তা মনিষ্যির ছানা কি পাওয়া যাচ্ছে না নাকি?

রাক্ষস রেগে উঠে বললে—পাওয়া যাবে না কেন? ঐ যে মনিষ্যির রাজাটার রাজ্যি ধ্বংস করতে গেলুম, সেখান থেকে হেরে পালিয়ে আসবার সময় তার মেয়েটাকে ভুলিয়ে ফাঁদে ফেলে ধরে এনেছি। সেটাকে তো কেটে ঝোল বানাতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু আমার মন্ত্রী বারণ করলে।

ময়না বললে—কেন, কেন মহারাজ? আপনার শরীর খারাপ হয়েছে...পথ্যি খেতে হবে...মন্ত্রীমশায় তাতে মানা করলেন কেন?

রাক্ষস বললে—মন্ত্রী বললে, ঐ মেয়েটার বাবার কাছে একটা খবর পাঠিয়ে দেবে যে, প্রত্যেক দিন সমুদ্দুরের ধারে আমার জন্যে একটি করে জ্যান্ত-মনিষ্যি রেখে দেয়, তবেই তার মেয়েকে আমরা ছেড়ে দেবো। নইলে দেবো না।

ময়না বললে—এটা মন্দ পরামর্শ নয় মহারাজ।

রাক্ষস বললে—হ্যাঁ, মন্ত্রীও বললে তাই। একদিনের জন্যে একটা বাচ্চা খেয়ে আর কি হবে? বরং প্রতিদিন যাতে একটা করে তাজা মনিষ্যি পাওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করাই ভাল।

রাক্ষসরাজ পেটের ব্যথায় ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে-করতে প্রাসাদের মধ্যে চলে গেল।

ময়না-পাখি ফিরে গিয়ে রাজপুত্তুরকে বললে—কলাবতী এইখানেই আছে। তাকে খুঁজে বের করতে হবে। তুমি এখন এইধারেই লুকিয়ে থাকো। আমি চারিদিকে দেখেশুনে বুঝে আসি।

এদিকে হয়েছে কি রাক্ষসরাজের সেই পেটের যন্ত্রণা বিষম বেড়ে গেছে। তার চেঁচামেচিতে চারিদিকে রাক্ষস-খোক্কসরা ছোটাছুটি করছে। ময়না-পাখি তাড়াতাড়ি গিয়ে তাদের বললে—আমাকে মহারাজের কাছে নিয়ে চলো। আমি পেটের যন্ত্রণা কমিয়ে দিতে পারি।

রাক্ষস-খোক্কসরা তাদের রাজার কাছে নিয়ে গেল ময়না পাখিকে।

ময়না-পাখি রাক্ষসরাজকে ঘাড় দুলিয়ে নমস্কার করে বললে—মহারাজ! আমি পেটের ব্যথা সারিয়ে দিতে জানি। তবে এ রকম দারুণ পেটের যন্ত্রণার ওষুধ তো পাতালে কেউ জানে না। এর খুব ভাল ওষুধ জানে পৃথিবীর মনিষ্যিরা। যারা এই পেটের ব্যথা সারাতে পারে তাদের বলে—গো-বদ্যি। মহারাজ যদি হুকুম দেন, আমি পৃথিবী থেকে গো-বদ্যি ধরে আনতে পারি। এখানে এসে সে আপনার পেটের ব্যথা সারিয়ে দেবে।

রাজা তখন যন্ত্রণায় ছটফট করছে। বললে—তা যদি পারো তো তুমি যা বলবে, শুনবো। যে করে হোক, শিগগির সারিয়ে দাও আমার পেট কামড়ানি।

ময়না-পাখি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে উড়ে রাজপুত্তুরের কাছে গিয়ে বললে—রাজপুত্তুর শিগগির তৈরি হয়ে নাও। তোমাকে গো-বদ্যি সেজে রাক্ষসরাজের পেট কামড়ানি সারিয়ে দিতে হবে এখ্খুনি।

রাজপুত্তুর তো আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন—সে কি কথা? আমি আবার চিকিৎসার কি জানি?

ময়না বললে—সে তোমায় ভাবতে হবে না। আমি যা-যা বলি, ঠিক

তেমনি-তেমনি করো দিকি! ময়না উড়ে গিয়ে রাজপুত্তুরের কাঁধের উপর বসে তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে যা করতে হবে শিখিয়ে দিলে ঘাড় নেড়ে-নেড়ে। শুনে রাজপুত্তুরের মহা আনন্দ।

রাক্ষসরাজ ময়দানের মত তার প্রকাণ্ড ঘরের মেঝেতে পড়ে এ মুড়া থেকে ও মুড়া গড়াগড়ি দিচ্ছে। কাতরানিতে মনে হচ্ছে, আকাশ-ফাটা মেঘ ডাকছে বুঝি বা! মাঝে-মাঝে আবার একসঙ্গে দশ-বিশটা বাজ পড়ার মতন উৎকট চিৎকার করে উঠছে। রাজপুত্তুরকে সঙ্গে নিয়ে ময়না এগিয়ে গিয়ে বললো—মহারাজ। পৃথিবী থেকে গো-বদ্যি ধরে এনেছি।

রাজা ককাতে-ককাতে বললে—এখ্খুনি আমার রোগের ব্যবস্থা করে দে। নইলে তোকেই আমি কাঁচা গিলে খেয়ে ফেলবো।

রাজপুত্তুর গম্ভীর মুখে এগিয়ে গিয়ে একদৃষ্টিতে রাক্ষসের পেটের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে বললেন—মহারাজ! আপনার খাবারে কোনো সমুদ্রের জন্তু রান্না হয়েছিল কি?

সেখানে উপস্থিত মন্ত্রী-পাত্র-মিত্র-রাক্ষস-খোক্কসরা সকলে মিলে চেঁচামেচি করে বলতে লাগলো—হ্যাঁ-হ্যাঁ—হয়েছিল। মহারাজ খেয়েছিলেন হাঙর আর তিমির ঝোল!

রাজপুত্তুর খুব গম্ভীরভাবে নিজের নাকটি টিপে ধরে চোখ দুটি বুজে একমুহূর্ত চুপ করে কি চিন্তা করলেন। তারপর বললেন—হয়েছে। সেই হাঙরগুলোই পেটের মধ্যে জ্যান্ত হয়ে উঠে তাদের দাঁত দিয়ে মহারাজের নাড়িভুঁড়ি চিবুচ্ছে! শুধু তাই নয়, তিমিটাও দেখছি বিশ্বাসঘাতক। সেও আস্তে-আস্তে পেটের মধ্যে বেঁচে ওঠার মতলবে রয়েছে।

সমস্ত রাক্ষস-খোক্কসরা ব্যাকুল হয়ে হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ করে বলতে লাগল—হায় হায় কী হল! গো-বদ্যি মশাই? এখন উপায়?

রাজপুত্তুর রাশভারী গলায় বললেন—হ্যাঁ, খুব শিগগিরই এর উপায় করতে না পারলে বিপদ হতে পারে। হাঙরগুলো বেঁচে উঠে পেটের মধ্যে যতই উৎপাত করুক না, তাতে শুধু যন্ত্রণাই হবে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক তিমি ব্যাটা বেঁচে উঠে পেটের মধ্যে তার ল্যাজ আছড়িয়ে নাকের ফোয়ারার জল ছাড়তে শুরু করলে—

রাজা ককাতে-ককাতে বললে—এখ্খুনি ব্যবস্থা করো। নইলে—

রাজপুত্তুর বললেন—ভাববেন না, রাজামশাই, আমি ঠিক ভাল করে দেবো আপনার পেট কামড়ানি! তবে একটা জিনিস চাই। আমার ওষুধের সঙ্গে সেটা মিশিয়ে খাইয়ে দিলেই এখ্খুনি সেরে যাবে। সেটা হচ্ছে, তিত্তিরে গাছের শেকড়, আর মানুষের মেয়ের দশ ফোঁটা চোখের জল। সে তো আর এ রাজ্যিতে পাওয়া যাবে না, সে পাওয়া যায় মানুষের রাজ্যিতে। আমি গিয়ে দুদিনের মধ্যে সব জোগাড় করে নিয়ে আসবো।

ময়না তাকে বাধা দিয়ে বললে—ওগো বদ্যি! তুমি মনিষ্যি জীব! তুমি এখান থেকে একলা ওষুধ খুঁজতে গেলে, মহারাজের রাজ্যির প্রজারা তোমাকে দেখতে পেয়ে পাকা আমটির মতন টুপ করে পেটে পুরে ফেলবে। তখন মহারাজের রোগ সারবে কী করে?

রাক্ষসরাজ বিরক্ত হয়ে কাতরাতে-কাতরাতে বললে—কিছু ভয় নেই। তুমি আমার রাজ্যে যেখানে খুশি ঘুরে বেড়িয়ে যত শিগগির পারো ওষুধের গাছ্ খুঁজে নিয়ে এসো। তোমায় আমার 'জাদু-টুপি' একটা দিচ্ছি, এই টুপিটা পরলেই তুমি রাক্ষস হয়ে যাবে। তখন আর আমার রাজ্যির কোনো রাক্ষস-খোক্কস তোমার চুলটি পর্যন্ত ছোঁবে না। শিগগির যাও।

রাজপুত্তুর রাক্ষসরাজের কাছ থেকে তামার ঝকঝকে 'জাদু-টুপি' নিয়ে মাথায় পরলেন।

ওমা! দেখতে-দেখতে রাজপুত্তুর একটা বিরাট রাক্ষস হয়ে গেলেন।

ময়না দারুণ ভয়ে আঁতকে চেঁচিয়ে উঠল। রাক্ষস এত যন্ত্রণার মধ্যে ফিক-ফিক হেসে ফেলে বললে—গো-বদ্যি, টুপিটা খুলে নামিয়ে রাখো।

রাজপুত্তুর তাড়াতাড়ি টুপিটা মাটিতে নামালেন। অমনি আবার তাঁর পরম সুন্দর চমৎকার চেহারা ফিরে এলো। যাই হোক, রাজপুত্তুর রাক্ষসরাজকে লম্বা দণ্ডবৎ করে ময়নাকে নিয়ে তো ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে এসে ময়নার সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন চুপি-চুপি।

পরামর্শ ঠিক হবার পর ময়না একলা রাজার কাছে গিয়ে রাজাকে জানালে—রাজামশাই! গো-বদ্যি ধ্যানে বসে জানলে যে আর চার প্রহরের মধ্যে ওষুধ না খাওয়ালে আপনাকে বাঁচানো শক্ত হবে। অথচ মানুষের মেয়ের চোখের জল দশফোঁটা এইসময়ের মধ্যে কেমন করে আনবে, সেই হয়েছে বিষম ভাবনা। আপনার রাজ্যির ধারে-পাশে কোথাও কি

মনিষ্যির বাস নেই? আপনার পেরমাই থাকতে-থাকতে শিগগির ভেবে বলুন!

পরমায়ু কমে আসছে শুনেই ভয়ে-ভয়ে রাজা বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, উপায় আছে, মনে পড়েছে। মন্ত্রীর কাছে যাও, গিয়ে সব কথা বলে জানাও যে, রাজার হুকুম, শিগগির ব্যবস্থা করো। গম্বুজের মাথায় বন্দিনীর চোখের জল—বুঝলে?

ময়না বললে—বুঝলুম, আর চললাম মন্ত্রীমশাইয়ের কাছে।

ময়না এসে রাজপুত্তুরকে বলতেই রাজপুত্তুর টুপি খুলে মানুষের বেশে রাক্ষসরাজের মন্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন—আমি শুক্তি ঝিনুক এনেছি। এই শুক্তি ঝিনুকে দশফোঁটা মনিষ্যির মেয়ের চোখের জল চাই। মহারাজের পেট কামড়ানির ওষুধ তৈরি করবো। মহারাজ বলেছেন, আপনার কাছে এলেই চোখের জলের ব্যবস্থা হবে। গম্বুজের মাথায় আছে চোখের জল!

মন্ত্রী বলল—হ্যাঁ, আমার কাছেও সে খবর এসেছে। চলো আমার সঙ্গে।

রাজপুত্তুর চললেন, মন্ত্রীর সঙ্গে। চলে—চলে—চলে, দেখলেন, কেল্লার শেষে সমুদ্রের ধারে একটা প্রকাণ্ড উঁচু গম্বুজ। সেই গম্বুজের উপরে উঠে দেখলেন, সেখানে একটা ছোট ঘরে রাজকন্যা কলাবতী বসে-বসে কাঁদছেন।

রাক্ষস-মন্ত্রী গিয়ে রাজকন্যাকে এমন বিশ্রীভাবে ধমক দিলে যে তার চোখ দিয়ে আরও বেগে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল। তখন মন্ত্রী ইশারা করে রাজপুত্তুরকে বললেন—নাও, নাও, এইবেলা চোখের জলটা শুক্তির ঝিনুকে ভরে নাও।

রাজপুত্তুর তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে কলাবতীর চোখের কোলে শুক্তির ঝিনুকটি ধরলেন আর খু-উ-ব আস্তে-আস্তে বললেন—ভয় নেই রাজকুমারী, আমি তোমায় উদ্ধার করতেই এসেছি।

• অনেকদিন বাদে কলাবতী মানুষ দেখে স্বাভাবিক আনন্দে চিৎকার করতে যাবেন, এমন সময় রাজপুত্তুরের ইশারায় চুপ করে গেলেন।

রাজপুত্তুর কলাবতীকে চোখ টিপে ইশারা করে—আবার অন্যসময়ে আসবেন জানিয়ে, তাঁর দশফোঁটা চোখের জল নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এমন সময় রাজপুত্তুরের পেছনে তাঁর নিজের পোষা ময়নাকে দেখতে পেয়ে

রাজকন্যা তাকে ধরে আদর করতে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেইসময়ে রাজপুত্তুর কলাবতীর পায়ের আঙুল, নিজের পা দিয়ে টিপে ধরে ইশারা না করতেন, তাহলে মুশকিল হতো। রাজকন্যা ইশারা বুঝলেন। বলে উঠলেন, —ও-মা! ওই পাখিটা আবার কোথা থেকে এলো? কী চমৎকার পাখি! আমি একলা থাকি, আমি ওটাকে পুষবো।

মন্ত্রীমশাই ভাবলে, ভালই হলো, ওই ময়না-পাখি আসার পর থেকেই রাজামশাইয়ের নিত্যি অসুখ লেগেই আছে। এ আপদটাকে রাজার কাছ থেকে তফাতে রাখাই উচিত। এই মনে করে মন্ত্রীমশাই বললে—আচ্ছা, পাখিটাকে তুমি তোমার সঙ্গী করে পোষো। ওকে এখানে রেখে যাচ্ছি। তারপর ময়নার দিকে ফিরে বললে—থাক ব্যাটা পাজি। তুইও এইখানে বন্দী থাক। দিন রাত্তির মহারাজের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া তোর ঘোচাচ্ছি।

এই বলে একটা মস্ত লোহার খাঁচা আনিয়ে তার মধ্যে ময়নাটাকে বন্দী করে রেখে, খাঁচার দরজা বন্ধ করে রাজপুত্তুরকে নিয়ে চলে এলো।

পথ চলতে-চলতে গো-বদ্যি বললে মন্ত্রীমশাইকে—দেখুন মন্ত্রীমশাই, আমি যাচ্ছি, কিন্তু আপনি ফটকের পাশে বসে থাকুন।

মন্ত্রীমশাই বললে—কেন?

গো-বদ্যি বললে—কেন আবার কী? রাজার পেরমাই আর মোটে একপ্রহর। এর মধ্যে আমায় সাত-সাতবার আসতে হবে চোখের জল নিতে। প্রতিবারেই গরম-গরম চোখের জল চাই—বুঝলেন? তবে রাজা বাঁচবেন। বারে-বারে আমায় গম্বুজের চাবি খুলে দেবে কে?

মন্ত্রীমশাই বললে—আমাদের রাজামশাই ঠিক বাঁচবেন তো?

গো-বদ্যি বললে—বাঁচবেন না কেন? নিশ্চয় বাঁচবেন। তবে আপনাকে একটা মন্তর শিখিয়ে দিচ্ছি, তাড়াতাড়ি গিয়ে রাজামশায়ের কানের কাছে বিড়বিড় করে তিন লাখ ছাপান্ন বার আওড়াতে থাকুন তাঁকে ছুঁয়ে! সাবধান! কেউ যেন না শুনতে পায় এই মন্তর। বড় বিশ্বাসী মন্তর এটা। আর আপনিও বিশ্বাসী মন্ত্রী রাজামশায়ের। শিগগির আপনি চলে যান...আমিও খুব শিগগির গরম-গরম জল নিয়ে সাত-সাতবার যাবো-আসবো...আসবো আর যাবো...

মন্ত্রীমশাই বললে—তবে গম্বুজ-ঘরের চাবিটা তুমিই রাখো...আমি যাই।

গো-বদ্যি বললে—সেই ভাল।

মন্ত্রীমশাই রাজপুত্তুরের হাতে চাবি দিয়ে চলে যেতেই, রাজপুত্তুর করলে কি তাড়াতাড়ি কলাবতীর ঘরের সামনে গিয়ে বললেন—ময়না, তুমি শিগগির জানালা দিয়ে বেরিয়ে এসো।

ময়না তখন কলাবতীর সঙ্গে মন খুলে গল্প করছিল। কলাবতী পিঞ্জর খুলে তাকে কোলে বসিয়ে বলছিলেন ঃ

'ময়না ময়না, দুঃখ যে আর সয় না।'

ময়না তার জবাব দিচ্ছে ঃ

'রাজকন্যে ভাই, চিন্তা কিছু নাই।

কেমন করে উদ্ধার করি, দেখো তখন তাই।'

এমন সময় রাজপুত্তুরের ঐ কথা শুনে কলাবতী জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে ময়নাকে বের করে দিলেন। ময়না বেরিয়ে এসে বললে—এখুনি আমাদের পালাতে হবে। এত দেরি দেখে মহারাজের লোকজন তোমার খোঁজ করতে এলো বলে।

রাজপুত্তুর বললেন—সে তো জানি। কিন্তু পালাবো কেমন করে?

তখন ময়না বললে—সেই জাদু-টুপিটা। তুমি শিগগির আমার মাথায় পরিয়ে দাও। তারপর তোমরা দুজনে আমার দু'খানা ডানার গা ঘেঁষে পিঠে চড়ে বসো।

রাজপুত্তুর তাড়াতাড়ি 'জাদু-টুপিটা' ময়নাকে পরিয়ে দিতেই সে ঈগল পাখির চেয়েও মস্ত বড় রাক্ষুসে-পাখি হয়ে গেল। কলাবতী আর রাজপুত্তুর তার পিঠে চড়ে বসতেই সে হু-হু করে উপর দিকে উঠতে লাগল। উঠতে—উঠতে—উঠতে—হাজির হল এসে পৃথিবীতে। হাজির হতেই রাজপুত্তুর দেখেন, বুড়ি বসে-বসে অঝোর ঝরে কাঁদছে। যেমন করে মানুষ-করা মেয়েকে রাক্ষসের হাতে সঁপে দিয়ে আজও কাঁদে তার অভাগিনী মা। এ কান্না শেষ হবে যদি কোনদিন কোন দয়ালু রাজপুত্তুর এসে তার মানুষ-করা মেয়ের সারাজীবনের ভার নিয়ে তাকে উদ্ধার করতে পারে।

রাজপুত্তুর পাতালপুরীর বাইরে এসে কলাবতীকে আর তার ধাইমাকে ময়নার পিঠে চড়িয়ে তাঁর বাবার কাছে ফিরিয়ে দিতে গেলেন।

আমার কথাটি ফুরুলো।

ঘুমন্তপুরীর কন্যা

প্রেমেন্দ্র মিত্র
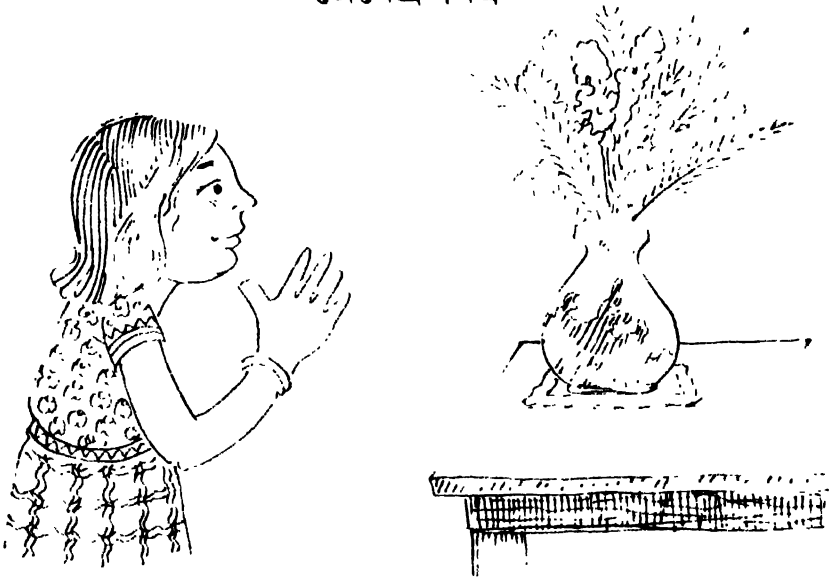
মিনুর মামামণি আজ সন্ধ্যাবেলা কোথা থেকে অনেকগুলো কেয়া ফুল কিনে এনেছেন। বায়না করে তার থেকে একটা মিনু চেয়ে নিয়ে তার ঘরে এনে রেখেছে।

কাঁটা দেওয়া লম্বা-লম্বা পাতার আড়ালে নরম সাদা ফুলটি যেন লাজুক একটি সুন্দরী মেয়ে। আর কি মিষ্টি তার গন্ধ। সমস্ত ঘর যেন ঢুলে পড়েছে নেশায়।

বাইরে ঝিম-ঝিম করে বৃষ্টি পড়ছে। ঘরের বাতি নেভানো। একলা বিছানায় শুয়ে-শুয়ে মিনুর কি ভালোই লাগছে। কেয়াফুলের গন্ধ নয়, যেন ভারি মিষ্টি কার আদর। সমস্ত মন জুড়িয়ে যায়।

কেয়াফুলটা পাশের টেবিলের ওপর ফুলদানিতে মিনু রেখেছে। ঘরের ভিতর বাতি নেভানো, কিন্তু জানালা, দরজা দিয়ে একটু-আধটু আলো চুঁইয়ে যে না আসছে তা নয়। অস্পষ্টভাবে ফুলদানিটা দেখা যাচ্ছে টেবিলের ওপর। ফুলটি যেন সাদার একটা আবছা ছোপ অন্ধকারে।

বাইরের রিমঝিম বৃষ্টির আওয়াজ, আর ঘরের ভিতর মিষ্টি কেয়ার

গন্ধে মিনুর চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিল, হঠাৎ ঠুক করে একটা আওয়াজে তার ঘোর কেটে গেল।

মিনু একটু অবাক হয়ে উঠে বসল, বাইরে বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ও হচ্ছে একটু। দমকা হাওয়ায় জানলার একটা পাল্লা গেছে খুলে। হয়ত তারই শব্দ।

মিনু আবার চোখ বুজতে যাবে। হঠাৎ টেবিলের পাশে স্পষ্ট করে মিষ্টি গলা শোনা গেল। তাইতো? ভারি আশ্চর্য! কেয়াফুলটির ভেতর থেকেই যেন কার কথা শোনা যাচ্ছে।

'শুনছ!'

মিনু প্রথমটা বিশ্বাস করতেই চাইল না। কেয়াফুল আবার কথা কয় নাকি! কিন্তু আবার যখন মিঠে গলার মিনতি শোনা গেল—'শুনছ?' তখন সে বলে ফেললে আপনা থেকেই—'কি?'

'আমায় একটু জানলার ধারে রাখবে!'

'কেন বলত?' মিনু জিজ্ঞেস করলে অবাক হয়ে।

'এখান থেকে ভালো দেখতে পাচ্ছি না!'

'দেখতে পাচ্ছ না। জানালার ধারে কি দেখবে?'

'বিদ্যুৎকুমারকে।'

মিনু একটু অবাক হল বই কি? বিদ্যুৎই তো সে জানে, বিদ্যুৎকুমার আবার কি? কে জানে হয়ত ভুলই শুনেছে কিম্বা কেয়াফুলেরা হয়ত বিদ্যুতের ওইরকমই বানান করে! কিন্তু কেয়াফুলের অনুরোধটা তো রাখা দরকার।

মিনু ফুলদানিটা ধরে জানলার ধারে বসিয়ে দিলে। তারপর বললে, —'পড়ে যাও যদি!'

'না পড়ব না। এই তলোয়ারের ফলাগুলো যদি একটু ফাঁক করে দাও আমি বেরুতে পারি!'

নাঃ ক্রমশঃ যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। মিনু অবাক হয়ে বললে—'তলোয়ার কোথায়? পাতা বল।'

'না পাতা হবে কেন, তলোয়ার। একটা রাজপুত্রের, একটা মন্ত্রীপুত্রের, একটা কোটালপুত্রের, একটা সদাগরপুত্রের!'

'সে আবার কি!' জিজ্ঞেস করলে মিনু, 'তলোয়ার কোথা থেকে এল?'

'বাঃ, আমায় পাহারা দিতে তারা তলোয়ার পুঁতে রেখে গেছে জানো না!'

'না তো!'

'শুনবে তাহলে?'

মিনুকে কি আর দুবার বলতে হয়। সে তাড়াতাড়ি উঠে বসে কেয়াফুলের পাতা, থুড়ি তলোয়ারগুলি সরিয়ে ধরল। ওমা। সত্যিই যে পালকের চেয়ে হাল্কা, ধোঁয়ার মত মিহি, রেশমের মত নরম, দুধের মত ওড়নায় ঢাকা, জোছনার মত সুন্দর একটি ছোট্ট মেয়ে বেরিয়ে এসে জানালার ধারে পাদুটি ঝুলিয়ে বসেছে।

মিনু অবাক হয়ে বললে, 'তুমি ছিলে ওই কেয়াফুলের ভেতরে।'

'আমি ছিলাম ওই কেয়াফুল হয়ে, কত বছর কত যুগ তুমি ভাবতেই পার না।'

'কেন? কেন?'

'সেই গল্পই তো তোমায় বলছি। বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচির দেশ জান?'

'জানি না তবে রূপকথায় যেন পড়েছি।'

'তোমরা আজকাল কি-ই বা জান।'

'বাঃ, আমাদের ভূগোলের কত দেশ আছে অদ্ভুত। চুয়ানাল্যান্ড, অ্যালাস্কা, ক্যামাস্‌ক্যাট্‌স্কা!'

'ওসব নয়, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর দেশ কোথায় বলতে পারো?'

'ও আমাদের ভূগোলে নেই।'

'তোমাদের ভূগোলে কিছু নেই?'

অন্য সময় হলে মিনু এত সহজে ভূগোলের অপমানটা হজম করত না, কিন্তু এখন তর্ক করলে গল্প শোনাটা যদি ফস্কে যায় এই ভয়ে সে চুপ করে রইল।

কেয়াফুল বললে—'সেই ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর দেশের শেষে ঘুমন্তপুরী।'

'ঘুমন্তপুরী জানি! যেখানে সবাই ঘুমিয়ে আছে, রাস্তায় লোকজন, রাজবাড়ির দরজায় সেপাই-সান্ত্রী, দরবারে পাত্রমিত্র কোটাল মন্ত্রী রাজা,

আর জলের মত পরিষ্কার স্ফটিকের ঘরে আফোটা পদ্মের নরম বিছানার ওপর ঘুমিয়ে আছে অপরূপ রাজকুমারী! তার পাশে সোনার কাঠি রুপোর কাঠি পড়ে আছে। রুপোর কাঠি ছুঁয়ে সে ঘুমিয়েছে সোনার কাঠি ছোঁয়ালে সে জাগবে। কিন্তু কে ছোঁয়াবে সোনার কাঠি। ঘুমন্তপুরী পাহারা দেয় অগুনতি রাক্ষুসী, তারা দিনে চরে বেড়ায় দেশ-বিদেশে, সন্ধ্যা হলেই কোথা থেকে দলে-দলে এসে হাজির। মানুষ তাদের চোখে দেখতে হয় না, নাকে শুঁকেই টের পায়!'

মিনু হাঁপিয়ে উঠে একটু থামল।

কেয়াফুলের মেয়ে একটু ভারী গলায় বললে, 'তাহলে তো তুমিই সব জান, আমি আবার কি বলব।'

মিনু বুঝল ভারী ভুল হয়ে গেছে, গল্প বলতে-বলতে মাঝখানে ফোড়ন দিলে ঠাকুমাই তো চটে যায়! কেয়াফুলের মেয়ে যে অভিমান করবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে।

সে খুব অপরাধীর মত বললে, 'না ভাই, আমি আর কি জানি! তোমার কাছেই তো শুনতে চাইছি।'

কেয়াফুলের মেয়ের মনটা হাজার হলেও নরম, এটুকুতেই গলে গিয়ে সে বললে, 'না-না তুমি তো অনেকটা ঠিক বলেছ, তবে তোমরা তো সব জান না, আমাদের দেশের সব ভুল খবর তোমাদের দেশে কারা রটিয়েছে কে জানে!'

উৎসাহভরে মিনু সায় দিয়ে বললে, 'তা হতে পারে। বাবা বলেন, খবরের কাগজেই রোজ কত ভুল খবর বেরোয়, যদুর ধড়ে রামের মাথা বসিয়ে, বাবা বলেন, তারা রামযদু তৈরি করে।'

কেয়া বললে, 'তবে! তোমাদের নিজেদের খবরেই যদি এত ভুল তাহলে আমাদের কথা তোমরা আর ঠিক কি করে জানবে। ঘুমন্তপুরীতে কোথা থেকে এল এত ঘুম তা জান?'

মিনু যা জানত তা বললে হয়ত আবার কেয়া রাগ করবে। তাই সে সাবধান হয়ে বললে—'না, তো।'

'ঘুমন্তপুরীতে একলা কে জাগে। তাও জান না?'

মিনু অবাক হয়ে বললে—'কই না।'

'একলা জাগে রাজকন্যা নিজে। পুরীর মানুষ ঘুমে অসাড়, পুরীর পাথর ঘুমে অঢুল, শুধু ঘুম নেই রাজকন্যার একচোখে।'

'একচোখে। সে আবার কি!'

'সেই তো গল্প। একদিন রাজপুরী ছিল জমজমাট। পথে হৈ-হৈ রৈ-রৈ, ঘরে-ঘরে লোক থই-থই, রাজপুরী গম-গম করে রাতদিন। হঠাৎ একদিন রাজকন্যা বাগানে গিয়ে, না-জানি ফুলের দো-দানি পাতা ছিড়ে বসল।'

'তাতে কি?'

'বলছি তো শোন না।'

'না জানি ফুলের দো-দানি পাতা তো শুনিনি কখনো।' বলে ফেলেই মিনু বুঝল কাজটা ভাল হয়নি। কেয়া-মেয়ের ঠোঁট তখনই ফুলছে।

'অত খিচ্ খিচ্ করলে গল্প হয় না।'

মিনু তাড়াতাড়ি শুধরে নিয়ে বললে—'না, না, এইবারটি মাফ করো, আর বলব না।'

কেয়া অবশ্য তখ্‌খুনি খুশি হয়ে বলতে শুরু করলে, —'পাতা তো নয়, জ্যোছনা রাতের দুই পরী দিনেরবেলা গলা জড়াজড়ি করে পাতা হয়ে ঘুমিয়ে ছিল। ছিঁড়ে তারা মাটিতে পড়ল, মাটিতে পড়ে শামুক হল, শামুক হয়ে শাপ দিলে—'

'শামুক হল কেন?'

'বাঃ, দিনেরবেলায় কেউ ছুঁয়ে দিলেই ভাঙা চাঁদ পুরন্ত না হওয়া অবধি পরীদের যে শামুক হয়ে কাটাতে হয়। কোথায় চাঁদের হালকা পাখায় উড়ে বেড়াবে মনের খুশিতে না শামুক হয়ে মাটির ওপর গুটি-গুটি নড়তে হবে। পরীদের রাগ তো হবেই।

তারা শাপ দিলে—এক ছিলাম দুই করলি, দিনে ছুঁয়ে ঘুম ভাঙালি, দু'চোখের পাতা তোর এক হবে না!

রাজকন্যা কাঁদতে-কাঁদতে ঘরে ফিরল। শাপের কথা শুনে রানী কাঁদেন, রাজা কাঁদেন, রাজ্যসুদ্ধ লোক কাঁদে। রাজকন্যার চোখে আর ঘুম নেই। দিন যায়, হপ্তা যায়, পক্ষ যায়, মাস যায়, রাজকন্যা দু'চোখের পাতা আর এক করতে পারে না। রাজা বৈদ্য ডাকলেন, রোজা ডাকলেন, কত শান্তি-

স্বস্ত্যয়ন-যাগযজ্ঞ করলেন। রাজকন্যার চোখে আর ঘুম আসে না।

শেষে রাজা দেশ-বিদেশে ঢেঁড়া দিলেন, রাজকন্যাকে ঘুম পাড়াতে পারলে মস্ত বখশিশ।

বখশিশের বহর বেড়ে চলল। মোহরের থলের বদলে মণিমুক্তো, মণিমুক্তোর জায়গায় হীরে-মাণিক কিন্তু কেউ রাজকন্যাকে ঘুম পাড়াতে পারলে না। কত গুণী এল ওঝা এল, নামের চেয়ে উপাধি বড় বৈদ্য এল, রাজকন্যার হয়রানিই সার। কেউ সারাদিন-রাত মন্ত্র পড়ে। কেউ হরেক রকম খাওয়ায়, রাজকন্যা তবু ঘুমের উপোসী। দিনে-দিনে রাজকন্যা শুকিয়ে কাটিটি হয়ে গেল।

রানীর চোখে জল শুকোয় না, রাজা ভেবে সারা। বলেন অর্ধেক রাজত্ব দেব মেয়ে যদি ঘুমোয়। এমন সময় রাজপুরীর টিকারায় ঘা।

কে আসে, কে আসে! নিশুতি নগরের মস্ত গুণী আসে। কিন্তু বড় বেশি তার খাঁই। অর্ধেক রাজত্বে তার কাজ নেই, ঘুম পাড়িয়ে স্বয়ং রাজকন্যাকে সে চায়। তাও বড় সহজ শর্তে নয়। —নিশুতি রাতে একলা আসবে, রাজকন্যার ঘরে একলা জাগবে। চোখে যদি কেউ চেয়ে দেখে তা হলে আজীবন তার অনিদ কাটবে, আর সমস্ত পুরীর ঘুম আর যুগ-যুগান্তরে ভাঙবে না।

রাজা অনেক ভাবলেন, অনেক চিন্তা করলেন। কিন্তু উপায় তো আর নেই। রাজি তাঁকে হতেই হল।

নিশুতি রাতে রাজপুরীতে টুঁ শব্দটি নেই। সবাই আছে যে যার ঘরে চোখ বুজে। দেউড়িতে পায়ের আওয়াজ, পায়ের আওয়াজ স্ফটিকের সিঁড়িতে। রাজকন্যার বুক কাঁপছে পালঙ্কে শুয়ে। পায়ের আওয়াজ ঘরের কাছে। রাজকন্যা চোখ বুজল। পালঙ্কের পাশে খস্‌খস্‌ ফোঁসফোঁস, কার বুঝি ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ।

'রাজকন্যা, চোখ যেন খুলো না।'

না রাজকন্যা চোখ কিছুতে খুলবে না। ঘরে কিসের ঠাণ্ডা মিষ্টি গন্ধ, গন্ধ নয় বুঝি ঘুমেরই ঘোর, নিঃশ্বাসে-নিঃশ্বাসে ঝিমিয়ে আসে গা, ঘুমের সাগর উথলে উঠছে, ঢেউ গেল কোমর ছাড়িয়ে, হিমের মত ঠাণ্ডা ঢেউ গলার কাছে খেলা করে, রাজকন্যার সকল দেহ এলিয়ে পড়ে হিমেল

ঘুমের ঢেউ এগিয়ে আসে।

'রাজকন্যা চোখ খুলো না।'

কিন্তু রাজকন্যা আর কি পারে! দুটি-চোখ ঘুমে এসেছে জড়িয়ে, কার সঙ্গে বিয়ে হতে যাচ্ছে একবার না দেখে যে থাকা যায় না।

রাজকন্যা একটি চোখ বুজে একটি চোখ খুলে তাকাল। সঙ্গে-সঙ্গে বুকের রক্ত হিম। রাজকন্যা আঁতকে উঠে চিৎকার করলে।

আঁতকে উঠল কি সাধে। মেঝেয় কুণ্ডুলি পাকিয়ে ছাদ পর্যন্ত বিরাট ফণা তুলে অজগরের রাজা নাগেশ্বর তার দিকে তাকিয়ে আছে।

চোখাচোখি একপলক শুধু, হঠাৎ ঘরের বাতি নিভল। জানলা-দরজা আছাড় খেল ঝড়ের দাপটে।

অন্ধকারে শোনা গেল শুধু দারুণ স্বর—

'যে চোখে দেখেছ, সে চোখে জাগবে,

নিঝুম পুরীর ঘুম আর না ভাঙবে।'

রাজকন্যা কেঁদে ফেলে বললে, 'আর কি তবে উদ্ধার নেই?'

অট্টহাসির সঙ্গে শোনা গেল, 'আছে যদি আমার রানী হও এখন।'

রাজকন্যা শিউরে উঠে বললে—'না না! সে হয় না!'

—'তবে যেমন আছ তেমনি থাক, যতদিন না—

জলের তলায় আগুন জ্বলে,

সে আগুনে শিলা গলে।'

সঙ্গে-সঙ্গে অট্টহাসি শোনা গেল।

সেই থেকে রাজকন্যা একচোখে জেগে কাটায়, রাজপুরীর ঘুম আর ভাঙে না।

রাজকন্যা জানে উদ্ধার আর নেই। জলের তলায় আবার আগুন কেউ জ্বালতে পারে নাকি! আর পারলেও এ ঘুমন্তপুরীতে আসছে কে!

মাস যায়, বছর যায়, ঘুমন্তপুরী জড়িয়ে ওঠে কাঁটালতার জঙ্গল। ভয়ে সেখানে কেউ ঘেঁষে না?

মিনু এতক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে গল্প শুনছে, এইবার উৎসুক হয়ে বললে, 'কেন রাজপুত্র কোথায় গেল?'

কেয়াফুল একটু চুপ করে থেকে বললে, 'কোথায় আর যাবে। রাজপুত্র

সবে পথে বেরিয়েছে, দুয়োরানীর ছেলে বলে সুয়োরানী রাতদিন দূর-দূর করেন, রাজা চোখে দেখেও কিছু করতে পারেন না। মনের দুঃখে রাজপুত্র ঘোড়াশাল থেকে ঘোড়া খুলে নিয়ে নিশুতি রাতে যেদিকে দুচক্ষু যায় বেরিয়ে পড়েছে। দুচক্ষু আর কোথায় যায়। পুরীর বাইরে মশান, রাজপুত্র সেইদিকে চলেছে। মশানের মাঝে পথ আগলে কোটালপুত্র দাঁড়িয়ে।

'কোথায় যাবে বন্ধু?'

'যেদিকে দুচক্ষু যায়।'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব।' রাজপুত্রের কোন মানা না শুনে কোটালপুত্র সঙ্গে চলে। মশান ছাড়িয়ে শ্মশান, সেখানে দুই বন্ধু দাঁড়িয়ে—মন্ত্রীপুত্র আর সদাগরপুত্র। কোন মানা তারা শুনল না। রাজপুত্রের সঙ্গে তারা দেশান্তরী হবেই।

শ্মশানে দাঁড়িয়ে চিতার আগুন সাক্ষী করে চারবন্ধু প্রতিজ্ঞা করলে, জীবনে-মরণে তাদের ছাড়াছাড়ি হবে না।

তারপর চারবন্ধু কত দেশ, কত বন, কত পাহাড় ডিঙিয়ে চলে, পেছন ফিরে আর তাকায় না।

শেষে একদিন ঘুরতে-ঘুরতে...

মিনু তাড়াতাড়ি বললে, —'ঘুমন্তপুরী!'

কেয়াফুল অবাক হয়ে বললে —'কি করে বুঝলে? আমি তো বলিনি।'

মিনু গম্ভীর হয়ে বললে—'আমি ওসব বুঝতে পারি।'

কেয়াফুল বোধহয় খুব অবাক হয়েছিল। সে খানিক চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করলে—'ঘুমন্তপুরীর সে কি হাল। তার দেওয়াল টলমল, পড়ে-পড়ে, তার ঘরদোর জঙ্গল-ঝোপে-ঝাড়ে।

তবু রাজপুত্রের কেমন সখ—ভেতরে যাবে। বন্ধুরা মানা করে, রাজপুত্রের সেই এক গোঁ। কি আর করে, চার বন্ধু মিলে তলোয়ারে জঙ্গল সাফ্ করতে করতে ভেতরে ঢুকল। যেদিকে চায় জানালা-দরজা খসে পড়েছে, ছাদ-দেওয়াল ধসে পড়েছে। তারই ভেতর ঘরে-ঘরে মরা মানুষ।

কি আশ্চর্য! মরা তো নয় জ্যান্ত মানুষ! মরা হলে কবে পচে খসে যেত। জ্যান্ত মানুষ ঘুমিয়ে আছে অঘোর ঘুমে।

চারবন্ধু এক-এক করে সব ঘর-দালান ঘুরে ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে

ওঠে। ঘরের পর ঘর ঘুরতে ঘুরতে—'

মিনু বললে, 'রাজকন্যার ঘরে—'

কেয়া বললে—'তুমি তো ঠিক ধরতে পার! রাজকন্যা একচোখে ঘুমায় আর একচোখে জাগে, ঘরের ভেতর চার বন্ধুকে দেখে অবাক! ঘুমের চোখে স্বপ্ন, না, জাগার চোখে সত্যি দেখছে ভেবে পায় না।

চারবন্ধু তো অবাক। মণি-মাণিক্যে পালঙ্কে পরমা সুন্দরী রাজকন্যা একচোখে চেয়ে আছে—এ আবার কে!

রাজপুত্র এগিয়ে গিয়ে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললে, 'অনেক দেশে বিদেশে ঘুরেছি, এমন পুরী দেখিনি। কেন তোমাদের এমন দশা?'

ঘুমের চোখে স্বপ্ন নয়, জাগার চোখে সত্যি দেখা!

রাজকন্যা চমকে উঠে বললে, —'সে কথা শুনে কাজ নেই, নাগেশ্বরের পুরী অজগর পাহারা, এক্ষুনি পালাও নইলে মারা পড়বে।'

চারবন্ধুর তবু জেদ, সব কথা না শুনে তারা যাবে না।

কি আর করে, রাজকন্যা দুচার কথায় সব বুঝিয়ে দিলে। বলতে-বলতে গাল বেয়ে একফোঁটা চোখের জল পড়ল।

চারবন্ধু বললে—'কেঁদো না রাজকন্যা। আমরা তোমায় উদ্ধার করব।'

রাজকন্যা দুঃখের হাসি হেসে বললে—'আমার উদ্ধার হবে না। জলের তলায় আগুন জ্বলবে, সে আগুনে শিলা গলবে, তবে আমার উদ্ধার। সে তো আর হবার নয়।'

রাজপুত্র খানিকক্ষণ চুপ করে কি ভেবে নিয়ে হেসে বললে—'এই কথা। এ আবার শক্ত কি! তোমার উদ্ধার হয়ে গেছে তাহলে।'

রাজকন্যা বড় দুঃখেও হেসে ফেললে রাজপুত্রের কথায়। রাজপুত্রের কাণ্ড দেখে আরো অবাক।

ঘরে ছিল স্ফটিকের পাত্র। রাজপুত্র তাতে জল ভরল। কোটালপুত্রকে বললে, হাতে করে ধরে থাক। তারপর শুকনো ঘাসপাতা কুড়িয়ে আনলে মন্ত্রীপুত্র। সদাগরপুত্র চকমকি ঠুকে স্ফটিকের পাত্রে তলায় আগুন জ্বাললে। ঘরে ছিল বাতিদানে মোমের বাতি, রাজপুত্র খুলে নিয়ে সে আগুনে গালিয়ে ফেললে।

কাণ্ড দেখে রাজকন্যা হেসেই খুন। হাসতে-হাসতে রাজকন্যা উঠে

বসল। বসে বললে, —'এতেই যদি শাপ খসে যেত।'

'খসে যেত কি, গেছে তো!'

তাই তো! অবাক কাণ্ড! রাজকন্যা হাসতে-হাসতে যে উঠে বসেছে। শুধু কি রাজকন্যা। পুরীর লোকজন সবাই উঠে বসে অবাক!

থমথম পুরী গমগম করে উঠল। রাজকন্যা পালঙ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ রাজকন্যার মুখের হাসি গেল মিলিয়ে। পুরীর চারিধারে হিসহিস, ফোঁস-ফাঁস, হাওয়ায় ভেসে আসে হিমেল নিঃশ্বাস!

নাগরাজ ক্ষেপে আসছে ছুটে, সঙ্গে তার সাঙ্গপাঙ্গ।

'পালাও বন্ধুরা পালাও।' রাজকন্যা চেঁচিয়ে উঠল।

'যদি যেতে হয় তোমায় সঙ্গে না নিয়ে যাব না!'

চারবন্ধু রাজকন্যার হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। বাইরে চারবন্ধুর ঘোড়া বাঁধা। রাজপুত্র রাজকন্যাকে নিয়ে উঠল নিজের ঘোড়ায়। পিছনে তিনবন্ধু। ঘোড়া ছুটছে হাওয়ার আগে। মাঠ-বন-জঙ্গল-পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে চারবন্ধু চলেছে রাজকন্যাকে নিয়ে। কিন্তু কতদূর আর যাবে। নাগরাজের মায়ার তো শেষ নেই। তার হাত থেকে কি নিস্তার আছে। দেখতে-দেখতে তেপান্তরের মাঝে অকূল নদী জেগে উঠল পথ রুখে। ফেরাও ঘোড়া, ফেরাও ঘোড়া, ফেরাবে আর কোথায়! পেছনে নাগরাজের চর-অনুচর নাগনাগিনী ছুটে আসছে, সামনে অকূল নদীতে দুরন্ত বান।

'কি হবে রাজপুত্র?'

চারবন্ধু রাজকন্যাকে নিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে।

'ভয় নেই রাজকন্যা তোমায় আমরা রক্ষা করব।'

চারবন্ধু রাজকন্যাকে ঘিরে দাঁড়াল। খাপ থেকে তলোয়ার খুলে মাটিতে গেঁথে রাজপুত্র বললে, 'এই রইল তোমার চিরদিনের পাহারা।' মন্ত্রীপুত্র, সদাগরপুত্র, কোটালপুত্রও নিজের-নিজের তলোয়ার খুলে চারধারে পুঁতে দিলে।

'নির্ভয়ে থাক রাজকন্যা, এ তলোয়ারের বেড়া ডিঙোবার সাধ্য কারুর নেই।'

রাজকন্যা কেঁদে উঠে বললে, 'কিন্তু তোমাদের কি হবে?'

'আমাদের?' চারবন্ধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। মন্ত্রীপুত্র বললে—

'আমি পবনমন্ত্র জানি, ঝড় হয়ে বইব।' কোটালপুত্র বললে, 'আমি মেঘমন্ত্র জানি, মেঘ হয়ে আকাশ ছেয়ে দেব। সদাগরপুত্র বললে—'আমি বরুণমন্ত্র জানি বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ব।'

আর রাজপুত্র।

রাজপুত্র বললে—'আমি বিদ্যুৎমন্ত্র জানি, বজ্র হয়ে জ্বলে উঠব। শোন রাজকন্যা আমাদের একসঙ্গে দেখা না পেলে মুখ তুলো না।'

মিনু প্রায় চুপি-চুপি বললে—'তুমি বুঝি সেই রাজকন্যা?'

'আমিই সেই রাজকন্যা ঘুমন্তপুরীর। নাগেরা আমায় ঘিরে থাকে তবু তলোয়ারের বেড়া ডিঙোতে পারে না। চারবন্ধু যেদিন একসঙ্গে দেখা দেয় সেদিন আমি মুখ তুলে চাই, গন্ধে জানাই মনের কথা।'

কড় কড় কড়াক্কড়! হঠাৎ শব্দে মিনু চমকে জেগে উঠে বসল বিছানায়। ওমা! কোথায় গেল রাজকুমারী! কোথাও কেউ যে নেই!

কেয়াফুলের গন্ধে ঘর শুধু আমোদ হয়ে গেছে।

আমার কথাটি ফুরালো

প্রবোধকুমার সান্যাল
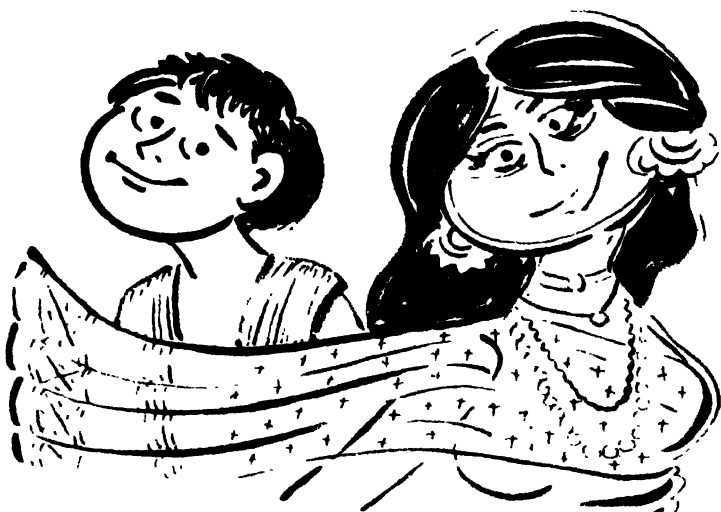
এক চাষার এক ছেলে ছিল। ছেলেটি ছাড়া সংসারে আর কেউ ছিল না। ছেলের নাম নবকুমার। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে নবকুমারের সমান সে দেশে আর কেউ ছিল না।

কিন্তু বড় গরিব। চাষ-আবাদ করে মহাজনের দেনা দিয়ে আর কিছুই থাকে না যে ভবিষ্যতের সংস্থান হতে পারে। পিতাপুত্রে সে জন্যে ভারি মনোকষ্টে থাকে।

একদিন নবকুমার ধানের ক্ষেতে কি কাজে যেন গিয়েছিল। দেখলে দু'জন সখীকে নিয়ে সে দেশের রাজকন্যা নদীতে স্নান করতে চলেছে। নবকুমারকে দেখে রাজকন্যা বলল—আচ্ছা, চাষার পো, হাওয়া নেই তবু ধানের শিষ দুলছে কেন বলতে পার?

নবকুমার খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল—আনন্দে! রাজকন্যাকে দেখে আনন্দে ওরা দুলছে, ওরা তো আর কথা বলতে জানে না।

রাজকন্যে হাসতে-হাসতে সখীদের নিয়ে চলে গেল।

এরপরে প্রায়ই রাজকন্যার সঙ্গে নবকুমারের দেখা হয়। একদিন রাজকন্যা সখীদের বলল—নবকুমার ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করব না।

সখীরা গালে হাত দিয়ে বসল।

খবর গেল রাজার কাছে। রাজা বললেন—এতবড় স্পর্ধা। চাষার ছেলে হয়ে আমার মেয়েকে বিয়ে করবার সাধ? কখনই না! দেবনগরের যুবরাজের সঙ্গে আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেব। আজ থেকে আমার মেয়ের নদীতে স্নান করতে যাওয়া বন্ধ।

রাজকন্যা ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে রইল। চাষার ঘরে এ দিকে খবর এল। রাজা বলে পাঠলেন—পাতার ঘরে যাদের বাস, যারা দিনমজুর, অন্নবস্ত্রের সংস্থান যাদের নেই, তারা কি আমার কন্যাকে তাদের ঘরে নিয়ে যেতে চায়? বেশি বাড়াবাড়ি করলে নবকুমারকে শূলে দেওয়া হবে।

বুড়ো চাষা ভয়ে কাঁপতে লাগল।

এমনি করে দিন যায়। দেবনগরের যুবরাজের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহের কথাবার্তা চলতে থাকে।

হঠাৎ একদিন শোনা গেল, রাজবাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেছে। হাতিশালার হাতি, ঘোড়াশালার ঘোড়া, গোশালার গরু আর একটিও নেই।

চারিদিকে হৈ-হৈ পড়ে গেল। এত প্রহরী, এত কোতোয়াল থাকতে চোখে ধুলো দিয়ে এতবড় চুরি কে করল? তার কি মরণের ভয় নেই? রাজা হুকুম দিলেন—ডাকাত যে ধরে দেবে, সে একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার পাবে।

অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চারিদিকে লোকজন চুটল। সবাই সন্দেহ করল—এ নবকুমারের কাজ। সে ছাড়া আর কেউ নয়। নবকুমারকে ধরতে গিয়ে দেখে সে ঘরে নেই—পালিয়েছে।

পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বন-জঙ্গল পার হয়ে হাজার হাজার লোক নানা দলে বিভক্ত হয়ে সেই রাজ্যময় ঘুরে-ঘুরে নবকুমারকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। নগর-কোতোয়াল যদি ডাকাতকে ধরে দিতে না পারে তাহলে তার গর্দান যাবে।

খুঁজতে-খুঁজতে তারা দেবনগরে এসে পড়ল। এসেই শুনলে সে রাজ্যের

রাজকোষ থেকে প্রায় পঁচিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা চুরি গেছে! তারাও ডাকাতকে খোঁজবার জন্যে বহু লোকজন পাঠিয়েছে!

নগর-কোতোয়ালের দল ছুটে-ছুটে আসছিল। পথে এক দর্জির সঙ্গে দেখা। সবাই জিজ্ঞাসা করল—এপথে কোনও ডাকাতকে দেখেছ? শিগগির বল!

দর্জি হাত-পা নেড়ে কেঁদে বলল—হ্যাঁ দেখেছি বাবুমশাই, আমার যথাসর্বস্ব সে কেড়েকুড়ে নিয়ে গেছে, ওই যে ওই পথে একটু আগে চলে গেল।

দর্জিকে দশটি মোহর পুরস্কার দিয়ে সবাই সেইদিকে ছুটল।

তার পরদিন শহরের পথে আর একদল প্রহরী দেখা গেল। যে-পথে তারা আসছিল, সেই মোড়ে এক সাধু আস্তানা পেতে ধুনি জ্বালিয়ে বসেছিল। তারা এসে বলল—সাধুজি! ডাকু কোনদিকে গেছে জান?

সাধু বলল—নবকুমার তার নাম?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোনদিকে গেছে বলতে পার?

হাঁ পারি, সে ছেলেটা দর্জি সেজে বেড়াচ্ছিল, ওই পথে গেছে, শিগগির যাও।

দলে-দলে অমনি তারা সেইদিকে ছুটে গেল।

দর্জির ছদ্মবেশে নবকুমারকে ধরবার জন্য দু'দিন দু'রাত চেষ্টা করল। অনেক দর্জি ধরা পড়ল, কিন্তু নবকুমার তাদের মধ্যে একজনও নয়। আবার সবাই ছুটল। পথে খবর পাওয়া গেল, অমুক পথের মোড়ে যে সন্ন্যাসী আস্তানা পেতে বসেছে, সেই হচ্ছে নবকুমার!

চারিদিকে 'ধর ধর' রব পড়ে গেল। কিন্তু সেই পথের মোড়ে সেই সন্ন্যাসীকে আর পাওয়া গেল না। তার বদলে অনেক সন্ন্যাসীকে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হল।

দেবনগর রাজ্যে ভীষণ অশান্তি আরম্ভ হল।

খুঁজতে-খুঁজতে সবাই নদীর ধরে এল। এক মাঝি তার খেয়ানৌকো তীরে বেঁধে বসে তামাক খাচ্ছিল। সবাই বলল—মাঝি, এক সন্ন্যাসীকে এদিকে দেখেছ?

তামাকের হুঁকো রেখে মাঝি বলল—জানি, সন্ন্যাসীটাকে চোর বলে মনে হল।

কেন বলত?

অনেক টাকা তার কাছে। অনেক! এইমাত্র ওপারে গেছে।

সবাই বলে উঠল—মাঝি, তুমি যা চাও তাই দেব, শিগগির আমাদের পার করে দাও।

দশজন লোককে মাঝি পার করে দিয়ে এল। পুরস্কার-স্বরূপ পেল দশটি মোহর! আহা গরিব লোক! কিন্তু মাঝি লোকটা যে ছদ্মবেশে নবকুমার হতে পারে এ কথা তখন কারও মাথায় এল না।

এদিকে রাজকন্যার দিন তেমনি করে কাটে। দেবনগরের রাজকুমার মাঝে-মাঝে ও রাজার রাজ্যে বেড়াতে যান। বিয়ে করবার জন্যে রাজকন্যাকে ও রাজাকে তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন। রাজা বলেছেন, তোমাকে ছাড়া আর কারও সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব না!

রাজকুমার বললেন—তাহলে আর দেরি কেন?

রাজকন্যার কাছে খবর গেল। সখীকে দিয়ে রাজকন্যা সংবাদ পাঠালে—আর অল্প কয়েকদিন সে কুমারী থাকতে চায়।

অল্প কয়েকদিন পরে রাজপুত্র অধীর হয়ে রাজকন্যাকে আবার খবর পাঠালেন। তখন সখীদের সঙ্গে নিয়ে দরবারে বেরিয়ে এসে রাজকন্যা রাজাকে বলল—মহারাজ?

রাজা বললেন—দরবারে কেন মা, মণিমালা?

মণিমালা বলল—আমার প্রার্থনা, এই দেবনগরের যুবরাজ যদি ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে আমার কাছে আনতে পারেন, তবেই তাঁকে আমি বিবাহ করব।

রাজা বললেন—তথাস্তু।

দেবনগরের যুবরাজ বললেন—এ অতি সামান্য কথা। অতি শীঘ্রই আমি ডাকাতকে ধরে আনছি।

লোক-লস্কর নিয়ে যুবরাজ মহাসমারোহে বেরিয়ে পড়লেন।

ডাকাতকে ধরবার জন্য চারিদিক একাকার হয়ে গেল। সবার মুখে

একই কথা—ডাকাতকে না গ্রেপ্তার করে তারা আর কেউ জলগ্রহণ করবে না!

বড়-বড় পুরস্কার ঘোষণা হয়ে গেল।

কোতোয়ালের দল, যুবরাজের দল, রাজার দল, মন্ত্রীর দল দেশ-বিদেশ, পথে-বিপথে ছোটাছুটি করতে লাগল। নদীর তীরে-তীরে তাঁবু পড়ল, মাঠে-মাঠে ঘাঁটি বাঁধা হল, দিকে-দিকে প্রহরী-পাহারা বসে গেল। ডাকাতকে ধরা চাই-ই-চাই। রাতেরবেলা মশাল জ্বালিয়ে সবাই অনুসন্ধান করে। পাহাড়ের ধারে, বনের কিনারায়, সমুদ্রের তীরে—কিন্তু কোথাও নবকুমারের দেখা পাওয়া যায় না।

যুবরাজ লোক-লস্কর নিয়ে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যেখানেই যান শুনতে পান সে দেশে ভয়ানক চুরি হয়ে গেছে। তারাও ডাকাতকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। প্রহরীর সংখ্যা বাড়ে, কিন্তু কোথায় ডাকাত?

সেদিন ক্লান্ত হয়ে যুবরাজ তাঁবুতে ফিরে এলেন। এসে দেখেন, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সবাইকে জাগাতে যান, কিন্তু কেউ জাগে না! সবাই অজ্ঞান হয়ে আছে।

জ্ঞান হতে সকলে উঠল, উঠে দেখে তাঁবুর ভেতর থেকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র চুরি গেছে। লাঠি-সোঁটা, ছোরা-ছুরি, তরোয়াল-বর্শা, তীর-ধনুক আর নেই। যুবরাজ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। এরকম ভোজবাজি হতে থাকলে রাজকন্যাকে তিনি কেমন করে বিবাহ করবেন।

প্রহরীদের জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন করে তোমরা অজ্ঞান হয়ে গেলে?

কোন উত্তর দিতে পারে না তারা। যুবরাজ তখন বললেন—বুঝেছি, কনকলতার শেকড় কেউ তোমাদের কাছে এনে ধরেছিল। তোমরা ঘুমিয়ে ছিলে বুঝি?

সবাই বলল—যুবরাজের কথাই সত্যি!

রাজকুমার আবার উৎসাহের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চয় করতে মনোনিবেশ করলেন। ক্রোধে অন্ধ হয়ে তিনি সবাইকে জানিয়ে দিলেন, ডাকাতকে ধরে তার ছিন্নমুণ্ড নিয়ে রাজকন্যার কাছে যাবেন। দলবল সঙ্গে নিয়ে তিনি আবার ডাকাতের সন্ধানে বেরোলেন। কিছুদূরে গিয়ে শুনতে পেলেন, রাজপুত্রের ছদ্মবেশে নবকুমার সবার চোখে ধুলো দিয়ে ডাকাত অনুসন্ধান

করবার ছল করে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে।

যুবরাজ বললেন—কোনদিকে?

তারা বলল—ওই যে জঙ্গলটা দেখছেন, ওইটা পার হয়ে গেলে একটা সরাইখানা পাওয়া যাবে। তার বাঁদিকে একটা রাস্তা চলে গেছে নদীর ধারে। সেদিকে না গিয়ে ডানহাতি রাস্তায় সোজা চলে গেলে পাহাড়ি পথ। সেই পথে ঘোড়ায় চড়ে নবকুমারকে একটু আগে যেতে দেখা গেছে।

যুবরাজ তার লোক-লস্করকে বললেন—তোমরা এই জঙ্গলের ধারে আমার জন্য অপেক্ষা কর, আমি হরিণ শিকারের নাম করে গিয়ে নবকুমারকে হত্যা করে আসব।

সবাই অপেক্ষা করতে লাগল।

রাজপুত্র একাই চলে গেলেন! ঘোড়ার পায়ের ধুলো উড়ে সব অন্ধকার হয়ে গেল।

ঘোড়ায় চড়ে রাজকুমার চলেছেন। গভীর জঙ্গল। বেলা পড়ে এল। সূর্য অস্ত গেল। রাজপুত্র চলেছেন। ক্রমে রাত হয়ে এল। অন্ধকারে বনের পথ আর চেনা যায় না, তবু রাজপুত্রের চলনের আর বিরাম নেই।

বহুদূর পর্যন্ত গিয়ে সামান্য আলোকে দেখা গেল, একজন ব্যাধ একটা নেকড়ে বাঘ ও দুটো ঘুঘুপাখি শিকার করে এই পথে আসছে। রাজপুত্রকে দেখে সে হেঁট হয়ে প্রণাম করে ঘুঘুপাখিদুটো উপহার দিতে চাইল।

রাজপুত্র বললেন—থাক ও আমি চাইনে। তুমি এইপথে কোন লোককে ঘোড়ায় চড়ে যেতে দেখেছ?

সে লোকটা বোকার মতো খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। কথাটা ভাল করে সে বুঝতে পারেনি ভেবে রাজপুত্র আর একবার তাকে কথাটা বললেন। তখন সে বলল—বিকেলবেলায় একজন কে ঘোড়ায় চড়ে এদিক দিয়ে যাচ্ছিল বটে। আবার সে এখনই আসবে। অপেক্ষা করলে রাজপুত্র তাকে দেখতে পাবেন।

ঘোড়া থেকে নেমে যুবরাজ তাড়াতাড়ি বললেন—ভাই, তুমি আমার পোশাক পরো, আর তোমার ওই ছেঁড়া কাপড়-চোপড়গুলো আমায় পরতে দাও। আমি তোমার ছদ্মবেশে এখানে অপেক্ষা করে থাকি আর তুমি আমার ঘোড়া আর পোশাক নিয়ে আমার তাঁবুতে চলে যাও। তোমার

পায়ে পড়ি ভাই, আমার কথাটা রাখো। অনেক টাকা পুরস্কার পাবে।

ব্যাধ রাজি হল। নিজের ছেঁড়া কাপড়গুলো দিয়ে সে যুবরাজের পোশাক পরল।

যুবরাজ বললে—ঘোড়ায় চড়তে জানো তো?

একটু-একটু জানি।

বেশ।

ঘোড়ার ওপর উঠে ব্যাধটা বনের অন্ধকার পথে অদৃশ্য হয়ে গেল। যুবরাজ সেই ব্যাধের শতছিন্ন জীর্ণ-পরিচ্ছদটি পরে গাছের পাশে লুকিয়ে

ঘোড়ার চড়ে ব্যাধটা রাজকন্যার দেশে এল। রাজবাড়িতে প্রবেশ করবার সময় দেবনগরের যুবরাজ ভেবে কেউ তাকে বাধা দিল না। রাজকন্যা গোপনে জানতে পারল, নবকুমার এসেছে। সে বেরিয়ে এল।

ঘোড়াশালা থেকে আর একটি ঘোড়া নিয়ে রাজকন্যা তার উপর চড়ল।

পাশাপাশি দু'টি ঘোড়ায় চড়ে রাজকন্যা আর নবকুমার নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

তারপর?

গোপনে নবকুমার দূর দেশে রাজ্যস্থাপন করেছিল। অনেকবার তাকে ডাকাতি করতে হয়েছিল। পরে যুদ্ধে নবকুমার জয়লাভ করে রাজ্যের নাম দিল 'চোরাবাগ!'

তারপর?

তারপর আর কি! আমার কথাটি ফুরালো।

মধুমালতী

লীলা মজুমদার

বহুদিন আগেকার কথা, যখন আজকাল যা, যা, ঘটে থাকে সে সমস্তই ঘটত, তখনকার কথা।

রানীমা বড় রাজকন্যে, মেজ রাজকন্যে আর মাসতুতো বোন মধুমালতীকে ডেকে বললেন 'পরীদিদি আসছেন অতিথি হয়ে, দেখিস্ তাঁর যেন অমর্যাদা না হয়। যেন আবার অপমান হয়ে রেগেমেগে শাপখোপ দিয়ে না বসেন। জানিস তো বাছারা রাজকোষ গড়ের মাঠ, উজির-নাজিরদের তিনমাসের মাইনে বাকি, জাহাজঘাঁটির জাহাজ সব চাঁচাপোঁছা, মহারাজের লাল পাথর বসান মুকুটটা পর্যন্ত থিয়েটার কোম্পানিকে বাঁধা দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু তোদের কারুরই বিয়ে হয়নি। হবার বিশেষ লক্ষণও দেখি না। তাই বলি যার পরীদিদি নেই, তা'র কেউ নেই।'

বড় রাজকন্যে, মেজ রাজকন্যে রেগে বললেন, 'কেন আমাদের বিয়ে হবে না? আমরা রাজার মেয়ে, আমাদের রূপগুণ কোনটা কম শুনি? বিয়ে না হয়, তো ঐ মধুমালতীর না হতে পারে। রান্নাঘরে দিন কাটে, চোখমুখে ঝুলকালি, না আছে একটা ভালো শাড়ি, না আছে একটা ভালো গয়না।

মাগো কি ঘেন্না।'

মধুমালতী চোখ নিচু করে রানীমার পায়ের দিকে চেয়ে রইল।

রানীমা বললেন, 'ছি, ছি গরিব মানুষকে টিটকিরি দিতে নেই। খেতে পেত না, পরতে পেত না, তাই ঘরে ঠাঁই দিয়েছি, তাই নিয়ে আর খোঁটা দিস নে। তোমাকেও বলি বাছা, তোমার ভরসাতেই খানসামা তাড়ালাম, তা রান্নাবান্নাগুলো যদি একটু মনের মতো হয়! পরীদিদি কী যে মনে করবেন কে জানে!'

মাসতুতো বোন মধুমালতী তবু চোখ নিচু করে চুপ করে রইল।

বড় রাজকন্যে বললেন, 'আমরা তো পরীদিদিকে নেমন্তন্ন করিনি তবু কেন আস্‌ছেন?'

মেজ রাজকন্যে বললেন, 'যেচে যখন আসছেন, যেরকম ব্যবহার করবেন, সেইরকম ব্যবহার পাবেন।'

বড় রাজকন্যে শুধোলেন, 'পরীদিদির কি অনেক সোনাদানা হীরে-মুক্তো আছে? তিনি কি চার ঘোড়ায় টানা জুড়িগাড়ি চড়ে আসবেন? সঙ্গে কি একশ দাসদাসী আসবে? একশ উটের পিঠে চাপিয়ে কি তিনি আমাদের জন্য উপহার আনবেন?'

রানীমা গালে হাত দিয়ে বললেন, 'ওমা! বলে কি! একশ উট থাকবে কোথায়? পশুশালা তো সার্কাস কোম্পানি ভাড়া নিয়েছে। একশ দাসদাসী খাবে কি? তোরাই তো দিনরাত খাই-খাই করিস। তোমাকেও বলি বাছা মধুমালতী খাবারদাবারগুলো না হয় বিশ্রী করেই রাঁধলে, পরিমাণটাও কি বাড়াতে পার না?'

মেজ রাজকন্যে বললেন, 'পরীদিদি কি জ্যোৎস্না রাত্রির রূপসী? তাঁর চুলগুলো কি মেঘের মত নরম? তাঁর চোখদুটো কি তারার মত উজ্জ্বল? কথা বল্লে কি তাঁর মুখ থেকে গোলাপফুল আর মুক্তো ঝরে পড়ে? তাঁর গলার আওয়াজ কি বসন্তকালের কোকিলের মতো?'

তাই শুনে রানীমা নড়বড়ে সিংহাসনে বসে পড়লেন। বললেন, 'কি জানি বাছা! তোর দিদির অন্নপ্রাশনে শেষ দেখেছিলাম। বয়স মনে হয়েছিল ষাট বছর। মাথায় দু'গাছি পাকা চুল ছিল। ঝাঁটায় চেপে এসেছিলেন, খালি হাতে, প্রচণ্ড ক্ষিদে নিয়ে। সঙ্গে উটটুট কিন্তু ছিল না; তবে একটা কালো

বেড়াল ছিল। গলার আওয়াজটা ছিল ভাঙা হাঁড়ির ভেতর খুন্তি ঘষলে যেমন শোনায়, অনেকটা তাই।' নাক সিঁটকে দুই রাজকন্যে একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'মা গো, কি ঘেন্না!'

রানীমা তাই শুনে মধুমালতীকে বললেন, 'আর তোমাকেও বলে রাখি বাছা মধুমালতী, গরিব আছ, গরিবের মতো থাকবে। পরীদিদির সঙ্গে বেশি ঘেঁষাঘেঁষি করতে গিয়ে যেন আবার তাঁকে চটিয়ে দিও না।'

মেয়েদের সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'দেখিস যেন বেখাপ্পা কিছু বলিস নে। যা রাগী মানুষ, এককথায় তোদের একেকটাকে একেকটা গিরগিটি বানিয়ে দিতে পারেন তা মনে রাখিস। এখন যা, তোদের নীল রং-য়ের হাওয়াই শাড়ি পরে, মুখে লোধ্ররেণু মেখে, আলোর দিকে মুখ করে, ফুলের মালা আর চন্দন বাটা নিয়ে সদর দরজায় দাঁড়া, পরীদিদিকে অভ্যর্থনা করতে হবে। আর তোমাকেও বলি বাছা মধুমালতী, সাজসজ্জার সঙ্গে তোমার কি? রান্নাঘরে গিয়ে বরং মুখে দেবার যুগ্যি কিছু রোঁধো।'

মধুমালতী ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'পরীদিদি আমার জন্যি কিছু আনবেন না? রেশমি শাড়ি, ফিরোজার গয়না, আনবেন না? রাজপুত্র বর আনবেন না?

শুনে রাজকন্যেরা আর হেসে বাঁচেন না। 'আরে তোর জন্যে আনবেন কেন রে? তুই হলি গিয়ে গরিব। আনেন যদি আমাদের জন্য আনবেন। আমরা হলাম রাজকন্যে।'

মধুমালতী মুখখানা কালি করে রান্নাঘরে গিয়ে গুটিকতক আলু, আধসের দুধ, আর দুটো তিতির পাখি দিয়ে রান্না চড়ায়।

তার মন ভালো নেই।

বাইরের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, এমনি সময়ে পিছনের দরজা দিয়ে, একমুখ দাড়ি-গোঁফ নিয়ে, রোগা ডিগডিগে একটা লোক, মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এই আমার উট দেখেছ,আমার ন্যাড়ামতন উট?'

চমকে গিয়ে মধুমালতী খুন্তি উঁচিয়ে বললে, 'এইও! ভাগো!' তারপর চোখ তুলে লোকটার মুখের দিকে চাইল! চেয়ে অবাক মানল। দেখল তার দাড়িগোঁফের ফাঁকে-ফাঁকে রূপের ছটা। তার খাকি রং-এর আধময়লা কুর্তা-পেন্টেলুন তার দেহের দিব্যকান্তি গোপন করতে পারছে না।

লোকটা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'উটটা কোথায় রেখেছ বল না। উট না হলে উটের খেলা দেখাব কী করে? আহা, আমার অমন শেখান-পড়ান উট গো।'

মধুমালতী হৃদয়খানা খাঁচায় বন্ধ পাখির মতো ডানা ঝাপটাতে লাগল। ক্ষীণ কণ্ঠে সে বললে, 'অমন উট উট কর না বলছি। উট দেখলে আমি ভয়ে মুচ্ছো যাব।'

লোকটা ঘরের ভেতর একটু সেঁদিয়ে বললে, 'বাঃ বেড়ে গন্ধ বেরুচ্ছে তো! এইখানে এই টুলটাতে একটু বসি?'

মধুমালতী ভালো করে কথা না শুনেই বললে, 'হুঁ'! কিন্তু খবরদার তিতির পাখির ভাগ চেয়ো না। তুমি তিতির পাখি খেয়ে ফেললে পরীদিদি কী খাবেন? আর পরীদিদি খেতে না পেলে রেগেমেগে রাজকুমারীদিদিদের আর আমাকে এককথায় গিরগিটি বানিয়ে দেবেন। তখন আমাদের বিয়েও হবে না, শাড়ি-গয়নাও পরা হবে না।'

লোকটা বলল, 'কেন বিয়ে হবে না? তোমার মতো যে রাঁধে তার একশ বার বিয়ে হবে। পরীদিদি এসব খাবেন না। দুরকম পরী হয়। এক নম্বর পরীরা মধু খায় আর দুনম্বর পরীরা গন্ধকের ধোঁয়া খায়, তিতির পাখির মাংস পরীরা খায় না!'

বলে তিতিরের একটা ঠ্যাং ছিঁড়ে তক্ষুনি সেটাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল। মধুমালতী আপত্তি জানাতে গেলে তাকে বাধা দিয়ে বললো, 'জান, আমি দেখতে এইরকম কিন্তু আমার জীবনে একটা বড় দুঃখ আছে।'

শুনে মধুমালতীর মনটাও হাহাকার করে উঠল। তিতিরের কথা সে ভুলে গেল।

লোকটা আবার বলল, 'বাইরে দেখছ কেমন কোট-পেন্টেলুন পরে দিব্যি উটই খুঁজে বেড়াচ্ছি, কিন্তু বুকের ভেতরটা শূন্য খাঁ-খাঁ করছে।'

মধুমালতীর চোখদুটিতে কালো দিঘির জলের মতো জল ছাপিয়ে এল।

লোকটি বলল, 'পৃথিবীতে কে সত্যিকারের সুখী বলতে পার? যার রূপ-গুণ-ধন-দৌলত আছে, সে নয়। যার প্রেম-ভলবাসা, স্বাস্থ্য-শান্তি আছে, সে নয়। কেবল সেই সত্যিকারের সুখী লোক, যার ঘরে ভালো রাঁধুনী আছে, একথা সত্যি নয় কি? আমার মতো দুঃখী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেউ নেই।

ভাবতে পার, আমার সার্কাস পার্টিতে পঞ্চাশজন লোক আছে, তাদের মধ্যে একজনও রাঁধতে পারে না? ভাবতে পার, আমি ছমাসে একষট্টিজন রাঁধুনে তাড়িয়েছি? ভাবতে পার, সাত বছরে আমি সাতবার ভালো করে খেতে পাইনি? জান, আমার হৃদয়টা কানায়-কানায় কান্না দিয়ে ভরা?'

মধুমালতী আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে ফেলল। লোকটা আড়চোখে তাকিয়ে তিতিরের অন্য ঠ্যাংটাও চিবিয়ে খেয়ে ফেলে বলল, 'কেঁদে আর কী হবে? সুখ আমার কপালে লেখা ছিল না, তার কী হবে? এক যদি—'

মধুমালতী চোখ মুছে উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'এক যদি—কি?'

'না! যা হবার নয় তা ভেবে লাভ কি? তুমি কি আর এই সুখের বাসা ছেড়ে আমার গরিব ঘরে ঠাঁই নেবে?'

মধুমালতীর বুকের ভিতর শঙ্খ-ঘণ্টা বেজে উঠল। কী হবে রাজপুত্র দিয়ে, রাজপুত্র কোনদিন হয় তো আসবে না, কী হবে তাকে দিয়ে? উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে, 'কেন যাব না?—অন্য তিতিরটাও খেয়ে ফেল। আজ আমি কাউরে কেয়ার করি না।'

তিতির খেয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে লোকটা বলল, 'সত্যি তুমি অনন্যসাধারণ, তুমি অনিন্দিত। দুয়িনাতে তোমার মতো কেউ নেই। শেষটা তুমিও ঐ একষট্টিজনের মতো আমাকে ছেড়ে ছেলে যাবে না তো?'

মধুমালতী বললে, 'তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না?'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বললে, 'দুঃখে-দুঃখে পৃথিবীটাতেই বিশ্বাস হারিয়েছি। তা ছাড়া বাবা বলতেন স্ত্রীলোককে কদাচ বিশ্বাস করতে নেই। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না, এস না আমরা বিয়ে করে ফেলি? দেখ, আপত্তি কর না। পরীদিদি কি ছাই দেবে রাজকন্যাদের? আমি তোমাকে যেসব লাল-নীল ডোরা কাটা ফুটকি দেওয়া শাড়ি দেব, হীরে-মুক্তো বসান গয়না দেব, তাই দেখে রাজকন্যাদের কেন, স্বয়ং পরীদিদির চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।—আচ্ছা রাঁধতে তোমার কোনও আপত্তি নেই তো?'

মধুমালতী ব্যাকুলভাবে বলল, 'গোটা সার্কাস পার্টির জন্য? রোজ দুবেলা পঞ্চাশজন লোকের জন্য?'

'আরে দূর! ওরা নিজেরা রেঁধে খাবে! আমার বৌ একা আমার জন্য

রাঁধবে। 'না' বোল না। তা হলে আমি বুক ফেটে মরে যাব। না হয়, যে দিন তোমার রাঁধতে ইচ্ছা করবে না, সেদিন ছুটি নিও। কিন্তু 'না' বল না। আমরা সেদিন হোটেলে খাব।'

মধুমালতী সগর্বে বলল, 'রোজ আমি খুশি হয়ে তোমার জন্যে রেঁধে দেব।'

লোকটাও খুশি হয়ে বলল, 'তবে আমরা কিসের জন্য অপেক্ষা করে আছি? চল, পুরুতঠাকুর আজ কমপ্লিমেন্টারি টিকিট পেয়ে সার্কাস দেখতে এসেছেন। এই তো পরম শুভ মুহুর্ত।'

মধুমালতী বলল, 'কিন্তু পরীদিদি যদি রেগে রাজকন্যাদের বর না দেন?'

'কছু পরোয়া নেই। আমি বর দেব। আমার দুই ম্যানেজারের সঙ্গে দুজনার বিয়ে দেব।'

'যদি রেগে গিয়ে ওদের গিরগিটি বানিয়ে দেন?'

'তা হলে তো ভালই হয়। রোজ আমি গিরগিটির খেলা দেখাব। চল আর বিলম্ব কিসের? ঐ দেখ হাম্বা-হাম্বা করে ডাকতে-ডাকতে উটটাও এসে উপস্থিত হয়েছে।'

বাতাবিলেবু-কন্যা

অমিতাকুমারী বসু

এক রাজা আর তাঁর দুই রানী। একই দিনে বড়রানীর হল এক ছেলে, আর ছোটরানীর হল এক বাতাবিলেবু। বড়রানী ছেলে পেয়ে আনন্দে আটখানা, আর ছোটরানী বাতাবিলেবু পেয়ে দুঃখে-লজ্জায় মনমরা। ছোটরানী রাগের চোটে বাতাবিলেবুটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আস্তাকুঁড়ে। কিন্তু কী জ্বালা, ছোটরানী যতবারই বাতাবিলেবু ছুঁড়ে ফেলেন, ততবারই সেটা ঘুরেফিরে তাঁর পায়ের কাছে এসে দাঁড়ায়, কিছুতেই আস্তাকুঁড়ে থাকে না। তখন রানী আর কী করেন, ঘরের এক কোণায় বাতাবিলেবুটা রেখে দিলেন।

একদিন বাতাবিলেবুটা গড়াতে-গড়াতে চলল নদীর ঘাটে। সেই সময় আর এক দেশের রাজপুত্র নদীর অপর ঘাটে মাছ ধরছিলেন। তিনি হঠাৎ দেখলেন একটা বাতাবিলেবু গড়াতে-গড়াতে এল, আর তার ভিতর থেকে এক রূপসী কন্যা বেরিয়ে এল। নদীর ঘাট আলো হয়ে উঠল কন্যার রূপে। কন্যা নদীতে হাতমুখ ধুয়ে স্নান করে উঠল, তারপর তীরে ঘাসের উপর বসে মেঘের মতো একরাশ চুল পিঠে ছড়িয়ে দিল। চুল শুকিয়ে কন্যা আবার লেবুর ভিতরে ঢুকল। লেবুও গড়াতে-গড়াতে ফিরে চলল।

রাজপুত্র এই অবাক কাণ্ড দেখে হতভম্ব। কন্যার পরিচয় জানবার জন্যে অস্থির হয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে গিয়ে গোঁসাঘরে খিল দিলেন। রাজারানী উঠিপড়ি করে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললেন, 'বাবা, দরজা খোলো।' কোনও উত্তর নেই। রানী দরজা ধাক্কা দিতে-দিতে বললেন, 'বাবা, দরজা খুলে বাইরে আয়, যা চাইবি তাই দেব।'

তখন রাজপুত্র দরজা খুলে বললেন, বাতাবিলেবু-কন্যাকে আমি বিয়ে করব।'

রাজারানী ছেলের কথা শুনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন। বাতাবিলেবু-কন্যা আবার কে?

রাজপুত্র বললেন, 'নদীর ঘাটে তার সঙ্গে আমার দেখা। কন্যা রূপে নদীতীর আলো করে বসেছিল।' এই বলে নদীর ঘাটের সব কথা খুলে বললেন।

রাজারানী গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন। বাতাবিলেবুর ভিতর কন্যা থাকে, তার সঙ্গে আবার বিয়ে হয়, এমন কথা তো তাঁরা জীবনে শোনেননি। রানী বললেন, 'বাবা, বাতাবিলেবু-কন্যা নিশ্চয় পরী, মানুষ নয়। ওর সঙ্গে কী করে বিয়ে হবে? আমি তিন দেশ ছেঁকে তোমার জন্যে অপূর্ব রূপসী কন্যা নিয়ে আসব, তুমি লেবুকন্যার কথা মন থেকে দূর করে দাও।'

রাজপুত্র বললেন, 'বাতাবিলেবু-কন্যা ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করব না।' অনেক ভেবেচিন্তে রাজারানী দেশে-দেশে দূত পাঠালেন বাতাবিলেবু-কন্যার খোঁজে। কিন্তু কেউ সন্ধান দিতে পারল না। রাজপুত্র হতাশ হয়ে পড়লেন। এবার নিজে দূত পাঠালেন তাঁর নাপিতকে বাতাবিলেবু কন্যার খোঁজে। নাপিত বর্ণনা মিলিয়ে নদীর অপর পাড়ে সেই রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হল। তারপর খোঁজ নিয়ে জানল, ওই দেশের ছোটরানীর ঘরে বাতাবিলেবু আছে বটে, কিন্তু তার ভিতরে কোনো কন্যা আছে বলে তো কেউ জানে না।

নাপিত খুশি মনে রাজ্যে ফিরে এসে রাজপুত্রকে খবর জানাল। রাজপুত্র রাজারানীকে খবর দিলেন। তারপর একদিন ধুমধাম করে সৈন্যসামন্ত নিয়ে বহুমূল্য শাড়ি গয়না উপহার ও রাজপুত্রের তলোয়ার নিয়ে সেনাপতি বাতাবিলেবু-কন্যার রাজ্যে চললেন। সে দেশে পৌঁছে সেনাপতি রাজাকে

বললেন, 'মহারাজ, আপনার বাতাবি-কন্যার সঙ্গে আমাদের রাজপুত্রের বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছি।'

রাজা তো অবাক। বললেন, 'কই, আমার তো কোনো বাতাবিলেবু-কন্যা নেই, তবে ছোটরানীর ঘরে এক বাতাবিলেবু আছে।'

সেনাপতি আগ্রহ করে বললেন, 'ওই বাতাবিলেবুর সঙ্গেই আমাদের রাজপুত্রের বিয়ে দিন। তার তলোয়ার প্রতিনিধি করে নিয়ে এসেছি।' রাজা অবাক হয়ে ভাবেন, এ আবার কী কাণ্ড! যাহোক, বাদ্যভাণ্ড বাজিয়ে রাজপুত্রের তলোয়ারের সঙ্গে বাতাবিলেবুর বিয়ে হল। সেনাপতি তাদের নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে এলেন।

রাজারানী দেখলেন, মস্ত বড় এক বাতাবিলেবু, দেখতে বেশ সুন্দর, তাজা আর পুষ্ট, কিন্তু তার ভিতরে কী করে কন্যা থাকতে পারে কেউ বোঝে না। দিনের পর দিন কাটে—না রাজারানী, না রাজপুত্র, কেউ কন্যার সন্ধান পায় না।

রাজপুত্রের ঘরে হাতির দাঁতের পালঙ্কে মখমলের শয্যায় বাতাবিলেবুকে যত্ন করে রাখা হল। রাজপুত্র রোজই একবার বাতাবিলেবুটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, এদিক দেখেন সেদিক দেখেন, লেবুকে বলেন, 'কন্যা, তুমি যে হও সে হও, লেবুর ভিতর থেকে বের হও, কথা বলো।' কিন্তু কন্যা বেরও হয় না, কথাও বলে না, লেবুও নড়ে না চড়ে না। সেই একই জায়গায় চুপ করে পড়ে থাকে। রাজপুত্রের মন দুঃখে ভরে গেল। রাজ্যের লোকেরা রাজপুত্রের এই পাগলামি দেখে হাসাহাসি করে, রাজারানীর মনেও শান্তি নেই।

রাজপুত্রের জন্য রাত্রে সোনার থালায় পঞ্চ-ভাত-ব্যঞ্জন আসে, রাজপুত্র খানিকটা খান, বাকিটা ঢেকে রেখে দেন। বিছানায় শুতেই ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েন। আর সেই সুযোগে লেবুটা গড়াতে-গড়াতে নিচে নামে, লেবুকন্যা বের হয়ে রাজপুত্রের আসনে বসে থালা থেকে ভাত ব্যঞ্জন খেয়ে আবার লেবুর ভিতরে ঢোকেন, লেবুটা তখন গড়াতে-গড়াতে খাটের কাছে যায়, একলাফে খাটে উঠে চুপ করে বসে থাকে। ভোরে উঠে রাজপুত্র দেখেন, সব খাবার শেষ। এককণাও থালায় অবশিষ্ট নেই। রোজ রাত্রেই এই কাণ্ড ঘটে, রাজপুত্র কিছুই বুঝতে পারেন না। রাত্রে জেগে

থেকে দেখবেন কী ব্যাপার—রোজই এ কথা ভাবেন, কিন্তু খাওয়া অর্ধেক হতে না হতেই এত ঘুমে কাতর হন যে আর জেগে থাকা সম্ভব হয় না।

রাজপুত্রের মনের শান্তি-আনন্দ নষ্ট হল। রোজ গালে হাত দিয়ে ভাবেন, নিজের চোখে দেখলাম এক কন্যা বাতাবিলেবু থেকে বের হয়ে আবার বাতাবিলেবুতে ঢুকল, আর এখন কেন সে কন্যাকে কোনরকমেও দেখা পাইনে।

এক বুড়ি এসে একদিন রাজপুত্রকে বললে, 'বাবা, তোমাকে এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন? সেদিন এত ঘটা করে বিয়ে করে বউ আনলে, তা আমার সে বউরানী কোথায়?'

তখন রাজপুত্র মনের দুঃখের কারণ খুলে বললেন। বুড়ি বললে, 'মন খারাপ করো না। আমি যতদূর জানি এ হচ্ছে পরীদের ছলা-কলা। মানুষ কি কখনও বাতাবিলেবুর ভিতরে বাস করতে পারে? আজ রাতেও তুমি খাবার খেয়ে থালায় অর্ধেক খাবার রেখে দেবে, আর তোমার খাটের বাইরে একটু আগুন জ্বেলে থাকবে। মাঝরাতে যেই বাতাবিলেবু থেকে কন্যা বের হয়ে খাবার খেতে বসবে, তুমি চট করে লেবুটা আগুনে ফেলে দিও। তাহলে তোমার পরী বউ আর পালাতে পারবে না। এই শিকড় দিচ্ছি, এটা তার মাথার চুলে ঘষে দিও, তাহলে সে মানুষ হয়ে যাবে, আর পরী থাকবে না।' এই বলে বুড়ি অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাজপুত্র মহাখুশি। পরের রাতে বুড়ির পরামর্শমতো ঘরের বাইরে আগুন জ্বেলে রেখে ঘুমের ভান করে বিছানায় শুয়ে রইলেন। মাঝরাতে বাতাবিলেবু-কন্যা বের হয়ে যেই খেতে বসল অমনি রাজপুত্র উঠে লেবুটা আগুনে ফেলে দিলেন। কন্যা 'কর কী, কর কী' বলতে-বলতে লেবুটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। রাজপুত্র কন্যার হাত খপ করে ধরে বললেন, 'কন্যা, তুমি রোজ-রোজ পালিয়ে বেড়াও কেন?' এই বলে বুড়ির দেওয়া শিকড়টা তার চুলে ঘষে দিলেন, পরী-কন্যা মানুষ হয়ে গেল। রাজপুত্রের মনে আনন্দ আর ধরে না। পরদিন রাজা-রানী ঘুম থেকে উঠে দেখেন কী, তাঁদের ঘর আলো করে বাতাবিলেবু কন্যা বসে আছে। রাজ্যের লোক আনন্দে ভিড় করে এল রাজপুত্রের অপূর্ব সুন্দরী বউ দেখতে। রাজ্য জুড়ে উৎসব চলল, রাজপুত্র বাতাবিকন্যাকে নিয়ে মনের সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

খেয়ালের খেসারত

আশাপূর্ণা দেবী

মেয়ের কথা শুনে রাজামশাই-এর তো মাথায় হাত!

এতো বড়ো-বড়ো রাজ্য থেকে বিয়ের সম্বন্ধ আসছে, আর মেয়ে কিনা জেদ করে বসে আছে, 'যে আমার তিনটি প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারবে তাকেই বিয়ে করব।'

রাজা বললেন, 'তা যদি খুব ক্ষুদে রাজ্যের রাজপুত্তুর হয়? তার যদি হাতিশালে মোটে একটা কি দুটো হাতি থাকে? আর সে যখন বিয়ে করতে আসবে যদি সোনার চতুর্দোলা না জোটে?'

রাজকুমারী বললেন, 'না জুটুক।'

রাজা বললেন, 'আর যদি দেখতে খুব বিচ্ছিরি হয়?'

'হোক!'

'আর যদি খুব রাগী হয়?'

'কী করা যাবে! তাই হবে।'

রাজা রেগেমেগে বললেন, 'ঠিক আছে যা ইচ্ছা কর।'

রানিমা মেয়েকে কত বোঝালেন, 'দেখো, তোমার বাবা কত বিশাল রাজ্যের সুন্দর-সুন্দর ছেলেদের নিয়ে আসবেন ঠিক করেছেন, তুমি স্বয়ংবরা হবে, সোনার চতুর্দোলায় শ্বশুরবাড়ি যাবে, এর মাঝখানে তোমার একী

জেদ? এ জেদ ছাড়ো তুমি।'

মেয়ে অটল।

'তিনটি প্রশ্ন করবই আমি তাদের।'

সখীরা এসে কত বোঝাল, রাজকুমারী হেলেন না দোলেন না।

তখন আর কী করা? রাজা ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দিলেন, 'যে ছেলে রাজকন্যার তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে, সেই রাজার জামাই হবে।'

রাজকুমারী এত সুন্দরী যে দিকে-দিকে তার রূপের নামডাক। সেই নামডাক শুনে দেশ-বিদেশ থেকে রাজপুত্রেরা আসে। আসর বসে, রাজকুমারী প্রশ্ন করেন, 'বলুন তো? আকাশে কত তারা?'

ওরা বলে ওঠে, 'আরে তাই কখনও বলা যায়? আকাশের তারা কে গুনতে পারে?'

রাজকুমারী বলেন, 'এক নম্বর কাটা!'

—'আচ্ছা বলুন তো মানুষের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য কী? অর্থাৎ যা না খেলে চলে না তার?'

কেউ বলল, 'ভাত', কেউ বলল, 'জল', আবার কেউ বলল, 'সন্দেশ' রসগোল্লা-ক্ষীর-দুধ-মাছ-মাংস। একজন বলে উঠল, 'নুন'।

যারা সভায় বসেছিল, তারা ভাবল, এই ছেলেটাই বোধহয় জিতে যাবে।

কিন্তু হায়!

রাজকন্যা বললেন, হল না।

'আচ্ছা বলুন তো মানুষ কার কাছে থাকতে সবচেয়ে ভালবাসে? মানে কাকে ছেড়ে থাকতে পারে না?'

কেউ বলল, 'মাকে ছেড়ে', কেউ বলল, 'বাবাকে ছেড়ে', কেউ বলল, 'ভাই-বোনকে ছেড়ে' কেউ বলল, 'বন্ধুকে'।

রাজকন্যা বললেন, 'হল না! হল না!'

একে একে সব প্রার্থী—ফর্সা।

তখন একপাশ থেকে এক কদাকার আর আধবুড়ো বামন রাজপুত্র বলে উঠল, 'যদিও আমি রাজপুত্র, কিন্তু আমার এই চেহারার জন্যে আমার এখনও বিয়ে হয়নি। তা আমি যদি ঠিক-ঠিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি, বিয়ে দেবেন তো?'

রাজামশাই সেই বামনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'তা দিতেই হবে। প্রতিজ্ঞা যখন করেছি।'

'আচ্ছা আর একটা কথা বলি, রাজকন্যা তাঁর তিনটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর তিনটি চুপি-চুপি একটি কাগজে লিখে আপনার হাতে দিয়ে রাখুন, আমি উত্তর দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আপনি মিলিয়ে দেখবেন। নচেৎ রাজকুমারী পরে উল্টো-পাল্টা কথা বলতে পারেন।'

রাজকন্যা বললেন, 'কী? আমি মিথ্যে কথা বলব।'

সেই আধবুড়ো বামন রাজপুত্র হেসে বলল, 'তা আমার মতো চেহারার বর হবার ভয়ে মিথ্যে কথা তো কিছুই না, লোকে জলে ঝাঁপ দিতে পারে। এখন আর একটি আর্জি, উত্তর দেবার জন্যে আমায় এক ঘণ্টা সময় দিতে হবে।'

সভার সকলে বলে উঠল, 'ঠিক আছে। ঠিক আছে।'

'আচ্ছা বলুন আপনার প্রশ্ন।'

রাজকন্যা বললেন, 'আকাশে কত তারা?'

সঙ্গে-সঙ্গে জবাব এলো, 'রাজকুমারীর মাথায় যত চুল।'

এই সেরেছে! এ যেন অন্য কথা বলল।

রাজকুমারী বললেন, 'প্রমাণ?'

বামন বলল, গুনে দেখিয়ে দেব। আকাশের তারার সংখ্যা আমার কাছে লেখা আছে, এখন আপনার চুলগুলি গুনতে হবে। একটি নাপিত ডাকা হোক, সে আপনার চুলগুলি মুড়িয়ে কেটে আমার হাতে দিক। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে গুনে দেব।'

'চুলগুলো মুড়িয়ে কেটে দিতে হবে?' রাজকন্যা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, 'তার মানে? ইয়ার্কি পেয়েছেন না কি?'

'বাঃ আপনি যে প্রমাণ চাইলেন। এই দেখুন আকাশের তারার সংখ্যা আমার হাতে।' বলে বামন রাজপুত্র একটা গোটানো কাগজ খুলতে বসল।

তাতে সংখ্যা আর শূন্য সংখ্যা আর শূন্য।

গোটানোটা খুলছে তো খুলছে।

রাজকন্যা বলে উঠলেন, 'হয়েছে হয়েছে। আর দেখার দরকার নেই আমার। মেনে নিচ্ছি আপনার উত্তর ঠিক।'

'দ্বিতীয় প্রশ্ন?'

'মানুষ কার কাছে থাকতে ভালবাসে। মানে কাকে ছেড়ে থাকতে পারে না?'

বামন রাজপুত্র সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, 'পৃথিবীর কাছে। পৃথিবীকে ছেড়ে থাকতে পারে না মানুষ। দেখুন, মা-বাপ, ভাই-বোন, বন্ধু, ছেলে-মেয়ে সকলকে ছেড়েই মানুষ থাকে, থাকতে হয়, কিন্তু পৃথিবী ছেড়ে থাকতে পারে?'

'তাইতো ঠিক তো!'

বলে উঠল সভার সবাই।

রাজকন্যা মুখ হাঁড়ি করে বললেন, 'ঠিক হয়েছে।'

'এখন বলুন কোন খাদ্য মানুষের সবচেয়ে প্রিয়!'

বামন রাজপুত্র বললেন, 'মহারাজ কথাটি বড় গোলমেলে, আগে আপনি সভার সমস্ত জানলা-দরজা-জাফরি বন্ধ করে দিন, তারপর বলব।'

রাজকন্যা দু-দুটো প্রশ্ন হার মেনেছেন, অতএব সভার সকলের খুব উৎসাহ। ঝটপট বন্ধ হয়ে গেল জানলা-দরজা। অথচ সভায় লোক ঠাসা।

বামন রাজপুত্র বলল, 'মহারাজ মনে আছে তো আমি একঘণ্টা সময় চেয়েছিলাম? আচ্ছা এইভাবে সব বন্ধ থাকুক, আমি উত্তর দিচ্ছি—সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য বাতাস।'

'বাতাস!'

'হ্যাঁ, দেখুন না পরীক্ষা করে। একঘণ্টা সকলেই জগতের কোনও কিছু না খেয়ে থাকতে পারে, থাকেও। কিন্তু বাতাস?'

'তাইতো!' সকলে বলল, 'দোর-জানলা খুলে দিন, প্রাণ যায়।'

রাজামশাই রাজকুমারীর সেই উত্তরের কাগজটি খুলে দেখেন, কিছু লেখা নেই—সাদা কাগজ।

রাজা বললেন, 'কন্যা, এর মানে?'

বামন রাজপুত্র বলল, 'মানে আর কিছুই নয়, রাজকুমারী নিজেই জানতেন না কী উত্তর হতে পারে। ভেবেছিলেন সবাইকে ভাগাবেন, বিয়েই করবেন না। তা তো হলো না। এখন দিন আমার হাতে।'

ব্যস। তখন সেই কদাকার বামন রাজপুত্রের সঙ্গেই ঘটাপটা করে বিয়ে হয়ে গেল রাজকন্যার। হাড়ে-হাড়ে বুঝলেন তিনি, মা-বাপের কথার অবাধ্য হয়ে অকারণ খেয়ালিপনা করলে তার কী ফল ফলে।

দেশসুদ্ধ সকলে বর দেখে ছি-ছি করতে লাগল। আর সেইসব হেরে যাওয়া রাজপুত্রেরা হো-হো করে হাসতে-হাসতে সঙ্গে-সঙ্গে চলল।

রাঙামুড়ি সর্দার

সুকুমার দে সরকার
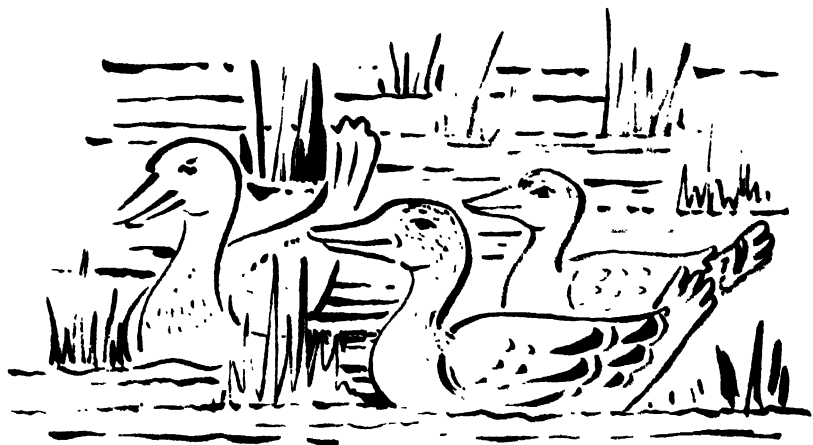
টিল হাঁসেদের সঙ্গে বিগড়িদের ক্বচিৎ কখনও সামাজিকতা চলে, কারণ টিলেরাও সবুজ আর বিগড়ি হাঁসেরাও সবুজ। পিংদের সঙ্গে কালদিগরদের কাজ কারবার চললেও চলতে পারে, কারণ পিং হাঁসেরা হলদে আর কালদিগর হাঁসেরাও হলদে। কিন্তু পেন্তামুখী আর রাঙামুড়িদের সঙ্গে কারও কাজ কারবার নেই, কারণ পেন্তামুখী হাঁসেরা নীল আর রাঙামুড়ি হাঁসেরা লাল। রাঙামুড়িরা যেন হাঁসের রাজা। টুকটুকে লাল তাদের শরীর—পেটের কাছ থেকে ধবধবে সাদা হয়ে এসেছে।

এইসব হাঁসের দল যখন তাদের অনাদিকালের বন-জলায় গা ভাসিয়ে দেয়, সবুজ বুনো ঘাসের লম্বা শীষ যখন আকাশ-মাখা জলের ছায়ায় কাঁপতে থাকে, উত্তরমুখী রোদের নিস্তেজ আভায় যখন জ্বলে ওঠে মৌসুমি বুনো ফুলের দল, তখন মনে হয় যেন পৃথিবীর এই কোণটুকুতে সূর্যের সোনা গলে গলে পড়ে সাতটা রানধনু রঙে ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে গেছে!

শরবনের ওপর দিয়ে বাতাসের বেগ বাড়তে থাকে। উত্তর-সাইবেরিয়ার সুমেরু সাগরের ওপর দিয়ে বয়ে আসা হিম-বাতাস। রাঙামুড়ির দল একবার আকাশ পানে চেয়ে ডানা ঝাপটে ডেকে ওঠে, 'পেঁয়াক পেঁয়াক!' অর্থাৎ

'হাঁসেরা জাগো, সারি বাঁধো, তৈরি হও! ওই শোনো শীত-রাজার সৈন্যদের ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ, ওই তাদের হিমেল নিঃশ্বাস!'

'পেঁয়াক! পেঁয়াক!' ডেকে ওঠে রাঙামুড়ির দল।

'পিঁয়াক! পিঁয়াক!' সাড়া দেয় পেন্তামুখীরা।

বিস্তীর্ণ জলাটার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত যেন টেলিগ্রাফ হতে থাকে!

'কোঁয়াক! কোঁয়াক!' খবরটা ছড়িয়ে দেয় চারদিকে পিং আর কালদিগর হাঁসের দল।

ঘাড়টা এদিক ওদিক দুলিয়ে দুলিয়ে টিল আর বিগড়িরা ডেকে ওঠে, 'পিঁ-ই-ক! পিঁ-ই-ক!'

তারপরে একদিন ভোর রাত্রে শরবনের ফাঁকে দেখা যায় একটা সাদা শেয়াল। হাঁসেরা আর অপেক্ষা করে না। একটার পর একটা দল সাজানো সৈন্যের শৃঙ্খলায় সার বেঁধে আকাশে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে। মেঘের ভেতর থেকে তাদের যাযাবর ডাক শোনা যায়, 'হকঁ! হকঁ!' শীত এসে গেল, চলো ভাই চলো! চির বসন্তের দেশ ভারতবর্ষ, যেখানে আপেল ফুলে ভোমরার গান শোনা যায়, যেখানে গমের শীষে ফিঙেরা দোল খায়, যেখানে জলায় আছে শালুকের নলে আর চিকিমিকি রুপোলি মাছের ঝাঁক—চলো, সেইখানে চলো!'

আকাশে রাঙামুড়িদের গতির বেগ তোমরা ধারণা করতে পারবে না। ঘন্টায় চল্লিশ মাইল বেগে তারা তিন হাজার ফুট দিয়ে উড়ে চলে। সাইবেরিয়া থেকে পার হয়ে চীন, পার হয়ে তিব্বত, পার হয়ে হিমালয়—শীতের মুখে তারা আসে ভারতবর্ষে। ছড়িয়ে পড়ে কাশ্মীর থেকে যুক্তপ্রদেশের বনে বনে জলাভুমিতে, আবার গরম পড়ার সাথে সাথে চলে যায় সাইবেরিয়া। সৃষ্টির অনাদিকাল থেকে এই নিয়ম তাদের রক্তে মেশানো।

পশ্চিম-আকাশে আবীর মাখিয়ে সূর্যিঠাকুর হেলে পড়েছে বিস্তীর্ণ জলাটার জলে। মৃদু বাতাসে ছোটো ছোটো ঢেউ তুলে কাঁপছে জলার সোনা-গোলা জল। দক্ষিণ-আকাশ নিস্তরঙ্গ—হারিয়ে গেছে দিগ্বলয়ে!

'হুঁক! হুঁক!'

সার বেঁধে দলকে চালিয়ে ঘুরে ঘুরে নামতে নামতে সাবধানি ডাক ডেকে ওঠে রাঙামুড়িদের সর্দার। যাত্রা শেষ, এসে গেছে তারা। ওই

পায়ের নিচে রুপোলি জলা, চিকিমিকি মাছের ঝাঁক, গুগলির পালা, শালুকের নাল। সামনেই খাদ্য আর বিশ্রাম। তবু তাদের সাবধান হতে হয়। রাঙামুড়িদের শত্রুর অভাব নেই। ডাঙায় শেয়াল চুপিচুপি পা চালায়, রাতে হানা দেয় বনবেড়াল, কিন্তু এদের চেনে রাঙামুড়িরা। সৃষ্টির অনাদিকাল থেকে ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া বুনো হাঁসেদের! কিন্তু ওই দু'পেয়ে মানুষগুলো বেজায় ফন্দিবাজ। তাদেরই সবচেয়ে ভায় করে রাঙামুড়ি সর্দার।

দলকে চালিয়ে নিয়ে নিচে নামতে নামতে রাঙামুড়ি-সর্দার দেখল এ জলাটায় এখনও নামেনি হাঁসের দল। কেন? ভয় আছে কোনও? ওইতো লাফাচ্ছে ছোটো ছোটো রুপোলি মাছের ঝাঁক। খাদ্য আছে, তবুও নেই হাঁসের দল? তবে কি তারাই প্রথম? ভালো করে তাকিয়ে দেখে সর্দার। না, ওই যে দূরে ওই পাড়টার দিকে গুটিকয়েক হাঁস ভাসছে। আনন্দে একটা শব্দ করে উঠে সেদিক পানে পাখা চালায় সর্দার—ওখানটায় অন্তত ভয় নেই। আর সেইখানটার কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ একটা অজানা আতঙ্কে কেমন যেন শিউরে ওঠে সে! ও হাঁসগুলো অমন শক্ত কেন? শুধুই ভেসেই আছে। মাথা নাড়ে না, ডাকে না। বুঝেছে সে। এই দু'পেয়েগুলোর ফন্দি।

'পেঁয়াক! ওঠো ওঠো! পালাও পালাও! ওগুলো কাঠের মরা হাঁস। সে সর্দার, সে দু'পেয়েদের ফন্দি জানে।'

হঠাৎ আকাশ কাঁপিয়ে বাজপড়া বন্দুকের আওয়াজে চমকে যায়। গুটিকয়েক রাঙামুড়িসমেত সর্দারও পাথরের মতো ঝুপ ঝুপ জলে পড়ে যায়।

গুলিটা রাঙামুড়ি সর্দারের বুকে লাগেনি, লেগেছিল তার ডানার একটা ছোট হাড়ে। হাড়টা ভেঙে সে এক মুহূর্ত জ্ঞান হারিয়ে ঘুরে পড়েছিল। যন্ত্রণার মধ্যে জ্ঞান হয়ে সে দেখল, সে বেঁচে আছে, একটা পাখার ডগায় অসম্ভব যন্ত্রণা ছাড়া শরীরের আর কোথাও কোন গ্লানি নেই। তাহলেও সে এখনও ওই শিকারি দু'পেয়েটাকে ফাঁকি দিতে পারবে। আস্তে আস্তে সে জল কাটতে শুরু করে।

আকাশ কালো হয়ে আসছে আর সেই আলোয় আধো-অন্ধকারে সে দেখল, একটা কান-ঝোলা-ঝোলা শিকারি কুকুর ঝুপ ঝুপ করে সাঁতরে তার দিকে আসছে! টুপ করে ডুব মারে রাঙামুড়ি-সর্দার আর ডুব সাঁতারে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে যেতে শুনতে পায়, জলের ওপর হতভম্ব কুকুরটা ডাকছে, 'ভৌ ভৌ!'

সেই বনের ওপারে চাষীদের ঘরে একদল পাতিহাঁস পোষা থাকত। তাদের মধ্যে যে হংসীটা ছিল ধবধবে সাদা, সেটা কিছুতেই ঘরে থাকত না। বেড়ার ফাঁক দিয়ে যেমন করে হোক সেটা পালিয়ে যাবেই। আগের দিন রাত্রে পালিয়ে সেই হাঁসটা শুধু অনুভূতির বলে জলার পানে পা চালিয়ে দিয়েছিল। ভোর নাগাদ তার নাকে ভেসে এল জলার জলের সুঘ্রাণ। আর শরবনটা ঠেলে পার হতেই তার চোখে পড়ল একটা অপূর্ব হাঁস! কি তার উজ্জ্বল লাল রঙ—আর কি জৌলুস!

'পিঁক পিঁক! তুমি কে ভাই?'

রাঙামুড়ি-সর্দার একবার ঘাড়টা বেঁকিয়ে তাকে দেখে নিয়ে বলল, 'পেঁয়াক! পালাও পালাও!'

পাতিহাঁস অবাক হয়ে বলল, 'কেন?'

'যাও! পাখা চালাও! উড়ে যাও!'

'ওড়ে তো পাখিরা। উড়ব কি করে?'

রাঙামুড়ি-সর্দার অবাক হয়ে বলল, 'ও মা, তুমি উড়তে পার না?'

'তুমি পারো?'

'নিশ্চয়ই।'

'কই দেখি।'

রাঙামুড়ি-সর্দার চুপ। কি করে সে দেখাবে? আজ তার ডানা ভাঙা।

'বাজে কথা বোলো না। হাঁসেরা আবার উড়তে পারে নাকি?'

'নিশ্চয় পারে। হাঁসেরা উড়ে আসে পৃথিবীর আর এক দিক থেকে। যখন সেখানে বরফে সব সাদা হয়ে যায়, তখন পার হয়ে আসে কত নদী, কত পাহাড়, গরম ধূ-ধূ বালির ওপর দিয়ে, এই দেশে।'

'এটা ছাড়া আবার দেশ আছে নাকি?

'আছে বইকি। এই পৃথিবী কত বড়ো, তার কত বন, কত জল। হাঁসেরা দেখেছে সব,আকাশের মাথায় থেকে, জলার জলের নিচে নেমে।'

পাতিহাঁস ঘাড়টা এদিক-ওদিক দুলিয়ে বলে, তুমি দেখতে বেশ—কিন্তু বড়ো বাজে কথা বল। হাঁসেরা আবার ওড়ে, হুঁঃ!'

সেই জলের ধারে তারা বাসা বাঁধল। রাঙামুড়ি, সর্দার কাঠটা কুটোটা শরঘাসের নরম কুচি মুখে করে নিয়ে আসে। পাতিহাঁস ডিম পাড়বে। বাতাস নরম ঠান্ডা—সূর্যের তেজ স্তিমিত। সূর্য ঘুরে চলে উত্তরায়ণ, উত্তরায়ণ ক্রমশ দক্ষিণে ঢলে পড়তে থাকে। পৃথিবী ঘুরে চলেছে।

পাতিহাঁস ডিম পেড়েছে অনেকগুলো। পালা করে তারা ডিমে তা' দেয়। ডিমের ওপর বসে থাকে রাঙামুড়ি-সর্দার শান্ত নিশ্চল, কিন্তু চোখ দু'টো তার আকাশে কি যেন খুঁজে ফেরে! শীতের যৌবনে ভাটা লাগে। বনে বনে ফুটে ওঠে রঙিন মৌসুমি ফুল। পলাশের রঙিন ফল আকাশের কোণে কোণে যেন লালের আগুন ধরিয়ে দেয়, কেয়ার সুগন্ধ জলার চারিদিকে।

ডিম ফুটে দুটো বাচ্চা হল তাদের। মাথার ডগাটি তাদের টুকটুকে লাল আর সারা শরীর সাদা। পিঁক পিঁক করে রাঙামুড়ি-সর্দারের পেছু পেছু ঘুরে বেড়ায় তারা।

পাতিহাঁস বলে, 'ওদের যেন আর ওড়ার কথা শুনিও না। হুঁ, হাঁসেরা আবার ওড়ে!'

রাঙামুড়ি-সর্দারের ডানায় ভাঙা হাড় জোড়া লেগে গেছে, কিন্তু সে কিছু বলে না। বাচ্চাগুলো কি ছোটো! কি সুন্দর! আর এই শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনই বা মন্দ কি? কোনও ভাবনা নেই, ব্যস্ততা নেই, ছোট্ট গন্ডির ভেতর ছোট্ট জীবন। কিন্তু আকাশ কি ইশারা করে? দখিন-বাতাস কি চোখ ঠেরে যায়? গোবি মরুভূমির বুকে কি উঠেছে এখন বালির ঝড়? উটেরা ছুটে চলেছে কি? সাইবেরিয়ার স্টেপিজ কি বরফের সাদা ধূমে সবুজ হয়ে আসছে? আবার কি হিমালয়ের উপত্যকায় উপত্যকায় পাহাড়ি ঝরনা গুণ গুণ করতে করতে ছুটে চলেছে? চলুক! তার বাচ্চাগুলো তবু কি ছোটো আর কি সুন্দর!

তারপরে একদিন এল গ্রীষ্মের হালকা বাতাস। সূর্য বসল দক্ষিণায়ণে, আকাশের রঙ তামাটে সবুজ হয়ে দেখা দিল।

তখন ভোর। পাতিহাঁস-গিন্নি বাচ্চাদের নিয়ে জলায় নামার জোগাড় করছে। হঠাৎ আকাশের ওপর শোনা গেল, 'হুঁক! হুঁক!'

রাঙামুড়ি-সর্দার ছটফট করে উঠল।

'হুঁক! হুঁক!' হাঁসের দল চলেছে মাথার ওপর দিয়ে,—অনেক উঁচুতে, সেখানে পাতিহাঁসদের চোখ কোনও দিন পৌঁছবে না। পড়ে রইল রাঙামুড়ি-সর্দারের বাসা।

'হুঁক! হুঁক!' শব্দে ডেকে উঠে আকাশে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাঙামুড়ি-সর্দার আর তির্যক গতিতে বিদ্যুতের মতো মিলিয়ে যেতে লাগল ওপরের হাঁসের দলটাকে লক্ষ্য করে। যাযাবরকে আবার টেনে নিল পথে, পাহাড়ের মাথায় মাথায়! মরুভূমির বালির ওপর দু'টো ডানা মেলে সে এগিয়ে চলে।

সমুদ্রের জল লোনা কেন

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সমুদ্রের জল কখনো মুখে দিয়েছ? সমুদ্রের জল এত লোনা যে, মুখে দেওয়া যায় না। কি করে তার জল এত লোনা হলো?

অনেক—অনেক কাল আগের কথা।

বেণু আর ভানু দুই ভাই। বেণু বড়, ভানু ছোট। সমুদ্রের ধারে এক পাহাড়ের কোলে তাদের বাড়ি। স্বভাবে ও ব্যবহারে বেণু ও ভানুর মধ্যে কোনই মিল নেই। বড় ভাই বেণু কেবল কৃপণই নয়, অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর। কিন্তু ছোট ভাই ভানু ঠিক তার উলটো। তাই সবাই ভানুকে ভালবাসে।

যতদিন তাদের বাবা বেঁচে ছিলেন ততদিন বিশেষ কোন গণ্ডগোল ছিল না। কিন্তু বাবা মারা যেতেই বেণু ভানুকে পৃথক করে দিল। জমিজমা টাকাপয়সা সে আগেই আত্মসাৎ করেছে। থাকার জন্য ভানুকে দিল শুধু একখানা ভাঙা চালাঘর।

ভানু দাদাকে কিছু বলতেও পারলো না—প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা। সহজ-সরল প্রকৃতির মানুষ সে। বৌকে নিয়ে মনের দুঃখে সেই

ভাঙা কুঁড়েতেই বাস করতে লাগলো।

দিন যায়। কিন্তু ভানুর দিন আর চলে না। এত অভাব যে, কোন-কোন দিন উপোস থাকতে হয়। কোন সম্বল যার নেই, কী করেই বা তার দিন চলবে! শেষে একদিন ক্ষিদের জ্বালায় আর থাকতে না পেরে ভানু গিয়ে দাঁড়ালো দাদার দরজায়। বললে, "দাদা, ক্ষিদের জ্বালা আর তো সইতে পারছি নে। আমায় কিছু চাল ভিক্ষে দাও। দয়া কর, দাদা।"

দয়ামায়া কাকে বলে বেণু জানে না। চাল দেওয়া তো দূরের কথা, ছোট ভাইকে সে শুধু মারতে বাকি রাখলে, তাড়িয়ে দিলে দূর-দূর করে।

ভানু চোখ মুছতে-মুছতে মাথা নিচু করে দাদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। আর তার যাবার স্থান কোথায়—একমুঠো ভাতের জন্যে?

শেষ পর্যন্ত সে জাল নিয়ে সমুদ্রে গেল মাছ ধরতে। কিন্তু এমনি কপাল যে, সারা দিনে জালে একটা মাছও পড়লো না। বিকালবেলায় সে বাড়ি ফিরছে। অনাহারে শরীর অত্যন্ত দুর্বল। পা যেন চলছে না। হঠাৎ সে দেখলে, পথের পাশে গম পেষা জাঁতার একখানা পাথর পড়ে আছে। কাজে লাগতে পারে ভেবে, ভানু পাথরখানা জালে জড়িয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরলো।

ভানুকে দেখে বৌ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বললে, "কি! মাছ পেয়েছ? অনেক মাছ পেয়েছ বুঝি?"

চোখের জল চেপে ভানু বললে, "না, একটা মাছও পাইনি। ফিরবার সময় পথের পাশে গম-পেষা জাঁতার এই পাথরখানা পড়ে আছে দেখলাম, কুড়িয়ে এনেছি।"

বৌ কেঁদে ফেললে। কপাল চাপড়ে বললে, "হায় রে কপাল! ঘরে যার এককণা গম নেই, জাঁতা দিয়ে তার কি হবে? উপোস করে আর তো পারি নে।" বলতে-বলতে বৌ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো।

ভানুর আর সহ্য হলো না। সত্যিই তো, কি হবে এই পাথর দিয়ে? পাথরখানা উঠোনে ফেলে দিয়ে সে ক্ষোভে-দুঃখে তাতে দু'ঘা লাথি বসিয়ে দিলে।

অমনি এক তাজ্জব ব্যাপার! লাথি মারতেই পাথরখানা ঘুরতে শুরু করে। আর তা থেকে বের হয় সাদা-সাদা কিসের গুঁড়ো।

ভানু আর বৌ তো হতভম্ব। কিসের গুঁড়ো এগুলো? লবণ নাকি? পরীক্ষা করে দেখলে, হ্যাঁ তাই তো! দুধের মতো ধবধবে সাদা চমৎকার লবণ। ভানু ও বৌ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলে। আর তাদের পায় কে! দেশে লবণের খুব দাম। এরকম চমৎকার লবণের ব্যবসা করে তারা যে দুদিনেই কোটিপতি হয়ে উঠবে!

এদিকে জাঁতা কিন্তু বনবন করে ঘুরে চলেছে। আর তা থেকে লবণ বের হচ্ছে অবিরাম। দেখতে-দেখতে সেখানে লবণের পাহাড় জমে উঠলো। ভানু ও তার বৌ মহা ফাঁপরে পড়লো। জাঁতাটা কি করে থামানো যায়? কতভাবে তারা চেষ্টা করলে। কিন্তু না, জাঁতা থামে না। রেগেমেগে ভানু শেষে 'ধুত্তোর' বলে জাঁতাটা দিলে উলটে। ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে ফল—জাঁতা থেমে গেল। তারা বুঝলো, ঘুরোতে হলে জাঁতায় লাথি মারতে হবে, থামাতে হলে জাঁতা উলটে দিতে হবে।

তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। লবণের ব্যবসা করে ভানু এখন কোটি-কোটি টাকার মালিক। আরো নানারকম ব্যবসা করে সে বহু টাকা রোজগার করে। দাদার বাড়ি থেকে দূরে গিয়ে সে প্রাসাদের মতো বাড়ি করেছে, বহু জমিজমা করেছে। গরিব-দুঃখীদের সে মুক্তহস্তে দান করে। দেশের মঙ্গলের জন্যও তার অনেক দান। দেশের মধ্যে সে একজন বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি।

এদিকে বড় ভাই বেণুর অবস্থা কিন্তু খুবই সঙ্গীন। দেনার দায়ে তার জমিজমা প্রায় সবই বিক্রি হয়ে গেছে। ভানুর সৌভাগ্যের কথা তার শুনতে বাকি নেই। হিংসায় সে ছটফট করে। কিভাবে জাঁতাখানা হাত করা যায়, দিনরাত তার মতলব আঁটে।

শেষে একদিন সে ভানুর বাড়ি গিয়ে হাজির হলো। বিরাট বাড়ি, লোকজন, দাসদাসী, জাঁকজমক দেখে সে হকচকিয়ে যায়। অনেকদিন পরে দাদাকে দেখে ভানু ও তার বৌয়ের কিন্তু আনন্দ ধরে না। অন্তর দিয়ে তারা দাদার আদর-যত্ন করে।

সুযোগ বুঝে বেণু একসময় কথাটা পাড়লে। বললে, "ভানু, বড় কষ্টে পড়েছি, তাই একটা জিনিস চাইতে এসেছি তোর কাছে। তোর জাঁতাটা আমায় একটু ধার দিতে পারিস? কয়েকদিনের মধ্যেই আবার ফেরত দিয়ে

যাব।”

ভানু মহা ফাঁপরে পড়লো। জাঁতা হাতছাড়া করার কথা সে ভাবতেও পারে না। কিন্তু দাদা চাইলে সে না করে কী করে? তাই শেষপর্যন্ত তাকে রাজি হতে হলো।

মহানন্দে জাঁতা নিয়ে বেণু বাড়ি ফিরলো। তার তর সয় না। ঘরে ঢুকেই সে জাঁতায় লাথি মারলে। সঙ্গে-সঙ্গে জাঁতা ঘুরতে শুরু করে। আর তা থেকে বেরোতে থাকে লবণ আর লবণ। দেখতে-দেখতে ছোটখাট লবণের পাহাড় জমে উঠলো।

বেণু ঘাবড়ে গেল। এখনি জাঁতা থামানো দরকার। কিন্তু কী করে থামাবে? তাড়াতাড়িতে ভুল করে ভানুর কাছ থেকে সে থামানোর কায়দা জেনে আসেনি।

লবণের গাদা ততক্ষণে বাড়ির ছাদে গিয়ে ঠেকেছে। পাগলের মতো বেণু নানাভাবে চেষ্টা করে জাঁতা থামাতে, কিন্তু ফল হয় না। দেখতে-দেখতে লবণের চাপে ঘরের ছাদ ফেটে গেল। দেয়াল ভেঙে পড়লো হুড়মুড় করে।

কপাল চাপড়ে বেণু কাঁদে। বেণুর বৌ-ছেলেমেয়েও কাঁদে : হায়-হায়! শেষকালে বাড়িটাও গেল!

রাগে-দুঃখে কাঁদতে-কাঁদতে বেণু জাঁতাটাকে বারান্দায় নিয়ে এল। তারপর সেটাকে ঠেলে গড়িয়ে বের করে দিল বাড়ির বাইরে।

আশ্চর্য ব্যাপার! গড়িয়ে-গড়িয়ে জাঁতা চলতে শুরু করলো। গড়াতে-গড়াতে সে চললো পাহাড়ের উপর দিয়ে। পাহাড়ের পরেই সমুদ্র। জাঁতা পাহাড় থেকে গড়িয়ে সোজা সমুদ্রে গিয়ে পড়লো। ডুবে গেল জলের তলায়।

কিন্তু সমুদ্রের তলায় গিয়েও জাঁতা থামে না। গড়িয়ে-গড়িয়ে চলে, আর বনবন করে ঘোরে। আর তা থেকে অবিরাম বের হয় শুধু লবণ আর লবণ। আজো জাঁতা থামেনি। সেই কতকাল আগে থেকে আজো পর্যন্ত একভাবে লবণ বের হচ্ছে তা থেকে।

তাই তো সমুদ্রের জল এত লোনা।

রাজশ্রী

ইন্দিরা দেবী

নতুন মা যে তাকে একটুও ভালবাসেনা একথা যখনি মনে হয় তখনি রাজশ্রীর সুন্দর চোখ দুটি জলে ভরে যায়। সে ত খুব ভালবাসে মাকে। নতুন মা কী সুন্দর দেখতে, তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এতো সুন্দরের মধ্যে এত রাগ কেন? বিশেষ করে রাজশ্রীকে ত একেবারেই দেখতে পারে না,যখন তখন মারধর বকুনি। বলে—শ্রী নাম কে রেখেছে। শ্রী না বিশ্রী। রাজশ্রীর বাবা এ সব কিছু জানতেও পারেন না। তিনি ত রাজা। যখন অন্দর মহলে আসেন—রানী ছাড়া কেউ কাছে যেতে পারে না। অথচ নতুন মা আসার আগে বাবা অন্দর মহলে এসেই দাসীকে বলতেন, 'আগে রাজশ্রীকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' তারপর কতো আদর করতেন। কি-চাই জানতে চাইতেন। রাজশ্রীর দাসীকে কতো সাবধান করতেন মেয়ের জন্য। রাজশ্রীর ত মায়ের কথা মনেই পড়ে না। বাবাই তার সব কিছু ছিলেন।

কিন্তু এখন বাবা এলে রাজশ্রী যখন বাবার কাছে যেতে চায়, দাসী বলে, 'নতুন মা বারণ করেছেন, রাজাবাবু এখন কত ক্লান্ত হয়ে এসেছেন—তুমি যেও না। এসব কথায় রাজশ্রীর খুব অবাক লাগে। ভাবে বাবা ত আগে

এসেই তাকে ডাকতেন—এমন আর বেশী কি ক্লান্ত হয়েছেন। একদিন দাসীর কাছ থেকে জোর করে চলে গেলো সে নতুন মার ঘরে। বাবা সোনার থালায় পঞ্চাশ রকমের রান্না খাচ্ছেন, আর নতুন মা কাছে বসে কি বলছে। তাকে দেখেই বাবার মুখটা কি খুশি খুশি হয়ে উঠলো। কিন্তু তাঁর কাছে যাবার আগেই রানী চোখ মুখ কালি করে বললো,—'আবার তুমি খাবার সময় বিরক্ত করতে এসেছো? দাসী, তোরা আমার আদেশ অমান্য করেছিস কোন সাহসে?' নতুন রানীকে সবাই ভয় পায়। রাজার মুখটা করুণ হয়ে উঠলো। আর দাসী তাড়াতাড়ি এসে রাজশ্রীকে কোলে তুলে নিয়ে চলে গেলো।

এরপর থেকে নতুন মা রাজশ্রীর উপর আরও ক্ষেপে গেলো। অকারণে এতো মারে যে রাজশ্রীর দাসী পর্যন্ত মেয়েটার জন্য লুকিয়ে কাঁদে। সহ্য করতে না পেরে দাসীটা রাজাকে সব বলবে ঠিক করে। কিন্তু নতুন রানী এসব কি করে জানতে পেরে যায়। তার পরদিন অতো পুরনো দাসীর চাকরি গেলো। এবার রাজশ্রীর জন্য রানীর পছন্দ মতো দাসী বহাল হলো। নতুন দাসীকে ডেকে রানী বললো, 'এ বাড়িতে থেকে রাজশ্রী একেবারে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তুই ওকে অন্য একটা জায়গায় রেখে আসবি। আমি আগেই সব কিছু ঠিক করে রেখেছি।' এই বলে রানী চুপিচুপি অনেকগুলো কথা দাসীকে বললো আর রাজশ্রীকে ডেকে দিতে বললো। নতুন মা ডাকছে শুনে রাজশ্রী তো ভয়ে ভয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো। রানী বললো,—'তুমি এখানে থেকে একদম খারাপ হয়ে যাচ্ছো! দিনকতক তোমার এক দিদিমার কাছে বেড়িয়ে এসো।' মার মুখে একটু মিষ্টি কথা শুনে আর বেড়াতে যেতে পারবে ভেবে রাজশ্রী তো খুব খুশি। পরদিন সকালে নতুন দাসীর সঙ্গে রাজশ্রী রওনা দিল। কিন্তু যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। পথ ফুরতে চায় না। খিদে তেষ্টা তার উপরে প্রচন্ড গায়ের ব্যথায় রাজশ্রী আর চলতে পারে না। দাসীকে বলে, 'মা যে দিদিমার বাড়ি যেতে বললেন, কিন্তু আমরা এ কোথায় যাচ্ছি? কেবল বন আর বন—কোন লোক নেই—বাড়ি-ঘর কিছু দেখছি না। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, আমি ভীষণ ভয় পাচ্ছি।' দাসীর মনটা যতই কঠিন হোক, এই সুন্দর নিরপরাধ মেয়েটির কথা ভেবে তার মন কেমন করতে লাগলো। কিন্তু রানী তাকে যা বলেছেন সেই মত না করলে কাল সকালেই তার গর্দান

যাবে। সে শ্রীকে একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়ে বললো, 'তুমি কিছুক্ষণ বসো, আমি খাবার আর জল নিয়ে আসি।' শ্রী ভয়ে কেঁদে উঠলো। 'এখুনি আসছি—' বলেই দাসী প্রায় দৌড় দিল। তারপর? তারপর সময় বয়ে যায়। দাসী আর ফেরে না।

কেঁদে কেঁদে রাজশ্রী ঘুমিয়ে পড়লো। যখন চোখ মেললো, অবাক হয়ে দেখলো একটা বেশ সাজানো ঘরের মধ্যে পালংকের উপর সে শুয়ে আছে। কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ভীষণ ফুলে গেছে। খিদে তেষ্টায় উঠবার ক্ষমতা নেই তার। তবু ধীরে ধীরে রাজশ্রী উঠলো। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে...এক থুরথুরে বুড়ি লাঠি ঠুকে ঠুকে ঘরে ঢুকছে। চোখ প্রায় বন্ধ। মাথার চুল শণের নুড়ি। চেহারা কুৎসিত— দেখলে ভয় হয়। তবুও রাজশ্রী দৌড়ে গিয়ে বুড়িকে প্রণাম করে বললে, 'দিদিমা, মা আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে। আমি এখন থেকে তোমার কাছে থাকবো।' এ সময় খুব বেঁটে একটা লোক কোথা থেকে এসে উপস্থিত হলো। বুড়ি তার দিকে তাকাতেই সে বলে উঠলো— 'গাছের তলায় ঘুমোচ্ছিল— নিয়ে এসেছি।' বুড়ি বললো, 'বেশ করেছিস—কিন্তু সেটা কই? দাসীটা?' 'তাকে সরবৎ খাইয়েছি, তারপর কুকুরের ঘরে রেখে এসেছি। এখন একে কি করবো?' এসব কথা শুনে রাজশ্রীর ভয়ে বুক ঢিবঢিব করছে। বুড়ির কাছে ঘেঁষে বললো—'দিদিমা, আমি তোমার কাছে থাকবো। কোথাও যাব না। তোমার কাজ করবো।' রাজশ্রীর কথায় যে কি যাদু ছিল। বুড়ির বুকটা মুচড়ে উঠল হঠাৎ। বললো, 'হ্যাঁরে নাতনি, তাই হবে। এখন আয় আমার সঙ্গে।' বুড়ির পেছন পেছন একটা ঘরে ঢুকল রাজশ্রী। ঘরে কয়েক জায়গায় কয়েক ভাগ খাবার সাজানো। বুড়ি বললো, 'ক্ষিদে পেয়েছে তো? যা যে কোন এক ভাগ খেয়ে নে।' রাজশ্রী একভাগ খাবারের সামনে বসতেই বুড়ি কেমন হা—হা করে বলে উঠল—'ওটা নয়, ওটা নয়"—ওইটায় বস তুই, আমি এটায় বসছি।' রাজশ্রী খেতে খেতে বললো—'খাওয়া হলে আমি গায়ে পায়ে হাত বুলিয়ে দেবো—বুড়ো বয়সে কত কষ্ট পেয়েছো।' সুন্দর মেয়েটার মিষ্টি মধুর কথায় বুড়ির মনে যেন তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। বলে—'চল তোকে আমি খুব যত্ন করে রাখবো। একটা এত সুন্দর দুধের শিশুকে যে কষ্ট দিয়েছে—তাকে আমি সাজা দেবই।'

দিন যায়। মাঝে মাঝে বেঁটে লোকটা নানা জনকে ধরে আনার খবর বয়ে আনে। বুড়ি তাদের কাউকে খাবার দিতে বলে, কাউকে সরবৎ, কাউকে বা অন্য কিছু।

বুড়ির অনেক কিছুই রাজশ্রী বুঝতে পারে না। জিজ্ঞেস করলে বুড়ি কেবল বলে—'এসব তুই বুঝবি না নাতনি। তবে যতদিন আমি আছি তোর কোন ভয় বিপদ নেই।' একদিন লোকটা কোথাকার এক রাজাকে ধরে নিয়ে আসার খবর দিল। বুড়ি তাকে সরবৎ খাইয়ে কুকুরের ঘরে রেখে দিতে বললো।

আরও কটা বছর চলে গেলো! রাজশ্রী এখন বড়ো হয়েছে।

তার রূপ দেখে বুড়ির আর আশ মেটে না। একদিন রাজশ্রীকে বললো, —'নাতনি রে! এবার তোর বিয়ে দেব সুন্দর বর দেখে।' 'না দিদিমা! আমি তোমার কাছে থাকবো—কোথাও যাবো না।' বুড়ি বললো, 'কোথাও যেতে হবে না। আয় দেখি আমার সঙ্গে। বুড়ির পেছন পেছনে গিয়ে রাজশ্রী দেখলো একটা বড় ঘর—ঘরটা খালি পাথরের চাই-এ ভর্তি। বুড়ি তার হাতের লাঠিটা পাথরের গায়ে ঠেকাতেই অবাক কান্ড। হাই তুলে, গা ঝেড়ে সব উঠে দাঁড়ালো—কত দেশের রাজপুত্র।' বুড়ি বললো,— 'তোমরা সবাই মুক্তি পাবে, দেশে ফিরে যাবে। কেবল আমার নাতনি যাকে পছন্দ করবে—সে থাকবে। তার সঙ্গে বিয়ে দেবো নাতনির।' কিন্তু কেউ আর বিয়ে করতে চায় না, চলে যেতে পারলে বাঁচে। দেখে শুনে শ্রীও হতবাক হয়ে গেছে। এ'সময় বুড়ি হঠাৎ বামনটাকে কি বলে যেন ডাকলো। সে আসতেই বুড়ি কি বলে টুক করে তার গায়ে লাঠিটা ছোঁয়ালো, ওমা, ও-মা এ কি? রাজশ্রী অবাক হয়ে দেখলো তার সামনে অতি রূপবান এক রাজপুত্র দাঁড়িয়ে। বুড়ি বললো, 'ও হলো রূপনগরের রাজপুত্র, বড়ো ভাল ছেলে ছিল বলে পাথর করিনি। এর সঙ্গেই তোর বিয়ে দেবো। কি রে তোরা রাজী ত দু'জন?' দুজনেই লজ্জায় মাথা নিচু করে বুড়িকে প্রণাম করে। এবার বুড়ি মুখে কি একটা আওয়াজ করতে একটা প্রকান্ড কুকুর এসে দাঁড়ালো। কুকুরটার গায়ে লাঠিটা ছোঁয়াতেই রাজশ্রী অবাক হয়ে দেখে তার বাবা তার সামনে দাঁড়িয়ে। রাজামশাই রাজশ্রীকে বুকে জড়িয়ে ধর কাঁদতে লাগলেন। বুড়ির চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। রাজাকে বললে,—'মা মরা মেয়ে, একটুকুও খোঁজ নিতে নেই তোমার? প্রচন্ড

হিংসায় মেরে ফেলতে পাঠিয়েছিলো তোমার নতুন রানী আমার কাছে। কারণ ও আমায় চেনে।' রাজশ্রী আনন্দে বলে উঠলো—'বাবা এ আমার সত্যি দিদিমা। এর জন্য আমার সব হয়েছে।' রূপনগরের রাজারানী এলেন। যে সব রাজপুত্রেরা মুক্তি পেলো তারা দেশে গিয়ে নানা উপহার নিয়ে এসে উৎসবে যোগ দিলো। বুড়ি এক নগর বসিয়ে দিল—নাম হলো রাজশ্রী নগর। রাজা ফিরে এলেন মেয়ে জামাই নিয়ে। সারা রাজ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে যেতে লাগলো। রাজশ্রীর দাসী এলো। বুড়ি হয়ে গেছে। চোখে দেখে না। রাজশ্রীকে জড়িয়ে খালি কাঁদে আর কাঁদে। কিন্তু রানী কোথায়? রাজশ্রীকে মেরে ফেলতে পাঠিয়ে অত্যাচারে অত্যাচারে রাজাকে দেশ ছাড়া করিয়ে রানী সুখেই ছিল। কিন্তু এবার রাজশ্রীর অনুনয় বিনয় কিছুই শুনলেন না রাজা। কারাগারে কষ্টে জীবন বাইতে হলো হিংসুটে রানীকে।

আনন্দের মাঝে কিছুদিন কেটে যায়। কিছুদিন পর রাজা মারা গেলেন। এই রাজ্যে তার নামেই রূপনগর। বিরাট রাজ্যের রানী এখন আমাদের রাজশ্রী। অনেক দিন পরে হঠাৎ রাজশ্রীর দিদিমার কথা মনে পড়লো। কতদিন হয়ে গেলো—কোন খবর নেই মনে করে রাজশ্রীর লজ্জা হলো। সখীসহ একদিন সে হাজির রাজশ্রী নগরে। 'দিদিমা, দিদিমা! দিদিমা গো!' রাজশ্রী ডেকে ডেকে সারা। বাড়ি খালি। খুঁজে খুঁজে বাগানের দরজা খুলে বড়ো পুকুরটির কাছে গিয়ে দেখে বুড়ি সেখানে বসে। চোখ দিয়ে জল পড়ছে। রাজশ্রী দু'হাতে দিদিমাকে জড়িয়ে ধরলো। দিদিমা, আমার উপর বড় রাগ করেছো।' বুড়ি দুর্বল হাতটা মাথার উপর রেখে বললো—' আমার মরার সময় হয়েছে। আর তোর উপর কি আমি রাগ করতে পারি? এক দেবতার শাপে ডাইনি হয়েছিলাম। দেবতার কাছে অনেক কাঁদলাম। তখন দেবতা বললেন,—যদি কোনদিন কাউকে একান্ত ভাবে ভালবাসতে পারো, তা হলেই এই ঘৃণিত জীবন থেকে মুক্তি পাবে। যাই হোক, এই লাঠিটা এবার পুকুরের জলে ফেলে দে তুই। তা হলে আমার মুক্তি। তোকে আমি আশীর্বাদ করছি।'

বুড়ির হাতের লাঠিটা জলে ফেলে দিতেই বুড়ির দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেল। রাজশ্রী দেখলো বুড়ি তো নয় অপূর্ব সুন্দরী একটা মেয়ে গাছের তলায় যেন ঘুমিয়ে রয়েছে। রাজশ্রীর চোখ থেকে টপ-টপ করে জল পড়তে লাগলো।

বুড়ি মায়ের মোরগ ছেলে

মহাশ্বেতা দেবী
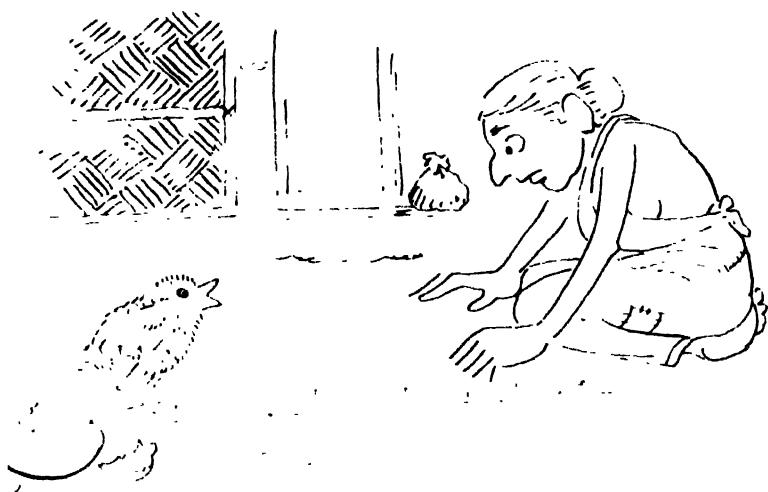
সে অনেক কাল আগেকার কথা। এক গরিব গ্রামে ছিল এক গরিব বুড়ি। বুড়ির যে সাতকুলে কেউ ছিল না। যতদিন পেরেছে, বুড়ি কাঠ কুড়িয়েছে, ঘুঁটে দিয়েছে। কিন্তু থুরথুরে বুড়ি হতে সে তো আর কাজ করতে পারে না। বড় দুঃখে বুড়ি ভিক্ষে করা শুরু করল।

গ্রামের মানুষও তো বড়ই গরিব। তারা কেমন করে রোজ ভিক্ষে দেয় তাই বলো। একদিন কেউ ভিক্ষে দিতে পারল না। শুধু একটি বউ বলল, বুড়ি মা! আমার ঘরে আজ তো কিছুই নেই তবু বুড়ো মানুষ তুমি! এমন আগুনঢালা দুপুরে খালি হাতে ফিরে যাবে? একটা ডিম আছে, তা নাও।

—তাই দাও বাছা!

ঘরে গিয়ে বুড়ি ভাবছে, আজ নয় উপোস করে থাকি। কাল ডিমটা খাব। এই ভেবে সে যত্ন করে ডিমটা তুলে রেখেছে। ও মা! সকাল হতেই চিক-চিক শব্দ! বুড়ি দেখে ডিম ফুটে একটা মোরগ বেরিয়েছে। এতটুকু ছানাটি। দেখলেই মায়া হয়। তখনি বুড়ি ঠিক করল যে মোরগটিকে বাড়িতে রাখবে।

ভিক্ষের ক্ষুদ-কুঁড়ো খাইয়ে-খাইয়ে বুড়ি তো মোরগকে বড় করল। বড় হতে-হতে সে মানুষ সমান উঁচু হল। এখন আর বুড়ি তাকে খেতে দেয় না। পোকামাকড় ক্ষেতকুড়ানো গমের দানা সে নিজে জোগাড় করে। একদিন সে মাকে বলল, কাল আমি কাজ করতে যাব।

—ওমা! মানুষ কাজ পায় না, তুই কোথা থেকে কাজ পাবি যে করবি?

—সে তুমি দেখো।

পরদিনই মোরগ গিয়ে হাজির ভিনগাঁয়ের মোড়লের বাড়ি। মোড়লের মাঠ জোড়া ধানক্ষেতে ধান কাটার ব্যবস্থা হচ্ছে। মোরগ বলল, আমাকে ধান কাটতে দেবে?

—তুমি পারবে?

—পারি কি না পারি দেখে নিও।

মোড়ল আর তার লোকজনেরা খানিক ধান কেটে বাড়িতে গেছে নাইতে খেতে। ফিরে এসে দেখে তাজ্জব ব্যাপার। সব ধান কেটেছে মোরগ। বয়ে নিয়ে গেছে গোলায়। তারপর উঁচু গাছের ডালে বসে আছে।

মোড়ল অবাক মানল। তারপর বলল, ভাই! যেদিন ধান মাড়াই হবে, সেদিন এসো। যত কাজ করেছ, তার দাম আমি ধান দিয়ে শোধ দেব।

মোরগ বাড়ি ফিরে এল। বুড়ি বলল। কি কাজ করলি, কত পয়সা পেলি?

—মা! ধানমাড়াইয়ের দিনে মজুরি পাব।

ধানমাড়াইয়ের দিনে মোরগ তো গিয়ে হাজির। দেখে তার জন্যে অনেক ধান রেখেছে মোড়ল।

—কি ভাই! বস্তা তো আনোনি। এত ধান তুমি নেবে কেমন করে বলো তো?

—ভাই! আমি মাথা হেলাচ্ছি। আমার কানের ফুটোয় ধান ঢেলে দাও।

—তোমার কানের ফুটোয় কত ধান ধরবে?

—যতটা ধরবে ততটাই নেব।

মোড়ল ভাবল তো, মোরগটা কাজ করতে পারে। কিন্তু বুদ্ধি তার নেই। একমুঠো ধান ঢাললেই ওর কানের ফুটো ভরে যাবে। এ একরকম

ভালই হল।

মোড়ল আর তার লোকেরা মোরগের কানের ফুটোয় ধান ঢালছে তো ঢালছেই। ফুটো আর বোজে না। শেষে সব কটি ধান নিয়ে তবে মোরগ বাড়ি এল।

বুড়ি বলল, বাছা! এত কাজ করলে সেদিন, আজ শুধু হাতে বাড়ি এলে?

—তাই কখনো আসি?

মোরগ মাথা কাত করে দিতেই ধান পড়তে থাকল। ধান পড়ে-পড়ে পাহাড়সমান উঁচু হল। তখন বুড়ির আনন্দ দেখে কে! আর তো ভিক্ষে করব না। আর কষ্ট পাব না। সব দুঃখই ঘুচে গেল।

মোরগ বলল, মা! এবারে আমাকে বিয়ে দাও। এত ধান সিদ্ধ করতে হবে, শুকোতে হবে, ভানতে হবে। তবে তো চাল হবে। এত কষ্ট তুমি একা কেন করবে? বউ আসুক, সে তোমার সাহায্য করবে।

বুড়ি তো বউ খুঁজতে বেরোল। কিন্তু যাকেই এ কথা বলে, সেই বলে, ও মা! মোরগের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব কেমন করে? মোরগ কি রোজগার করবে। না বউকে খেতে দেবে? সে কখনো হয় না বাছা।

বুড়ি তো ফিরে এল। মোরগ বলল, কি গো মা! মোরগের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে কেউ রাজি নয়? দাঁড়াও, আমি নিজেই নিজের বউ জোগাড় করব।

পরদিন সকালে মোরগ বেরিয়ে পড়ল বউয়ের খোঁজে। সে তো চলেছে হনহনিয়ে। পথে এক শিয়ালের সঙ্গে দেখা। শিয়াল বলছে, মোরগ ভাই, যাচ্ছ কোথায়?

—বিয়ে করতে যাচ্ছি ভাই।

—চলো, আমিও বরযাত্রী হয়ে যাই।

—চলো না, সে তো ভাল কথা

—তা, বরয়াত্রী হয়ে কি হেঁটে যাব?

—কেন, আমার কানের মধ্যে ঢুকে পড়ো।

—শেয়াল তখনি কানের ফুটোয় ঢুকে গেল। মোরগ চলছে তো চলছে,

এক বাঘের সঙ্গে দেখা।

—এমন ব্যস্ত হয়ে চলছ কোথায়?

—বিয়ে করতে যাচ্ছি ভাই।

—চলো চলো, আমিও যাব। তবে বাঘ দেখে ভয়ের চোটে মেয়ে পালাবে না তো?

—তুমি আমার কানের ফুটোয় ঢুকে পড়ো।

একে-একে বরযাত্রীর দলে জুটল এক দঙ্গল বোলতা, আগুন আর জল। মোরগ তো সামান্য মোরগ নয়। সকলকেই কানের ফুটোয় ঢুকিয়ে নিল।

সামনে এক গ্রাম। সে গ্রামের রাজার মেয়েরা কেউ ধান ভাঙছে, কেউ কাঠ কাটছে, কেউ বাগান কোপাচ্ছে। তা দেখে মোরগ ভাবল, এমনি মেয়েই আমার দরকার। খাটতে পারবে, হাসিমুখে কাজ করবে, রাজাটা কেমন লোক কে জানে! দেখাই যাক।

শিমুল গাছের ডালে বসে মোরগ হেঁকে বলল, কোঁকর কোঁকর কোঁ! বলি অ রাজামশাই! ভালয়-ভালয় আমায় সঙ্গে একটি মেয়ের বিয়ে দেবে। না আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে? যুদ্ধ করলে তুমি হেরে যাবে তা তো নিশ্চয়। তার চেয়ে একটা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দাও।

রাজা বললেন, এমন কথা? কে কোথায় আছিস? মোরগটাকে ফেলে দে তো গুড়ের জালার মধ্যে। হাবুডুবু খেয়ে মোরগটা মরে যাক।

যেমন কথা। তেমন কাজ! রাজার লোকজনরা মোরগকে ধরে গুড়ের জালায় ফেলল। মোরগ তখনি বোলতার দঙ্গলকে বের করে দিল। ভাই! বরযাত্রী এনেছি। চেটেপুটে গুড় খেয়ে নাও; একরত্তিও ফেলে রেখো না।

বোলতার দঙ্গল তো মহাখুশি। তারা গুড় খেয়ে শেষ করে দিল। মোরগ বেরিয়ে এসে আবার গাছের ডালে বসল। রাজা তা দেখে খুব রেগে গেলেন। এমন সোনারাঙা খাসা গুড়। তা সব ওই মোরগটা খেয়ে ফেলল? দে ওকে ছাগলের খোঁয়াড়ে ফেলে। আমার ছাগলগুলো ওকে পা ঠুকে-ঠুকে মেরে ফেলুক।

এই বলে রাজামশাই ঘুমোতে গেলেন। মোরগ তখনি শেয়ালকে বের করে আনল। ভাই! বরযাত্রীকে খাওয়াতে হয়। তা এই তোমার খাসা বন্দোবস্ত।

শেয়াল তো মহাখুশি! সে আগেই সবগুলো ছাগলকে মেরে ফেলল। তারপর পেট পুরে মাংস খেয়ে বনে চলে গেল। বলে গেল। ভাই! অনেক বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে গেছি বটে। তবে এমন ভোজ কখনো খাইনি। তোমার কথা আমার খুব মনে থাকবে।

পরদিন রাজামশাই রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। একটা সামান্য মোরগ। সে কি না বারবার তাঁকে জব্দ করবে? এবারে ওকে আমার মোষের গোহালে পুরে দাও। আমার মোষগুলো যেমন জোয়ান, তেমনি বড়। ওরা ওকে সিং দিয়ে মেরে ফেলবে।

তোমরা ভাবছ, মোরগটাকে রাজা নিজে কেন মারতে গেলেন না। রাজা হলেন অহংকারী মানুষ। সামান্য একটা মোরগকে মারলে তাঁর তো মানহানি হবে। লড়াই হয় সমানে-সমানে। রাজা নয়, বীর যোদ্ধা নয়। সামান্য একটা মোরগকে মেরে তিনি কি মান খোয়াবেন?

মোষের গোহালে ঢুকেই মোরগ বাঘকে বের করে দিল। ভাই! কত খেতে চাও খাও। মোষের মাংস কত ভাল তা তো তুমি ভালই জানো।

বাঘকে পায় কে? সব কয়টা মোষের ঘাড় মটকে সবচেয়ে মোটা মোষটার মাংস পেট পুরে খেয়ে বাঘ বলল, ভাই! তোমার বিয়ের ভোজের কথা চিরকাল মনে রাখব। বিয়ে না হতেই এমন ভোজ খাওয়ানো। এমন কথা শোনাই যায় না।

পরদিন সকালে রাজা রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন। বললেন। ওরে হতভাগা! তোকে আমি নিজেই মারব এবারে।

মোরগ উড়ে গিয়ে শিমুল গাছের ডালে বসল। আগুনকে বের করে এনে বলল, 'ভাই! এবারে তুমি রাজবাড়িটা খেতে শুরু কর।'

রাজবাড়ি জ্বলে উঠতে রাজা তো ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেন। এতো সামান্য মোরগ নয়। আগুন যদি জোরে জ্বলে, তাহলে সব তো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এবারে তাঁর সুবুদ্ধি হল। হাতজোড় করে তিনি বলতে থাকলেন, ও মোরগ! আগে বুঝতে পারিনি তুমি কত শক্তিশালী। তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব। সে তো আমার সৌভাগ্য। এখন দয়া করো, আগুন নেভাও। সব যদি জ্বলে যায়। তাহলে বিয়ে দেব কেমন করে?

মোরগ তো এই কথাই শুনতে চাইছিল। কান থেকে জল বের করে

সে আগুন নিভিয়ে দিল। এবারে সে মহানন্দে গাছ থেকে নেমে এল।

তারপর রাজার এক মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হল। রাজা তো ভারে-ভারে চাল, গম, ভুট্টা, গুড়, লবণ, তেল, এমন কতকিছু যৌতুক দিলেন। বিয়ের সভায়, বাঘ, শিয়াল, আগুন, জল আর বোলতাও এল। বাঘ বলল, 'জীবনে তোমার বাড়ির কোন মানুষকে বাঘে খাবে না।'

শিয়াল বলল, 'তোমার বাড়ির কোনো ছাগল-ভেড়া শিয়ালের পেটে যাবে না।'

বোলতা বলল, 'তোমার বাড়িতে কখনো বোলতার পাখার গুঞ্জন শুনতে পাবে না।'

আগুন বলল, 'তোমার ঘরে কখনো আগুন লাগবে না।' আর জল বলল, 'সারা দেশ বানের জলে ভেসে যাক। তোমার ঘর ঠিক থাকবে।'

মোরগ যখন বউ আর বিয়ের যৌতুক নিয়ে মায়ের কাছে পৌঁছল, তখন তার মায়ের আনন্দ কতখানি হল সে কি বলা যায়? বুড়িমা তার গরিব গ্রামের সকলকে নেমন্তন্ন করে ভাত, ডাল, পিঠে আর গুড় খাওয়াল। এরাই তো এতদিন ভিক্ষে দিয়ে ওকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। গ্রামের সবাই বলল, বুড়ি মা! এতদিন অনেক দুঃখ করেছ। এবারে তুমি সুখ করো।

বুড়িমা হাসতে গিয়ে কেঁদেই ফেলল।
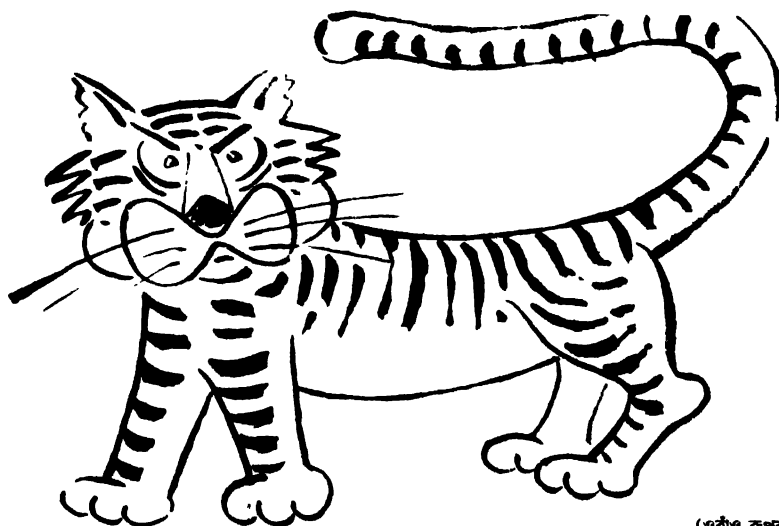
(ওরাঁও রূপকথা)

এর নাম ভগবানের হাত

শৈলেন ঘোষ

রাজা কাক্কাবোক্কা যখন অকাতরে ঘুমোন তখন যা দেখতে লাগে! সেই সময় যদি আবার ভোরের হাওয়া ফুরফুর করে বয়ে যায়, তাহলে তো আর কথাই নেই। শোবেন তিনি চিত হয়ে। নাক ডাকাবেন ভুরভুর করে। নিশ্বেসের তালে-তালে পেটটি একবার উঠবে একবার নামবে। দেখলে হেসে মরে যাই।

তা দেখি না তোমার মুরোদ! একটু হাসো! রাজার যদি ঘুম ভেঙে যায়, আর, তোমাকে হাসতে দ্যাখেন, ব্যস, ঘটে যাবে মহাপ্রলয়। তোমার হাসা তো চুকে যাবেই, এমন কী প্রাণটিও যদি ফুস হয়ে যায়, কিছু বলার নেই। কে বলবে? যে বলবে সেও মরবে। শখ করে কে আর মরতে চায় বলো?

কেন, একবার তো হলোও তাই। হলো-তো-হলো সেই মন্ত্রীমশায়ের ওপরই হলো। তা ঠিক আছে, তুমি ঘুমাচ্ছ, নাক ডাকাচ্ছ, কি থেকে-থেকে ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করছ, এসব দেখে না-হয় নাই হাসলুম। কিন্তু তুমি যদি একটি বাছুরের পেছনে ছুটতে গিয়ে লাথি খাও! কিংবা ধরো লাথি খেয়ে চিতপটাং হয়ে ছিটকে পড়ো, তখন কে না-হেসে থাকে শুনি! তার

ওপর তুমি রাজা। তা, রাজা বাছুরের লাথি খাচ্ছে, ডিগবাজি মারছে, আর আমরা তাই দেখে প্যাঁচার মতো মুখ ভার করে বসে আছি, এমন কথা কে কবে শুনেছে! তুমি হয়তো শুনলে অবাক হবে, যে-বাছুরটির কথা বলছি, সেটি রাজার চোখের সমুখেই জন্মাল। রাজার পাশেই ছিলেন মন্ত্রীমশাই। তাঁকে কিছু না বলেই রাজা ধরতে গেলেন বাছুরটিকে। কী আশ্চর্য, বাছুরটি সঙ্গে-সঙ্গে তিড়িং-বিড়িং শুরু করে দিলে! ব্যাটার নাকে পৃথিবীর নোংরা-হাওয়া সেঁদুতেই বাছুর চার-পা তুলে নাচ জুড়ে দিলে! শাবাশ! তা, তুমি রাজা! তুমিও তার সঙ্গে নাচানাচি শুরু করে দিলে কী বলে! ঘরে রাজলক্ষ্মী আছে। গাছে কাক-পক্ষী আছে। পাশে মন্ত্রী আছে। ছিঃ, ছিঃ, রাজার মান-সম্মান বলে তো একটা 'ইয়ে' আছে! তা তুমি সেসব কিছু মানবে না! তুমি কী বলে বাছুরের সঙ্গে নাচো! বলতে নেই, রাজাকে বাছুরের সঙ্গে নাচতে দেখে গোশালের লোকজন একটুও হাসেনি। অবিশ্যি তারা ভেতরে-ভেতরে হাসছিল কিনা, তা বাপু তাদের ভেতরে না ঢুকলে কে বলবে! কিন্তু রাজাকে বাছুরের লাথি খেতে দেখে মন্ত্রীমশাই আর থাকতে পারেননি। তার ওপর বাছুরের লাথির ধাক্কায় রাজামশাই যখন আছাড় খেলেন, তখন মন্ত্রীমশাই একেবারে অট্টহাস্য করে উঠলেন, হা-হা-হা!

ব্যস! সেই হা-হা-হা থেকেই শুরু হয়ে গেল হাহাকার। সিপাই-সান্ত্রী ছুটল রাজাকে সামাল দিতে। দাস-দাসী ছুটল রানীকে খবর দিতে। পাত্র-মিত্র ছুটল রাজ-কবিরাজকে ডাক দিতে। সে এক হুলুস্থূল কাণ্ড! কিন্তু মন্ত্রীমশায়ের 'হা-হা' শুনে কোন ফাঁকে যে রাজা কাক্কাবোক্কা মন্ত্রীর মুখের দিকে কটমট করে চোখের দৃষ্টি হানলেন, সে এক মন্ত্রমশাই ছাড়া আর কেউ টের পেল না। রাজা কাক্কাবোক্কার সেই ভয়ঙ্কর চক্ষু দেখেই মন্ত্রীমশায়ের রক্ত হিম। আর হাসি! এবার ফাঁসির হুকুম হলো বলে!

খুব রক্ষে বলতে হবে। কপালের জোর না থাকলে এমন বিপদ থেকে মানুষ বাঁচে না। কেননা, অমন কটমট করে তাকিয়েই ঝপ করে চোখ বোজালেন রাজা কাক্কাবোক্কা। আসলে, তিনি যে শখ করে চোখ বোজালেন, তা যেন ভেবো না। তিনি মূর্ছা গেলেন। বাছুরের লাথি খেয়ে এক আছাড়েই রাজার কম্ম সারা। রাজার কাঁকাল ভাঙল, না, ঘাড় মটকাল সেটা তৎক্ষণাৎ বলবার মতো কবরেজ তখনও সেখানে উপস্থিত হননি। তিনি হয়তো

তখনও পথে ছুটছেন। সেই ফাঁকে রাজাকে চ্যাংদোলা করে ঝুলিয়ে আনা হলো গোশাল থেকে তাঁর শয়নকক্ষে।

মন্ত্রীর তখন দুরু-দুরু বুক। মুখখানা তাঁর রোদে-পোড়া শুঁটকি মাছের মতো চিমসে গেছে। তাঁর মনের ভেতরটা যতবারই 'হে ভগবান, হা ভগবান' করে কেঁদে উঠছিল, ততবারই তাঁর চোখের ওপর রাজা কাক্কাবোক্কার সেই কটমট করা চাউনিটা ভেসে-ভেসে উঁকি মারছিল। রাজা যদি অক্কা পান, তবে, তিনি যে ভূত হয়ে মন্ত্রীমশায়ের ঘাড় মটকাবেন, এ-কথাটা একজন উদোও জানে। তেমনি তিনি যদি চক্ষু কপালে না তোলেন, তবে, মন্ত্রীমশাইকে যে মন্ত্রিত্ব খুইয়ে রাস্তায়-রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে হবে, এটাও কারো অজানা নয়। এহেন অবস্থায় রাজা কাক্কাবোক্কার মরা না বাঁচা কোনটা উচিত, মন্ত্রীমশাই সেটা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলেন না। তবে, বাছুরের লাথি খেয়ে একজন রাজা পটল তুলবেন, এটা কখনই মেনে নেওয়া যায় না। বিশেষ করে রাজা যখন মানুষ। বাছুরের ঠ্যাং-এর ঠোক্করে রাজা নামের এই মানুষটি মরলে, পৃথিবীতে অন্য রাজারা মুখ দেখাবেন কেমন করে! তবে কি মনে করতে হবে, মানুষের ক্ষমতার চেয়ে বাছুরের লাথির তাকত বেশি?

যাকগে যাক, সে যাই হোক, আনন্দের কথা হচ্ছে রাজা কাক্কাবোক্কা বেঁচে গেছেন। বোঝা গেল, তাঁর আঘাতটা তেমন গুরুতর নয়। কেন না, রাজা আপনা-আপনিই জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন। আরও আনন্দের খবর হচ্ছে, তাঁর কোমর-কাঁকাল অটুট আছে। ভাঙা-ফাটার লক্ষণ নেই। এটাও একটা কম তাজ্জব ব্যাপার নয়। রাজা কাক্কাবোক্কার অতবড় দেহটা ধপাস করে পড়ল, অথচ ফটাস করে ফাটল না, এ যেন বিশ্বাসই করা যায় না। তবে রাজার জ্ঞান ফিরতে একটু সময় নিয়েছে। তা নিক। তিনি যে শেষপর্যন্ত কথা কইতে পেরেছেন, এও কম কথা নয়!

জ্ঞান ফিরতে, প্রথমেই রাজা একটি ঢোঁক গিলে রানীর মুখের দিকে চোখ ফেরালেন। রানী আঁকপাঁকিয়ে রাজার মুখের দিকে ঝুঁকে পড়তেই রাজা ফোঁস করে উঠলেন। মানে, নিঃশ্বাস ফেললেন। রানী চমকে উঠে 'আউ' করে ছিটকে গেলেন। রাজা তারপরই কথা কইলেন, 'এখন কত রাত?'

রানী তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে রাত তো

নয়, এখন দুপুর।'

রানীর উত্তর শুনে রাজা অবাক চোখে এদিক-ওদিক তাকালেন। তারপর বললেন, 'ছিঃ ছিঃ, আজ আমি একদম ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। বেলা দুপুর হয়ে গেল!'

রানী বললেন, 'না রাজামশাই, আপনি ঘুমিয়ে পড়েননি, আপনি গড়িয়ে পড়োছলেন।'

রাজা কাক্কাবোক্কা উত্তর দিলেন, 'ওই হলো, যাহা ঘুমোন, তাহাই গড়ান।'

রানী ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার বুকে-পিঠে ব্যথা হয়নি তো?'

রাজা কাক্কাবোক্কা গোঁফভর্তি নাকের নিচটা দুবার নাচিয়ে নিয়ে ঝপ করে উঠে বসলেন। বসেই তিনি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। কেননা, তিনি দেখলেন, একঘর লোক তাঁর দিকে উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে। দেখলেন, পাত্র-মিত্র, সভাসদ, সেনাপতি, সান্ত্রী-সেপাই সবাইকে। মন্ত্রীমশাই তো আছেনই। রাজা অস্ফুটস্বরে রানীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার?'

রানী বললেন, 'আপনাকে দেখতে এসেছেন।'

'কেন?'

রানী উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে আপনি এঁদের রাজা। আপনি দুর্ঘটনায় পড়লে, এঁরা তো দেখতে আসবেনই।'

'দুর্ঘটনা!' রাজা যেন আকাশ থেকে পড়লেন, 'কীসের দুর্ঘটনা?'

মন্ত্রীমশাই ঝট করে এগিয়ে এসে বলে বসলেন, 'আজ্ঞে আপনি বাছুরের লাথি খেয়ে এরই মধ্যে ভুলে গেলেন।'

আচ্ছা, কথাটা আগ বাড়িয়ে তোমার বলার কী দরকার ছিল! আরে বাবা কথা হচ্ছে রানীর সঙ্গে রাজার, তোমায় কে ওস্তাদি করতে বলেছে! কপালে দুর্ভোগ থাকলে কে তাকে খণ্ডাবে! বাছুরের লাথি খাওয়ার কথাটা হয়তো রাজা ভুলেই যেতেন। হয়তো ভুলে যেতেন মন্ত্রীমশায়ের সেই হা-হা করে হাসির কথাটাও। এখন আবার সেই মন্ত্রীই খুঁচিয়ে ঘা করে বসলেন। রাজার চোখ আবার ঝলসে উঠল। কটমটিয়ে উঠল তাঁর চোখের দৃষ্টি। চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরোচ্ছে। সেই মূর্তি দেখেই তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া। পালা, পালা! ঘরভর্তি লোক চোখের পলকে হাওয়া! মন্ত্রী,

সান্ত্রী, সিপাই-সৈন্য, যে যেখানে ছিল, মারল ছুট।

তাদের যেই না ছুটতে দেখা, অমনি রাজার চিৎকার, পাকড়ো! বলেই, ধপাস করে আবার বিছানায় গড়াগড়ি।

ঘরে তখন শুধু রানী একা। তিনি ব্যস্ত হলেন। রাজার কানের কাছে মুখ এনে আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহারাজ, আপনার কি আবার মূর্ছা, মূর্ছা লাগছে?'

'না-আ-আ!' চিল চেঁচিয়ে উঠলেন রাজা, মন্ত্রীকে পাকড়ে আনতে বলো!

তা, হুকুম বলে হুকুম, রাজার হুকুম। সঙ্গে-সঙ্গে কাজ। অবশ্য মন্ত্রীকে পাকড়াতে হলো না। রাজার হুকুম মন্ত্রীর কানে সেদুঁতেই তিনি নিজেই উপস্থিত। সেই সময় রাজার সামনে উপস্থিত হওয়া তো নয়, যেন জলহস্তীর মুখের গর্তে মুণ্ডু পেতে দেওয়া। তা.হলে কী! উপায় তো নেই। মন্ত্রীমশাই মাথা হেঁট করে রাজার সামনে দাঁড়ালেন। ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন ভয়ে। তা এইরকম একজন বুড়ো মানুষকে অমন করে হাঁপাতে দেখে রানীর নিজেরই এমন লজ্জা-লজ্জা পাচ্ছিল যে, তিনি আর ঘরে থাকতে পারলেন না। পাছে মন্ত্রীমশাই তাঁর লজ্জাটা দেখে নিজে লজ্জা পান, তাই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এই রে, এইবারেই বিপদ! তবু ঘরে একটা মানুষ ছিল। যদিও রানী মেয়েমানুষ, তবুও মানুষ তো বটে। রাজা উল্টোপাল্টা কিছু বললে, রানী কি আর মন্ত্রীর হয়ে দু-একটা কথা বলতেন না! নিশ্চয়ই বলতেন। কিন্তু এখন! হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

হঠাৎ রাজা কাক্কাবোক্কা মন্ত্রীকে খোঁচা মারলেন, 'কী হলো? বরের মতো মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আর একবার হা-হা করে হাসুন।'

মন্ত্রীমশাই কথা বলতে সাহস করলেন না।

রাজা কাক্কাবোক্কা এবার গাঁক করে উঠলেন, 'ভাবছেন, মুখে কুলুপ এঁটে দাঁড়িয়ে থাকলে পার পেয়ে যাবেন। বাছুরে আমার লাথি মেরেছে, এবার আমি আপনাকে'—পরের কথাটা বলতে গিয়েও তিনি বললেন না। কেননা, তাঁর মনে হলো রাজার মুখে এমন কথা শোভা পায় না। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে অন্য কথা পাড়লেন, 'আমাকে বাছুরে লাথি মেরেছে, এ কথাটা রানীর সামনে

কে আপনাকে বলতে বলেছিল? জানেন না, রানীর সামনে এমত কথাবার্তা হলে রাজা-বাদশারা কতখানি অপমানিত বোধ করেন?'

মন্ত্রীমশাই এবার মাথা তুলে রাজার মুখের দিকে চাইলেন। চোখদুটি তাঁর পিটপিট করে উঠল। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'আজ্ঞে তিনি তো আমাদের সকলের মহারানী। আমাদের সকলের মা।'

'আপনাদের সকলের মা হাত পারেন, কিন্তু তিনি তো আর আমার মা নন!' রাজা কড়কে উঠলেন। 'তিনি মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষের সামনে মুখ ফসকে যে কোনো কথা বলা উচিত নয়, এ বুদ্ধিটা আপনার এখনও হলো না!'

'কিন্তু মহারাজ, আপনি যে বাছুরের লাথি খেয়েছেন, এ কথাটা তো মিথ্যে নয়।'

'চোপ!' চিৎকার করে ধমকে উঠলেন রাজা কাক্কাবোক্কা। 'কে বলেছে আমি বাছুরের লাথি খেয়েছি। ডাহা মিথ্যে কথা।'

'আজ্ঞে রাজ্যসুদ্ধু সবাই জানে।' খুবই ভয়ে-ভয়ে উত্তর দিলেন মন্ত্রী।

'সবাইটা জানল কেমন করে?' তেমনি তিরিক্ষি মেজাজে জিজ্ঞেস করলেন রাজা।

মন্ত্রী বললেন, 'আজ্ঞে আপনি রাজা। এমন একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা সে কি চাপা থাকে!'

রাজা হুঙ্কার ছাড়লেন, 'আমি বুঝতে পেরেছি, আমার নামে এইসব মিথ্যে কথা আপনিই রটিয়েছেন।'

রাজার হুঙ্কার শুনে মন্ত্রীমশাই ভয়ে ব্যস্ত হয়ে বলে ফেললেন, 'আপনি কিছুই বুঝতে পারেননি মহারাজ।'

আগুনে যেন ঘি পড়ল। রাজা কাক্কাবোক্কা দপ করে জ্বলে উঠলেন। বললেন, 'বলেন কী, আমি কিছুই বুঝতে পারিনি! এ্যাঁ! এর পরে বলবেন, বাছুরটা জন্মেই উঠে দাঁড়াল, এটা আমি বুঝতে পারিনি! উঠে দাঁড়িয়েই সে ছুটতে আরম্ভ করল, এই আজব ব্যাপারটাও আমি বুঝতে পারিনি। ছুটতে-ছুটতে সে লাফাতে লাগল, আমি তাকে ধরতে গেলুম, সে আমাকে লাথি মারল, আমি তাও বুঝতে পারিনি! ভাল!'

হঠাৎ মন্ত্রীমশাই রাজা কাক্কাবোক্কার কথার শেষে খুবই উৎসাহে চেঁচিয়ে

উঠলেন, 'এই তো মহারাজ, আপনি নিজেই তো স্বীকার করছেন বাছুরটা লাথি মেরেছে।'

রাজা চটে লাল, 'আপনার আস্পর্ধা তো কম নয়। আপনি আমাকে মিথ্যুক ঠাওরান। লাথি খাওয়া আর লাথি মারা এক হলো। আমি তো আপনাকে লাথি মারার কথা বলেছি। লাথি খাওয়ার কথা তো বলিনি। আপনিই তো লাথি খাওয়ার কথা বলছেন।'

রাজার কথা শুনে মন্ত্রীমশাই কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। তাঁর কেমন যেন ধাঁধা লেগে গেল। তিনি কী বললেন, না বলবেন ভেবে ওঠার আগেই রাজা কাক্কাবোক্কা বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে আমি আপনার পেটে একখানি ঘুষো মারি। আপনার বিবেচনায় সেটি যদি খাওয়া হয়, তবে নিশ্চয়ই আপনার পেটও ভরবে।'

মন্ত্রীমশাই ঢোঁক গিললেন। বলে উঠলেন, 'আজ্ঞে এ ক্ষেত্রে ঘুষো খাওয়ার কথা ওঠে না।'

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'তবে কী খাওয়ার কথা ওঠে?'

মন্ত্রী বললেন, 'আজ্ঞে লাথি খাওয়ার কথা।'

রাজা গাঁক করে উঠলেন, 'ঠিক আছে। তাহলে আপনাকে লাথিই'— বলতে গিয়ে আবার সামলে গেলেন রাজা কাক্কাবোক্কা। তিনি অজান্তে জিব কেটে ফেললেন।

কিন্তু সামলাতে পারলেন না মন্ত্রীমশাই। রাজাকে অমন করে জিব কাটতে দেখে, তাঁর ভয় মাখানো মুখের ওপর ফিক করে এক টুকরো হাসি পিছলে পড়ল। ব্যস! উল্টা বুঝিলি রাম! রাজা রেগে টং। জিজ্ঞেস করলেন, 'ফিক করে হাসা হলো কেন?'

আর হাসি! মন্ত্রীর তখন বুকের ধুকধুকি ধকধক করতে শুরু করে দিয়েছে। ইস! বে-আক্কেলে হাসিটা কি হাসবার আর সময় পেল না। এখন কী উত্তর দেবেন তিনি!

তাঁকে আর উত্তর দিতে হলো না। রাজাই আবার কড়কে উঠলেন, 'ফিক করে হাসা হলো কেন?'

আর কথা না বলে উপায় নেই মন্ত্রীমশায়ের। তিনি অত্যন্ত কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, 'মহারাজ, মাপ করবেন। আমি হাসতে চাইনি। হাসিটাই আমার

সঙ্গে শত্রুতা করে হেসে দিয়েছে।'

'বটে!' রাজা কাক্কাবোক্কা কড়কে উঠলেন। 'বেশ রসিকতা করতে শিখেছেন তো। হাসিটা আপনার সঙ্গে শত্রুতা করে হাসিয়ে দিল। এ্যাঁ! এ কী ছেলেমানুষের হাসি যে, হাসি না পেলে হাসিটাই হাসিয়ে দেবে। আপনি মশায় একাট ধুমসো লোক। আপনাকে হাসিটা হাসিয়ে দিল। এ আমায় বিশ্বাস করতে হবে। আমাকে আপনি বোকা ঠাওরেছেন। ভেবেছেন এই বলে পার পেয়ে যাবেন। আমি বুঝতে পেরেছি, এর পেছনে আপনাদের গভীর ষড়যন্ত্র আছে। আমি এক-এক করে সক্কলকে দেখে নেব।'

মন্ত্রীমশায়ের গলা শুকিয়ে গেল ভয়ে। তিনি খকখক করে কেশে উঠে বললেন, 'বিশ্বাস করুন মহারাজ, আমি কোনো ষড়যন্ত্রের মধ্যে নেই।'

রাজা কাক্কাবোক্কা চোখ টেরিয়ে দেখে নিলেন মন্ত্রীমমশাইকে। তারপর সন্দেহে চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ষড়যন্ত্রের মধ্যে নেই। তবে বাছুরটা আমায় লাথি মারল কেন?'

'আজ্ঞে, আপনি তাকে ধরতে গেলেন বলেই তো সে আপনাকে মারল।'

মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা ঘোর ভয়ঙ্কর চটিতং। তিনি হাঁকাড় দিলেন, 'নিজেরা দোষ করে এখন দোষটা আমার ঘাড়ে চালান করে দিচ্ছেন। বাঃ! খুব কায়দা শিখেছেন তো! আমি যদি বলি বাছুরটাকে আপনারা আমার পেছনে লেলিয়ে দিয়ে আমাকে হত্যা করার ফন্দি এঁটেছিলেন।'

মন্ত্রীমশাই আর থাকতে পারলেন না। সটান ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'রাজামশাই গো, এমন কথা কেন বললেন গো! আমি আপনার গোঁফের দিব্যি করে বলছি, এমন ফন্দি আমি জীবনে করিনি!'

'তবে বাছুরটা লাফায় কেন? আপনাদের উসকানি না থাকলে ব্যাটা জন্মেই পা ছোঁড়ে! আমায় লাথি মারে।'

মন্ত্রীমশাই তেমনি ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন, 'বিশ্বাস করুন মহারাজ, বাছুরের লাফালাফিতে আমার কোনো উসকানিও নেই, ফুসফাসানিও নেই। আমি নির্দোষ! এ ব্যাপারে আমার কোনোই হাত নেই।'

রাজা কাক্কাবোক্কা এবার ঠেস দিয়ে কথা বললেন, 'এই তো পথে আসুন। আপনি নির্দোষ। এ্যাঁ? আপনার কোনো হাত নেই। আপনি তাহলে নিশ্চয়ই জানেন কার হাত আছে?'

কী ফ্যাসাদ দ্যাখো দিকিনি। বুড়ো মন্ত্রীকে একেবারে নাজেহাল করে ছাড়লেন। আচ্ছা, মন্ত্রীমশায়ের নিজের হাত নেই বলার মানে কী আর কার হাত আছে সেটা জানা! আশ্চর্য যুক্তি!

'কী হলো!' হঠাৎ রাজা কাক্কাবোক্কা গর্জে উঠলেন, 'কথা বলছেন না কেন?'

এরকমভাবে অন্যায় বকাবকি করলে মানুষের মেজাজ কি ঠিক থাকে! কিন্তু মন্ত্রীমশাই একটুও রাগ করলেন না। করলেও সেটা মনের মধ্যে চেপে রাখলেন। তারপর খুবই ইনিয়ে-বিনিয়ে বললেন, 'এর পেছনে ভগবানের ছাড়া আর কার হাত থাকতে পারে বলুন!'

'ভগবানের?' রাজার কপালের চামড়া কোঁচকাল।

'আজ্ঞে।' উত্তর দিলেন মন্ত্রী।

'তার আসকারায় বাছুর আমাকে লাথি মেরেছে?'

'আজ্ঞে।'

'ভগবানের হাতের এত জোর?'

'আজ্ঞে।'

'তার হাতটা আমার চাই। যেমন করে পারেন সেই হাত ভেঙে আনার ব্যবস্থা করুন।'

'আজ্ঞে, হুজুর!' চমকে উঠলেন মন্ত্রী।

'কোনো কথা নয়!' ধমক দিলেন রাজা। 'কোনো ওজর-আপত্তি শুনব না আমি। যার হাতের জোরে আমি লাথি খাই, তার হাত আমার চাই-ই!'

মন্ত্রীমশাই ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। আরে বাবা, কী বলতে চেয়েছিলেন তিনি, সে তো একটা বাচ্চা ছেলেও জানে। ভগবানের হাত কোথায় আছে, সে ভগবানের দেখা না পেলে কে ভেঙে আনবে! আরে বাবা, বাঘা-বাঘা মানুষ তার কোনোদিন দেখা পেল না এখনও পর্যন্ত তো এই বুড়ো মন্ত্রী! কী হ্যাপা বলো দিকি! আর, এ এমন একগুঁয়ে রাজা, একবার যেটি মাথায় ঢুকবে, তার হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্যন্ত ছাড়ান নেই। সত্যি, খুবই ভেঙে পড়লেন মন্ত্রীমশাই।

ভাঙা মন নিয়ে তিনি রাজার ঘর থেকে বেরিয়ে যখন এদিকেই আসছিলেন, তখন দেখা হয়ে গেল রাজবাড়ির ওস্তাগরের সঙ্গে।

ওস্তাগরেরও বয়েস হয়েছে। মন্ত্রীকে অমন মনমরা হয়ে হাঁটতে দেখে, ওস্তাগর থমকে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, 'মন্ত্রীমশাই অমন শুকনো মুখে কোথায় চললেন?'

'আর বলো কেন ভাই, আমার ভীষণ বিপদ।'

'কীসের বিপদ?'

রাজামশাই বলেছেন, 'তাঁর ভগবানের হাত চাই। আচ্ছা বলো তো, এমন অসম্ভব আবদার আমি কেমন করে মেটাই!'

মন্ত্রীমশায়ের কথা শুনে ওস্তাগর হো-হো করে হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে বলল, 'ও তাই বলুন! এইজন্যেই আপনার মন খারাপ। কিছু ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'তুমি, সব ঠিক হয়ে যাবে, কী করে বলছ ভাই?'

ওস্তাগর উত্তর দিল, 'বলছি কেন জানেন, আপনার ওই ভগবানের হাত আমার কাছে আছে বলেই বলছি।'

মন্ত্রীমশাই ফ্যাকাশে মুখে একটু কষ্ট করে হেসে বললেন, 'তুমি কি আমার সঙ্গে তামাশা করছ ভাই?'

'তামাশা কি সাচ্চা, সেটা আমি প্রমাণ করে দিলেই তো হলো!' হাসতে-হাসতেই উত্তর দিল ওস্তাগর।

'সাচ্চা, কী করে বলছ ভাই? ভগবানের হাত এ তো কথার কথা।' মন্ত্রীমশাই জবাব দিলেন।

'এখন রাজামশাই যদি এই কথার কথাটাকেই সত্যি বলে মনে করেন, তখন তার জবাবটাও তো সেই কথার মতোই হওয়া চাই।' উত্তর দিল ওস্তাগর। তারপর বলল, 'এখন আপনি ঘরে যান। খানিক পরে আমি নিজে ভগবানের হাত আপনাকে দিয়ে আসব।'

ওস্তাগরের আশ্বাস পেয়ে মন্ত্রীমশাই নিজের ঘরে ফিরে গেলেন ঠিকই, কিন্তু মন তাঁর কিছুতেই ওস্তাগরের কথায় বিশ্বাস করতে পারছিল না। ভগবানের হাত, সে আবার কী! সে-হাত ওস্তাগর কোথা থেকে পাবে!

যেমন কথা ছিল, ঠিক সেই কথামতোই খানিক পরে ওস্তাগর মন্ত্রীমশায়ের ঘরে হাজির। হাতে একটি বেতের তৈরি টুকরি। আঁটসাঁট করে মুখ ঢাকা। ঝলমলে রেশমি কাপড় দিয়ে চমৎকার করে বাঁধা। মন্ত্রীমশাই

তো উদ্‌গ্রীব হয়ে বসেই ছিলেন। ওস্তাগর ঘরে ঢুকতেই মন্ত্রীমশাই ব্যস্ত হয়ে তাকে কাছে ডেকে নিলেন। বসল ওস্তাগর। মন্ত্রী তার হাতের টুকরিটার দিকে কেমন যেন হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলেন। অবশ্য মন্ত্রীমশাইকে কিছু বলতে হলো না। ওস্তাগরই মন্ত্রীমশাইয়ের মুখের চেহারা দেখে নিজেই বলল, 'ভাবছেন বোধহয়, আমার হাতে এটা কী?' তারপরে নিজেই হাসতে-হাসতে বলল, 'এর ভেতরই ভগবানের হাত আছে।'

ছ্যাঁত করে উঠল মন্ত্রীমশায়ের বুকের ভেতরটা। অবাক হয়ে, সেই রেশমি কাপড়-বাঁধা টুকরিটা দেখতে-দেখতে নিজেই ভাবতে লাগলেন, কী বলে লোকটা!'

ওস্তাগর এমনই সময় বলে উঠল, 'আপনার ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমি যেমনটি-যেমনটি বলব, ঠিক তেমনটি আপনাকে অক্ষরে-অক্ষরে করতে হবে। আপনি খুব সাবধানে এই টুকরিটি রাজামশায়ের কাছে নিয়ে যান। তাঁকে বলবেন, এই টুকরির মধ্যেই আছে ভগবানের হাত। বলবেন. আজও নয়, কালও নয়, পরশুদিন সূর্য ওঠার ঠিক আগে, এই টুকরির বাঁধন খুলতে হবে। তার আগেও নয়, পরেও নয়। তাহলেই কিন্তু সব গুবলেট হয়ে যাবে। আর তাঁকে সাবধান করে দেবেন, তিনি ছাড়া ভগবানের হাতের এই খবরটি অন্য কেউ যেন না জানতে পারে। টুকরিটি কেউ দেখতে না পায়। এমন কী রানীও।'

মন্ত্রীমশাই কেমন যেন একটা সন্দেহ-মেশানো গলায় উত্তর দিলেন, 'আচ্ছা, তুমি যা বলছ তাই করব।'

মিথ্যে বলব না, সন্দেহ হলেও মন্ত্রীমশাই টুকরিটি রাজার কাছে তক্ষুণি-তক্ষুনি নিয়ে গেলেন। ওস্তাগর যেমন-যেমন শিখিয়ে-পড়িয়ে টুকরিটি রাজাকে দিতে বলেছিল, সেগুলি সব ঠিক-ঠিক তিনি বলেওছিলেন। কিন্তু এ এক আশ্চর্য বোকা রাজা! মন্ত্রীমশায়ের হাত থেকে টুকরিটি পেয়ে তিনি সত্যিই ধরে নিলেন, এর মধ্যে ভগবানের হাত আছে। তিনি শুধু নাচতেই বাকি রাখলেন! প্রথমটা তিনি হেসেও ফেলেছিলেন খুব জোরে, খুশিতে। তারপর সামলে গেলেন মন্ত্রীমশায়ের চোখ-মটকানিতে।

না, রানী কেন, রাজবাড়ির একটি প্রাণীও জানতে পারল না, ভগবানের হাতের সেই টুকরির কথা। এমন জায়গায় রাজা কাক্কাবোক্কা লুকিয়ে রাখলেন,

কার সাধ্যি টের পায়! কিন্তু তাহলে কী হবে, রাজা নিজেকে নিয়েই নিজে মুশকিলে পড়লেন। সারাদিন যেমন-তেমন। কিন্তু সন্ধে হতেই মনটা তাঁর এমন ছুঁকছুঁক করতে লাগল। বারবার মনে হচ্ছিল টুকরিটা খুলে এখনই তিনি ভগবানের হাতটা একবার দেখে নেন। না, বাবা, কাজ নেই। মিছিমিছি লোভ ভাল নয়। পরশুদিন তো আর খুব দূরে নয়। আজ রাতটা, তারপর কালকের রাত। তারপরেই কেল্লা ফতে। অবিশ্যি টুকরিটা একটু নেড়েচেড়ে দেখা যেতে পারে। উঁহু, একদম নয়। হুট করে কখন যে রানী ঘরে ঢুকে পড়বে কেউ জানে না। তার চেয়ে ধৈর্য ধরাই ভাল।

কিন্তু রাজার মন মানে কই। কোনোরকমে মনকে প্রবোধ দিয়ে তিনি রাতে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু শুলে কী হবে, কখনও তিনি উঠে বসেন। কখনও তিনি বালিশ নিয়ে ধামসা-ধামসি করেন। কখনও হাই তোলেন। কখনও জল খান। রাজামশায়ের দোষ নেই। তোমার-আমার ঘরেও যদি এমনি করে ভগবানের হাত লুকোনো থাকত, আমাদেরও এই দুর্ভোগে পড়তে হতো। চোখ বুজত না ঘুমে। মন বসত না কাজে। আমাদেরও নাস্তানাবুদ হতে হতো।

সত্যি চোখে সেদিন রাজা কাক্কাবোক্কার ঘুম এল না। হঠাৎ একটি পাখি ডেকে উঠল বাইরের বাগানে। ব্যস! অনিদ্রায় রাত কেটে গেল রাজা কাক্কাবোক্কার। মন তাঁর ওই ভগবানের হাতের টুকরিটির জন্যে এমনই উচাটন হয়ে উঠল যে, তিনি কিছুতেই আর থাকতে পারছেন না। এ খুব অন্যায়। এমন করে তিন দিনের সময় নেওয়া খুবই অনুচিত। একটা রাত তাঁর ঘুমই হলো না। আবার আজকের রাতেও তো রাজার চোখে ঘুম না আসতে পারে। ঘুম না আসা মানে, আবার সেই ছটফটানি। আচ্ছা, আজকের ভোরের সঙ্গে কালকের ভোরের তফাতটা কোথায়! আজকের ভোর যা কালকের ভোরও তা। আজকে যেমনভাবে আকাশ রাঙিয়ে সূর্য উঠবে, কালও তো তেমন করেই সূর্য উঠবে। তবে শুধুমুধু শরীরকে কষ্ট দেওয়া কেন? রাজা কাক্কাবোক্কা এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে বিছানা ছেড়ে বাগানের অলিন্দের সামনে এসে দাঁড়ালেন। হ্যাঁ, ভোরের আলো দেখা দিয়েছে। সূর্য এখনও ওঠেনি। আকাশ লাল হচ্ছে। পাখির কিচির-মিচির শুরু হয়ে গেছে। গোশালে গরুর ডাকাডাকি কানে আসছে। হ্যাঁ, গরুর ডাক শুনেই রাজার

মনে পড়ে গেছে সূর্য উঠে পড়বে। রাজা কাক্কাবোক্কা তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি দেরাজের পেছন থেকে লুকোনো রেশমি-বাঁধা টুকরিটা বার করে আনলেন। ঝটপট খুলে ফেললেন রেশমি কাপড়ের আস্তরণ। চটপট করে টুকরির ঢাকাটা খুলতেই হঠাৎ রাজার শয়নকক্ষের দরজা ঠেলে রানী ঢুকে পড়লেন। রাজা থতমত খেয়ে গেছেন। তাড়াতাড়ি টুকরিটাকে সরিয়ে ফেলে, তিনি নিজেও দেরাজের আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন।

রাজা যে রানীর ভয়ে লুকিয়ে পড়বেন, এ কথা অত কে ভাবে! রানী তাই বিছানায় রাজাকে না দেখে নরম গলায় ডাকছিলেন, 'মহারাজ।'

মহারাজের সাড়া নেই।

আবার ডাকলেন, 'মহারাজ!' মহারাজের তবু সাড়া নেই।

মহারানীর কেমন যেন আশ্চর্য লাগল। এই ভোরে রাজামশাই কোথায় গেলেন। তিনি আবার ডাকলেন। এবারও সাড়া পেলেন না। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। রাজার শয়নকক্ষের প্রহরীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহারাজা ঘরে নেই, কোথায় গেছেন দেখেছ?'

আজ্ঞে না তো। তিনি তো ঘর থেকে বেরোননি।' উত্তর দিল প্রহরী।

'তিনি তো ঘরে নেই।' রানী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

প্রহরী ভড়কে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ঠিক দেখেছেন?'

দুশ্চিন্তায় অস্থির রানী উত্তর দিলেন, 'দেখেছি, ডেকেছি। দেখাও পাইনি, সাড়াও পাইনি।'

প্রহরী রানীর কথা শুনে ঘরে ঢুকল। 'মহারাজ, মহারাজ,' বলে ডাকাডাকি শুরু করে দিল। কিন্তু কে সাড়া দেবে। যিনি সাড়া দেবেন, তিনি তখন দেরাজের পেছনে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছেন। হঠাৎ প্রহরী থমকে দাঁড়াল। তার নজরে পড়ে গেল, সেই টুকরিটার দিকে। দেখেই সে চেঁচিয়ে উঠল, 'রানীমা, এটা কী?'

রানীমা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। দেখলেন, একটা বেতের টুকরি। খালি। দেখলেন, খানিকটা রেশমি কাপড়। অবাক হয়ে বললেন, 'তাই তো!'

ঠিক এইসময়ে রাজা কাক্কাবোক্কা দেরাজের আড়াল থেকে উঁকি মারলেন। তাঁর বুক ঢিপঢিপ করে উঠল। তিনি না পারলেন বেরোতে, না পারলেন চেঁচাতে! তিনি শুধু ভাবতে লাগলেন, 'টুকরিটা খালি কেন?'

এদিকে হৈচৈ কাণ্ড। সবার মুখে এক কথা, রাজামশাইকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মন্ত্রীমশায়ের কানে এমন একটা গুরুতর কথা পৌঁছতে বেশি সময় লাগল না। কথা শুনে তাঁর তো বুক শুকিয়ে কাঠ। কীরে বাবা, ভগবানের হাত নিয়ে শেষে কিছু একটা ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটে গেল নাকি! তিনিও ছুটলেন। একেবারে রাজার শয়নকক্ষে। ঘর ফাঁকা, এমন কী রানী পর্যন্ত ব্যস্ত হয়ে অন্য ঘরে খোঁজ চালাচ্ছেন। তিনি শয়নকক্ষে ঢুকে যেই মহারাজ বলে ডাক ছেড়েছেন, মহারাজ দেরাজের আড়াল থেকে দেখতে পেয়েছেন। দেখতে পেয়ে রেগে আগুন! মন্ত্রীমশাই ঘরের এদিক-সেদিক খুঁজতে-খুঁজতে পালঙ্কের নিচে যেই মাথা গলিয়েছেন, ব্যস! অমনি আর এক কাণ্ড! দেরাজের পেছন থেকে রাজা কাক্কাবোক্কা ঝপ করে বেরিয়ে এসে, খপ করে মন্ত্রীর গলাটা খামচে ধরেছেন। মন্ত্রী 'ওরে বাপরে' বলে ভয়ে আঁতকে উঠতেই রাজা চেপে ধরেছেন তাঁর মুখখানা। চেপে ধরেই রাজা চাপাস্বরে ধমক দিলেন 'চুপ!'

মন্ত্রী চুপ করলেন না। ফিসফিসিয়ে বলে উঠলেন, 'ছেড়ে দিন মহারাজ। আমার ঘাড়ে লাগছে।'

মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বলে উঠলেন, 'আমাকে বিপদে ফেলার সময় মনে ছিল না। আমার সঙ্গে টোক্কা-ফোক্কা খেলা!' বলে মন্ত্রীর ঘাড়ে মারলেন এক ঝটকা। মন্ত্রী হুমড়ি খেয়ে পালঙ্কের নিচে গড়াগড়ি খেলেন। খেয়েই চিৎকার করে উঠলেন।

তাঁর চিৎকার শুনে রাজা কাক্কাবোক্কা আবার কড়কে উঠলেন, 'চেঁচানো হচ্ছে!'

মন্ত্রীমশাই তবু থামলেন না। তিনি চেঁচাতেই লাগলেন, 'ওরে বাবারে।'

রাজা মন্ত্রীমশায়ের চিৎকার থামাতে তাঁর বুকের ওপর চেপে বসলেন। মন্ত্রীর তো দফা শেষ। তিনি একে বুড়ো, তার ওপর একগাল দাড়ি। বুড়োর দম আটকে আসছে, দাড়িতেও টান লাগছে। তিনি আর না পারলেন চেঁচাতে না পারছেন ছাড়াতে। শেষে যখন মনে হলো দম ফেটে তিনি বুঝি মরে যান, তখন মারলেন এক ঠেলা। মন্ত্রীর বুক থেকে রাজা ছিটকে ধপাস! তারপর লেগে গেল ধস্তাধস্তি। পালঙ্কের নিচে সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড। প্রথমটা হচ্ছিল চাপা গলায় তড়পানি। তারপর কাঁপা গলায় কড়কানি।

শেষে হুহুঙ্কার, আর্তনাদ। রাজা আর মন্ত্রীতে সে কী লড়াই। দুজনেই বেপরোয়া। লড়তে-লড়তে দুজনেই এমন বেঁহুশ হয়ে গেলেন, ঘুরে যে কখন রানীমা এসেছেন, কারো খেয়াল হয়নি। প্রথমটা রানীমা তাঁদের দেখতে পাননি। শুধু তাঁদের তড়পানি শুনতে পাচ্ছিলেন। রানীমা এদিক-ওদিক খুঁজতে খুঁজতে যখন পালঙ্কের নিচে উঁকি মেরেছেন, তখন তো তিনি থ! দুটো ধুমসো লোকের এ কী কাণ্ড! দেখে তাঁর চক্ষু ছানাবড়া! তিনি কী করবেন, কী বলবেন ভেবে না পেয়ে মারলেন এক ধমক, 'কী হচ্ছে আপনাদের?'

রানীর এক ধমকেই কাজ। দুজনেই থতমত খেয়ে থমকে গেছেন। দুজনেই চোখ ঘুরিয়ে রানীকে দেখে, এ ওকে ছেড়ে দিয়েছেন। ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়েছেন। পলঙ্কের নিচে মাথা ঝুলিয়ে পিটপিট করে দেখতে লেগেছেন। ছিঃ ছিঃ! কী লজ্জা! দুজনেই লজ্জায় মরে যান আর কী! যতই হোক, কথাটা তো বলার মতো নয়। একটা পালঙ্কের নিচে রাজা আর মন্ত্রী মারামারি করছেন, আর রানী তাই দেখে তাঁদের ধমক দিয়ে থামাচ্ছেন, এ কথা বলতেও লজ্জা, শুনতেও লজ্জা। সুতরাং দুজনেরই মাথা হেঁট। হেঁট মাথায় তখন তাঁরা হয়তো দুজনেই ভাবছিলেন, এরই নাম বোধহয় ভগবানের হাত! ভগবানের হাত আছে বলেই লড়াইটা লাগল, লড়াইটা থামল। সে-হাত দেখা যায় না।
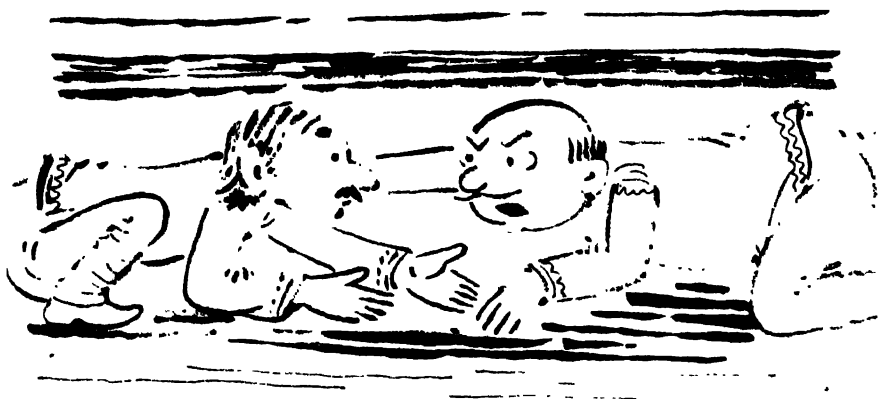
খাই-খাই বুড়ো

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
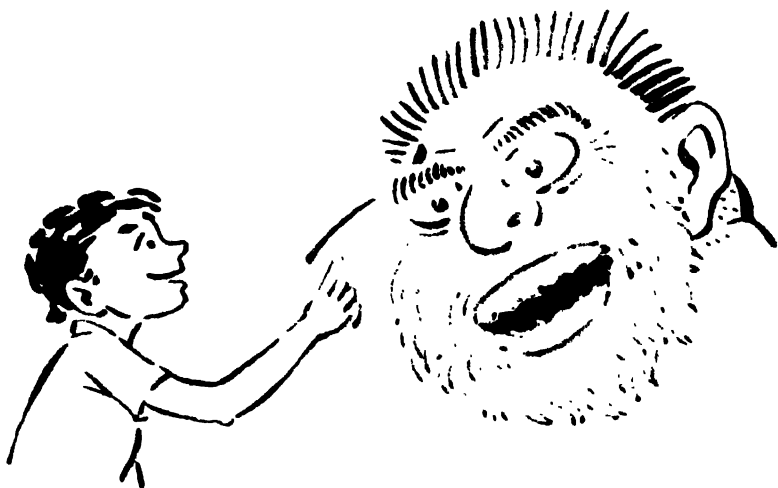
সেই আজব রাজ্যের সুখের কথা কী বলব—এমন সুখ-শান্তি পৃথিবী খুঁজলে কোথাও তুমি দেখতে পাবে না। সেখানে মাঠভরা সোনার ফসল, গাছভরা মিঠে ফল, আর শহরে-বাজারে দোকান-পাটে থরে-থরে সাজানো কতরকম সুন্দর জিনিস। কারও কোনও অভাব নেই। সবাই সুখী। তাই চোর-ডাকাত নেই। খুনোখুনি নেই। তাছাড়া পশুপাখিরা সেখানে মানুষকে ভয় করে না। ফুলে-ফুলে আলো সে রাজ্যের বাগিচাগুলো। প্রজাপতি ওড়ে। পাখি ডাকে। লোকে মনের আনন্দে গান গায় আর যে যার কাজ করে। তারপর রাত হলে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়।

হঠাৎ একদিন সেই সুখের রাজ্যে এক অবাক কাণ্ড দেখা গেল।

রান্না করে বউঝিরা নাইতে গেছে ঘাটে। ফিরে এসে দ্যাখে, সব খাবার কে চেটেপুটে খেয়ে ফেলেছে।

ফলের বাগানে গাছভরা ফল ছিল। হঠাৎ কখন সব ফল উধাও।

চাষীরা মাঠে ফসল লাগিয়েছিল। সেই ফসল আর দেখা যাচ্ছে না।

আর সে রাজ্যের রাজার ছিল ঘোড়াশালে ঘোড়া, হাতিশালে হাতি।

সকালে আস্তাবলে এসে ঘোড়ার সহিস আর হাতির মাহুতের চোখ কপালে উঠেছে। কী সর্বনাশ! গেল কোথায় সব?

তারপর দিনে-দিনে আরও আজগুবি ঘটনা ঘটতে লাগল...

কোথাও একটুখানি খাবার মতো জিনিস নেই। ঘরে-ঘরে উপোস চলল। রাজার কাছে নালিশ গেল। রাজা কোতোয়ালকে ধমকে বললেন, যেমন করে হোক, এই আজব কাণ্ডের বিহিত করো। নইলে গর্দান যাবে।

কোতোয়াল পাহারা দেয়। কিন্তু কোনও ফল হয় না। এমনকি শেষে দেখা গেল সবুজ পাতাগুলি নেই, ঘাস নেই, —সব রুক্ষু-ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছে। আর প্রজাপতি দেখা যায় না। পাখি নেই। জন্তু-জানোয়ার বলতে কিছু নেই। তারপর একটি-দুটি করে জ্যান্ত মানুষও উধাও হয়ে যাচ্ছে। দেশটা একেবারে শ্মশানের মতন দেখাচ্ছে।

তখন কোতোয়াল রাজার সামনে এসে বললে, মহারাজ, নির্ঘাত কোনও মায়াবী রাক্ষসের কাণ্ড। মায়াবলে অদৃশ্য হয়ে সবকিছু খেয়ে ফেলছে। হয়তো এরপর সব জীবিত প্রাণী ও উদ্ভিদ খাওয়া শেষ হলে আস্ত ঘরবাড়িগুলি খেয়ে ফেলবে। তার চেয়ে বরং আমরাই এখুনি কেটে পড়ি চলুন।

রাজা মন্ত্রীকে বললেন, সর্বনাশ! একটা উপায় বের করো তো মন্ত্রী।

মন্ত্রী মাথা চুলকে বলল, উপায় আর কি মহারাজ। কোতোয়াল যা বলছে, তাই করা যাক। চলুন, সরে পড়ি। প্রাণে বাঁচল ফের একটা রাজ্য মিলতে পারে। সেনাপতি আছে, তার কোমরে তলোয়ার আছে—তখন সে ভাবনা নেই। কী বলো সেনাপতি?

সেনাপতি সায় দিয়ে তলোয়ার ঘুরিয়ে বলল, আমিও তাই বলছি মহারাজ।

ব্যস। রাতারাতি রাজা-মন্ত্রী-সেনাপতি কোতোয়াল আর যারা-যারা বেঁচে ছিল, দল বেঁধে পালালো রাজ্য ছেড়ে। রাজ্যে তখন সত্যি-সত্যি শ্মশান-দশা। খাঁ-খাঁ নিঝুম পুরী। একটুও সবুজ রং নেই কোথাও। শুধু ঘরবাড়িগুলিই যা রইলো...

কিন্তু না—সবাই পালালো বলছি বটে, একজন থেকে গেল চুপি-চুপি। এক সুন্দর ছেলে। এই রাজ্যের প্রতিটি জিনিসের উপর ছিল তার ভালবাসা। এর মাঠ, নদী, বন, গাছপালা, ফুল, পাখি-প্রজাপতিদের সে ভালবাসতো।

সে তাই এই শ্মশান রাজ্য ছেড়ে কোথাও যেতে চাইল না। সে অবাক হয়ে খুঁজতে বের হল, কে সেই অদৃশ্য মায়াবী রাক্ষস? কেন সে সবকিছু খেয়ে ফেলল এমনি করে?

মাটিতে ঘাস গজায় না। গাছে গজায় না পাতা। নদীর জল গেছে শুকিয়ে। আর সে সেই শূন্য-রুক্ষ মরুভূমির মতো মাটিতে ক্লান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। আজব রাক্ষস কিন্তু তাকে খায় না। হয়তো মজা দেখে। অতটুকু একটা বাচ্চা ছেলে! রাক্ষুসে মুখে বড়জোর একটা ক্ষুদে রসগোল্লা বই তো আর নয়।

কিন্তু রাক্ষুসে লোভ যাবে কোথায়? একদিন সে আর থাকতে পারল না। সামনে এসে দাঁড়াল। গর্জে উঠল, হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ!

ছেলেটি কিন্তু ভয় পাবে কি, ওকে দেখে হেসেই খুন।

রাক্ষস চোখ কটমট করে বলল, হাসছ যে? ভয় হচ্ছে না আমায় দেখে?

ছেলেটি জবাব দিল, হাসব না কেন? আরে, তুমি যে দেখছি মানুষের মতো।

মানুষের মতো? রাক্ষস একেবারে অবাক।

হ্যাঁ, তোমায় কেমন দেখাচ্ছে জানো। অবিকল একটা বুড়ো মানুষ। রোসো, তোমার নাম দিলাম, 'খাই-খাই বুড়ো।' কী? খুশি তো?

রেগে-মেগে রাক্ষস ওকে হালুম করে গিলে ফেলল। কিন্তু কী মুশকিল। ছেলেটি পেটের ভিতর এমন লাফালাফি শুরু করে যে, সে ওয়াক করে উগরে দিতে বাধ্য হয়। ফের অবশ্য গিলে নেয়। ছেলেটি নাকের ভিতর অ্যায়সা সুড়সুড়ি দেয় যে, সে হেঁচে ফেলে, 'হ্যাঁচ্চো'। ছেলেটি ডিগবাজি খেয়ে বেরিয়ে পড়ে, হাততালি দিয়ে হাসে।

অগত্যা বেচারা হার মেনে বলল, ওফ! কী সর্বনেশে ছেলে রে বাবা! ঠিক আছে। তোমায় ছেড়ে দিলাম।

ছেলেটি বলল, না খাই-খাই বুড়ো, সেটি হচ্ছে না। আমি কিন্তু তোমায় ছাড়ছি না।

রাক্ষস চোখ পাকিয়ে বলল, ছাড়ছি না মানে? যাও বকবক করো না আর। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। দেখি, অন্য কোথাও যাই। এখানে তো আর খাবার মতো কিছু নেই।

ছেলেটি বলল, তোমার খুব খিদে পেয়েছে বুঝি?

ওঃ! ভীষণ খিদে। দিন-রাত্তির পেটটা শুধু খাই-খাই করে। ওই তো হল জ্বালা...রাক্ষস দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

চিন্তিত মুখে ছেলেটি বলল, তাই তো! খাই-খাই বুড়ো, তোমার সত্যি কোনও দোষ নেই বাপু! এত খিদে থাকলে তুমি আর কী করবে বলো। তবে যদি একটা কাজ করো, এতো খিদে তোমার থাকবে না—আর রাজ্য শ্মশান হবে না। করবে?

খাই-খাই বুড়ো আর ছেলেটি তখন হন-হন করে হাঁটতে থাকল। মাঠ-নদী বন-জঙ্গল পেরিয়ে সে আর এক রাজ্য। সেখানে একটা পাহাড়ের চুড়োয় ঘর। ছেলেটি বলল, খাই-খাই বুড়ো, এই ঘরে যে থাকে সে তোমার মিতে—নাম তার 'উপোসী বুড়ো।' বেচারা কিস্যু খেতে পারে না। শুকিয়ে আমসি হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। কতো কবরেজ-বদ্যি করলো, কোনও ফল হয়নি। ওর খিদেই পায় না।

খাই-খাই বুড়ো মহানন্দে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, মিতে, ওহে উপোসী মিতে!

উপোসী বুড়ো রোগা-পটকা গতর নিয়ে বেরিয়ে অতি কষ্টে বলল, কে রে?

আহা, কাছে এসেই দ্যাখো, কে এসেছে। বলে ছেলেটি উপোসী বুড়োকে টানতে-টানতে খাই-খাই বুড়োর সামনে নিয়ে গেল।

কী তাজ্জব কাণ্ড! দুই বুড়ো যেই না কাছাকাছি হয়েছে, ছেলেটি দু'জনের পিছনে দুটো ধাক্কা লাগাতেই ব্যস। দুই বুড়ো একাকার—একসঙ্গে মিলেমিশে একজন।

তার ফলাফল কী হল বলব?

বলে আর লাভ নেই। নিজেই বুঝে নাও না।

আর যদি অগত্যা বুঝতে না পারো, অঙ্ক কষে দ্যাখো প্লাসকে মাইনাস দিয়ে গুণ করলে কী হয়? স্রেফ মাইনাস।

তাহলে বুঝতে পারছ, ফের গাছভরা ফুলফল, পশুপাখি-প্রজাপতি আর খেতভরা ফসল, থরে-থরে সাজানো দোকানপাট, মানুষ নির্ভয়ে সুখশান্তিতে বাঁচছে।

ছেলেটি কে চিনতে পারছ না?

আরে, সে তো তুমিই।

ময়নামতী

গৌরী ধর্মপাল

গ্রামের নাম দুধপুকুর। ঝকঝকে-তকতকে নিকনিকে ছুঁচটি পড়লে তুলে নেওয়া যায়। দশ পুকুরের এক পুকুরের পাড়ে মূলীবাঁশের প্রকাণ্ড এক ঝাড়। সেই ঝাড়ের একধারে ছোট্ট একটি দোচালা ঘর। সেই ঘরে থাকে ময়নামতী আর ময়নামতীর মা। ঘরের পাট সারা হলে দুপুরবেলা ময়নামতীর মা বসে-বসে কাঁথা সেলাই করে। ময়নামতী মার পাশে-পাশে পা ছড়িয়ে বসে পাড় থেকে সুতো তুলে দেয়, আর বেলা পড়ে এলে মা যখন আর চোখে ভাল দেখতে পায় না, তখন মার ছুঁচে সুতো পরিয়ে দেয়।

একদিন সেলাই করতে-করতে ছুঁচ গেছে মট করে ভেঙে, আর ময়নামতীর মা কাঁদতে-কাঁদতে বলছে, কি হবে রে ময়না?

ময়না বলছে, কেঁদো না মা, আমি তোমায় ছুঁচ এনে দেব।

এই বলে ডুরে শাড়ির আঁচলটি কোমরে জড়িয়ে ময়না গেল কামারবাড়ি।

—কামারখুড়ো কামারখুড়ো, আমার মায়ের কাঁথা সেলাইয়ের ছুঁচ গেছে ভেঙে, তুমি এই ভাঙা ছুঁচের বদলে নতুন ছুঁচ দেবে?

কামার বললে—ভাঙার বদলে নতুন? না বাছা, তা হয় না। তবে

আমার নাইবার গামছাখানা ছিঁড়ে গেছে, তুমি যদি আমায় একখানা নতুন গামছা এনে দিতে পার তো ভেবে দেখতে পারি।

ময়না বললে, আচ্ছা। গামছা নিয়ে ময়না গেল জোলাবাড়ি।

—জোলাখুড়ো জোলাখুড়ো, এই ছেঁড়া গামছাখানার বদলে নতুন গামছা দেবে? তাহলে কামারখুড়ো আমায় নতুন ছুঁচ দেবে, তাই দিয়ে আমার মা কাঁথা সেলাই করবে?

জোলা বললে, ছেঁড়ার বদলে নতুন? না বাছা তা হয় না। তবে আমার ভাত রাঁধার হাঁড়িটা বড্ড পুরোনো হয়ে গেছে, তুমি যদি আমায় একখানা নতুন হাঁড়ি এনে দিতে পার তো ভেবে দেখতে পারি।

ময়না বললে, আচ্ছা। বলে হাঁড়ি নিয়ে ময়না গেল কুমোরবাড়ি।

—কুমোরদাদা কুমোরদাদা, এই পুরোনো হাঁড়ির বদলে আমায় একটা নতুন হাঁড়ি দেবে? তাহলে জোলাখুড়ো আমায় নতুন গামছা দেবে, কামারখুড়ো নতুন ছুঁচ দেবে, তাই দিয়ে আমার মা কাঁথা সেলাই করবে?

কুমোর বললে, পুরোনো-র বদলে নতুন? না বাছা তা হয় না। তবে আমার মেয়ের শাঁখাজোড়া ফেটে গেছে, তুমি যদি আমায় একজোড়া নতুন শাঁখা এনে দিতে পারো তো ভেবে দেখতে পারি।

ময়না বলল, আচ্ছা। বলে শাঁখাজোড়া নিয়ে গেল শাঁখারিবাড়ি।

শাঁখারিমামা শাঁখারিমামা, এই ফাটা শাঁখার বদলে আমায় একজোড়া নতুন শাঁখা দেবে? তাহলে কুমোরদাদা আমায় নতুন হাঁড়ি দেবে, জোলাখুড়ো আমায় নতুন গামছা দেবে, কামারখুড়ো নতুন ছুঁচ দেবে, তাই দিয়ে আমার মা কাঁথা সেলাই করবে?

শাঁখারি বললে, ফাটার বদলে নতুন? না বাছা, তা হয় না। তবে আমার মায়ের বড় সখ হয়েছে, ডিমভরা কৈ মাছের চৈ-দেওয়া ঝোল খাবে নতুন কাঁসার থালায়, নতুন পিঁড়িতে বসে, নতুন কাপড় পরে, নতুন নথ নাকে দিয়ে। তুমি যদি বাছা স্যাকরা বাড়ি থেকে সোনার নথ, ছুতোর বাড়ি থেকে কাঁঠালকাঠের পিঁড়ি, তাঁতিবাড়ি থেকে মেঘডম্বর শাড়ি, কাঁসারি বাড়ি থেকে খাগড়াই কাঁসার ফুল কাটা বগি থালা, জেলেবাড়ি থেকে এককুড়ি ডিমভরা কৈ আর মুদিবাড়ি থেকে তেল-নুন-সরষে—

এই পর্যন্ত শুনে ময়না ভ্যাক করে কেঁদে ফেলল। আর সেই কান্না শুনে

গ্রামের যে যেখানে ছিল সব্বাই ছুটে এল।

যতই সবাই বলে, ময়না তোর কি হয়েছে বল, ময়না ততই কাঁদে। কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারে না, এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে, এমন সময় একগলা ঘোমটা টেনে শাঁখারির বৌ বাড়ির থেকে বেরিয়ে এসে শাঁখারির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, ওকে জিগ্যেস কর, ও জানে।

শাঁখারি থতমত খেয়ে বললে, এই এই এই।

সবাই বললে, তার আগে?

এক-কপাল ঘোমটা দিয়ে কুমোর-বৌ এসে কুমোরের দিকে আঙুল তুলে বললে, ওকে জিগ্যেস কর, ও জানে।

কাঁচুমাচু হয়ে কুমোর বললে, এই এই এই।

সবাই বললে, তার আগে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে খ্যানখেনে গলায় চেঁচিয়ে উঠল জোলার মা, আমার ছেলেটিকে জিগ্যেস কর জানেন কিনা।

আমতা-আমতা করে জোলা বললে—এই এই এই।

সবাই বললে—তার আগে?

তখন কামার কাঁপতে-কাঁপতে এগিয়ে এসে বললে, আমি ভাই যত নষ্টের গোড়া, শোন বলছি—

কামারের বলাও শেষ হয়েছে আর 'ময়না কই, কোথায় গেলি রে?' বলতে বলতে ময়নামতীর মাও এসে হাজির হয়েছে, আর ময়নাও ছুটে গিয়ে মায়ের কোলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে। মেয়ে যত কাঁদে মা-ও কাঁদে আর বলে, ছুঁচ পেয়েছি রে ময়না, পেয়েছি। মায়ের প্যাঁটরায় তোলা ছিল এতদিন খুলিনি তাই চোখে পড়েনি।

তখন বড়াইবুড়ি চোখ মুছতে-মুছতে এগিয়ে এসে বললে, এই ময়নার মার তৈরি কাঁথা গায়ে দিয়ে তোমরা গাঁ-সুদ্ধ সবাই শীত কাটাও, বাদলা হাওয়ায় গা বাঁচাও, আর তার মেয়ে কিনা সারা গাঁ ঘুরে একটা ছুঁচ পায় না? তোমরা কি মানুষ না, আর কিছু?

সবাই মাথা নিচু করে রইল।

কামার হাতজোড় করে বললে, মাপ কর মা, আর হবে না। এবার থেকে ময়নার, ময়নার মার সব ছুঁচ-কড়াই আমি গড়ে দেব।

সেইদিন থেকে রোজ ময়নাদের বাড়িতে

মাছ দিয়ে যায় জেলে

দুধ দিয়ে যায় গয়লা

খইমুড়ি দিয়ে গদাইবুড়ি

চাষীরা মিলে দেয় সম্বচ্ছরের ধান, তাঁতি দেয় শাড়ি-কাপড়, ঘরামি দেয় ঘর ছেয়ে।

আর ময়না, ময়নার মা লাল-নীল-হলদে-সবুজ-কমলা সুতো দিয়ে কাঁথা সেলাই করে-করে ঘরে-ঘরে পৌঁছে দেয়—জংলা-কাঁথা, পদ্মকাঁথা, নক্‌শিকাঁথা, চিকন-কাঁথা আর দোল-দুর্গোৎসবে আসরে-বাসরে খাটে-বিছানায় জমিয়ে পাতার জাজিম কাঁথা।

কেবল প্রত্যেক বছর পুজোর সময় মহালয়ার দিন সবথেকে সেরা একজোড়া শাঁখা বেছে নিয়ে শাঁখারিমামা যখন ময়নাদের বাড়ি গিয়ে হাঁক দেয়, 'ও ময়না, আছিস নাকি?' তখন ময়নার মা বেরিয়ে এসে বলে এ বছরটা থাক দাদা, আসছে বছর দিও।
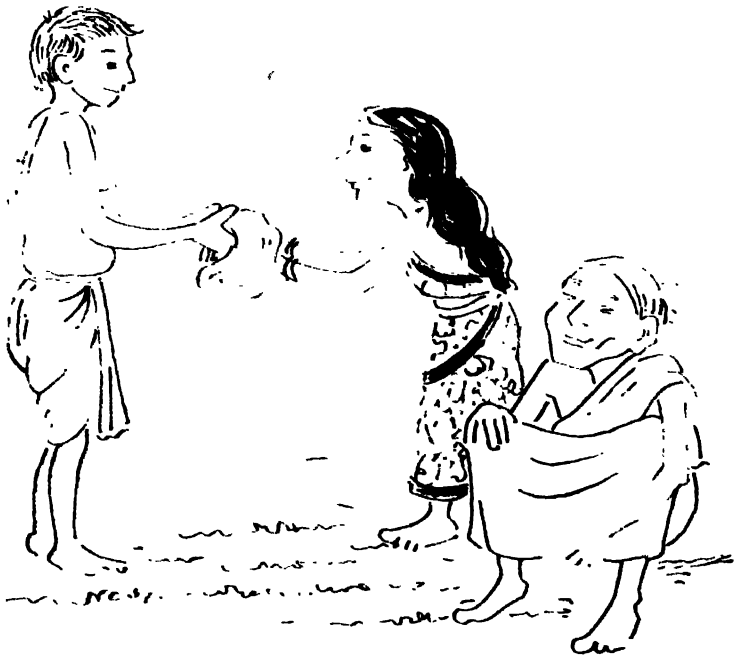
টগরদিদির ডালিম বোন

নবনীতা দেবসেন
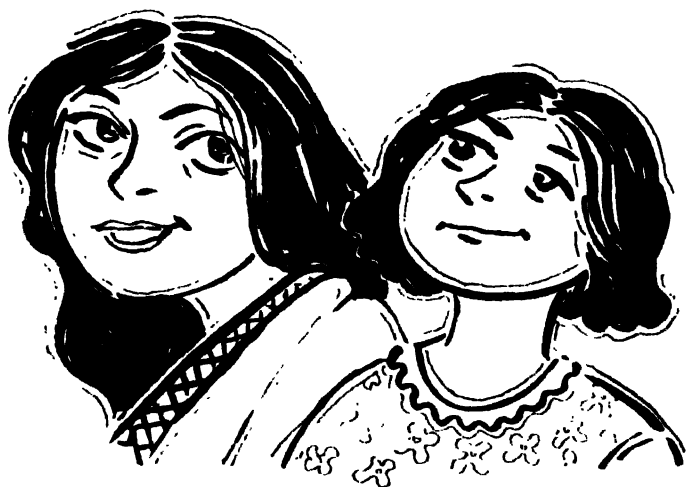
এক গরিব চাষীর উঠানে একটা টগরফুলের গাছ ছিলো। তাতে প্রচুর ধবধবে সাদা গোলগাল টগরফুল ফুটতো। আর তার উঠানে একটা ডালিমগাছও ছিল, তাতে না হতো ফুল, না ধরতো ফল।

চাষীর ছিল এক মেয়ে। আদর করে তার নাম দিয়েছিল তারা টগর। টগর নিজের মনে মাঠেঘাটে খেলা করে ছুটে বেড়াতো, গান গাইতো, গাছে চড়তো, ঝপা-ঝপ নদীর জলে সাঁতার কাটতো—শূন্য পাখির বাসা পাড়তো, পাখির ডিম কিন্তু কখনও চুরি করতো না—টগর দুরন্ত ছিল বটে—কিন্তু তার প্রাণে খুব মায়া। কোনো জীবজন্তুকে সে কষ্ট দিত না। প্রজাপতির পাখা ছিঁড়তো না, ফড়িংয়ের পায়ে সুতো বাঁধতো না। ডানপিটে মেয়ে টগর আজ কাবাডি কাবাডি খেলছে, কালকে খো-খো, পরশু সাইকেল প্রতিযোগিতায় এ জেলা থেকে ও জেলায় চলে যাচ্ছে।

একদিন চাষীবৌয়ের আরও এক মেয়ে হলো। মেয়ের রাঙা টুকটুকে রঙটি দেখে টগর নিজেই বোনের নাম দিয়ে দিল ডালিমফুল। ডালিমফুল সত্যি-সত্যি হয়ে উঠলো ডালিমের মতনই। সে গাছে চড়ে না, পুতুল

খেলে। জলে ঝাঁপায় না, রান্নাবাড়ি খেলে, ফুল তুলে মালা গাঁথে। আবার দিদির সঙ্গে এক্কাদোক্কা খেলে, কুমির-কুমির খেলে, লুকোচুরি খেলে। দুই বোনে মিলে কুলের আচার খায়, পেয়ারা পাড়ে। বোনে-বোনে খুব ভাব। আর রোজ সকালে পেঁয়াজ দিয়ে পান্তাভাত খেয়ে শেলেট, পেনসিল, বর্ণ-পরিচয় বগলে করে দুই বোন বেণী দুলিয়ে ইস্কুলে যায়। অ আ শেখে, দুয়েক্কে দুই—দুই দুগুনে চার শেখে। চাষীবৌয়ের খুশি আর ধরে না। সে লিখতে-পড়তে না শিখলে কী হবে, তার দুই মেয়ে বিদ্যের দিগগজ হচ্ছে। এমনি করতে-করতে মেয়েরা বড় হয়ে উঠছে।

দুই বোনেতে খুব ভাব
টগরফুলটি দুষ্টু যেমন
তেমনি ডালিম চুপচাপ।

টগর হচ্ছে ডানপিটে, আর ডালিম শান্তশিষ্ট। ডালিম সেলাই করে, আলপনা দেয়। গান গায়। আর টগর? সে দস্যিপনা করে বেড়ায়। যেই টগরের ক্লাস এইট ফুরালো অমনিই তার ইস্কুল যাওয়াও শেষ! কী করবে? ওদের গ্রামের ইস্কুলে মোটে নাইন, টেন ক্লাসই নেই যে! পড়বে কোথায়?

এখন তাই ডালিম একলাটি ইস্কুলে যায়। টগর বেচারী বাড়িতেই থাকে, ঘরের কাজকর্ম করে। পাড়ার বাচ্চাদের পড়া দেখিয়ে দেয়। আর কী করে?

আর বড়ি দেয়, পাঁপর তৈরি করে, ঠোঙা বানায়। কেন?

কেননা—

একটা সাইকেল যদি থাকতো, তাহলেই টগর ওই দূরের ইস্কুলে পড়তে যেতে পারতো। সেখানে নয়-দশ কেন, এগারো, বারো পর্যন্ত সব পড়ানো হয়। কিন্তু গরিব চাষী—চাষীবউয়ের যে সাইকেল কিনে দেবার মতন অত টাকা নেই। টগর তাই মন দিয়ে বড়ি দেয়, পাঁপর তৈরি করে, ঠোঙা বানায়। তারপর দুই বোনে মিলে সেগুলো হাটে বেচে টাকা এনে সাইকেলের ফান্ডে মাটির লক্ষ্মীর ভাঁড়ে জমা করে।

পাঁচ পয়সা
দশ পয়সা
বিশ পয়সার খেল্

একদিন ঠিক পৌঁছে দেবে
ইস্কুলে, সাইকেল!

সাইকেল একটা যে চাইই! হাইস্কুলে যেতে হবেই। সেদিন টগরের জ্বর হয়েছে খুব। হাটের দিনে জ্বর হলে চলে? বড়ি-পাঁপর হাটে নিয়ে যেতে হবে না? টগর অস্থির যাবার জন্য। ডালিম বললে—

—'টগরদিদি ভাই
আমি একাই হাটে যাই?
বড়ি বেচবো ঠোঙা বেচবো
সাইকেলটি চাই!

--দিদি, তুমি কিচ্ছু ভয় পেয়ো না—আমি হাটে গিয়ে ঠিক সব বেচে আসতে পারবো। পথ তো চিনেই গেছি। হাটের মানুষজনও আমাদের চিনেছে।'

চাষী-চাষীবউ বললে—"তবে যাও, সাবধানে যেও। আর সন্ধের আগেই ঘরে ফিরে এসো!"

কিন্তু ডালিমফুল সেই যে হাটে গেলো, আর কোনোদিনই বাড়িতে ফিরলো না। কাঁদতে-কাঁদতে টগর কতদূর বনে-বাদাড়ে খুঁজে এলো। কাঁদতে-কাঁদতে চাষী কতদূর গ্রামে-গঞ্জে খুঁজে এলো। কাঁদতে-কাঁদতে চাষীবউ কতদূর হাটে-মাঠে-ঘাটে খুঁজে এলো।

সবাই বললে, হ্যাঁ, ডালিম তো হাটে এসেছিলো। বড়ি-পাঁপর বেচেছিলে। সে তো কখন ফিরে গেছে।

কিন্তু, নাঃ, ডালিমের খোঁজ মিললো না। মেয়ে যেন হাওয়াতে মিলিয়ে গেছে। চাষীর, চাষীবউয়ের, টগরের চোখে জল শুকোয় না, মুখে হাসি নেই। কেউ পেটভরে খায় না। পাড়ার লোকেদের পর্যন্ত মন ভালো নেই। এত মিষ্টি মেয়ে ডালিম, সে গেলো কোথায়? কেউ তাকে দেখেনি!

হঠাৎ একদিন চাষীবউ দ্যাখে, তাদের ডালিমগাছে ফুল ধরেছে। চমৎকার ফুল। ফুল প্রায় ফুটবো-ফুটবো করছে—কিন্তু পুরোটা ফুটছে না। ফুটছে না বলে সে ফুল ঝরেও না। তাতে ফল ধরেও না। চাষীবউ অবাক হয়ে চাষীকে ডেকে দেখালো—'দ্যাখো, দ্যাখো আমাদের ডালিম গাছে ফুল ধরেছে—সেই ফুল ঝরছে না, পড়ছে না, দিনের পর দিন যেমনকে

তেমনটিই রয়েছে।' চাষী দেখলো।

'তাই তো?'

টগরও দেখলো। তাই তো?

ডালিম গাছে ফুল ধরেছে,
করছে ফুটি ফুটি
ফুটছেও না, ঝরছেও না,
নাড়ছে কেবল ঝুঁটি।

এতো অবাক কাণ্ড! মাসের পর মাস সেই একটি লাল ফুল, হাওয়ায় হেলে-দোলে, পাপড়ি তার পুরোপুরি খোলেও না, ঝরেও না। রোজই মনে হয়, সদ্য ফুটেছে যেন!

রাত্তির বেলা লুকিয়ে লুকিয়ে চাষীবউ বলে চাষীকে—'শোনো, একটা কথা বলি। ফুলটা দেখে আমার কেমন যেন মনে হয়, বুঝি আমাদের ডালিম ফুলটিই ঘরে ফিরে এসেছে। কেন বলো তো?' চাষী বলে বউকে—'আমারও ঠিক এমনটিই মনে হয় বউ! ওই ফুলটির দিকে চেয়ে-চেয়ে মনটা যেন ঠাণ্ডা হয়, প্রাণটা যেন জুড়োয়। কেন বলো তো?

প্রাণটা জুড়োয়, মনটা জুড়োয় ফুলের পানে চেয়ে।

—ফুলের ভেতর লুকিয়ে যেন ডালিম সোনা মেয়ে।'

দূর দূর। তা কি হয়? তা কি হয়?

আবার মনের দুঃখু মনেই নিয়ে, চাষী, চাষীবউ পাশ ফিরে শোয়। দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে।

মেয়েকে হারিয়ে হুতোশে চাষী আর চাষীবউ হয়ে পড়েছিল যেন পাগল-পারা, দিশেহারা। না ভালো লাগে লোকজনের মুখ দেখতে, না রোচে মুখে কোনো খাবার, শীতল বাতাসকেও মনে হয় বুঝি আগুনের হলকা। তোষক যেন কণ্টকশয্যা। কেবল টগরই তাদের মনে একটু শান্তির ছিটে।

একদিন দুপুরবেলা।

চাষী আর চাষীবউ খেতে কাজ করতে গেছে। টগর উঠোনে বসে বড়ি দিচ্ছে, আর মনে-মনে দুঃখু করছে—'আমার ডালিমফুল বোনটিরে!'

হঠাৎ—'দিদি?'

কে ডাকলো? কে ডাকলো? কে ডাকলো? টগরের হাত কেঁপে গেলো। বড়ির নাকটি থেবড়ে গেলো। টগর কান খাড়া করে চারিদিকে চাইলো।

কেউ তো নেই?

—'দিদি?'

—'কোথায় তুই? ডালিমরানী? কোথায় তুই?' টগর চেঁচিয়ে উঠলো।

—'আস্তে! আমি এখানে। এই গাছে।'

—টগর ওপরদিকে চেয়ে দ্যাখে তার মাথার ওপরে রাঙা টুকটুক ডালিম ফুলটি যেন তার দিকে চেয়ে-চেয়েই দুলছে। টগর বললে—

—'বোনটি?'

ফুল বললে—

—'দিদি!'

—'তুই ফুল হলি কেমন করে বোনটি?'

ডালিম ফুল বললে—'দাঁড়াও। বলছি।'

তারপরেই ফুলের পাপড়িগুলো সব খুলে গেলো আর তার ভেতর থেকে টুপ করে খসে উঠোনে নেমে পড়লো ডালিমফুল। পরনে সেই রাঙা ডুরে শাড়িটি, কপালে কাজলের টিপ, চুলে দুই বিনুনী ঝুলছে। তাতে সবুজ ফিতের ফুল। বড়িটড়ি চুলোয় গেলো, টগর লাফিয়ে উঠে বোনকে বুকে জড়িয়ে ধরে। 'এভাবে ফুলের ভেতরে ঢুকে কেন বসে আছিস বোনটি? বাবা-মাকে কষ্ট দিয়ে?' কিন্তু বুকে তো কেউ ধরা দিলো না।

ডালিমফুল বললে—

—'কেমন করে জড়াবে দিদি? ধরবে কাকে? আমি যে এখন আমার ছায়াটি! আমাকে ডাকাতে ধরেছিলো। তাই ডালিমফুলটি হয়ে ফিরে এসেছি বাড়িতে, তোমাদের কাছে। মাকে দেখি, বাবাকে দেখি, মিনিবেড়ালকে দেখি, তোমাকে দেখি, মনে কত শান্তি পাই।'

টগর বললে—

—'কিন্তু ওতে আমাদের শান্তি নেই। তুমি আমাকে বলো কেমন করে তোমাকে কোলে জড়িয়ে ধরতে পারি। তোমাকে ফিরিয়ে আনার কোনোই কি রাস্তা নেই, ডালিমফুল? যত কঠিনই হোক আমি সেটা ঠিক করতে পারবো। আমাকে বলো।'

—'রাস্তা আছে। কঠিন খুব। তবে তুমি হয়তো পারবে। ডাকাতদের হাত থেকে চুপি-চুপি পালাতে গিয়ে আমি একটা ইঁদারার মধ্যে পড়ে গেছি। সেই ইঁদারায় এক বিশাল অজগর সাপের বাসা ছিলো, তারই

পেটের মধ্যে আমি এখন আছি। তুমি যদি অজগরের পেট থেকে আমাকে বের করতে পারো, আমি আবার বাড়িতে ফিরে আসবো।'

—'ইঁদারাটা কোথায়?'

—'এখান থেকে সাতক্রোশ দূরে পশ্চিমপুরায়।'

—'পশ্চিমপুরায় ইঁদারা কি একটাই? না অনেকগুলো?'

—'এটার নাম বিষ-কুয়ো। অজগরের বাসা কিনা? সবাই চেনে। কেউ কাছে যায় না।

সাতক্রোশ পথ পেরিয়ে দিদি
পশ্চিমপুরায় যাবি
বিষ ইঁদারায় সাপের পেটে
আমায় খুঁজে পাবি।'

—'ঠিক আছে বোনটি। কালই আমি বেরিয়ে পড়বো। তুমি ধৈর্য ধরো। সাপের পেট থেকে বের করে তোমাকে আমি নিশ্চয়ই বাড়িতে ফিরিয়ে আনবো।'

পরদিন ভোরবেলাতে চাষী-চাষীবউ যেই খেতে বেরিয়েছে, অমনি টগরও বেরিয়ে পড়লো। গামছায় চিঁড়ে-গুড় বেঁধে নিয়ে। যাচ্ছে, যাচ্ছে, যাচ্ছে, যাচ্ছে। পশ্চিমপুরা আর আসেই না। হাঁটতে, হাঁটতে, হাঁটতে শেষকালে টগরের খুব খিদে পেয়ে গেল। সূয্যি ততক্ষণে ঠিক মাথার ওপরে। টগর একটা পুকুরের পাড়ে, বুড়ো আমগাছের ছায়ায় বসে চিঁড়ে ভিজিয়ে গুড় দিয়ে খেতে যাচ্ছে—এমন সময় সে দেখে, কী-একটা নাম না-জানা পাখির ছানা বাসা থেকে মাটিতে পড়ে গিয়ে ভয়ের চোটে আপ্রাণ চিঁ-চিঁ করে কাঁদছে আর তার কান্না শুনে এক দুষ্টু শেয়াল চুপিচুপি গুটি-গুটি এগিয়ে আসছে তাকে ধরবে বলে!

টগর তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া ফেলে উঠে দৌড়ে গিয়ে শেয়ালটাকে তাড়িয়ে দিল। তারপরে যত্ন করে পাখির ছানাটাকে আঁচল দিয়ে জড়িয়ে খুব সাবধানে ধরলো, যাতে তার গায়ে নোনা হাতের ছোঁয়া না লাগে। তারপরে গাছে চড়ে, বাচ্চাকে তার বাসার মধ্যে রেখে দিল। টগর গাছে উঠে দ্যাখে বাসাতে আরও তিনজন বাচ্চা চ্যাঁ-চ্যাঁ করে কাঁদছে খিদেয়। টগর কী করে? সে তখন তাদের শালিধানের চিঁড়ে খেতে দিল, আর সোনালি আখী গুড় খেতে দিল। তারপর বলল—

'খুব সাবাধানে থাকবি! আর যেন মারামারি করে নিচে পড়ে যাবি না! দেখলি তো জঙ্গলে কত বিপদ-আপদ? মা যতক্ষণ না ফিরে আসছেন, চুপটি করে বসে থাকবি বাসাতে! হ্যাঁ!'

বাচ্চাদের বুঝিয়ে-সুজিয়ে গাছ থেকে নেমে, টগর আবার খেতে বসতে যাচ্ছে, হঠাৎ থপ্ করে টগরের পায়ের ওপরে থলথলে হড়হড়ে কী যেন একটা জিনিস এসে পড়লো, কাদার ভেতর থেকে। —'ওরে বাবা' বলে লাফিয়ে উঠলো টগর! 'কী ওটা পিছ্‌লা মতন জিনিস আমার পায়ের ওপরে পড়লো?' বলতে বলতেই ছিপটি তুলেছে, টগরের হাতে ছিপটি ছিল একটা, সেই যেটা দিয়ে শেয়াল তাড়াতো। গ্রামের রাস্তায়, বনজঙ্গলের পথে চলতে হলে ছিপটি একটা কাজে লাগে। টগর ছিপটি দিয়ে জিনিসটাকে যেই সরাতে গেছে, থুপুস করে লাফিয়ে নেমে গেল পা থেকে সেই পিছ্‌লা জিনিস। আর ঘাসের মধ্যে কে যেন বলে উঠলো—'টগরদিদি, টগরদিদি, আমি তোমার বন্ধু হই/আমার বড়ো ইচ্ছে করে, আমি তোমার সঙ্গে রই।'

—'কে কথা বলছে আমার সঙ্গে?' টগর ভালো করে তাকিয়ে দেখে।

—আরে? এ তো একাট কোলাব্যাঙ। ব্যাঙকে কেমন করে সঙ্গে নেওয়া যায়? টগর উবু হয়ে ঘাসে বসে পড়লো, বললো—

—'ভাই কোলাব্যাঙ, তোমাকে সঙ্গে নিতে আমার একটুও আপত্তি নেই, কিন্তু নেবো কেমন করে? আমার সঙ্গে কোনো থলি নেই, ঝুড়ি-চুপড়ি কিছুই নেই। শাড়িতে পকেটও থাকে না—কিসে করে নেবো?" কোলাব্যাঙ বললে, 'আমাকে তোমার আঁচলে বেঁধে নাও।' আঁচলে ব্যাঙ। এম্যা! তবুও টগর মায়া করে আঁচলের এককোণে সেই পিছ্‌লা কোলাব্যাঙকে বেঁধে নিল। সঙ্গে-সঙ্গে বললোও, —'আমি কিন্তু যাচ্ছি পশ্চিমপুরাতে, বিষ-কুয়োর অজগরের পেটের ভেতর থেকে আমার বোন ডালিমফুলকে উদ্ধার করতে। তুমি ভয় পাবে না তো? সাপ কিন্তু ব্যাঙ ধরে খায়।'

—ব্যাঙ বললে, 'আমি জানি। চলো তো!' তখন? টগরদিদির কোলে। কোলাব্যাঙটি দোলে।

—চলতে, চলতে, চলতে, অবশেষে পশ্চিমপুরা এসে গেল। টগর যাকেই জিজ্ঞেস করে, বিষ-কুয়োটা কোথায়, তারা উত্তরদিক দেখিয়ে দেয়। মুখে কিছু বলে না। এমনি উত্তরে হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ আঁচলের মধ্যে থেকে কোলাব্যাঙ বলে উঠলো, 'আমি এখানেই অজগর সাপের গন্ধ পাচ্ছি।

টগরদিদি সাবধান! ইঁদারা কাছাকাছিই আছে, দেখো পড়ে যেওনা যেন!'

একটু পরেই দ্যাখা গেল লতাপাতায় ঢেকে যাওয়া মস্তো একটা ইঁদারার মুখ। ব্যাঙ না বলে দিলে হয়তো টগর পড়েই যেত তার মধ্যে। যেমন ডালিম পড়ে গিয়েছিল। কৃতজ্ঞ হয়ে টগর বললে, —'ভাই ব্যাঙ, ভাগ্যিস তুমি সঙ্গে এলে! বলো তো এবারে এখন আমার কী করা উচিত? ইঁদারাতে তো এসে গেছি!' ব্যাঙ বললে—'তুমি কিছুই করবে না। চুপচাপ দ্যাখো না ভগবান কী করেন।'

এই বলে ব্যাঙ থুপথুপিয়ে নেমে পড়লো টগরের আঁচল থেকে। নেমেই সে 'গ্যাঙোর গ্যাঙ' করে ডাকতে শুরু করে দিলে। আর সঙ্গে-সঙ্গে এ গর্ত, সে গর্ত, ও গর্ত থেকে গাদা-গাদা ব্যাঙ বেরিয়ে আসতে লাগল তো আসতেই লাগল। কোলাব্যাঙ, সোনাব্যাঙ, কুনোব্যাঙ, আরও ক-ত্-তো ব্যাঙ! কোলাব্যাঙ তখন একটা ব্যাঙের ছাতায় উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করলো ঃ ভাইরা আর বোনেরা, আমাদের প্রিয় টগরদিদিকে সাহায্য করতে আজ আমরা এখানে জড়ো হয়েছি। এই ইঁদারার মধ্যে এক দুষ্টু অজগর সাপ থাকে, টগরদিদির বোন ডালিমফুল তার পেটের মধ্যে আছে। কী করে তাকে বের করা যায়?' তখন পশ্চিমপুরায় ব্যাঙদের নেতা বললে—'কিন্তু দাদা, আমরা তো ব্যাঙ। সাপের খাদ্য। আমরা কেমন করে সাপকে জব্দ করব? সাপের সঙ্গে লড়তে পারে কেবল নকুল, মানে বেজি! তা, এপাড়ার সব বেজিরা ওর কাছে হার মেনে নিয়েছে। অজগরটা এমনই মোটা, যে বেজি কেন, বাঘেও তার সঙ্গে লড়তে পারবে না।'

—'তাছাড়া সে তো ইঁদারা ছেড়ে বেরুবেই না। বাঘেই বা তাকে পাবে কী করে?' এমন সময় বিশাল একটা কালো ছায়া উড়তে-উড়তে এসে পড়লো সেই মাঠের ওপরে।

তারপর টগরের সামনে নেমে এলো হেলিকপ্টারের মতো বিরাট এক পাখি।

—'তুমি কি ঈগলপাখি?' অবাক টগর জিগ্যেস করলো।

—'আমি গরুড়পাখি। তুমি তো টগর? আমি তোমাকেই খুঁজছি।'

—'আমাকে? কেন ভাই?'

—'আমার ছানারা বললে তুমি ওদের প্রাণ বাঁচিয়েছো। শেয়াল তাড়িয়ে আমার ছোট ছেলেটাকে বাসায় পৌঁছে দিয়েছো, নিজের খাবার ভাগ করে

আমার ছানাদের খিদে মিটিয়ে দিয়েছো। চিঁড়ে-গুড়ের মতো সুখাদ্য তো ওরা আগে খায়নি। এমন অপূর্ব নেমন্তন্ন খেয়ে তারা খুব খুশি। এখন আমি এসেছি তোমাকে সাহায্য করতে। বলো কী করতে পারি?'

—'তুমি কি অজগরের সঙ্গে লড়তে পারবে? অজগর তো অনেক বড়ো! আর তুমি তো পাখি?' হো হো করে হেসে উঠে পাখি বললে—

—'আমরা হলুম গরুড় পক্ষী
সাপ আমাদের খাদ্য
অজগরকে হজম করা
নেহাত সহজসাধ্য!

সে তো হবে, কিন্তু ইঁদারাতে নামবে কে? আমি তো পারি না!'—

—'কাউকে ইঁদারাতে নামতে হবে না। সাপকেই বাইরে বের করে আনবো আমরা।' ব্যাঙ বললে—'সে ব্যবস্থা আমরা করেছি, কিন্তু বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গেই তাকে না মারলে, সে আমাদের খেয়ে ফেলবে। একটুও দেরি করলে চলবে না। হ্যাঁ! বিষম বিপদ হবে কিন্তু!'

গরুড় বললে—'একটুও দেরি হবে না, তুমি ওই নিয়ে একদম ভেবো না! দ্যাখো না কী হয়!'

এবারে সমস্ত ব্যাঙেরা একত্র হয়ে কী যেন পরামর্শ করলো ফিসফিস করে। মিটিং শেষ হতে ব্যাঙ বন্ধু বললে—'টগরদিদি, গরুড়দাদা, এবারে প্রস্তুত হও, অজগর কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরুবে। বেরুলেই তাকে ধরে ফেলবে কিন্তু! চটপট্।' তারপরেই রাজ্যের যত ব্যাঙ সবাই মিলে গলা ফুলিয়ে চোখ বড়-বড় করে কোরাসে গান ধরলো—

গ্যাঙোর গ্যাঙ গ্যাঙোর গ্যাঙ
বীরবাহাদুর আমরা ব্যাঙ

একটা আছে কুয়োর সাপ
ব্যাঙ দেখলেই বাপ্‌রে বাপ্

গ্যাঙোর গ্যাঙ গ্যাঙোর গ্যাঙ
এই অজগর ড্যাড্যাং ড্যাং

ব্যাঙকে এমন ভয় পায়
লুকিয়ে থাকে ইঁদারায়।

এই অজগর ধরবি ব্যাঙ?
গ্যাঙোর গ্যাঙ গ্যাঙোর গ্যাঙ।

এমন অপূর্ব গান কানে যাওয়ামাত্রই অজগর তো রেগে আগুন, তেলে বেগুন। ব্যাঙ হয়ে কিনা এতো আস্পদ্দা! দলে-দলে বাড়ি বয়ে এসে কিনা তাকেই খ্যাপাচ্ছে? প্রাণের ভয় নেই? অজগরকে কিনা গলা ছেড়ে এমন মন্দ কথা বলা? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। অজগর রেগেমেগে গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো।

ইঁদারার নরম ঠাণ্ডা কাদার বিছানা ছেড়ে উঠে, রাগে হিসহিস করতে-করতে কুণ্ডলীটা পাকে-পাকে খুলতে-খুলতে ফণা তুলে বেরিয়ে এলো ওপরে, মাঠে। সেখানে উঠে এসেই সামনে হাজার-হাজার সুইসাইড স্কোয়াডের ব্যাঙ দেখে তো তার মাথা খারাপের জোগাড়—কাকে ছেড়ে কাকে খাবে? মনস্থির করবার আগেই গরুড়পাখির বাঁকা ঠোঁট তরোয়ালের ফলার মতন আছড়ে পড়লো নিষ্ঠুর অজগরের মাথায়।

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই হিস হিস করে অজগরের প্রাণটা বেরিয়ে গেল। তখন গরুড়পাখি তার ধারালো ঠোঁট দিয়ে খুব সাবধানে সাপের পেটটি চিরে দিল—ঠিক যেন নিপুণ সার্জেনের ছুরি। তারপর? তারপর সবাই কী দেখলো? দেখলো, অজগরের পেটের মধ্যে এক পরমা সুন্দরী কন্যে ঘুমিয়ে আছে। রাঙা ডুরেটি পরনে, কাজলটিপটি কপালে, দুই বিনুনীতে দুটো সবুজ রেশমি ফিতের ফুল দুলদুল করছে। টগর দৌড়ে গিয়ে বোনকে জড়িয়ে ধরলো। এবারে দিব্যি জড়ানো গেল। এ তো ছায়া নয়?

—'ডালিমফুল? ডালিমফুল? চোখ মেলো বোনটি?' ডালিমফুল চোখ মেললো। দেখলো। হাসলো।

—'দিদি? এসেছিস?'

শুনে ব্যাঙেরা আনন্দে হেসে উঠলো ঘ্যাং-ঘ্যাং করে। এমন অপূর্ব ব্যাঙের হাসি এর আগে কেউ দেখেনি। কেউ শোনেনি।

টগর বললে—'কোলাব্যাঙ ভাই—তোমরা আমার কত যে উপকার করলে, সত্যি—কীভাবে ধন্যবাদ দেবো জানি না!'

কোলাব্যাঙ বললে—

—'তাহলে এবারে বলি? এইটেও আসলে কিন্তু ধন্যবাদ দেওয়াই। আমরাই তো তোমাকে ধন্যবাদ দিলুম। জানো কি, তোমার কাছে আমরা

কত কৃতজ্ঞ? আমাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে?'

—'ওমা, সে আবার কেমন? জানি না তো?'

ওদিকে গরুড়পাখি মন দিয়ে সাপভোজন শুরু করেছে, আর টগর ততক্ষণে ডালিম বোনের হাতটি মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরেছে। কোলাব্যাঙ বললে—'তবে শোনো। যখন তুমি খুব ছোট ছিলে, পাড়ার দুষ্টু ছেলেরা একবার একগাদা ব্যাঙাচি ধরে এনে হাঁড়ির মধ্যে পুরে রেখে দিয়েছিল। তুমিই আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে গিয়ে পুকুরের জলে ছেড়ে দিয়েছিলে। তোমার মনে অনেক দয়া-মায়া। সেই ব্যাঙাচি থেকেই তো আমরা জন্মেছি, আমাদের ছেলেপুলেরা নাতিপুতিরা জন্মেছে। আজ তোমার একটা উপকারে লাগতে পেরে আমরা খুব খুশি।'

টগরের মনে পড়ে গেল, হ্যাঁ, একবার সেই বেচারী খুদে-খুদে ব্যাঙাচিগুলোকে হাঁড়িতে ছটফট করতে দেখে সে লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে পুকুরে ছেড়ে দিয়েছিল। বটে!

—'ওমা তোমরা সেই ব্যাঙাচির ব্যাঙ? কী মজা!' এবারে গরুড় বললে—'সন্ধে হয়ে গেল, সবটা সাপ খেতে পারবো না, খানিকটা বরং থাকুক। কাল আমার ছানাদের জন্যে নিয়ে যাবো। এখন তারা ঘুমিয়ে পড়েছে।

টগর, চলো, আমার পিঠে উঠে বসো, আমি তোমাদের দুজনকে গ্রামে পৌঁছে দিই। সন্ধে হয়ে গেছে, এখন সাতক্রোশ রাস্তা হেঁটে যাবে। আবার যদি ডাকাতে ধরে?" ব্যাঙের দল তক্ষুণি গ্যাঙোর-গ্যাঙোর করে তাতে মত দিলো। আর গাঁই-গাঁই করে বাইবাই করে দিল। টগরদিদি তার ডালিম বোনকে নিয়ে বন্ধু গরুড়ের পিঠে চড়ে বসলো, ততক্ষণে আকাশে সূর্য্যিঠাকুর পাটে নেমেছেন।

আর চাষী-চাষীবউ কী দেখলো? দেখলো যে তাদের উঠোনের ডালিম ফুলটার পাপড়িরা খসেছে, এতদিনে তাতে প্রথম ফল ধরেছে। ডালিম ফিসফিস করে টগরকে বললো,

—'আরে দিদি। আমরা যে উড়তে না উড়তেই বাড়ি পৌঁছে গেছি!'

—'হবে না? গরুড়পাখি যে মনপবনে ভেসে যায়। একি এমনি-এমনি বাতাস?' উত্তরটা দিল গরুড়পাখি নিজেই।

—'আমরা না বিষ্ণুর বাহন।'

—'তা বটে। তা বটে।'

পরের দিন সকালে চাষীদের পাড়ায় হৈ-হৈ রৈ-রৈ। কী ব্যাপার? ব্যাপার কী? সব্বাই সব্বাইকে নাড়ু খাওয়াচ্ছে কেন?

কেন? কেননা—

এক তো ডালিমফুলকে খুঁজে এনেছে টগর। আর বাঁচা গেল। গাঁয়ের মানুষের এতদিনে ভাত রুচলো। মনের আঁধারটি ঘুচলো।

আর দুই? এই গাঁ জেলার মেয়েদের সাইকেল প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়েছে।

কী আনন্দ! কী আনন্দ!

কোন মেয়েটি হলো? কোন মেয়েটি হলো?

আবার কে? ডানপিটে দস্যি মেয়েটি।

টগর। আবার কে?

তারপর একদিন এলো পুরস্কার বিতরণী উৎসব। মাঠে সামিয়ানা টাঙানো হলো। সভা হলো, উৎসব হলো, রঙিন পতাকায়, গাঁদাফুলে, আমপাতায় সাজানো হলো মঞ্চ—জেলাশাসিকা অগ্নিহোত্রী দিদিমনি এসে ফার্স্ট প্রাইজ দিয়ে গেলেন টগরফুলকে।

কী প্রাইজ? কী প্রাইজ?

নতুন গয়নার মতন চকচকে ঝকঝকে বেনারসী শাড়ির মতো বেগ্‌নি রঙের একটা চমৎকার সাইকেল!

গাঁসুদ্ধু লোকের আহ্লাদ দ্যাখে কে? আর সবচেয়ে খুশি হলো ডালিমফুল, এইজন্যেই না বেচারার ডাকাতের হাতে পড়া! তারপর? তারপর—

টগরদিদি, ডালিমফুল
রোজ যাচ্ছে দূরের স্কুল
সাইকেল নয়, পক্ষীরাজ
গপ্পো আমার সাঙ্গ আজ!
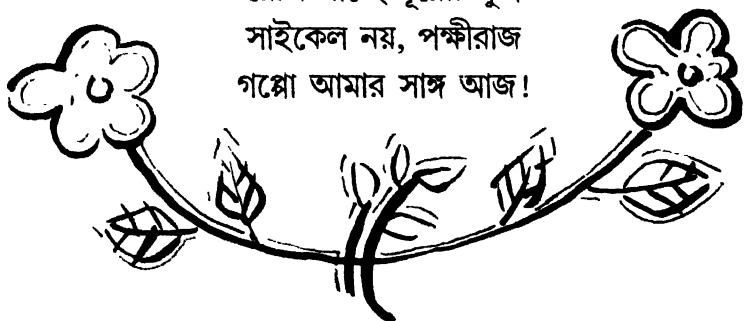
পোস্তমণির উপাখ্যান

অপূর্ব ঘোষ

সে আজ অনেকদিনের কথা। গঙ্গার ধারে তখন এক ঋষি বসে থাকতেন। তাঁর আর কোন কাজকর্ম ছিল না, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত গঙ্গার তীরে বসে-বসে কেবলি জপ, তপস্যা আর ঈশ্বরের আরাধনা করে সময় কাটাতেন। তারপর যখন সন্ধ্যা হয়ে আসত, তিনি তাঁর আসন, কমণ্ডলু গুটিয়ে ধীরে-ধীরে ছোট্ট একটা কুঁড়েঘরে গিয়ে হোম-যোগ করে সমস্ত রাত কাটিয়ে দিতেন। কুঁড়েঘরটি তার নিজের হাতে তৈরি। গঙ্গার ধারেই সে কুটীর ছিল—কিন্তু আশপাশে জনপ্রাণীর চিহ্নও ছিল না।

তবু তিনি একেবারেই সঙ্গীহীন একাকী ছিলেন তা নয়, সেই কুঁড়েঘরে আরও একটা প্রাণী থাকত—সেটি কে তা জনো? সে একটা ছোট্ট ইঁদুর। ঋষি ফল-মূল খেয়ে যা ফেলে দিতেন সেইগুলি কুড়িয়ে খেয়ে সে জীবন ধারণ করত।

ঋষি ছিলেন পরম ধার্মিক। কাহাকেও হিংসা করা তাঁর অভ্যাস ছিল না। সুতরাং ইঁদুরের কোন ভয়-ভাবনা ছিল না। দিব্যি নিশ্চিন্ত আরামে সে খেয়ে-খেলে ছুটে বেড়াত। ঋষিকে ভয় করা তো দূরের কথা—সে তাঁর

দয়ার পরিচয় পেয়ে একেবারে তার পায়ের কাছে গিয়ে নিরিবিলি বসে খেলা করত।

ঋষি দয়া করে সেই ইঁদুরকে মানুষের মত কথা বলার শক্তি দিয়েছিলেন—তাতে করে ঋষির এই লাভটুকু হয়েছিল যে সারাদিন জপ-তপের পর তিনি তার সঙ্গে গল্প করে বেশ একটু আরাম বোধ করতেন।

এইভাবে দিন যায়। একদিন সন্ধ্যাবেলা ঋষি কুটীরে এসে হাতমুখ ধুয়ে ফলমূল খেয়ে বসে আছেন, এমন সময় সেই ইঁদুর সুড়সুড় করে তাঁর খুব নিকটে এসে দুহাত জোড় করে বলতে লাগল—মুনিঠাকুর! আপনার দয়ার তো সীমা নেই, দয়া করে আপনি আমায় কথা বলবার ক্ষমতা দিয়েছেন বলে পশু হয়েও আমি ঠিক মানুষের মত কথা বলতে পারি। যদি অভয় দেন তো আজ একটি নিবেদন আপনার কাছে করতে পারি।

মুনি বললেন—কি চাও তুমি?

ইঁদুর বলল—দিনের বেলা যখন আপনি নদীর ধারে চলে যান তখন একটা বিড়াল কোথা থেকে এসে রোজ আমাকে ভারি চোখ রাঙায়। আপনার ভয়েই শুধু আমাকে সে ধরতে সাহস করে না, তা নইলে কবেই সে আমাকে ধরে মেরে খেয়ে বসে থাকতো। রোজ-রোজ চোখ রাঙানো দেখে আমার বড্ড ভয় করছে, মনে হচ্ছে সে আমায় শিগগিরই খেয়ে ফেলবে। তাই প্রার্থনা করছি। ঠাকুর আমার ইঁদুরের চেহারা বদলিয়ে আমাকে একটা বিড়াল করে দিন।

ইঁদুরের কথা শুনে ঋষির ভারি দয়া হল। তিনি হাতে করে একটু জল নিয়ে মন্ত্র পড়ে ইঁদুরের গায় ছিটিয়ে দিলেন—আর দেখতে-দেখতে সেই ইঁদুর প্রকাণ্ড এক বিড়াল হয়ে গেল—কিন্তু তার চেহারা, এ্যা লম্বা তার গোঁফ দেখেই মনে হয় যেন ঠিক বাঘের মাসী। সে তখন ঋষির পায়ের কাছে ম্যাঁও-ম্যাঁও ডাকতে শুরু করে দিল।

কিছুদিন যায়—মুনি একদিন রাত্রিবেলা সেই বিড়ালকে ডেকে বললেন, পুষী পুষী—আজকাল কোনো নালিশ যে শুনতে পাই না। বেশ স্ফূর্তিতেই আছ বলে মনে হচ্ছে।

মাথা নেড়ে বিড়াল উত্তর দিল—না ঠাকুর, স্ফূর্তিতে নয়। মুনি অবাক হয়ে বললেন—কেন? আমি তো তোমাকে সামান্য বিড়াল করে দিয়েছি

তা নয়, পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা বিড়াল যে তুমি, তোমার সাথে পারে এমন বিড়াল আর পৃথিবীতে একটাও নেই।

বিড়াল বলল—হ্যাঁ মুনিঠাকুর। সে কথা ঠিক। আমি পৃথিবীর কোন বিড়ালকেই আর ভয় করি না বটে, কিন্তু হয়েছে কি জানেন? এক নতুন শত্রু এসে দেখা দিয়েছে যে! আপনি নদীর ধারে চলে যেতেই একদল কুকুর এসে দাঁত খিঁচিয়ে এমনি ধমকাতে শুরু করে দেয় যে তা দেখে ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে যায়। আপনি এতই যখন করেছেন, তখন একটিবার আমায় কুকুর করে দিন, দেখি ওদের জব্দ করতে পারি কিনা।

মুনি বললেন—তথাস্তু। অমনি দেখতে-দেখতে সেই বিড়াল প্রকাণ্ড এক কুকুর হয়ে গেল।

দিন যায়। সপ্তাহ যায়। একদিন রাত্রিবেলা সেই কুকুর মুনিকে বলল—ঠাকুরমশাই, আপনার দয়ার কথা বলব কত। একমুখে বলে শেষ করা যায় না। ছিলাম ইঁদুর, বলতাম মানুষের মত কথা, হলাম বিড়াল, তাতেও সাধ মিটলো না, হলাম কুকুর। কিন্তু কি বলব ঠাকুর—এই রাক্ষুসে কুকুরের পেট কি আর সহজে ভরতে চায়? আপনি জানেন না আমার পেট কেবলি খাই-খাই আর চাই-চাই করে। আহা! এই বানরগুলির কি হাসিখুশি মুখ। ওদের কেমন ভরা পেট। সারাদিন গাছে-গাছে লাফালাফি, ছুটোছুটি করে বেড়ায়, নানা গাছের ফল-মূল, কচিপাতা খেয়ে সারাদিন কি স্ফূর্তিতেই ওরা সময় কাটায়। মুনিঠাকুর দয়া করে আমাকে যদি একটা বানর...

ঋষি তার মনের কথা বুঝতে পেরে মন্ত্র পড়া জল ছিটিয়ে তাকে একটা প্রকাণ্ড হনুমান করে দিলেন। হনুমান খো-খো করে লাফিয়ে গিয়ে গাছে চড়ল।

হনুমানের বাঁদরামী দেখে কে। সারাদিন কেবল গাছে-গাছে লাফালাফি করে...ডাল ভাঙে...পাতা ছেঁড়ে...তার লেজ আর মাটিতেই পড়ে না।

এমনিভাবে হেসে-খেলে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে দিন যায়। ক্রমে শীত গেল। গ্রীষ্ম এল। রোদের তাপে নদী-খাল-বিল সব শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠল। বেচারা হনুমানের কষ্ট দেখে কে! সে আর একফোঁটা জলও খেতে পায় না। এমন সময় দেখা গেল একদল জংলী শূকর ডোবার নোংরা ঘোলা জলে দিব্যি আরামে গড়াগড়ি দিচ্ছে। এমন অসহ্য গরম—গাছের পাতা

পুড়ে গেছে—পুকুরের জল শুকিয়ে গেছে—কিন্তু ঐ শূকরগুলো তো একটুও কষ্ট পাচ্ছে না। ওদের পরিষ্কার জলের দরকার নেই। ওরা তো নোংরা জলেই দিব্যি আছে।

ঋষি হনুমানের মনের কথা জানতে পেরে তক্ষুনি তাকে শূকর বানিয়ে দিলেন। হনুমান শূকর হয়েই ঘোঁৎ করে ডোবার জলে লাফিয়ে পড়ে রইল।

পরদিন সকালবেলা সেই ডোবার ধার দিয়ে দেশের রাজা প্রকাণ্ড হাতিতে চড়ে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। তাই দেখে শূকর ভাবল—ওঃ, ঐ হাতিটার কি সৌভাগ্য। এতসব জরি-জহরত, মণি-অলঙ্কারে তার এতবড় শরীরটা ঢাকা পড়ে গেছে। লক্ষ টাকার কম কিছুতেই হবে না ঐ সব অলঙ্কারের দাম। শুধু কি তাই? দেশের রাজাকে সে নিজের পিঠে চড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে—উঃ! কতবড় সৌভাগ্য তার। হায়! এমনি একটা হাতি হয়ে যদি জন্মাতে পারতুম!

ঋষির নিকট প্রার্থনা জানান গেল। ঋষি খুশি হয়ে তাকে এক প্রকাণ্ড হাতি করে দিলেন। হাতি তখন ছুটে গেল সেই বনের ধারে যেখানে রাজা হরিণ শিকার করতে যান। রাজা শিকার করতে গিয়ে দেখেন সুন্দর একটা হাতি ঘুরে-ঘুরে কেবলি তাঁর পাশ দিয়ে আসা-যাওয়া করছে। রাজা সেটাকে বেঁধে ফেলবার জন্য মাহুতকে হুকুম দিলেন। সবাই মনে করেছিল জংলী হাতি। ধরতে কতই না মেহনত করতে হবে। কিন্তু হাতি ভাবছিল—কখন আমাকে ধরে রাজবাড়ি নিয়ে যাবে। সুতরাং মাহুত যখন দড়ি দিয়ে বাঁধতে গেল, হাতি নিজেই এসে ধরা দিয়ে নেচে নেচে রাজপ্রাসাদে হাতিশালার দিকে ছুটে চলল।

ঘোড়াশালে ঘোড়া...হাতিশালে হাতি...খায় দায় ঘুমায়। একদিন রানীর ইচ্ছা হল হাতিতে চড়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাবেন। শুনে রাজাও বললেন—আমি তোমার সঙ্গে যাব।

হুকুম গেল হাতিশালে—জমকালো সাজে দুটো হাতিকে সাজিয়ে মাহুত রাজবাড়ির অন্দর মহলের দ্বারে হাজির করল। রাজারানী পোশাক পরে বেরিয়ে এলেন। নতুন হাতিটা দেখতে যেমন সুন্দর ছিল, পোশাকে-অলঙ্কারে তাকে আজ আরও চমৎকার দেখাচ্ছিল। রানী বললেন আমি চড়বো সুন্দর হাতিতে।

রাজারানী হাতি চড়ে গঙ্গার ধারে চলেছেন—ধীরে-ধীরে হাওয়া সেবন করে। এদিকে নতুন হাতিটা করেছে কি—ধেই-ধেই করে লাফাতে শুরু করেছে। ওর প্রথম থেকেই মনে রাগ জমে উঠেছিল। সে ভেবেছিল রাজবাড়ি এসেছে স্বয়ং মহারাজ তার পিঠে চড়বেন; কিন্তু কই—তার পিঠে চড়ে বসেছে কিনা রানী—একটা মেয়েমানুষ! তাই তার রানীর উপর এমন রাগ হয়েছে যে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে মাহুতকে রানীকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে তুলেছে। মাহুত কিছুতেই পারছে না হাতিটাকে শান্ত করতে। রানীও পারছেন না শান্তিতে হাতির পিঠে বসে থাকতে। শেষকালে চোট সামলাতে না পেরে রানী একেবারে ধপাস করে মাটিতে চিৎপাত।

রাজা ছুটে এসে রানীকে হাত ধরে তুললেন। রুমাল দিয়ে মুখ-হাত মুছিয়ে দিলেন। ধুলো ঝেড়ে কত আদর-যত্ন করলেন। এসব দেখে হাতি ভাবল—বটে। এত আদর? আমি যাকে ঘৃণা করে পিঠ থেকে ফেলে দিলাম তার এত যত্ন? এত সৌভাগ্য যার সে নিশ্চয়ই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী। আমার কি তেমন সৌভাগ্য হবে? আচ্ছা দেখা যাক, মুনিঠাকুরকে আর একবার বলে দেখব।

এই না ভেবে সেদিন সন্ধ্যার সময় হাতি ছুটে গিয়ে বন পেরিয়ে নদীর ধারে সেই ঋষির কুটীরে গিয়ে উপস্থিত। ঋষি তাকে দেখেই তো একেবারে অবাক। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাপার? রাজার ওখানেও মন উঠলো না? রাজবাড়ি ছেড়ে চলে এলে যে?

হাতি ঋষির পায়ের তলায় লম্বা হয়ে পড়ে বলতে লাগল—কি আর বলব ঠাকুর, আপনি দয়া করতে আর কম করলেন না। —আমি যখন যা ইচ্ছা করেছি আপনি তখনি তা পূর্ণ করেছেন। কিন্তু আর একবার আমার সাধ পূর্ণ করতে হবে। তবেই হবে। আর কোনদিন আমি কিছু চাইব না। আপনার বরে আমি হাতি হয়েছি বটে, কিন্তু তাতে করে আমার শরীরটা মোটা আর ভারী হয়েছি বটে, —আমার সুখ-শান্তি একটুও বাড়েনি। আমার মনে হচ্ছে পৃথিবীতে যদি কেউ সুখী থেকে থাকে তবে ঐ রানী। ওগো ঠাকুর। একটাবার দয়া করে আমায় রানী করে দিন।

ঋষি বললেন—আরে হতভাগা। তোর আশার বুঝি আর শেষ নেই? কিন্তু আমি তোকে রানী করব কেমন করে? একটা রাজ্য চাই, একটা রাজা

চাই—তবে তো রানী হওয়া চলে। আচ্ছা এক কাজ করা যাক। তোকে খুব সুন্দর একটা মেয়েমানুষ করে দেখি—কোনদিন যদি কোন রাজার নজরে পড়িস তবেই তোর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে—কেমন?

হাতি তাতেই রাজি হল। ঋষি তাকে সুন্দর একটা মেয়ে হবার মন্ত্র পড়ে জল ছিটিয়ে দিলেন—দেখতে-দেখতে সেই ভীষণ মোটা কালো হাতির শরীরটা কোথায় মিলিয়ে গেল। আর সেইখানে রইল ছোট্ট একটা মেয়ে। টুকটুকে তার মুখ, ফুটফুটে তার চোখ—ধবধবে সাদা কুন্দ ফুলের মতো তার গায়ের রং। ঋষি তার নাম রাখলেন পোস্তমণি।

পোস্তমণি ঋষির কাছেই থাকে—গাছে জল দেয়—ফুল পাড়ে। ফল খায়—গঙ্গার জলে সাঁতার কাটে, সন্ধ্যাবেলা ঋষির পূজার ঘরে ধূপ দেয়—দীপ জ্বালে। এইভাবে তার দিন কাটে। একদিন সে দোরগোড়ায় চুপটি মেরে বসে আছে—ঋষি তখন ঘরে নেই—এমন সময়ে খুব জমকালো পোশাক পরা এক রাজপুত্র সেইখানে এসে উপস্থিত।

পোস্তমণি তাকে জিজ্ঞাসা করল—আপনি কে? কি জন্যই বা এই বনের মধ্যে একাকী এসেছেন?

রাজকুমার বলল শিকার করতে বেরিয়ে এক হরিণকে তাড়া করে ছুটতে-ছুটতে বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তাই একটু জল খেতে এই কুটীর দেখতে পেয়ে এখানে এসেছি।

পোস্তমণি বলল—আপনি বিশ্রাম করুন, জল এনে দিচ্ছি।

পোস্তমণি একঘড়া জল এনে রাজপুত্রের পা ধুইয়ে দিতে গেল। রাজপুত্র লাফিয়ে উঠে বলল—ও কি কর! আমি হলাম ক্ষত্রিয়, আর তুমি হলে ঋষিকন্যা—তুমি তো আমরা পা ছুঁতেই পার না।

পোস্তমণি বলল—আমি ঋষিকন্যা নই। তাছাড়া আপনি যখন আজ আমার অতিথি হয়ে এসেছেন তখন আপনার পা ধুইয়ে দিতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। আর একথাও জেনে রাখুন আমি ব্রাহ্মণকন্যাও নই।

রাজপুত্র অবাক হয়ে বলল—তুমি ঋষিকন্যা নও। ব্রাহ্মণকন্যাও নও। তাহলে তুমি কার মেয়ে? তোমার বংশপরিচয় না দিলে আমি তোমার আতিথ্য গ্রহণ করব না।

পোস্তমণি তখন বলল—ঋষির কাছে শুনেছি আমার মা-বাবা দুজনেই

ক্ষত্রিয় ছিলেন।

রাজপুত্র বলল—তোমার বাবা কি তাহলে রাজা ছিলেন? তোমাকে দেখে তো রাজকন্যা বলে মনে হচ্ছে।

পোস্তমণি সেকথার কোন জবাব না দিয়েই ঘরের ভিতর চলে গেল এবং একটি রেকাবি করে নানারকম মিষ্ট ফল এনে রাজার কাছে রেখে খেতে অনুরোধ করতে লাগল। রাজপুত্র বলল—আমার কথার জবাব না দিলে আমি কিছুতেই এ ফল গ্রহণ করব না।

পোস্তমণি বাধ্য হয়ে বলতে লাগল—ঋষির কাছে শুনেছি আমার পিতা একজন রাজা ছিলেন। কোন এক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মনের দুঃখে তিনি বনে চলে যান। সেই সঙ্গে মা-ও গিয়েছিলেন। কিন্তু বেশিদিন তাঁরা জীবিত ছিলেন না। সেই বনে বাঘের মুখে বাবার প্রাণ যায়। আমার তখনও জন্ম হয়নি। বাবার মৃত্যুর কয়েকদিন পরই আমার জন্ম হয়। আমি যেদিন পৃথিবীতে এসে চোখ চাইলুম সেদিন চিরকালের তরে চোখ বুজে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন মা। মা-বাবা মারা গেলেন, কিন্তু বিধাতা আমার বাঁচবার এক আশ্চর্য উপায় করে দিলেন। আমি যেখানে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলুম ঠিক সেখানে আমার মাথার উপরেই একটা গাছের ডালে সুন্দর একটা মৌচাক ছিল—সেই মৌচাক থেকে টসটস করে মধু এসে আমার মুখে পড়ত—আমি তাই খেয়ে বেঁচে রইলুম। শেষে একদিন এই ঋষি আমায় দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে এনে পালতে লাগলেন। সেই থেকে আমি এখানে আছি।

রাজপুত্র প্রথম থেকেই এই কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি পরিচয় পেয়ে আর দেরি করলেন না। তাড়াতাড়ি রাজধানীতে নিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে বিয়ে করে একেবারে সিংহাসনে নিজের পাশে বসিয়ে দিলেন।

সেই পোস্তমণি—ছিল বনের ধারে ছোট্ট এক কুটীরে—আর এখন সে এসেছে রাজপ্রাসাদে। বসেছে সিংহাসনে—রাজার পাশে—রাজরানী হয়ে। মাথা তার ঠিক থাকতে কি পারে? তার মেজাজ হয়ে গেল ভারি কড়া—ভারি কনকনে।

গন্ধতৈল মাথায় দেয়। গোলাপজলে স্নান করে। শতেক দাসীতে হাওয়া করে—কিন্তু মাথা তার কিছুতেই ঠাণ্ডা হয় না। কি উপায় হবে? রাজা ভেবে আকুল—মন্ত্রী একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা। রানীর একি উৎকট ব্যাধি

হল। কোন বৈদ্যই এই উৎকট ব্যাধির ঔষধ জানে না।

একদিন কিন্তু সব চিন্তা দূর হয়ে গেল। সেদিন গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় আকাশে প্রকাণ্ড চাঁদ উঠেছে। গরমে রানী আর কিছুতেই ঘরে থাকতে পারেন না। বাগানে বেরিয়ে এলেন। ফুরফুরে হাওয়া—ফুটফুটে জ্যোৎস্না। রানী আপন মনে বেড়াতে-বেড়াতে বাগানের একধারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে ছিল একটা প্রকাণ্ড কূপ। সেই কূপের ধারে গিয়ে দাঁড়াতেই তার মাথায় কেমন বনবন—গা-টা কেমন ছমছম করে উঠল। দেখতে-দেখতে মাথা ঘুরে তিনি কূপের ভিতর পড়ে রইলেন।

রাজা খবর পেয়ে পাগলের মত ছুটে এলেন সেই কূপের ধারে। কেমন করে রানীকে বাঁচাবেন তার চেষ্টায় কি যে করবেন ঠিক করতে পারলেন না। এমন সময় সেই ঋষি এসে উপস্থিত হলেন সেই কূপের ধারে। কেমন করে খবর পেলেন—কি করেই বা সেখানে উপস্থিত হলেন তা কেউ বলতে পারে না।

ঋষি এসেই রাজাকে বললেন, মহারাজ! যা হবার হয়ে গেছে সেজন্য দুঃখ করবেন না। ভাগ্য খণ্ডাবে কে? আপনি যাকে রাজার মেয়ে মনে করে রানী করেছিলেন, সে কনে রাজকন্যা ছিল না—সে ছিল একটা ইঁদুর! আমার বরে সে ইঁদুর থেকে বিড়াল, বিড়াল থেকে কুকুর, কুকুর থেকে বানর, বানর থেকে শূকর, শূকর থেকে হাতি এবং হাতি থেকে সেই রাজকন্যা হয়ে শেষপর্যন্ত আপনার রানী হয়েছিল। সে যখন আর নেই তখন তার জন্য আর দুঃখ করে লাভ কি? তবে আমার একটা ইচ্ছা আছে—এই মেয়েটির নাম যাতে চিরকাল পৃথিবীতে থেকে যায় তার একটা উপায় ঠিক করেছি। আপনি কূপ থেকে আর তাকে তুলবেন না। মাটি দিয়ে সেটা একদম বন্ধ করে দিতে হবে। সেই মাটি থেকে একটা গাছ উঠবে। —তাকে সবাই বলবে পোস্ত গাছ। সেই গাছ থেকে একরকম কস বের হবে—সে কসের নাম হবে আফিঙ। যে সেই আফিঙ খাবে সে হবে আফিঙখোর। সেই আফিঙখোরের স্বভাব হবে—ইঁদুরের মত অনিষ্ট করা, বিড়ালের মত দুধখোর, কুকুরের ন্যায় ঝগড়াটে, হনুমানের মত নোংরা, শূকরের মত জংলী, হাতির মত হোঁৎকা এবং এই পাটরানীর মত গরম মেজাজি।

রাজকন্যার খোঁজে

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

এক দেশে এক মস্ত রাজা ছিল। বিশাল তার রাজপ্রাসাদ। দ্বারে-দ্বারে প্রহরী...হাতিশালায় হাতি...ঘোড়াশালায় ঘোড়া...। মন্ত্রী, সেনাপতি, সৈন্যসামন্ত, পাইক-পেয়াদা...। রাজার মনে কিন্তু সুখ ছিল না। কারণ কিছুতেই তার বিয়ে হচ্ছিল না। কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না তার কনে।

—বলতে পারো কেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আমার রানী? রাজা একদিন প্রশ্ন করলেন মন্ত্রীকে।

—অপদার্থ পুরোহিতটার জন্যে হুজুর। মন্ত্রী উত্তর দিলেন টপ করে। ওটাকে তাড়িয়ে দিয়ে একটা নতুন রাজপুরোহিত আনুন, দেখবেন এক্ষুণি আপনার বিয়ে হয়ে গেছে।

—সত্যি!

হ্যাঁ হুজুর। সত্যি কথাটা চেপে গিয়ে মন্ত্রী দিব্যি চালিয়ে দিলেন একটা ডাহা মিথ্যে। হাজার হোক রাজা তো। মন্ত্রী তাই বলতে পারলেন না, আপনার মত কালো কুচ্ছিত, ট্যারা, নাকব্যাঁকাকে কে বিয়ে করবে শুনি!

—তুমি বলছ, পুরোহিতকে তাড়ালে আমার বিয়েটা লেগে যাবে?

রাজা ফের প্রশ্ন করলেন।

—নিশ্চয়।

—মিথ্যে কথা। রাজা হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। আসলে তুমিই একটা অপদার্থ। তোমার জন্যেই আমার দেরি হচ্ছে কনে পেতে।

এ্যাঁ...মন্ত্রী একলাফে উঠে দাঁড়ালেন।

হ্যাঁ। রাজা আবার হুঙ্কার ছাড়লেন। এবার আমার রানী চাই-ই চাই। সাত দিনের মধ্যেই। আর তা না জোটাতে পারলে তোমাকেই আমি দেব দূর করে।

—সেকি?

হ্যাঁ। কথাটা শেষ করেই রাজা বেরিয়ে গেলেন হনহন করে। মন্ত্রীও তো শুরু করলেন ঠকঠক করে কাঁপতে। মাত্র সাত দিনের মধ্যে এই কুৎসিত লোকটার জন্য একটা কনে জোগাড় করা কী সহজ কথা!

—সেনাপতি...সেনাপতি...মন্ত্রী হঠাৎ ছুটলেন সেনাপতির খোঁজে।

—হুজুর।

—যাও এক্ষুণি ঢ্যাড়া পিটিয়ে দাও—বলো, যে যেখান থেকে পারে রাজার জন্যে কনে জোগাড় করে আনুক... সাত দিনের মধ্যে...তা না পারলে এ রাজ্যে কারোর ঘাড়েই আর মাথা থাকবে না...

—যাই হুজুর। হুকুমটা শুনেই সেনাপতি দৌড়লেন কোটালের বাড়ি। কোটাল অমনি ছুটে গেলেন ঢুলির বাড়ি। হুকুম পেয়েই ঢুলি ঢ্যাড়া পিটিয়ে দিল রাজ্যের সর্বত্র।

আর তাই শুনেই রাজ্যে যত মেয়ের বাপ ছিল তারা গিয়ে লাইন লাগাল রাজবাড়ির সামনে। সবাই ভাবল, দেখি না চেষ্টা করে। যদি লাগিয়ে দিতে পারি...মেয়ের সঙ্গে রাজার বিয়েটা। আসলে ঢ্যাড়া পেটাতে গিয়ে ঢুলি তো বলেনি...রাজার কেমন কনে চাই, কী তার পছন্দ।

—মন্ত্রী...মন্ত্রী, রাজা তো পরের দিন মেয়ের বাপেদের লাইন দেখেই ক্ষেপে উঠলেন। কী, এদের এক সাহস...এইসব প্রজারা এসেছে আমায় জামাই পেতে! দাও এদের সবকটাকে দূর করে এ দেশ থেকে। রাজা চেঁচিয়ে উঠলেন। আর মন্ত্রীও দিলেন তাদের সবাইকে দেশ থেকে তাড়িয়ে।

—আমি চাই খাঁটি রাজকন্যা...বুঝলে...রাজা আবার হাঁক ছাড়লেন মন্ত্রীর কানের গোড়ায়।

—জী হুজুর। মন্ত্রী এবার দৌড়লেন রাজশিল্পীর বাড়ি। তিনি তো হুকুম শুনেই বসে গেলেন চিঠি লিখতে আশপাশের যত রাজাদের, সোনার কাগজে মুক্ত সাজিয়ে।

—সেনাপতি...সেনাপতি... মন্ত্রী সেই ফাঁকে দৌড়ে গেলেন সেনাপতির বাড়ি...

—আজ্ঞে। মন্ত্রীর ডাক শুনেই তিনি দৌড়ে এসে দাঁড়ালেন।

—বলি, মাথাটা কি তোমার গোবর বোঝাই?

—কেন হুজুর।—বললাম ঢ্যাঁড়া পেটাতে...তা রাজাদের বাড়ি না পিটিয়ে তুমি তা পিটিয়ে দিলে প্রজাদের বাড়ি?

—ছ্যা....কোটালটা দেখছি আচ্ছা গবেট! সেনাপতি দৌড়লেন কোটালের বাড়ি....। কোটাল দৌড়লেন ঢুলির বাড়ি। আর ঢুলি তার ভুলটা বুঝতে পেরেই এক হাত জিভ বার করে বসে পড়ল মাটিতে।

এদিকে রাজার চিঠি পড়েই তো শুরু হয়ে গেল হাসির হুল্লোড়, রাজ্যে রাজ্যে। 'হুকোমুখোর শখ হয়েছে বিয়ে করার!' কে করবে শুনি, ওই ট্যারা টেকোকে বিয়ে? রাজকন্যারাও সব গা ঠেলাঠেলি করতে লাগল।

—আমার রাণী কই? সাত দিন পার হতেই রাজা ফের হাঁক পাড়লেন। আর তাই শুনেই মন্ত্রী কাঁপতে শুরু করলেন।

—ঠিক আছে। এবার আমি সময় দিলাম এক মাস। এই একমাসে রানী আমার চাই-ই চাই। তা না হলে আমি আর কাউকেই তোমাদের আস্ত রাখব না। যাও, আজ থেকে তোমাদের সবার ছুটি। এখন শুধু তোমাদের একটাই কাজ। আমার জন্যে কনে খুঁজে আনা।

—কিন্তু কোথায় রানী! দেখতে-দেখতে ফের আটাশটা দিন গেল পার হয়ে। উনত্রিশ দিনের রাতে মন্ত্রী ভাবল—পালাতে হবে। ছদ্মবেশে। মাঝে আর একটাই দিন। সেটা কাটলেই রাজা সংবাদ নেবেন।

যা ভাবা তাই কাজ। মন্ত্রী অমনি বেরিয়ে পড়লেন পথে। খালি গা, খালি পা, ময়লা ধুতি, মাথায় পাগড়ি।....ছুটতে...ছুটতে...ছুটতে মন্ত্রী সোজা হাজির হলেন বনের ধারে। ওই বনটা পেরুলেই মন্ত্রী পৌঁছে যাবেন—ভিন রাজ্যে। কিন্তু বনের পথে দৌড়ান!... সে কী সহজ কথা! পায়ে-পায়ে ইট, কাঠ, পাথর। ইস হঠাৎ পায়ে কাঁটা ফুটতেই মন্ত্রী বসে পড়লেন...

একি! একটু পরেই মন্ত্রী দেখেন তার দিকে হেঁটে আসছে নাপিতভায়া।

—আপনি? মন্ত্রীমশাই? নাপিতমশাই তো মন্ত্রীকে দেখেই চিনতে পারলে। ওর যা বুদ্ধি!

—বোসো, তোমায় লুকবো না। মন্ত্রী নাপিতভায়াকে ডাকলেন ওঁর পাশে।

—আমি পালাচ্ছি। দারুণ বিপদ!

—বিপদ? নাপিতভায়া তো কথাটা শুনেই হাঁ।

—হ্যাঁগো।

আরে একি! হঠাৎ পায়ের শব্দ পেতে নাপিতভায়া তাকিয়ে দেখে দৌড়ে আসছেন সেনাপতি আর কোটাল।

—আপনি?

তারা তো সামনে মন্ত্রীকে দেখে অবাক। শুনলাম আপনি নাকি পালিয়েছেন...?

—ঠিকই শুনেছ। পথে হঠাৎ নাপিতভায়াকে দেখে একটু বসেছি।

—কিন্তু নাপিতভায়া কেন এই বনের মাঝে? ও কেন পালাচ্ছে...!

—রামচন্দ্র! আমি কেন পালাব? আমি মন্ত্রী না সেনাপতি...আমি গেছিলুম বাঘবনে। বাঘের আজ বিয়ে তো। তাই গেছিলুম, গোঁফ ছাঁটতে...।

—বাঘের.... গোঁফ...তুমি! কথাটা শুনেই মন্ত্রী, সেনাপতি আর কোটাল লাফিয়ে উঠলেন।

—আমি ছাড়া আর কে ছাঁটবে বলুন? বাঘেদের তো নাপিত নেই।..

—সত্যি!

—হ্যাঁ মন্ত্রীমশাই। বাঘরা তো আর মানুষ না যে ওদের মধ্যে ভেদাভেদ থাকবে। নাপিত, ধোবা, কামার...কিছুই পাবেন না ওদের ভেতর। ওদের সবাই রাজা। তাই গোঁফ-দাঁড়ি ছাঁটার প্রয়োজন হতে আমাকেই ওরা ডেকে পাঠাল।

—তোমার সাহস তো খুব...সেনাপতি বললেন।

—তা কেন হবে না হুজুর! আমি তো প্রজা। আপনাদের মত মন্ত্রীও নই, সেনাপতিও নই। প্রজাদের প্রাণের তো কোন দামই নেই। তাই মৃত্যুভয়ও নেই।

—তা তুমি আমাদের কিছু সাহস দাও না ভাই। কোটাল এবার নাপিতভায়ার হাতদুটো চেপে ধরলেন।

—নিশ্চয় দেব। এ ছাড়া প্রজাদের আর কী-ই বা দেবার আছে হুজুর। কিন্তু আপনাদের বিপদটা কি...তাই তো শোনা হল না।

—আমরা চাই বাঁচতে। আর একটা রাত কাটলেই রাজা আমাদের গর্দান নেবেন।

—কেন? কেন?

—রাজা ক্ষেপেছেন বিয়ের জন্যে। কিন্তু কিছুতেই যে আমরা জোটাতে পারলুম না একটা কনে। ওঁর জন্যে।

—ছ্যা, এই সামান্য কারণে কেউ পালায় নাকি, নাপিতভায়া হেসে উঠল।

—কারণটা সামান্য হল?

—হবেই তো। রাজার কনে দরকার। তা আমায় এতদিন বলেননি কেন? এক্ষুণি আমি দিতে পারি কনে খুঁজে।

—সেকি! কোথায় পাবে তুমি, অমন কুচ্ছিত লোকটার কনে?

—সে হল গিরিরাজের মেয়ে। থাকে ওই দূরের পাহাড়ে।

—কিন্তু তিনি কি দেবেন এমন কুৎসিত লোকের সাথে তাঁর মেয়ের বিয়ে?

—নিশ্চয় দেবেন। কোন রাজাই যে যেতে রাজি হচ্ছে না ওই পাহাড়-চূড়ায়। তাই তিনিও তো বসে আছেন সেই কবে থেকে, মেয়ে নিয়ে। অথচ ওঁরও এই একটাই পণ, খাঁটি রাজা না পেলে তিনি কিছুতেই দেবেন না ওঁর মেয়ের বিয়ে।

নাপিতের কথা শুনেই মন্ত্রীরা সব দৌড়লেন ফের রাজপ্রাসাদে। হুঁকোমুখো পাহাড়ে কেন...বিয়ে করতে সমুদ্রেও ডুবতে পারেন। কনে মিলেছে, বিয়ে হবে শুনেই রাজ্যে তো সাজসাজ রব পড়ে গেল। কিন্তু গোল বাধলে রাজার সাজতে বসে। 'বলি আয়না কোথায়?'

কোথাও আয়না খুঁজে না পেয়ে রাজা হাঁক ছাড়লেন। আয়নায় নিজের মুখ দেখ পাছে রাজা ক্ষেপে ওঠেন, তাই রাজপ্রাসাদ থেকে বহুকাল আগেই মন্ত্রী সব আয়না সরিয়ে ফেলেছিলেন।

কিন্তু একি! ভয়ে-ভয়ে মন্ত্রী একটা আয়না দিতেই রাজা অমনি সেটাকে ফেলে দিলেন ছুঁড়ে। এটা একটা আয়না হল? এতে তো আমার নাক খ্যাঁদা, চোখ ট্যারা দেখাচ্ছে...মাথাটা মনে হচ্ছে টেকো...। ভাল আয়না কই?...

মন্ত্রী যে আয়না দেন রাজা সেটাই ছুঁড়ে ফেলেন।

—এখন উপায়! সেনাপতি ফিসফিস করে বললেন—চলুন, নাপিতভায়ার কাছে যাই। সেই যদি পারে আমাদের এই বিপদ থেকে বাঁচাতে।

—ঠিক-ঠিক। মন্ত্রী আর সেনাপতি ছুটলেন নাপিতের বাড়ি।

—এই নিন। সমস্যাটা শুনেই নাপিত এগিয়ে দিল একটা আয়না।

—আরে! এ তো দেখছি আরো খারাপ। এতে আমাদের সুন্দর মুখগুলোই তো বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। আয়নাটায় উঁকি মেরেই মন্ত্রী ভয় পেলেন।

—হ্যাঁ, এর নাম খ্যাপা আয়না। নাপিতভায়া হেসে বলল, এতে সোজাকে দেখায় ব্যাঁকা, আর ব্যাঁকাকে দেখায় সোজা।

—তার মানে।

—রাজার ব্যাঁকা নাক, ট্যারা চোখ, কালো রঙ, টেকো মাথা, এতে সব দেখাবে ঠিকঠাক। রাজা দেখবেন, তিনি ফর্সা, মাথা ভর্তি চুল, চোখদুটো পটলচেরা, নাকটা সোজা।

—বলো কি ভাই! মন্ত্রী দৌড়লেন খ্যাপা আয়না বগলে নিয়ে।

রাজাও সেই খ্যাপা আয়নায় মুখ দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন।

আর তাই দেখেই ফের শুরু হয়ে গেল রাজ্যের হৈ-হুল্লোড়। রাজার এবার বিয়ে হবে।

বিয়ে করে, বউ নিয়ে বাড়ি পৌঁছেই রাজা দৌড়লেন খ্যাপা আয়নায় মুখ দেখতে। একি! আমার রানী এমন কুৎসিত কেন? রাজা তো আয়নার ভেতর দিয়ে রানীর মুখ দেখেই ক্ষেপে উঠলেন। অথচ সোজাসুজি রানীর মুখ দেখতেও রাজা সাহস পেলেন না। কালরাত্তির না কাটলে...পারোহিত মানা করেছেন রাজাকে নিজের চোখে বৌয়ের মুখ দেখতে...তাই রানী কেমন তা উনি দেখছিলেন আয়নার ভেতর দিয়ে।

—মন্ত্রী! মন্ত্রী! রাজা হাঁক ছাড়লেন...

—হুজুর!

—আরে এ কি রানী জোটালে তুমি, এ্যাঁ? রাজা তো তেতে আগুন।

—মাথায় টাক, ট্যারা, কালো, বিচ্ছিরি...

মন্ত্রী বুঝলেন...রানীর মুখ দেখেছেন রাজা খ্যাপা আয়নার কিন্তু তা এখন কি বলা যায়!

—যাও! রাজা রাগে ফেটে পড়লেন। এক্ষুণি এই রানীকে বনে পাঠাও।

আর যেখান থেকে পার নিয়ে এসো আমার রানী...পরমাসুন্দরী।

রাজা হুকুম করতেই সেনাপতি ছুটলেন বৌ নিয়ে বনে।

এখন উপায়। মন্ত্রী ফের ছুটলেন নাপিতভায়ার বাড়ি।

—কী হল। মন্ত্রীকে অমন দৌড়ে আসতে দেখে নাপিত তো অবাক। তারপর সব শুনে...নাপিতভায়া চট করে বেনারসীটা পরিয়ে টেনে আনল ওর কালো ট্যারা টেকো মেয়েটাকে।

—কিন্তু! মন্ত্রী ভয়ে কাঁপতে লাগলেন।

—কোন ভয় নেই মন্ত্রীমশাই। আপনি শুধু আমার এই কুচ্ছিত মেয়েটাকে দাঁড় করিয়ে দিন গিয়ে রাজার পাশে...

—সেকি! এই মেয়ে হবে...রাজরানী!

—বটেই তো। নাপিতভায়া মিটমিট করে হাসল...। একে রাজামশাই যখন দেখবেন আমার খ্যাপা আয়নার ভেতর দিয়ে ব্যাস : দেখবেন, উল্লাসে তিনি নাচতে শুরু করেছেন।

—কিন্তু রাজা যদি চান অন্য আয়নায় মুখ দেখতে?

—রামচন্দ্র! তা কখন কেউ চায়? যে আয়নায় যাকে ভাল দেখায়, তা ছেড়ে কেউ কখন নড়ে? ...দেখবেন, ওই খ্যাপা ছাড়া অন্য কোন আয়নাতে রাজা চাইবেন না ওর মুখ দেখতে...।

—বাঃ বাঃ। কি বুদ্ধি তোমার! নাপিতকে তারিফ করে মন্ত্রীমশাই চললেন ওর মেয়েকে নিয়ে রাজবাড়ি। সেই থেকেই রাজামশাই সুখে ঘর করছেন। কোনদিনই উনি নিজের মুখটা দেখেননি আর অন্য কোন আয়নায়। তাই জানতেও পারেননি ওঁকে দেখতে কেমন। সবাই রাজাকে বড় ভয় পায়। প্রজারাও তাই কেউই রাজাকে বলতে পারেনি তাদের রাজা কতটা কুচ্ছিত! নাপিতের বুদ্ধিতে মন্ত্রীর প্রাণটাও গেল বেঁচে। মন্ত্রীর চেয়ে ওর বুদ্ধি অনেক বেশি কিনা। তবু মন্ত্রীই রয়ে গেলেন নাপিত রয়ে গেল নাপিতই আজ অবধি।

তাই নাপিতের ভারি দুঃখ। আরো দুঃখ, ও রাজা, রানী, মন্ত্রী কারোর সঙ্গেই আর দেখা করতে পারে না বলে। মেয়ে রানী হয়ে একদম ভুলে গেছে ওর গরিব বাবাকে। মন্ত্রীও আর ঘেঁষে না নাপিতের দিকে। এক-এক দিন ওর খুব ইচ্ছে হয়, মন্ত্রীর পাশে গিয়ে বসে, গল্প করে। কিন্তু সে পথও রাজা বন্ধ করে দিয়েছেন। নাপিতভায়া রাজবাড়ির দিকে এলেই দ্বাররক্ষীরা ওকে তরোয়াল দেখায়।

রাজপুত্তুর

বলরাম বসাক

'এক যে—। উ-রে বাবা-রে।'

'এক যে ছিল—। ও-রে বাবা-রে এ-এ-এ...।'

'এক যে ছিল রাক্—। উ-রে বাবা-রে, পালা-পালা-পালা...।'

'পালাবি, কোঁতায়। হাঁউ-মাঁউ-কাঁউ। মান্‌ষের গেন্ধো পাঁউ। ধরি ধরি খাঁউ আঁউ। ইদিকে আঁউ—। কোঁতায় যাঁউ...। হাঁউ-মাঁউ...।'

এততো বড় বড় চোখ, উ-রে বাবা—

লাল কেন বাপু চোখ ঘষে?

বার হাত হাতে তের হাত পায়ে

ওরে ধরল-ধরল রাক্‌খোসে।

পালা পালা পালা...।

সব্বাই পালিয়ে গেল। লাল রাস্তা ফাঁকা। সবুজ মাঠ খালি। নীল পাহাড় শূন্য। শুধু রাক্‌খোসটা বেরিয়েছে ধুপুস-ধাপুস-ধুড়ুম-ধড়াম। আর বলছেঃ

'হিলি-মিলি-কিলি-কিলি-কিলি...

কোঁতায় পালালি সবে মিলি...

পেট পুরে খাব গিলি গিলি...
হিলি-মিলি-কিলি-কিলি-কিলি...

রাক্‌খোসটা হাঁটছে। তেত্রিশ হাত লম্বা। বত্রিশ হাত চওড়া। তার কান যেন কুলো। দাঁত যেন হিংলি মুলো। আর পেটখানা এত্‌তোখানি ফুলো। বাপ্‌রে। দুই হাতের পাঁচ আঙুলে পাঁচ হাত লম্বা নখ। করে উঠছে ঝকমক। জিব করছে লকলক। তা থেকে কী ঝরছে চকচকে? আগুন। আর চোখ থেকে কী ঝরছে? আগুন আর নাক থেকে? কান থেকে? আগুন। মুখ থেকে? ওই আগুন।

হ্যাঁ আগুনের জন্যেই তো রাক্‌খোসটার সাথে কেউ পেরে উঠছে না। দিনেরবেলা হলদে নদীর ওপারে, নীল পাহাড়ের ওধারে, সাদা ঝরনার কিনারে, কালো গুহায় ভেতরে, পড়ে-পড়ে ঘুমোয় নাক ডাকিয়ে—ঘঘ্‌ঘোর্‌ ফুরুর ফুক্‌ ঘঘ্‌ঘোর ফুরুরফুক্‌...।

রাত্‌তির হলেই জেগে ওঠে। জেগে উঠেই রেগে ওঠে—ইয়া মিয়াঁ কিঁয়া। রেগে-মেগে এক লাফে উঠে দাঁড়ায়। গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দুইহাতে ঘুসি পাকিয়ে আকাশের দিকে ছুঁড়ে বলে ওঠে, 'হিলি-মিলি-কিলি-কিলি—। তরতাজা খাবু গিলি গিলি।

খাবু তাজা রাজা-ভাজা
খাবু তাজা রানী ভাজা
খাবু তাজা প্রজা-ভাজা
মরা নয় তর তাজা
মরা মুঁই ছুঁই না, ছুঁই না, ছুঁই না।'

রাজপুরীতে রাজার চোখে ঘুম নেই। মন্ত্রীর চোখে ঘুম নেই। কেউ পারছে না রাক্‌খোসটার সঙ্গে। যে-ই ওর কাছে গেছে, তার গায়েই রাক্‌খোসটা ফুঁ দিয়ে আগুন ছুঁড়ে দিয়েছে। আগুনে আধপোড়া মতন হলে কাঁটা-চামচের মত আঙুলের নখ বিঁধিয়ে তাকে মুখে পুরেছে। কচমচ করে চিবিয়ে কৎ-কৎ গিলে খেয়েছে এমনি করে কত গরু-মোষ মানুষ। এমন কী, রাজার হাজার-হাজার সৈন্যও প্রায় শেষ করে এনেছে। রাজা আর কী করে। সারা রাজ্যে ট্যাঁড়া পিটিয়ে দিয়েছে ঃ 'সোন্‌ধে হলেই সবাই ঘুমোবে, না হলে রাক্‌খোসে ধরবে।' আসলে রাক্‌খোসটা বুঝতে পারে না কোনটা

ঘুমন্ত আর কোনটা মরা। তাই ও ঘুমন্ত মানুষকেও ছোঁয় না। ঘুমন্ত প্রাণীকেও ছোঁয় না। সেজন্যে সন্ধে হলেই, সব্বাই হাপুস-হুপুস করে তাড়াতাড়ি যা হয় কিছু খেয়ে-দেয়ে, ধাপুস-ধুপুস করে এলোমেলো বিছানাতেই চিৎপাত শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। রাজা ঘুমোয়। রানী ঘুমোয়। মন্ত্রী ঘুমোয়। সান্ত্রী ঘুমোয়। প্রজা ঘুমোয়। পশু ঘুমোয়। পাখি ঘুমোয়।

হয়তো কোনও একটামাত্র গাছে, শিমুল কিংবা বকুল গাছের কোনও একটামাত্র ডালে, কোনও একটা কাকের বাসায় আস্তে করে আওয়াজ হয়—'কা'। সঙ্গে-সঙ্গে কাক-মা কাক-ছানাকে চুমো খায়। আস্তে করে বলে, 'কো', মানে ঘুমো।'

হয়তো মাঝরাত্তিরে শেওড়াগাছের ভূতের বাচ্চা আচ্ছা করে ঠ্যাং নাচাতে চায়। সঙ্গে-সঙ্গে কানটি মুলে বাবা ভূত ধমকায় চাপা হেঁড়ে গলায়, 'নিঁদদা মগনোঁ ভঁবঁ।'

রাজবাড়ির নিশান ওড়ে না পতপত। ওরে বাবা, উড়লে যদি রাক্খোসটার চোখে পড়ে, অমনি ও ভাববে ওটা জ্যান্ত। তক্খুনি ছুটে আসবে রাজবাড়ির সামনে। দুই পা ফাঁক করে, মাথাটা নামিয়ে দেখবে রুপোর প্রাসাদ। সোনার গোম্বুজ। ভেতরে ঘুমায় হিরের পালঙ্কে—কে?

কে ঘুমোয়? ছোট্‌ট টুকটুকে রাজপুত্তুর। এইটুকুনি। ওতো এখনও বড় হয়নি। ওতো এখনও কোলে-কোলে—রাজার কোলে, কখনও রানীর কোলে, কখনও মাসির—আবার কখনও দাসীর কোলে। ও যখন বড় হবে। মস্তো বড় হবে, তখন শক্ত হাতে এ্যাততো বড় তরোয়াল ঘোরাবে বন-বন-বন। চকচকে তরোয়াল করে উঠবে চারদিকে ঝকমক ঝকমক—ঝিকমিক ঝিকমিক। ঐ রাক্খোসটা তখন ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচ-ঘ্যাচাং-ঘ্যাঁচ হয়ে যাবে—একেবারে কচুকাটা—দাঁড়াও না, সেদিন এল বলে। আগে থেকে ওকে চুপি-চুপি বড় হতে দাও...।

তাই সবাই এখন চুপ-চুপ। ওরে ব্যাঙ পুকুরপাড়ে। আর গ্যাঙর-গ্যাঙ করিসনে। ওরে পেঁচা —লক্ষ্মী প্যাঁচাটি আমার—আর ক্যাঁচর-ক্যাঁচর করে চেঁচাসনি। সোনা ঘুমোয়, ঘুমোয় সোনা। ঘুম ভাঙাতে কেউ এলো না।

'তাপ্‌পর। রাক্খোসটা কখোন মরবে?'

'মরবে, দাঁড়াও। রাজপুত্তুর একটু বড় হোক।'

'রাজপুত্তুর কখোন বড় হবে?'

'এই তো সবে এক পেরল। তারপর দুই। দুই-এর পর তিন। তারপর চার। পাঁচ আ-রে আ-রে। এরই মধ্যে ছোট্‌টো রাজপুত্‌তুর একটু বড় হয়ে গেছে। কী মিষ্টি-মিষ্টি মুখখানা—তুলতুলে মাখম-মাখম—ফরসা গাল লালুট-লালটু—কালো মিশমিশে চুল কালুট-কালটু, ঘনকাজলে নীল পুঁতি চোখ, লাল-টুকটুকে কচি-কচি ঠোঁট। একছুটে ছুট্‌টে রাজার কাছে এসে কী চাইল বলত?'

'তরোয়াল?'

'না।' রাজপুত্‌তুর বলল—'এখন নয়। আগে দাও দিকিনি কিছু বই, খাতা আর পেনসিল।'

তক্‌খুনি দেওয়া হল লাল-সবুজ ছবিওয়ালা ফুল পরীর মত বই, তার পাতায়-পাতায় চাঁদের জোছনা, তারার আলো, সূর্যিমামার কিরণে-কিরণে লেখা রয়েছে অ, আ, ই, ঈ, অজগর, আনারস, 'পাখি সব করে রব। রাতি পোহাইল।' আর দেওয়া হল সোনায়-রুপোয় বাঁধান একটা খাতা, তার প্রত্যেকটা পাতা, পাতা তো নয় যেন স্থির চৌকো দুধ সরোবর। আর দেওয়া হল একটা ময়ূরকণ্ঠী রঙের—বাপরে বাপ—এযে সাপ, মন্ত্রীপুত্র-সান্ত্রীপুত্ররা তো ভয়ে এদিক পালায়, সেদিক পালায়। সাপ নয় ওটা পেনসিল। ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে কখনও কাজল-নীল দাগ, কখনও ডালিম-লাল, যখন যেমন চাও।

বই খাতা আর পেনসিল নিয়ে ছোট্‌ট রাজপুত্‌তুর মাঝে-মধ্যে একটা লজেন্স, আধটা চকোলেট ঝপ করে গালে পুরে কত্‌তো যে পড়ল, লিখল, —এ্যাততো, এ্যাততো আঁক কষল। এমনি করে রোজ দিন শেষ হয়। পৃথিবীর আধ-পাক শেষ হয়। শুনশান রাত্‌তির শুরু হয়।

রাত্‌তির হলে ছুটে এসে দেখে রাক্‌খোসে।
রাজপুত্‌তুর মরে আছে সব আঁক কষে।।

তারপর?

'তারপর তো রাজপুত্‌তুর আরেকটু বড় হল। গায়ে কী জোর! একলাফে ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়ে-লাফিয়ে উঁচু পাঁচিল ডিঙোয়। ঝাঁপিয়ে দিঘির জলে সাঁতার কাটে অনেকদূর পর্যন্ত। সাদা পদ্ম পেড়ে এনে রাজাকে দেয়

দিয়ে কী চাইল বলতো?'

'তরোয়াল?'

'না। রাজপুত্তুর বলল, —এখন নয়। আগে দাও দিকিনি কিছু রঙ তুলি আর কাগজ।'

তক্‌খুনি চলে এলো নীল-আকাশ বাক্স। বাক্সটার ভেতর রামধনু রঙ। বাসন্তি হলদের পর খাঁটি হলদে তারপর জাফরানি। তারপর কমলা। অন্যদিক দিয়ে সবুজ, তারপর ঘাস-সবুজ, তারপর কলাপাত-সবুজ, খাঁটি সবুজ, নীলাভ সবুজ ফিরোজা...। আর এলো কতরকমের তুলি—সরু-মোটা, যেন কোনটা হরিণ চোখের কোণা, আবার কোনটা ছোট কোটালের গোঁফ। আর কাগজ? কে বলবে ওটা কাগজ, যেন নীলদিগন্ত ছুঁই-ছুঁই ছাই-ছাই-সবুজ-সবুজ দূরের বিশাল বেলাভূমি...।

রঙ-তুলি আর কাগজ নিয়ে রাজপুত্তুর ছবি আঁকল, ফুল, পাখি, মানুষ। এমনি করে তরমুজ দিন শেষ হয়। পৃথিবীর আধপাক শেষ হয়। রাত্তির হলে রাক—খোস এসে দেখে রাজপুত্তুর মরে আছে ছবি এঁকে। এবারে কিন্তু রাকখোসটা বেঁকে দাঁড়া—থমকে, চমকে। তাই•তো, রাজপুত্তুর তো মরে পড়ে আছে ঠিকই। কিন্তু কাগজে আঁক নেই কেন? তার বদলে কেন ফুল-পাখি—মানুষ?

রোজ রাত্তিরে ফুল পাখি আর মানুষ,
রাক্‌খোসটার হয়নি দিলখুশ।

'তাপ্‌পর?' রাজপুত্তুর এবারে আরো একটু বড় হল। কব্জিতে কী জোর হল, রাজপুত্তুরের সাথে পাঞ্জা লড়ে হেরে গেল মন্ত্রীপুত্র, সান্ত্রীপুত্র। তারপর হেরে গেল খোদ মন্ত্রী, সান্ত্রী, সেনাপতি। শুধু হেরেই গেল না, ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল, 'এঁ, এঁ, হাতে লেগেছে—।'

'রাজপুত্তুরের কব্জিতে তে জোর, তাহলে তো ও অনেক বড় হয়েছে। হ্যাঁ, অনেকটা বড় হয়েছে। এবারে রাজপুত্তুর, বলতো কী চাইল?'

'এবারে বুঝি তরোয়াল?'

'না, এখনও নয়। রাজপুত্তুর বলল। দাও তো দেখি এবারে কাচি-কাগজ-আঠা। এসে গেল কালো মেঘ চিরবিড় করা চোখ ধাঁধান বিদ্যুৎ কাঁচি। হাঙর-মুখ ইস্পাতের গায়ে আয়নার মত নিকেল, কিন্তু গোলাপি

রঙের ফুলেল দুটি হাতল। এসে গেল সবুজ-কালো, হলুদ, নীল, খয়েরি, লাল মারবেল কাগজ যেন প্রজাপতির পাখনাজোড়া বিশাল হয়ে উঠেছে। আর এসে গেল আঠা, গা ঘিন-ঘিন করা।

'রাজপুত্তুর কাঁচিতে কাগজ কেটে, আঠা দিয়ে জুড়ে কী শিখতে লাগল বলত? ক্রাফট।'

রাততির হলে, রাক্‌খোস এসে দেখল, —কী দেখল? দেখল রাজপুত্তুর যেমনটি মরে পড়েছিল, তেমনটিই আছে। কিন্তু তার পাশে আঁক নেই, এসব কী?

লাল নীল কাগজ যে ব্যাপারটা কি?
কেনই বা কাগজের ফুল পাতা পাখি?

ভুরু কুঁচকে রাক্‌খোস চলে গেল। দেখা যাক—

তারপর রাজপুত্তুর এবারে অনেক বড় হল। বেশ লম্বা। লম্বায় যেন শাল-ঝাউ। চওড়া বুক যেন ঘন সবুজ বন। মাথার মুকুট কাঞ্চনজঙ্ঘা। এ্যাততো বড়। এবারে নিশ্চয় তরোয়াল চাইল, তাই ভাবছো তো।

'না। এখনও নয়। রাজপুত্তুর বলল, দাও দিকি দড়ি, বাঁশ, দা আর মাটি। দাও দিকি কোদাল, কুড়ুল, ঝুড়ি আর বালতি। মডেলিং শিখব।

মডেলিং শিখতে-শিখতে রাজপুত্তুর বই-খাতা পেনসিল নিল সঙ্গে রঙ-তুলি-কাগজও নিল। কাঁচি-কাগজ-আঠাও নিল। চলে এল রাজ্যের বাইরে মাঠ পেরিয়ে, বন পেরিয়ে, মাঠ পেরিয়ে, আবার বন পেরিয়ে একেবারে হলদে নদীর ধারে। ওপারে নীল পাহাড়। কুয়াসা-ধূসর নীল। তুষার-সাদা চূড়া। ঐ নীল পাহাড়ে আছে সেই কালো গুহা। গুহার ভেতর রাখখোস। দিনে ঘুমোয়। রাতে জাগে।

হলদে নদীর ধার দিয়ে চলল রাজপুত্তুর। কাঁধে ঝুলছে বিশাল ঝুলি, তাতে কাগজ, রঙ, তুলি, বই, খাতা, পেনসিল, কাগজ লাল-নীল, আঠা, কাঁচি। আর আছে ঘোড়ার পিঠে দড়ি-কোদাল, কুড়ুল-টুড়ুল সব। খুঁজতে-খুঁজতে পাওয়া গেল—হ্যাঁ পাওয়া গেছে। বেশ মনের মত।

'কী পাওয়া গেল?'

'নদীর পাড়ে বটবৃক্ষ। মরা গাছ। তার তলায় বসে রাজপুত্তুর আঁক কষল। আঙুল গুনে হিসেব করল। হিসেব অনুযায়ী একটা করে বাঁশ বাঁধল

দড়ি দিয়ে মরা বটগাছটায়।'

'তিতির ময়না বুলবুল পাখিরা, লেজটি তুলে কাঠবিড়ালি, নলখাগড়ার ঘাস ফাঁক করে বাঘের ছানারা নদীর পাড়ের কাশ-ঝাড় মাথা তুলে, দেখল দেখল, শুধু দেখেই গেল। কী দেখল?'

'দেখল রাজপুত্তুর ঘামছে আর খাটছে। খাটছে আর ঘামছে। বাঁশ কাটছে, দড়ি কাটছে, বাঁধছে, জুড়ছে। ঘুরছে, হাঁটছে আর খাটছে। কুল-কুল করে ঘামছে তার দুধবরণ গা।'

'দেখল মরা বটগাছটার চারদিকে রাজ্যের বাঁশ বাঁধা হয়েছে। আস্ত গাছটা যেন বিশাল এক বাঁশের খাঁচায় ঢুকে গেছে। তারপর তার মধ্যে তালতাল কাদামাটি ঠেসে দিল রাজপুত্তুর। আরও কাদামাটি তুলে আনল হলদে নদীর পাড় কেটে। তাল-তাল কাদামাটি ঢাই ঢাই করে ফেলতে-ফেলতে ফেলতে-ফেলতে—হ্যাঁ, একসময় আস্ত মরা বটগাছটা সম্পূর্ণ ঢেকে গেল। আরও মাটি ফেলতে-ফেলতে শেষে বাঁশের খাঁচাটাও পুরো ঢেকে গেল। হয়ে গেল একটা উঁচু মাটির ঢিবি। নদীর জল ঢেলে-ঢেলে কাদামাটির এই ঢিবিটাকে নরম করে রাখতে হল সবসময়।'

'তারপর কাগজ কেটে রাজপুত্তুর একটা মুণ্ডু বানাল। তাতে তুলি দিয়ে আঁকল চোখ-মুখ-কান। মুণ্ডুর মাথায় কাগজের টোপর। মুণ্ডুটাকে মাটির ঢিবির ওপর বসিয়ে দিল। লম্বা বাঁশ দিয়ে দুটো হাত দুটো পা বানিয়ে মাটির ঢিবিটার গায়ে লাগিয়ে দিল। তার ডান হাতে জুড়ে দিল একটা বাঁশের কঞ্চিতে বানানো তরোয়াল। লাল-নীল মারবেল কাগজের জামা-প্যান্ট-জুতো বানিয়ে, তাতে তুলি দিয়ে ফুল-পাখির নকশা এঁকে দিল সবুজ-কমলা-লাল-নীল।'

'ঠিক দেখতে হল যেন রঙচঙা জামা-প্যান্ট পরা একটা ইয়াবড়া মানুষ। তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক রাক্খোস্টার মতই ইয়া লম্বা চওড়া।'

'তারপর?'

'তারপর রাজপুত্তুর একটা কাগজে বড়-বড় হরফে তুলি দিয়ে কালো, লাল, সবুজ আর নীল রঙে লিখল ঃ

'দাঁড়াও, খবরদার—
এক পা কাছে আসিস যদি আর—

এই চেয়ে দ্যাখ আমার তলোয়ার।'

'তারপর লেখাটা ঐ মূর্তিটার বুকে ঝুলিয়ে দিল। ব্যাস। কাজ শেষ। না, না বাপু। কাজ এখনও শেষ হয়নি। ওদিকে যে সূয্যিমামা—'খ্যামা দ্যাও গো এবারে চলি-চলি' করছে। একটু পরেই টুপ করে ডুব দেবে নীল দিগন্তে। সাঁঝের তারা ফুটি-ফুটি করছে। রাজপুত্তুর কিন্তু থামছে না। বাঁলতি বালতি জল আনছে খালি আর ঢালছে মূর্তি হয়ে ওঠার ঢিবির গায়ে। ঢিবির কাদামাটিটাকে ভিজিয়ে নরম করে রাখছে।'

'এই করতে-করতে যেই না হল রাত্তির, অমনি ধুড়ুম, ধড়াস, ধাপুস-ধুপুস। হিলি মিলি কিলি কিলি কিলি। ব্যস তক্ষুনি রাজপুত্তুর ঘোড়া ছুটিয়ে বন-টন মাঠ-ঘাট পেরিয়ে রাজ্যে ফিরে এল।

রাক্‌খোসটাতো নদী পেরিয়ে এপারে এল। মূর্তিটার সামনে দাঁড়াল। মূর্তির বুকে লেখাটা তো পড়ল। আর খুব রেগে গেল—। বলল—ইয়াঁও, মুঁইকে বলিস খবরদার, মুঁইকে দেখাস তলোয়ার।

'এদিকে তখন বাতাস দিচ্ছিল। বাতাসে কাগজের মাথাটা নড়ে-নড়ে উঠল। এমন করে নড়ে উঠল যেন মাথা নেড়ে বলল—'হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ।' তাইতো রাকখোসটাতো আরও চটে উঠল...

'ইঁ-ইঁ-ইঁ-য়া-য়াও তুই দেখছি তাজা,
ও-রে তুই কোঁতাকার খাজা,
খাবু তুকে বেশ ভাজা ভাজা।'

'বলেই না দুই হাতে পাঁচ পাঁচ দশটা পাঁচ হাত লম্বা নখ ঢুকিয়ে দিল মূর্তিটার পেটে। কাদা-কাদা মাটি তো—বেশ ভেজা ছিল তাই প্যাট-প্যাট করে ঢুকে গেল। রাক্‌খোসটার চোখ-কান-নাক থেকে আগুন বেরুতে লাগল। হাঁ করল। তখন মুখ দিয়েও আগুন বেরুল। বত্রিশটা হিংলি মুলো-মার্কা দাঁত বসিয়ে দিল মূর্তিটার কাঁধে। কাঁধটা কাদামাটির তো। তাই দাঁতগুলো সবটাই মাটির ভেতর ঢুকে গেল। এদিকে চোখ-কান-নাক-মুখ থেকে যা আগুন ঝরল—গ্যাস-ওভেনের নীঁল শিখার মত সেই জ্বলন্ত আগুন ঝরতে লাগল মূর্তিটার ওপর। মূর্তির কাদামাটি পুড়ে শক্ত ইটের মত হয়ে যেতে লাগল। আর তো নখ খোলে না, পোড়া ইটের মত শক্ত পেটে আটকে গেল হাতদুটো। আর তো দাঁত খোলে না। পোড়া ইঁটের

মত শক্ত কাঁধে আটকে গেল রাক্খোসটার মুণ্ডু। রেগে-মেগে কাঁই রাক্খোসটা পা ছুঁড়ল মূর্তিটার গায়ে। মূর্তির নিচটা তখনও নরম ছিল। পা ঢুকে গেল কাদামাটির মধ্যে। আর মাটিটাও শক্ত হয়ে যেতে লাগল রাক্খোসটার নিজেরই আগুনে। তাই তার পাদুটিও শক্ত মাটির ভেতরে আটকে গেল।

এইভাবে রাক্খোসটার হাত-পা-মুণ্ডু আটকে থাকল মূর্তির গায়ে আর ওটা সারারাত চেঁচাল আঁ আঁ আঁ আঁ আঁ...'। যেই না হল ভোর রইল না আর রা—।

'এইবারে তরোয়ালটা দাও।' বলল রাজপুত্তুর আর দাও একটা খুব উঁচু মই লাগানো গাড়ি। ইলেকট্রিকের তার মেরামত করার মইগাড়ি এল একটা। তাতে চড়ে রাজপুত্তুর মূর্তিতে আটক রাক্খোসটার কাছাকাছি এল। তারপর তরোয়াল হাতে মই-এ চড়ে অনেক উঁচুতে উঠল।

'ততক্ষণে গাড়িটা যেই না রাক্খোসটার গায়ে-গায়ে ঠেকল, অমনি রাজপুত্তুর তরোয়াল ঘুরিয়ে ওর ঘাড়ে বসিয়ে দিল এক কোপ। ব্যাস। এক কোপেই রাক্খোসটার মুণ্ডু আর ধড়-এর মাঝখানে ফাঁক হয় গেল। সঙ্গে-সঙ্গে সবাই আকাশে হাত ছুড়ে দিয়ে হেঁকে উঠল 'জয় রাজপুত্তুরের জয়।'

তারার আলো

সরল দে

ছোট্ট মুঠোয় মস্ত এক হেঁয়ালী পাকিয়ে টিংকুড়ি এলো আমাকে বোকা বানাতে।

'টক্‌কা না ফক্‌কা?'

টিংকুড়ির মুঠো আমার নাকের ডগায়। ফস করে আমি 'ফক্‌কা' বলতেই, ব্যস, মুঠো খুলে ধেই ধেই করে নেচে উঠলো পাজিটা, 'টক্‌কা'। অমনি আশ্চর্য, তার হাতের তালুতে ওটা কি? পুরনো একটা তামার পয়সা। তার একপিঠে কিনা সাহেব রাজার কাটামুন্ডুর ছাপ! সেই কবেকার।

পয়সাটা একবার ছুঁতেই ম্যাজিক। আমার মধ্যে তখন আর এই আমি নেই, ছটফটিয়ে উঠলো ছোট্টবেলার সেই আমি।

'কি হ'ল দাদাই, কথা ব'লছো না যে? তুমি জেগে জেগে ঘুমোও? হি হি...।' হাসতে, হাসতে আমারই গায়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে টিংকুড়ি।

'জানিস দিদু ভাই, যখন আমি তোর মতই ছোট্ট, এরকম একটা পয়সা পেলেই বড়োলোক। সেটা ভাঙালেই দুটো আধলা। একটা দিয়ে এই এ্যাততো ঘুগনি, আর-একটা দিয়ে দুখানা ইস্কুল বিস্কুট। না,আর বলছি না। তুই হিংসে করবি।'

'ধ্যাৎ' বলে টিংকুড়ি একপা দুপা ছুটেই আবার ঘুরে দাঁড়ালো। তার হাতের পয়সা টুপ করে পড়ল আমার কোলের ওপর।

'নাও, এটা দিয়ে বিস্কুট কিনে খে-ও। কিন্তু খবদ্দার, ঘুগনি খাবে না। দিদু বকবে।' বলে আমাকে সেই ছেলেবেলার জানলাটার কাছে ঠেলে দিয়ে ছুট্টে পালালো দুষ্টুটা।

আমি তখন ছোট্ট খোকাটি। আর বাড়িটাও পুরনো। জানলাও সেই সেকেলে। লোহার শিক বসানো।

গরাদের ফাঁকে পা গলিয়ে দিব্যি আমি বসে পড়েছি চোখ বড়ো বড়ো করে। নিঃঝুম দুপুর। মেঝের মাদুর পেতে মা তো ঘুমিয়ে কাদা। দিদা বারান্দায়। কাঁথা সেলাই করছে। আর দাদু ও ঘরে গল্পের বই মুখে করে এই হাসছে তো এই কেঁদে ফুঁপিয়ে উঠছে। আর এ ঘরে আমি রাস্তামুখো জানলায় বসে ছবি দেখছি।

ছবি নড়ছে। ছবি চলছে। ছবি ছুটছে। রাস্তার ওপারে গাছের ডালে ছবি ল্যাজ নাড়াচ্ছে। ওদিকে পাঁচিলের ওপর একটা দুটো ছবি আবার টুকটুক করে লাফাচ্ছে।

অবাক হয়ে আমি দেখছি আর দেখছি। কিন্তু আমাকে কেউ দেখছে কি? না।

টুক করে আমি তখন জানলা থেকে নেমে দেয়াল আলমারির সামনে। নিচের তাকটাই আমার নাগালে। সেটাতে কাপ ডিস। সব কাঁচের। একটা করে টেনে নামাই আর জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলি রাস্তায়। শব্দ হয় ঠুং ঠাং ঝন্ ঝনাৎ। সে এক মজা।

তা, মজা সেদিন টের পেয়েছিলাম বটে। এই যে দেখছ আমার ঠোঁটের কোনে আধইঞ্চি কাটাদাগ-এতবচ্ছরের এত বৃষ্টিজলেও সে দাগ ধুয়ে মুছে গেল না। যাবে কী করে, এ যে আমার মায়ের রাগ থেকে দাগ!

কিন্তু আমারও রাগ কম নাকি? জানলা থেকে আর নামছিই না। চোখের জল কখন শুকিয়ে গেল, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হ'ল, বিকেল ফুরিয়ে সন্ধে যখন হবো হবো সেই গ্যাসবাতি জ্বালানো লোকটাকে চোখে পড়ল। তার ঘাড়ে মই। একটার পর একটা থামে মই লাগিয়ে উঠছে আর আলো জ্বেলে দিচ্ছে।

লোকটা একসময় আমাদের বাড়ির সামনে। জানলার মুখোমুখি। আমার দিকে তাকিয়ে সে হাসল। অমনি আমার সব জ্বালা সব দুঃখ সব রাগ জুড়িয়ে জল।

'আমাকে চিনতে পারলে না? আমি তোমার নেই মামা' বলে লোকটা আরও কাছে এগিয়ে এলো।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'নেই যদি তো মামা হলে কী করে?'

'আছে ভাবলে আছে, নেই ভাবলে নেই....।' এই একটাই কথা বলতে বলতে লোকটা তখন আরও একটা আলো জ্বালাতে গেল।

আর ঠিক সেই সময় হঠাৎ ঘন্টার আওয়াজ কানে এলো।

ঠং ঠং ঢং ঢং...।

আরতি হচ্ছে রামসীতামন্দিরে। আমাদের বাড়ির সামনের ট্রামলাইন কিছুটা গিয়ে যেখানে বাঁয়ে ঘুরেছে, সেখানেই মন্দির। এখন মনে হয়, এই তো পা বাড়ালেই। কিন্তু তখন মনে হ'ত অনেক অ-নে-ক দূর।

দাদুর হাত ধরে কতবার গেছি। আরতির পর বাতাসা বিলি হয় মন্দিরে। এক একটা এই এ্যাততো বড়ো। সে কথা মনে হতেই কি যে ইচ্ছে হ'ল! ভাবলাম, যাই না একবারটি। যাই? ছুটে যাবো আর আসবো।

মা তখন তুলসি তলায় পিদিম জ্বেলে শাঁখে তিনবার ফুঁ দিয়ে পেন্নাম করছে। দিদা ঠাকুরঘরে। আর দাদু বেরিয়ে পড়েছে লাঠি ঠুক ঠুক করে চেলোপটির ঘাটে হাওয়া খেতে। একাই। আজ যে আমি সঙ্গে যাই নি। এই সুযোগ।

পা টিপে টিপে দরজা ঠেলে অমনি আমি রাস্তায় তারপর ছুট ছুট। আমিও হাত বাড়িয়েছি। তারপর আধখানা বাতাসায় কামড় দিয়ে বাকি আধখানা হাতে নিয়েই ফের ছুট। কিন্তু যত ছুটি বাড়িটা যেন ততই পিছিয়ে যায়। বাড়ি আর খুঁজে পাই না।

সন্ধে রাত। কিন্তু আমার মনে হ'ল অ-নে-ক রাত। ভয়ে বুক টিপ টিপ। কান্না পেলো। বাবা এতক্ষণে আপিস থেকে ফিরেছে নিশ্চয়। মা কাঁদছে। দিদা ঠাকুরকে ডাকছে। দাদু লাঠি ঠুকে ঠুকে হয়তো আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। জলভরা চোখে আমি যেন স্পষ্ট এসব দেখতে পাচ্ছি।

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আমি ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠতেই কে যেন মিষ্টি

করে বলল, 'ছি, কাঁদতে নেই। কাঁদলে যে রাস্তা আরও ঝাপসা হয়ে যাবে, বাড়ি আর খুঁজেই পাবে না।'

কে? ওমা, এ তো সেই আলো জ্বালানো নেই মামা!

'আমি বাড়ি যাবো' বলে কেঁদে ফেলতেই নেই মামা আমার হাত ধরে বলল, 'চলো আমি তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবো।'

আর ঠিক তখনই ভোঁ-ও-ও করে যেন জাহাজের বাঁশি বেজে উঠল। ওমনি ব্যস, কোথায় বাড়ি কোথায় কী! সব ভুলে আমি তখন নেই মামার হাতে টান দিয়ে বায়না জুড়ে দিলাম, 'আমি জাহাজ দেখবো। নেই মামা বললো, 'বেশ তো, দেখবে চলো। ওই ছোট গলিটা পেরোলেই তো ছাতুবাবুর ঘাট। ওখান থেকেই দেখা যাবে।'

নেই মামার সঙ্গে ঘাটে গিয়ে দেখি, এক অন্ধ মানুষ গোল চাতালে বসে গান গাইছে। হাতে একতারা। আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে অবাক। নেই মামা বসল গান শুনতে।

দূরে মাঝগঙ্গায় ঢেউ তুলে একটা ষ্টিমার যাচ্ছে। লাল আলো, নীল আলো দপ দপ করে জ্বলছে। কতক্ষণ যে সেদিকে তাকিয়েছিল কে জানে, গান থামতেই আমার হুঁশ ফিরলো।

'সেই হারিয়ে-যাওয়া খোকাটা না?' বলে একতারাটা কোলের ওপর নামিয়ে রাখল সে।

আমি তো অবাক। বললাম 'তুমি দেখতে পাও?'

হ্যাঁ পাই তো। ছুঁলে দেখতে পাই, ভাবলে দেখতে পাই, গান গাইলে সুরে সুরে স্পষ্ট দেখতে পাই। ওই যে দেখছ আকাশের সাত ঋষিতারা সাত পিদ্দিম জ্বালিয়ে গান করছেন, আমার গানের সাত সুর ওই আলো ছুঁয়ে পৃথিবীতে ফিরে এলো।'

'বাঃ বেশ মজা তো!'

হ্যাঁ, বেশ মজা বলে মজা। তুমি যদি আকাশপাড়ায় একবারটি ঘুরে আসতে পারো, তো আরও মজা।'

আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'আকাশ তো অনেক উঁচুতে। আমি উঠবো কী করে?'

নেইমামা সব শুনছিল। বলল—'আমি তো আছি, ভাবছ কেন? আমি

মই ধরছি, তুমি উঠে যাও।'

আকাশে ওঠার ইচ্ছেটা তখন খুব ছটফটিয়ে দিল আমাকে। মই বেয়ে উঠতে বেশ মজাঃ লাগল। আমি উঠছি তো উঠছি। ধাপে ধাপে। একটুও ভয় করছে না যত উঠছি মইটাও তত লম্বা হয়ে যাচ্ছে। উঠতে উঠতে একবার নিচের দিকে তাকাতেই কিন্তু বুক ধড়াস ধড়াস। কোথায় গঙ্গা, কোথায় ঘাট, কোথায় নেইমামা, কোথায় বা সেই গান গাওয়া লোক। ওপরে নিচে খালি ধূ ধূ আকাশ। মনে হ'ল পড়ে যাবো। এমন সময় একটাই কথা গানের সুরে সুরে ভেসে এলো আমার কানে দু ফোঁটা আলো চাই...দু'ফোঁটা আলো চাই, বলে মই থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে নামলাম তারাতুরির পাড়ায়। আলোয় আলোয় ভরে আছে চারদিক।

আলোর ঢেউ। আলোর ফুল। আলোর ঝর্ণা।

ওই তো সাত ঋষিতারা। ওই তো জ্বলছে সাত পিদ্দিম।

সেদিকে তাকিয়ে আমি বলে উঠলাম, 'দু'ফোঁটা আলো চাই, দু'ফোঁটা আলো।'

ঋষিতারাদের ধ্যান ভাঙল।

চোখ মেলে তাঁরা সবাই একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'দু'ফোঁটা আলো তুমি ঘরেই ফেলে এসেছো বৎস। যাও, ঘরে ফিরে যাও।'

মই ঠেকল মেঘপাহাড়ের গায়ে।

আমি মই বেয়ে নেমে আসছি। নামছি তো নামছি, নামছি তো নামছি...নামতে নামতে নামতে নামতে...ওমা, এ যে আমাদের বাড়ির ছাদ! কোথায় নেইমামা, কোথায় তার আলো জ্বালানো মই, কোথায় বা সেই অন্ধ বাউল!

তরতর করে নেমে এলাম সিঁড়ি বেয়ে।

মা কোথায়?

সদর দরজা হাট করে খোলা। মা সেখানে পথের দিকে চেয়ে আকুল ব্যাকুল কার জন্য?

আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম মায়ের কোলে।

মা বলল, 'দুষ্টু, কোথায় ছিলি?'

অবাক হয়ে তখন দেখলাম, আমারই মায়ের দু'চোখে সেই দু'ফোঁটা তারার আলো!

ফুল-ফোটানো মানুষ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বুড়ো কাঠুরিয়া। জ্বালানি কাটতে যায় জঙ্গলপাহাড়, একদিন একটা কুকুরছানা দেখে পথে পড়ে—না খেয়ে, শীতে, মরণদশা।

বড়ো মায়া হল। বুকে চেপে তাকে ঘরে নিয়ে ফিরল কাঠুরিয়া—দেখ্‌সে আয় কাঠুরেনী, কাকে এনেছি—

কাঠুরেনী বেরিয়ে দেখে কুঁকড়ো-শুঁকড়ো ধবধবে একটা কুকুরছানা।

—ও মা, কী সুন্দর কুকুরছানা। ভালোই হল, কথা কওয়ার একটা লোক বলতে নেই ঘরে। বেশ হল!

বুড়োবুড়ির যত্নআত্তিতে দেখতে-দেখতে কুকুরছানাটা তাগড়াই ধবধবে ছোটোখাটো একটা নেকড়ে বাঘের মতন হয়ে উঠল। সাদা দুধরঙের কুকুর—ওরা নাম দিল শিরো। শিরো মানে হল সাদা।

ছেলেপুলে নেই বুড়োবুড়ির ঘরে। শিরোই হল ওদের ছেলে। ফরমাশ খাটে, কাঠ বয়, গলা জড়িয়ে আদর আদায় করে। একদিন বুড়োর পেছনে-পেছনে বাঁশের বনে গাছের বনে চলতে-চলতে—হঠাৎ টানতে শুরু করেছে বুড়োর কিমোনো—কী রে?

শিরো একটা জায়গায় ঘুরঘুর করে মাটি শোঁকে আর থাবা আঁচড়ে মাটি কুড়োতে থাকে...

খানিক দেখে, বুড়ো—দেখা যাক ভেবে কাঠ না কেটে মাটিই খুঁড়তে বসল, কী আর করা! হাতটাক খুঁড়েছে কি খোঁড়েনি—ও মা, ঠন্ করে উঠল শব্দ। মাটি সরিয়ে দেখে কলসির কাঁদা। কলসিই তো? হ্যাঁ। মাটি সরিয়ে তুলল কলসি—কী ভার! উপুড় দিতেই মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল পুরোনো আমলের সব টাকা—রাশি-রাশি ওবান আর কোবান, নিবু আর ইশু—

ও মা, এ যে সাত রাজার ধন!

শিরো ঘুরে-ঘুরে কেবলই পিঠ পেতে দেয়, কেবলই পিঠ পেতে দেয়! বুড়ো তখন খড়ের ছালা মোহর বোঝাই দিয়ে, ছালার মুখ বেঁধে, চাপিয়ে দিল শিরোর পিঠে। বুড়োর আগে-আগে গরবে-গরবে তনতোকো-তনতোকো—শিরো চলতে লাগল টগবগিয়ে...

দুঃখ ঘুচল বুড়োর। কেবল তারই বা কেন—বুড়োর মনটা ছিল ভারি ভালো, জ্ঞাত-পড়শি যে যেখানে—বুড়ো সবাইকে ডেকে-ডেকে রোজ-রোজ দিন জিনিসটা-আশটা নানান সামগ্রি দিতে-থুতে লাগল হাত-কোঁচড় ভরে-ভরে। জানা-চিনতির মধ্যে ভাত-কাপড়ের জ্বালা লাঘব হয়ে গেল অনেকেরই।

লাঘব তো হল, কিন্তু বুড়োর যে ছিল সবচেয়ে পাশের ঘরের পড়শি—তার বুক ফাটতে লাগল হিংসেতে। কারণ-অকারণ খোঁজ পাড়তে আসে বিশ বার করে, বলেই ফেলল অবশেষে—হ্যাঁ গা কাঠুরেদাদা, একটা কথা শুধুই। ক-দিন আগেও যে জ্বালানি বেচে দিন কুলোতো না তোমার, হঠাৎ এত টাকা পেলে কোন্খানে?

ও, এই কথা! বুড়ো তার মুখের দিকে কতক্ষণ চেয়ে শেষে বলে, সে ওই শিরো জানে, ওকেই শুধোও। শিরোই দিয়েছে সব—যা দেখছ।

শিরো? ওই কুকুর?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, শিরো। বলে, বুড়ো সরল চিত্তে গলগল করে সব বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিলে পড়শিকে। সৌভাগ্যের কথা, না বলেও পারা যায় না।

হ্যাঁ হে কাঠুরেদাদা, তা তোমার শিরোকে একটা দিন ধার দাও না দাদা

আমায়।

তার আর কী। কাঠুরিয়া—মনে যাই হোক, মুখে আর না করতে পারে না। বলে, নেবে একদিন, তার আর কী। বলে, কিন্তু বলতে যেন বেঁধে যায় কথা।

পড়শি দাঁড়িয়ে ওঠে। কিন্তু কাঠুরেনীর কিছুতে আর হাত ওঠে না কুকুরটাকে এগিয়ে দিতে। সবচেয়ে, শিরোই যেন গররাজি।

যা বাবা শিরো, অবাধ্য হতে নেই। একটা দিন থেকে আয় গিয়ে ও বাড়িতে—বুড়ো বলে ওঠে তখন, শুকনো গলায়।

ভারি বেআদব কুকুর তো? বলে কাউকে আর ফুরসুৎ না দিয়ে পড়শি ঝটিতি এক দড়ির ফাঁস গলিয়ে দিয়েছে শিরোর গলাতে। তারপর অনুপায় দু-জোড়া চোখের সামনে দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল সে কুকুরটাকে সঙ্গে করে।

কী আর করা! ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক, দড়ির বাঁধন গলায় পরেছে, শিরোর আর না চলে উপায় কী পড়শির পেছনে-পেছনে—পাড়া ছাড়িয়ে যায়, গাঁ ছাড়িয়ে যায়—বাঁশের বন, তারপর গাছের বন, নিঘাসী মাঠ, আবার বাঁশের বন—পড়শি এক এক পা এগোয় আবার ফিরে চায়—কী রে, আর কতদূর? —আবার এগোয়—কী রে, সন্ধে অবধি হাঁটাবি নাকি?

আমি হাঁটাচ্ছি? শিরো বোধহয় ভাবছে মনে মনে।

না, থেমে দাঁড়িয়েছে দেখছি কুকুরটা। মাটি শুঁকছে। থাবা আঁচড়াল, এইখানেই তা হলে? ঠিক তো? কুড়ুল কাঁধ থেকে নামিয়ে, দড়ির আগাটা টানতে-টানতে চলল সে কুকুরটাকে গাছের সঙ্গে বাঁধতে—বিশ্বাস নেই, হতভাগা কুকুর না পালায়—পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে দড়িটাকে ছোট্ট করে দিল যতটা পারা যায়—থাক বাঁধা, নড়াচড়া বন্ধ! তারপর, নিশ্চিন্তি হয়ে খুঁড়তে বসল মাটি।

খুঁড়ছে তো খুঁড়ছেই—তিন হাত চার হাত খুঁড়ে ফেলল, হতভাগা কুকুর! চালাকি করছে না তো! চালাকি? তাহলে আর ঘরে ফিরতে হবে না তোমার এ জন্মে...ভাবতে না ভাবতে কোদালের মুখে শব্দ বেজে উঠছে ঠন্ করে—এই কি? পেয়েছি—বলে উত্তেজনায় চিৎকার করে

ওঠে পড়শি। এখন তোলার অপেক্ষা—

ঝুঁকে পড়ে, হাত-কাঁধ শক্ত করে, ওই অতখানি নিচুর থেকে টেনে তুলেছে ভারভর্তি দশাসই কলসিখানা। এইবার! কিন্তু উপুড় দিতেই— কোথায় সোনার মোহর, কোথায় ওবান-কোবান—ধড়ফড়িয়ে পড়ছে খালি ভাঙা লোহা, ছেঁড়া কানি, ঢিলের চাড়া, মরা ব্যাঙ—ইশ্! ইশ্! ইশ্! রাগে—মাথায় আগুন জ্বলে উঠল তার, এগিয়ে গিয়ে ধাঁ করে শিরোর গায়েই বসিয়ে দিয়েছে কুড়ুলের এক ঘা! রক্ত ছুটল ফিনিক দিয়ে—

কিন্তু সে ঘায়ে দড়িও গেল ছিঁড়ে। আর, দৃক্‌পাত না করে অমনি ঘরের দিকে তড়িৎ-বেগে ছুটে চলল কুকুর...

ঘর অবধি যেতে হল না। অজানা কী আশঙ্কাতে মাঝপথেই এসে দাঁড়িয়ে আছে বুড়োবুড়ি— রক্তদরিশন শিরোকে দেখে দুজনারই বাক্য হরে গেল মুখ থেকে।

হা ভগবান! এ কী! এ তোর কী হল শিরো? —কোলে জড়িয়ে তুলল নিয়ে ঘরে। ইশ্! এ কী রক্ত রে। কী করি এখন?

কষ্টে-যত্নে কুসুমজলে কাটা ধুয়ে ঘাসপাতার রস দিয়ে পটি জড়িয়ে দিল...হা ভগবান! কী অন্যায় করলাম রে তোর ওপরে।

—সারারাত জেগে বসে আছে শিয়রে—কিন্তু কিসের কী! ভোর হবার আগেই মারা গেল অতখানি নেকড়ে বাঘের মতন তাগড়াই সাদা কুকুরটা।

বুড়োবুড়ি চোখের জল ফেলতে-ফেলতে তাকে নিয়ে পুঁতে দিল গিয়ে জমির একটা ধার দিয়ে। তারপর ঝুরো নবম মাটির ওপর শিরোর স্মৃতি বলে লাগিয়ে দিল এতটুকু এক য়েনোকি গাছের চারা।

ক-দিনের বা কথা। গাছ হু হু বেড়ে দেখতে-দেখতে যেন মেঘ ছুঁয়েছে গিয়ে। আশ্চর্য কথা গাঁ-দেশ পার হয়ে রাজ্য জুড়ে ঢি ঢি পড়ে গেছে রাতারাতি—কী? না, জানো আশ্চর্য! শিরোর কামি ভর করেছে গাছে।

বুড়ি গাছতলা নিকিয়ে মাটি তুলে বেদী গড়ল একটুখানি। রোজ সকালে শিরোর নাম করে যা হোক খাবার রেখে যায়—চোখের আড় হলেই সে খাবার লুট হয়ে যায় পাখি আর কাঠবেড়ালিদের মধ্যে—বুড়ি এসে দেখে তার খাবার চেটেপুটে খেয়ে গিয়েছে গাছের মধ্যে শিরোর যে পরানভোমরা আত্মা—সেই কামি!

বুড়ি বলল গিয়ে বুড়োকে—দেখ বাপু, ওই য়েনোকির কাঠ দিয়ে বড়োসড়ো একটা ডালা গড়ে দাও তো আমায়। ভালো করে একটু পিঠে-মোচি গড়ি, ভোগ দিয়ে আসি ঠাকুর উজিগামির থানে—শিরোর কল্যাণে!

বুড়ির কথায় অতবড়ো গাছটা একা হাতে বুড়ো কাটতে বসল।

কেটেকুটে, নিপুণ করে গড়ল একখানা কাঠের থালা, লতাপাতা-ফুলের নকশা গা ভরা। তাইতে পিঠে-মোচি চুড়ো করে নিয়ে বুড়ি ফিরল দেবতাকে উচ্ছুগ্য সেরে।

এক-আধজন জানা-চিনতি আসতে থাকে খবর পেয়ে—বুড়ি হাত পুরে পুরে পিঠে দেয় সবাইকে—লোকজন আসছেই তারপর একজন একজন—হঠাৎ খেয়াল হয় বুড়ির—আরে! এত যে দেয়া হল, একবিন্দু কমেনি তো থালার! এটা কী করে হল?

আরো লোক আসছে—বুড়ি দিতে লাগল মুঠো-মুঠো হাত ভর্তি করে—পিঠে যে কে সেই!

শুধু কি পিঠে? সাঁঝের বেলা খেতে বসে দেখে থালা ভর্তি কত যে খাবার! দু দিন-পাঁচ দিন—যখনই খেতে বসে—থালা ভর্তি-ভর্তি কত পদ কত স্বাদের যে খাবার।

দেখতে-দেখতে রাষ্ট্র হয়ে পড়ল সে অফুরন থালার কথাও।

লোক তো আসছেই। তার উপর উঁকিঝুঁকি দিয়ে যায় সেই যে পাশের ঘরের পড়শি—ভেতরে ওঠে না। আবার আসে উঁকিঝুঁকি দিতে—সময় নেই, অসময় নেই—শেষটা আর না পেরে উঠেই এল ঘরে—হ্যাঁ গো কাঠুরেদাদা, কী চণ্ডাল রাগ! কী অন্যায় যে হয়ে গেল আমার! দিনরাত গুমরে মরছি!

বুড়োবুড়ি নীরব হয়ে শোনে।

সেদিন থেকে চোখে আমার নিদ্রা নেই হে কাঠুরেদাদা। উঠছি-বসছি, কেবলই মনে হচ্ছে কী অন্যায়টা না হয়ে গেল আমার হাতে।

আহা অনুতাপী মানুষটা! বুড়োবুড়ির মনটা যেন আপনা থেকেই নরম হয়ে যায়।

যখনই মনে হয় কুকুরটার কথা...

বুড়োবুড়ি নীরব হয়ে শোনে।

তা দেবে তোমার ওই থালাটা এক সাঁঝের জন্যে?

থালা? আমতা-আমতা করছে বুড়ো, মনে যাই থাক। মুখে আর না করতে পারে না শেষ অবধি। তা নাও এক সাঁঝ।

কাঠের থালাটা নিয়ে ঘরে গেল পড়শি। একবার আশপুরোনো খাওয়াটা নয় খেয়েই নেয়া যাক সকলে মিলে। ঘরের যে যেখানে সব্বাইকে ডাক দিয়ে মধ্যিখানে পাতা হল থালা। হরেক রেকাব বাটিকুটি এত-এত নিয়ে বসেছে সব গোল হয়ে। চুপ! গোলমাল নয়, স্থির হয়ে বসো দেখি সব, দেখ এবারে—

দেখে অফুরন থালার ওপর দেখ-দেখ করে চুড়ো হয়ে উঠছে—না, খাবার সামিগ্রি নয়, উপুরিউপুনি জমে উঠছে—খালি ভাঙা লোহা, ছেঁড়া কানি, ঢিলের চাড়া, মরা ব্যাঙ—

মুহূর্তে, রাগে আগুন চড়ে উঠল মাথায়। তবে রে? পড়ে ছিল কুড়ুলখানা—ক্রমাগত ফালা করে কুপিয়েও রাগ যায় না, শেষে কাঠের চটাগুনো হড়্‌হড়্‌ করে ঢেলে দিল গিয়ে জ্বলন্ত চুলোর ভেতরে!

পরদিন থালা ফিরিয়ে আনতে গিয়ে বুড়ো দেখে থমথম করছে পড়শির উঠোন-ঘর।

বেরিয়ে এল লোকটা, মুখ ভার। বুড়ো আমতা-আমতা করে বলে, দেবে না কি থালাটা আমাদের?

পড়শি কথা কয় না। ভেতর থেকে আর কে বলে উঠল, থালা ঐ উনুনে, যাও তুলে নাও গে—বুড়ো গিয়ে দেখে উনুন-ঠাসা ছাই—

পুড়িয়ে ফেলেছ? হাউহাউ করে কেঁদে ফেললে বুড়ো। ওর মধ্যে ছিল যে আমাদের শিরোর পরানভোমরা—কামি—

পুড়িয়ে ফেললে তোমরা?

উনুনে হাত ডুবিয়ে বুড়ো সেই ছাই তুলতে লাগল মুঠো করে-করে। তোলে আর কাঁদে, পেটকোঁচড় ভর্তি ছাই নিয়েই ফিরছে শেষে—চলে এক পা-এক পা, চলে আর কাঁদে—চলে, আর এক-এক মুঠো ছাই নিয়ে উড়িয়ে দেয়—

হেমন্ত শেষ হয়ে আসছে, নতুন শীতের হাওয়া দিয়েছে চারধারে—গাছপালা মুড়োনো—একদমকা ছাই লাগল গিয়ে ফুজি গাছের ডালে, আর

থমকে গেল বুড়ো। হঠাৎ দেখে গাছটা ভরে যাচ্ছে যেন পাতায়-পাতায়, যেন কুঁড়ি দিয়ে উঠল দেখতে-দেখতে।

কী হল? রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হলদি-লেশ-মুড়োনো সাকুরা গাছ। কৌতূহলে বুড়ো উড়িয়ে দিল একমুঠো ছাই তার ডালেপালায় আর তখুনি, দেখতে-দেখতে সারা গাছ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল গোলাপি আভার বসন্ত ফুল—

সেই পথ দিয়ে চলেছিলেন এক রাজপুরুষ দাইমিয়ো, পাশে-পাশে সাঙ্গোপাঙ্গ সামুরাই সব—হঠাৎ দেখেন আলগা হাওয়া উঠছে, সে হাওয়ার ঘা লাগতেই হঠাৎ গাছ ভরে উপচে উঠেছে বিজিবিজি কুঁড়ি আর মঞ্জরি, গরবী সাকুরা ফুল—

কাছে আসতে দেখেন, দুঃখীমতন একটা বুড়োসুড়ো লোক, কী যেন বিড়বিড় করছে নিজের মনে।

তুমি? তুমি ফুটোলে নাকি এই অকালের চেরীফুল?

হতভম্ব দাইমিয়ো। দেখেন, লোকটা কাঁদছে। কাঁদছে, আর বিড়বিড় করছে কী যেন নিজের মনে।

আশ্চর্য! তুমি ফুটিয়েছ এই অকালের চেরীফুল? আরো পারো? ওই যে ওই গাছটাতে?

বুড়ো পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল পাশের মুড়ো গাছটার তলাতে। একমুঠো ছাই তুলে উড়িয়ে দিল আলগা হাওয়ায়। ছাই তো না, শিরোর পরান-ভোমরার আগুন-পোড়া রুপোলি রেণু—হাওয়া লেগে ছড়িয়ে পড়ল নিচু থেকে ওই উঁচু ডালপালায়, আর,—

গোলাপি আভা দেয়া মঞ্জরিতে-মঞ্জরিতে উপচে পড়ল, ঝলমল করে উঠল গাছটা।

দাইমিয়ো থ হয়ে দাঁড়িয়ে। কী কাণ্ড! শুনিওনি তো এমন আশ্চর্য! ফুল ফুটিয়ে দেয় মানুষে? ফুল-ফোটানো মানুষ, রাজা তো নেই এখানে, দেশের রাজার হয়ে আমাদেরই দিতে হয় তাহলে তোমার সম্মানী।

সর্, তোল, নিয়ায়—হৈচৈ পড়ে গেল সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে। রাস্তার ওপরেই মেজ পড়ল ফটিকপাথরের। লাক্ষার নকশা-কাটা থালার ওপরে পাটের চাদর, একজন তুলি নিয়ে বসে পড়েছে সিল্কের ওপরে মানপত্রের ছবি লিখতে, একজন থালার ওপর ঝমঝম করে ঢেলে দিয়ে গেল অত উঁচু সোনার টাকার চুড়ো।

দাইমিয়ো নিজে এগিয়ে এসে কাঠুরের হাতদুটো চেপে ধরলেন।

খবর ছুটল বাতাস ভর করে।

আসতে-যেতে লাগল লোক আর লোক। অবাক হয়ে চায় সব আশেপাশে।

—শুনেছিস?

—শুনেছিস?

আর, খবর পেয়ে এবারেও হিংসেয় বুক ফাটতে লাগল পড়শির। এই চুলো থেকেই তো তুলে নিয়ে গেল ছাই, আর কি না—

তাড়াতাড়ি উনুনপাড়ে গিয়ে যেটুকু পড়েঝড়ে আছে হাতড়ে কেঁকে-পেটকোঁচড়ে পুরে খানিকটা দূর উজিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সে হাঁক

পাড়তে লাগল আপনমনে—ফুল ফোটাই গো—শুকনো গাছে ফুল ফোটাই গো—

পথে-পথে সেখানটাতেই আবার এসে পড়েছে দাইমিয়োর দলবল—এ আবার কে?

শুকনো গাছে ফুল ফোটাই গো—

এ যে আবার আরেকজন দেখছি। এ তল্লাটে দেখছি একের পর এক ফুল-ফোটানোর লোক! কী কাণ্ড! জানতামই না। কী হে, তুমিও ফুল-ফোটাও নাকি?

হেই হুজুর, ফুল তো আমিই ফোটাই গো!

তবে যে আরেকজনকে দেখে এলাম একটু আগে?

কাকে আবার দেখলে! ও, সেই বুড়ো? ও তো আমারই চেলা।

তুমি গুরু? ভোজবিদ্যে তাহলে তোমার?

কী বলেন হুজুর, বিনয়ে জিভ কাটল পড়শি।

বেশ। ফোটাও তবে, দেখি। ওই তো কত গাছ রয়েছে, ফোটাও!

খুশিতে, আশাতে হড়বড় করে ছুটল সে সোজা সামনের গাছতলাতে—দেখুন হুজুর—এই দেখুন—বলে, মুঠোভর্তি ছাই সে উড়িয়ে দিল ওপরমুখো—

ছাই ভেসে উড়তে লাগল শীতের বাতাসে...

আবারও ছুঁড়ল মুঠো করে—ছাই দমকা হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল সামুরাইদের মাথায়-মাথায়, দাইমিয়োর মুখে-চোখে।

ভয় পেয়ে, যত ছিল মুঠো-মুঠো ছুঁড়তে লাগল ছাই—

হাওয়া-বাতাস কালচে হয়ে গেল, ছাই পড়ে মুখ-চোখ জ্বলতে লাগল সব্বার, ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে হঠাৎ সামনের পা তুলে দিল মাথার সমান, ঘোড়ার পিঠ থেকে খসে পড়ল দু-দুজন সামুরাই—

জাপটে ধরল উঠে পড়শিকে। আর দুজন ঘোড়া থেকে নেমে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁধল তাকে—আছমোড়া-পিছমোড়া।

দাইমিয়ো বললেন, তুমিই তাহলে গুরু?

মুখে বাক্য নেই।

পড়শির ঠাঁই হল এবারে অন্ধকার কারাগারে।

জাদুকর

নির্মলেন্দু গৌতম

আশ্চর্য এক জাদুকর রাজ্য জুড়ে শোরগোল তুলে দিয়েছে।

এখানে সেখানে সে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে তার খেলা।

তার খেলা যেন প্রত্যেকবারই নতুন। এক খেলা বুঝি সে দু'বার দেখায় না।

যেখানে তার খেলা, সেখানেই রাজ্যের সব লোক।

বাড়িতে-বাড়িতে, পথে-ঘাটে সেই জাদুকরের গল্প। বলতে গেলে কাজকর্মও বন্ধ হয়ে গেছে সেই জাদুকরের জন্য। জাদুকর দেখতেও ভারি রহস্যময়।

মস্ত আলখাল্লার মতো তার পোশাক। মাথায় একটা রঙবেরঙের পাগড়ি। টকটকে ফর্সা রঙ। ঠোঁটের ওপর চমৎকার একজোড়া গোঁফ।

সে যেখানে খুশি থাকে। খাবার দোকান পেলেই খেয়ে নেয় কিছু। অবশ্য তার জন্য তাকে কিছু দিতে হয় না। তাকে খাওয়াতে পারলেই সবাই খুশি হয়।

সেই আশ্চর্য জাদুকরের গল্পই রাজার কানে পৌঁছুল।

সঙ্গে-সঙ্গে রাজামশাই খবর পাঠালেন মন্ত্রীকে।

মন্ত্রীও ছুটতে-ছুটতে এসে পৌঁছুলেন রাজামশাইয়ের কাছে।

মন্ত্রীকে দেখেই রাজামশাই খানিকটা সময় পায়চারি করলেন। তারপর বললেন, 'আপনি শুনেছেন সব?'

প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারলেন না মন্ত্রী। বললেন, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

সেই যে, এক জাদুকর এসেছে এখানে—রাজামশাই বললেন।

সঙ্গে-সঙ্গে মন্ত্রী বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তার কথা খুব শুনেছি। শুধু শুনেছি কেন, তাকে দেখেওছি একবার—'

রাজামশাই বললেন, 'কিন্তু আমি তাকে দেখিনি—শুধু শুনেছি তার কথা।'

মন্ত্রী একমুহূর্ত ভেবে বললেন, 'এতে আর সমস্যার কী আছে, এক্ষুণি লোক পাঠিয়ে তাকে নিয়ে আসছি। আপনি তাকে যত ইচ্ছে দেখুন।'

জাদুকরকে আনবার কথাটা শুনে প্রায় চমকে উঠলেন রাজামশাই। বললেন, 'তাকে আনবার কোনো দরকার নেই।'

মন্ত্রী অবাক হলেন রাজামশাইয়ের কথা শুনে।

কী বলবেন ভেবে পেলেন না। জাদুকরকে রাজবাড়িতে নিয়ে এলে ক্ষতি কী?

রাজামশাই মন্ত্রীর দিকে তাকালেন। ফের বললেন, 'আমি তাকে রাজবাড়িতে দেখতে চাই না।'

মন্ত্রী তেমনি অবাক হয়েই বললেন. 'তাহলে তাকে কোথায় দেখতে চান বলুন আমায়। সেখানেই তাকে নিয়ে যাব।'

রাজামশাই এবার অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকলেন। কোনো উত্তর দিলেন না।

অস্বস্তিবোধ করলেন মন্ত্রী। রাজা যতক্ষণ না বলছেন ততক্ষণ চলে যাওয়া যাবে না এখান থেকে অথচ দাঁড়িয়ে থাকাও যাচ্ছে না।

হঠাৎ থামলেন রাজামশাই।

বললেন, 'রাজ্যসুদ্ধ লোক তাকে দেখে ফেললে এখানে-ওখানে, আর আমি তাকে ডেকে এনে দেখবো, এ কখনো হতেই পারে না।' এটা একটা সমস্যাই বটে, মন্ত্রী ভাবলেন মনে মনে।'

রাজা ফের বললেন, 'আমি এখন কী করব সেটা জিজ্ঞেস করছি আপনাকে।'

মন্ত্রী একটু সময় ভেবে বললেন, 'সেটা আমায় একটু ভাবতে হবে।'

'একটু কেন, অনেকখানি ভাবুন। সেটা ভাববার জন্যেই তো আমি আপনাকে ডেকেছি।' রাজামশাই বললেন সঙ্গে-সঙ্গে।

মন্ত্রী বললেন, 'কিন্তু শেষপর্যন্ত ভেবে যদি কিছু করতে না পারি?'

রাজামশাই বললেন, 'সেটা না হয় তখন ভাবা যাবে।'

বলে ফের পায়চারি করতে থাকলেন রাজামশাই।

আর দাঁড়িয়ে থাকবার দরকার কী?

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভেবে ফেলতে হবে।

মন্ত্রী আস্তে-আস্তে বললেন, 'তাহলে আমি এখন আসছি।'

রাজামশাই বললেন, 'আচ্ছা।'

মন্ত্রী আর দাঁড়ালেন না। পায়ে-পায়ে বাইরে চলে এলেন।

তারপর হাঁটতে থাকলেন বাড়ির দিকে। তাঁর মস্ত ঘোড়ার গাড়ি রইল পড়ে। ভাবনার তাড়ায় সব ভুলে গেলেন তিনি।

কেউ তাঁকে ডাকতেও সাহস করল না।

কতক্ষণ হাঁটলেন মন্ত্রী, তা তাঁর খেয়াল রইল না।

হঠাৎ একজায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালেন মন্ত্রী।

মস্ত ভিড় জমেছে একজনকে ঘিরে।

ভালো করে তাকালেন মন্ত্রী। সেই জাদুকর জাদুর খেলা দেখাচ্ছে।

পায়ে-পায়ে মন্ত্রী এগিয়ে গেলেন।

প্রজারা কেউ কিন্তু দেখলো না মন্ত্রীকে। মন্ত্রীও জাদুকর ছাড়া আর কাউকে দেখলেন না।

অদ্ভুত একটা খেলা দেখাচ্ছে জাদুকর। সেদিক থেকে চোখ সরাতে পারছেন না মন্ত্রী।

শুধু মন্ত্রী কেন, কেউ চোখ সরাতে পারছে না।

খেলাটা শেষ হলো দেখতে-দেখতেই। নতুন খেলা শুরু হলো আবার। সে খেলাটা যেন আরো অনেক ভালো।

মন্ত্রী মুহূর্তের জন্য চোখ সরাতে পারছেন না।

আরো ভালো করে দেখবার জন্য ভিড়ে ঠেলে একেবারে সামনে এসে

দাঁড়ালেন।

আর এই ব্যাপারটা যখন খেয়াল করলেন, তখন জাদুর খেলা শেষ।

লজ্জা পেয়ে ঘুরে বেরিয়ে পড়বার আগেই জাদুকর এসে দাঁড়াল সামনে। বলল, 'আপনি আমার খেলা দেখতে এসেছেন বলে আমি খুব খুশি হলাম মন্ত্রীমশাই।'

মন্ত্রী কিছু একটা বলতে চেষ্টা করলেন।

যারা খেলা দেখতে এসেছিল, খুশিতে তারা এতো জোরে চেঁচিয়ে উঠল যে মন্ত্রী বলবার চেষ্টা করেও কিছু বলতে পারলেন না।

জাদুকর ফেল বলল, আপনাকে আমি আমার সেরা খেলাগুলোই দেখালাম—

বলে গড় হয়ে নমস্কার করে জাদুর খেলা দেখাবার ঝোলাঝুলি তুলে নিল জাদুকর।

'তোমার সঙ্গে একটু গোপন কথা আছে জাদুকর।'

জাদুকর বুঝি অবাক হল। বলল, 'বলুন মন্ত্রীমশাই।'

মন্ত্রী চারপাশে তাকালেন।

যারা দাঁড়িয়েছিল চারপাশে, সঙ্গে-সঙ্গে তারা সরে গেল দূরে। মন্ত্রী যে কিছু গোপন কথা বলবেন জাদুকরের সঙ্গে সবাই সেটা বুঝতে পারল।

মন্ত্রী তবু নিচু গলায়, প্রায় ফিস্‌ফিস্‌ করেই বললেন, 'রাজামশাই তোমায় দেখতে চান।'

লাফিয়ে উঠল জাদুকর। বলল, 'রাজামশাই আমাকে দেখতে চান! আমি এখুনি যাব মন্ত্রীমশাই।'

'না না, রাজবাড়িতে গেলে চলবে না।' মন্ত্রী বললেন।

জাদুকর বলল, 'কেন?'

মন্ত্রী একটুখানি ভাবলেন। তারপর গুছিয়ে সব বললেন জাদুকরকে।

জাদুকর হাসল। বলল, 'আপনি কিছু ভাববেন না মন্ত্রীমশাই। আমি ঠিক কাল রাজামশাইকে আমার জাদুকর খেলাই দেখিয়ে আসব।' বলে আর দাঁড়াল না জাদুকর। ঝুলিঝোলা নিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্তে চলে গেল।

চারদিকের লোকজনও চলে গেল তার পেছন-পেছন।

মন্ত্রীমশাই দাঁড়িয়েই রইলেন সেখানে।

কী করে জাদুকর রাজামশাইকে ম্যাজিক দেখিয়ে আসবে কে জানে?

তবে দেখিয়ে আসবে ঠিকই।

যাক্‌গে, এখন আর এসব নিয়ে ভাববার কোনো দরকার নেই। কাল জাদুকরের সঙ্গে রাজামশাইয়ের দেখা না হলে তখন ভাবা যাবে। ভেবেই নিশ্চিন্তে মন্ত্রী ফিরতে থাকলেন।

রাজসভা তখন সবে বসেছে।

রাজামশাই চিন্তিতভাবে এসে বসেছেন রাজসভায়।

যতক্ষণ জাদুকরকে দেখার ব্যাপারে মনের মতো কোনো কথা মন্ত্রীমশাই না বলবেন ততক্ষণ রাজামশাই নিশ্চিন্ত হবেন কী করে?

আজ রাজসভায় আসবার আগে মন্ত্রীর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেছিলেন রাজামশাই।

মন্ত্রী একদিনের সময় চেয়েছেন।

আজই তো জাদুকর জাদুর খেলা দেখিয়ে যাবে। সে যখন বলেছে, তখন সে আসবেই। কাজেই আজকের দিনটাতো অপেক্ষা করতেই হবে মন্ত্রীকে।

রাজসভায় বসে জাদুকরের কথাটাই ভাবতে শুরু করেছিলেন মন্ত্রী।

হঠাৎ প্রহরী ছুটে এলো রাজসভায়।

একজন বিচার চাইতে এসেছে রাজার কাছে। জোর করেই সে ঢুকবে রাজসভায়। যার বিরুদ্ধে বিচার চাইতে এসেছে, সঙ্গেই নিয়ে এসেছে তাকে।

রাজামশাই মন্ত্রীর দিকে তাকালেন।

মন্ত্রী বললেন, 'আপনার কাছে যখন বিচার চাইতে এসেছে তখন—'

রাজামশাই মন্ত্রীর কথা শেষ হবার আগেই প্রহরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নিয়ে এসো ভেতরে।'

ছুটে বাইরে চলে গেল প্রহরী।

ফিরলও প্রায় ছুটেই। সঙ্গে তার দুজন লোক।

দুজনের একজনকে দেখে চমকে উঠলেন মন্ত্রী। তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। সে কিন্তু একপলকের জন্যও তাকাল না তাঁর দিকে।

রাজামশাই নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসলেন।

দুজনের একজন এগিয়ে এল দুপা। তারপর দু'হাত জোড় করে বলল, 'রাজামশাই, এই লোকটি আমার অনেককিছু নিয়েছে। কিন্তু কিচ্ছু দিচ্ছে না। এর বিচার চাই আমি।'

অন্যজন, মস্ত দাড়ি-গোঁফ যার, সঙ্গে-সঙ্গে বলল, 'আমি আপনার

সামনেই ওর কাছ থেকে যা-যা নিয়েছি, ফিরিয়ে দিতে চাই সব।'

যে বিচার চাইতে এসেছে, সে অবাক হয়ে বলল, 'সে তো অনেক জিনিস!'

দাড়িঅলা লোকটি বলল, 'রাজামশাইয়ের সামনে সব ফিরে পেলেই তো হবে!'

বলে কি যেন ভাবল সে।

মন্ত্রীর চোখ নড়ছে না তার দিকে থেকে। উত্তেজনায় বড়-বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন তিনি।

দেখাই যাক না, কী হয় শেষপর্যন্ত।

দাড়িঅলা লোকটি কিছু ভেবেই বলল, 'তুমি আমার কাছে কী কী পাও, বলে যাও এক-এক করে—'

সঙ্গে-সঙ্গে সে বলল, 'চারটে মস্ত মস্ত লাল-নীল-সবুজ আর সাদা ফিতে—'

কথা শেষ হলো না। লোকটি সঙ্গে-সঙ্গে মুখের ভেতর থেকে টেনে বার করতে থাকল লাল রঙের একটা ফিতে। লাল শেষ হতেই নীল। নীল শেষ হতেই সবুজ। সবুজ শেষ হতেই সাদা।

রাজামশাইয়ের চোখে আর পলক পড়ছে না।

পলক পড়ছে না সভার আর সবার চোখেও।

মন্ত্রী শুধু খুশিতে লাফিয়ে উঠলেন ভেতরে-ভেতরে। দেখাই যাক্, কী হয় শেষপর্যন্ত।

ফিতেগুলো বের করে লোকটি বলল, 'আর কী?'

'একটা পায়রা।'

'পায়রা?' বলে থামল দাড়িঅলা লোকটি। তারপর এক পকেট থেকে একটা শূন্য কৌটো বের করল, অন্য পকেট থেকে বের করল একটা পায়রার ডিম। সবাইকে দেখিয়ে ডিমটা রাখল সেই শূন্য কৌটোয়। কৌটোটা বন্ধ করে দুবার ঝাঁকিয়ে খুলতেই বেরিয়ে এলো একটা পায়রা।

সেটা লোকটির হাতে দিতেই সমস্ত সভা অবাক।

পাখির একটা পালক পড়লেও বুঝি তার শব্দ শোনা যেত।

রাজামশাইয়ের চোখদুটো এক্কেবারে গোল হয়ে গেল মুহূর্তেই।

লোকটি বলল, 'দুটো ফুলও নিয়েছিল আমার বাগান থেকে।'

'এই নাও।' বলে দাড়িঅলা লোকটি সেই কৌটো থেকে পরপর দুটো ফুল বের করে দিয়ে দিল লোকটিকে।

রাজামশাই এবার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'একী দেখছি আমি?'

মন্ত্রী বললেন, 'আরো বোধহয় দেখতে হবে।'

কথাটা শেষ হবার আগেই লোকটি ফের বলল, 'এবার এতদিন ধরে যে আমার জিনিসগুলো রেখেছিলে তার জন্য আমায় কী উপহার দেবে?'

দাড়িঅলা লোকটি একটু ভেবে বলল, 'আমার এই দাড়ি-গোঁফ তোমায় উপহার দিতে পারি—'

বলেই লোকটি একটানে খুলে ফেলল তার দাড়ি-গোঁফ।

সঙ্গে-সঙ্গে সারা সভা চেঁচিয়ে উঠল, 'জাদুকর—জাদুকর—'

রাজামশাই প্রায় উঠেই দাঁড়িয়েছেন। মন্ত্রীও।

জাদুকর এগিয়ে এসে জোড়হাত করে দাঁড়াল রাজামশাইয়ের সামনে। তারপর একটু হেসে বলল, 'আমিই যাদুকর।'

রাজামশাইয়ের মুখে কথা নেই।

জাদুকর মন্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে হেসে বলল, 'সবাইকে যেমন করে জাদুর খেলা দেখাই, রাজাকে তো আর সেভাবে খেলা দেখানো যায় না! তাই এমনিভাবে রাজাকে জাদুর খেলা দেখিয়ে গেলাম—'

রাজামশাই মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জাদুকর ঠিক কথাই বলেছে মন্ত্রীমশাই। আপনি কী বলেন?'

মন্ত্রী বললেন, 'ঠিক বলেছে জাদুকর।'

'ওকে এখ্‌খুনি একটা উপহার দিয়ে দিন।' বলে বসে পড়লেন রাজামশাই।

সভাসুদ্ধ লোক আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

রাজামশাইও হাততালি দিতে থাকলেন তাদের সঙ্গে।

জাদুকরকে রাজামশাইয়ের উপহার তো দিলেন মন্ত্রীমশাই।

নিজেও একটা উপহার দিলেন।

সেটা অবশ্য জাদুর খেলার জন্য নয়।

এমনি একটা বুদ্ধি বের করে মন্ত্রীকে বাঁচাবার জন্য।

সত্যি, বুদ্ধিটাতো চমৎকারই ছিল।

শিউলি পরীর দেশে

আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন
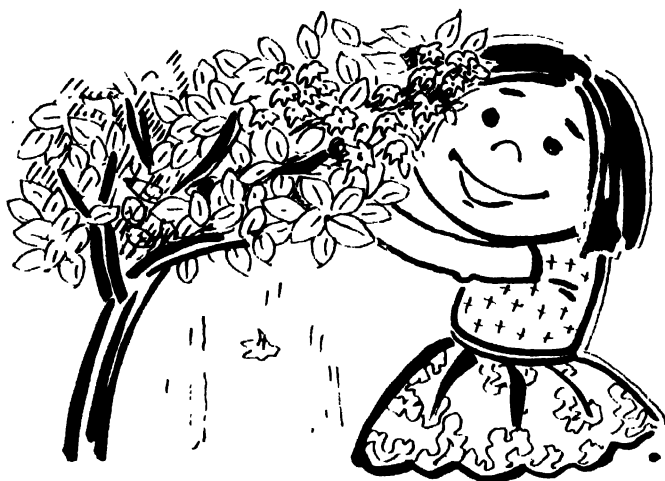
হাপিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে থাকে, শিউলি ফুলের গাছটা, গলিটার মোড়ের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে। খাঁ খাঁ দুপুরে পালতোলা দমকা হাওয়া শরীরে আমেজ আনে, আনে একটা ঘুম ঘুম ভাব। দু-চোখে তন্দ্রা ছড়ায়, কিন্তু ঘুম হয় না। মাঝে মাঝেই চোখ মেলে চায়। একটু পরেই গলির মুখে দেখা যাবে সেই ছোট্ট শরীরটাকে, প্রাণচঞ্চল ঢেউয়ের মতো নাচতে নাচতে স্কুল থেকে ফিরছে। গেটের সামনে এসেই আগে হাতে দুটো ফুল নেবে, দোল খাবে একবার ডাল ধরে, তারপরই মিষ্টি গলায় ডাক ছাড়বে—'মা এসে—এ গেছি-ই' তাই সারাটা দুপুর গাছটার কেটে যায় ঐ দিকে চেয়ে। কি বাঁধনেই না বেঁধেছে মেয়েটা ওকে, সারাটা দিনে একবার অন্তত ওকে না দেখলে স্বস্তি পায় না গাছটা। সেবার যখন মেয়েটার খুব জ্বর হয়েছিল অধিকাংশ সময়ে বিছানাতেই পড়ে থাকত, সবাই খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছিল। শিউলি গাছটার চোখে ছিল না ঘুম। মাটির সাথে আটকে থাকা শরীরটাকে যতটা সম্ভব ঝুঁকিয়ে জানলার ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করত মেয়েটাকে। অন্তরের সমস্ত আকুতি দিয়ে প্রার্থনা করত ভগবানের কাছে, মেয়েটি যেন

সেরে ওঠে, এই কটা দিন প্রচন্ড ক্লান্তিতে, দুভার্বনায় সে একটি ফুলও ফোটায়নি, যারা রোজ সকালে ফুল তুলতে আসত তারা অবাক হয়ে ভাবতে লাগল যে, এতসুন্দর তাজা ফুল গাছটা বোধহয় মরেই গেল। কিন্তু সেদিন যখন একটু সুস্থ হয়ে মেয়েটি তার মায়ের হাত ধরে বেরিয়ে এল বাইরে, আর বেরিয়েই সটান এগিয়ে এল গাছাটার কাছে, আহত অভিমানী স্বরে বলে উঠল 'দেখছো মা! গাছটা একটা ফুলও আমার জন্য রাখেনি', গাছের ভাষা অন্য কেউ বুঝতে পারে না তাই। না হলে দেখত যে, শিউলিগাছটা সেদিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল, সমস্ত ডালপালা পরমস্নেহে বুলিয়ে দিয়েছিল তার গায়ে।

যখন প্রচন্ড গরমে সমস্ত সবুজ পুড়ে ছাই হয়ে যায়, গাছে ফোটেনা ফুল, তৃষ্ণায় সমস্ত শরীর যখন মরুভূমি হয়ে যায় তখন এই মেয়েটি বুঝতে পারে তার কষ্ট, জল ঢালে তার গোড়ায়। লোকে বলে 'ফুলের মতো সুন্দর।' গাছটা ভাবে, এটুকু বললে কম বলা হয়। মেয়েটির সৌন্দর্য্য ফুলের চেয়েও গভীর। আকাশের চেয়েও বিস্তৃত, পাপড়ির চেয়েও নরম। তাই পরদিন সকালে মেয়েটি যখন ফুল তুলতে এসেছিল ওর জন্য ফুটিয়ে রেখেছিল নিজের সেরা সবটুকু। ঝর ঝর করে ঝরিয়ে দিয়েছিল ওর সারা গায়ে, মাথায়। ভরিয়ে দিয়েছিল শুভ্র ফুলের চুম্বনে।

স্কুল থেকে ফিরে বিকেল বেলায়, সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে খেলে মেয়েটি। গাছটি দেখে, ওকে ঘিরে বাচ্চাগুলোর চোর চোর খেলা, হুটোপাটি, হইচই, দেখে আর দেখে, এত দেখেও মন আর ভরে না তার। ধীরে ধীরে নববধূর ঘোমটার মতো সন্ধ্যা নামে। মাঝে মাঝে জানলার ফাঁক দিয়ে চাঁদের কণা এসে পড়ে মেয়েটির ঘুমন্ত মুখে। জ্যোৎস্নার টুকরোটাকে গাছটার হিংসে হয়। এইভাবে এক সুরেলা তন্দ্রায়, আবেশে, রাত কেটে যায়। উষার প্রত্যাশায়, ফুলের ডাল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে গাছটি। মেয়েটি আসে, ফুল তোলে, গাছটার প্রাণ মন ভরে দিয়ে যায়।

এইভাবেই দিন কাটছিল বেশ, কিন্তু নীল আকাশেও দাগ কাটে কালো মেয়ের ময়লা। একদিন এক সাধু আসে ওদের বাড়িতে। মেয়েটি বাইরে আসে ভিক্ষা দিতে। মেয়েটিকে দেখে সাধুটার চোখ চকচক করে ওঠে। ভিক্ষে নিয়েই সে চলে যায় না, সিঁড়িতে বসে জল চায়। সাধুর চকচকে চোখ দুটো দেখেই কেমন যেন লেগেছিল গাছটার। ওঁকে বসতে দেখে

সন্দেহটা বাড়ে। ব্যগ্র হয়ে কান পেতে থাকে। মেয়েটি জল নিয়ে এলে সাধুটি বলে, 'মামনি, তোমার তারাদের দেশে যেতে ইচ্ছে করে না?' মেয়েটি বলে 'হ্যাঁ! খুব করে। কেন তুমি সেখানে গেছ?' সাধুটি বলে 'হ্যাঁ, আমি তো সেখানেই থাকি।'

—'সেখানে কি আছে?'

—'কি নেই? তুমি যা চাও সব আছে। হীরে, মণি-মাণিক্য, সুন্দর সুন্দর খাবার, গয়না, পোশাক। তাছাড়া ওখানে কখনো অন্ধকার হয় না। সবসময় আলোয় ভরে থাকে। গরমও নেই, ঠান্ডাও নেই, দুঃখও নেই, কষ্টও নেই। সে এক ভারি সুন্দর জায়গা। একবার গেলে আর আসতে ইচ্ছা করে না। তুমি যাবে সেখানে আমার সাথে?' মেয়েটির চোখদুটো আনন্দে ঝিকঝিকিয়ে ওঠে।

—'হ্যাঁ, কিন্তু মা তো আমায় যেতে দেবে না। আর তাছাড়া আমি কি করেই বা যাব?' সাধুটি গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলে 'তোমার মাকে এখন কিছু বলার দরকার নেই। ওখানে থেকে ঘুরে এসে সবাইকে চমকে দেবে। কেমন?' হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে যাওয়ায় মেয়েটি প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, সেই সেখানে ফুল আছে?'

—'হ্যাঁ, কতো ফুল। তুমি ফুল বুঝি খুব ভালবাস?'

—'খুব। আমাদের এই গাছটায় না ভারি সুন্দর শিউলি ফুল ফোটে।' সাধুটি গাছটির দিকে একবার অবজ্ঞাভরে তাকায়, তারপর বলে 'এ আর এমন কি! আমাদের ওখানে এমন সব ফুল আছে যা তুমি চোখে কখনো দেখনি। তবে শুনে রাখো কিভাবে সেখানে যেতে হবে। পূর্ণিমার রাতে আমি তোমাদের ছাঁদে একটা জ্যোৎস্নার সিঁড়ি নামিয়ে দেব, তুমি ওই সিঁড়ি বেয়ে সোজা উঠে চলে যাবে। চাঁদের দেশ পার হলেই আমি তোমাকে নিয়ে নেব। তাহলে আজ চলি, কেমন? কাউকে কিন্তু কিছু বলো না। মনে রেখো, পূর্ণিমার রাতে?' সাধুটি হন হন করে হারিয়ে যায়। যেহেতু শিউলি গাছটির অন্তর্দৃষ্টি মানুষের মতো লোভ লালসার ক্লেদে চাপা পড়েনি সেহেতু সে অচিরেই বুঝতে পারে যে সাধুটি ছদ্মবেশি। আসলে সে এই পৃথিবীর মানুষ নয়। মেয়েটিকে খুব পছন্দ হওয়ায় তাকে তারার দেশে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার তালে আছে। উত্তেজনায় গাছটির শরীর শক্ত হয়ে ওঠে। থর থর করে কাঁপতে থাকে। সমস্ত রাত কাটে

বিনিদ্র। কিছুতেই ভেবে পায়না কি সে করতে পারে। শুধুমাত্র তার মনের একান্ত অমূল্য রতনটি চলে যাবে এই ভেবেই তার সমগ্র অন্তরাত্মা ব্যথায় অবশ হয়ে যেতে থাকে। একের পর এক দিন কেটে যায়। পূর্ণিমা যত কাছে আসে গাছটিও আজকাল আর তার কাছে আসে না। সে তার নতুন দেশের স্বপ্নেই মশগুল।

অবশেষে পূর্ণিমা আসে। মেয়েটি ভোরবেলা থেকেই প্রবল উত্তেজনায় আবেগে ছটফট করতে থাকে। অন্যদিকে সূর্য যতই পশ্চিমদিকে এগোয় গাছটির সব পাতা একে একে ঝরে যায়।

অবশেষে সে এক প্রাণহীন কঙ্কালের মতো একলা দাঁড়িয়ে থাকে। ধীরে ধীরে রাত গভীর হয়। মেয়েটি চুপিসাড়ে বিছানা ছাড়ে। ছাঁদে যায়। আকাশ থেকে নেমে আসে এক অলৌকিক সিঁড়ি। চাঁদের অলোয় গড়া। মেয়েটি পা রাখে সিঁড়িতে, ক্রমশঃ উপরে উঠে যেতে থাকে। স্নিগ্ধ আলোয় শিশিরের মতো ঝলমল করে তার শরীর। সমস্ত ঘটনার নীরব সাক্ষী গাছটি আর পারে না। তার সমস্ত অস্তিত্বকে যেন টান মেরে উপড়ে ফেলতে চায়। সমস্ত হৃদয় এক শব্দহীন আর্তনাদে হাহাকার করে ওঠে। প্রচন্ড যন্ত্রনার কম্পনে তার শরীর ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায় অণুতে পরমাণুতে। নিজের অদম্য ভালবাসা আর ইচ্ছার জোরে সে হয়ে যায় মেঘ, উড়ে যায় মেয়েটির ফেলে যাওয়া পথ ধরে, দাঁড়ায় গিয়ে মেয়েটির সামনে। হঠাৎ মেঘটিকে দেখে মেয়েটি অবাক হয়। বলে একটু সরো। আমাকে তারাদের দেশে যেতে হবে।' মেঘটি সরে না। মেয়েটি আবার বলে—'দয়া করে একটু সরো। আমাকে মায়াবি আলোর দেশে যেতে দাও।' মেঘ কোন উত্তর করে না। কেবল তার শরীর থেকে নিঃসৃত হয় এক পরিচিত তীব্র সুবাস, শিউলি ফুলের। সেই গন্ধে শরীর মন মাতোয়ারা হয়ে যায় মেয়েটির, কেটে যায় সব সম্মোহন। জেগে ওঠে নিজের একান্ত আপন বাড়ি, বাবা-মা, সঙ্গীসাথী এমন কি সেই শিউলি গাছটার স্মৃতিও। আকুল আবেগে সে জড়িয়ে ধরে মেঘরূপী শিউলি গাছটাকে। তার শরীরের তার ভালবাসার উষ্ণতায়, প্রচন্ড তৃপ্তিতে শিউলি মেঘ গলে যায়, টুপটাপ ঝরে পড়ে।

পরদিন সকালে, সকলে ফুল তুলতে এসে অবাক হয়ে দেখে, শিউলি-গাছটা আর নেই। তার জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র শ্বেতশুভ্র শিউলিফুল, তাদের গায়ে অশ্রুজলের মতো বড় বড় শিশিরের ফোঁটা।

সোহাগপুরের জঙ্গল

অবি সরকার
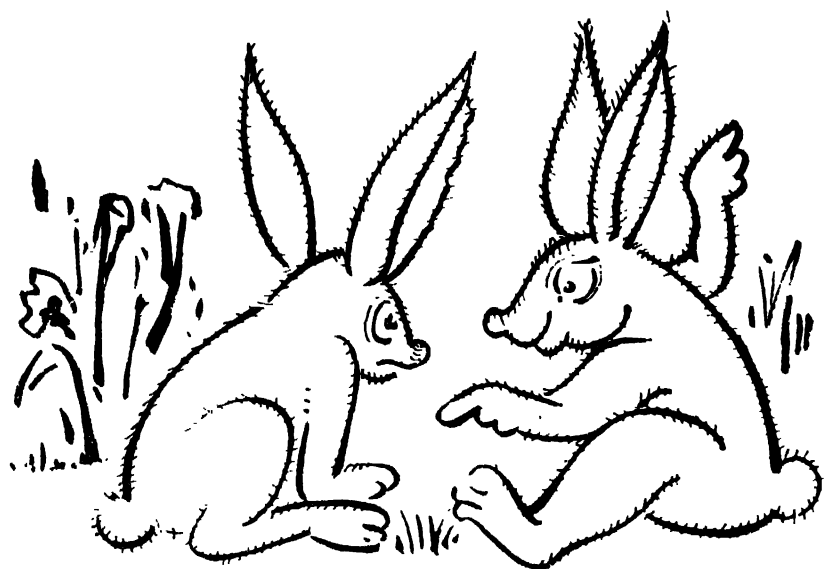
সোহাগপুর জঙ্গলের বাসিন্দারা ছিল তো বেশ ভালোই। সুখে-দুঃখে অভাবে-অনটনে, খেলায়-ঝগড়ায় সারা জঙ্গল গুম-গুম করত। পাখিরা খুনসুটি করত। বাঁদরেরা ভেংচি কাটত। খরগোসরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে কৃষকদের খেতের আলুটা, মুলোটা, বাঁধাকপিটা খেয়ে পেট ভরাতো। সব কিছু বেশ ভালোই চলছিল। সব গোলমাল করে দিল কতগুলি ছোট্ট ছোট্ট ছেলে-মেয়ে বনভোজন করতে এসে। ফুলের মতো ফুটফুটে ছেলেমেয়েগুলো রঙিন জামাকাপড়ে ঝলমল করতে-করতে প্রজাপতির পেছনে ছুটে-ছুটে গান গাইতে লাগল—

'প্রজাপতি, প্রজাপতি,
কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা—'

বড়ো একটা অর্জুন গাছের আড়াল থেকে দুই খরগোসভাই লুকিয়ে দেখছিল এইসব কাণ্ড। প্রথম খরগোস কাঁপছে দেখে দ্বিতীয় খরগোস বলল, 'কাঁপছিস কেন? ভয় পেয়েছিস?' প্রথম খরগোস চেঁচাতে গিয়েও সামলে নিল। হিসহিস করে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ভয়? হুঃ, রাগে,

রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে—। সেই রাগে আমার সারা শরীর কাঁপছে।'

ছেলেমেয়েরা গান গাইতে-গাইতে প্রজাপতির পেছনে ছুটে নদীর দিকে গেল। খরগোসরা বেরিয়ে এসে সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। প্রথম খরগোস হঠাৎ চিৎকার করে বলল, 'সব হিংসুটের দল। তোদের মাথায় ফোঁড়া হোক—' দ্বিতীয় খরগোস দুঃখিত হয়ে বলল, 'সবটাতেই তোর বাড়াবাড়ি। হিংসুটে বলছিস কেন? কি সুন্দর গান গাইছিল ওরা।'

প্রথম খরগোস রেগে বলল, 'গান গাইছিল? হিংসেয় জ্বলছিল।' ওদের গান নকল করে ভ্যাঙালো—'কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা—'। তোরা কোথায় পেলি অমন রঙিন জামা?'

দ্বিতীয় বলল, 'ওদের বাবা-মা দিয়েছে।'

প্রথম হেসে কুটিপাটি—'হ্যাঁ, ওদের বাবা-মা দিয়েছে। তার মানে নকল সাজ! আর প্রজাপতির রঙিন সাজ ওদের নিজেদের। কেউ দয়া করে দেয়নি। চাইতেও যায়নি। তাহলে? তোরা কেন তার খোঁজ করছিস? হাতাবার মতলব। মানুষকে একদম বিশ্বাস করবি না। ওরা হিংসুটে। বলি, প্রজাপতিরা কি তোদের কাছে জানতে গেছে (সুর করে) কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন জামা?'

দ্বিতীয় বলল, 'যাই বলিস ভাই আমার তো মনে হয়, ওরা প্রজাপতি খুব ভালোবাসে—'

প্রথম বিরক্ত হয়ে বলল, 'দূর দূর, মানুষের ভালোবাসা! মানুষের মতো খারাপ জিনিস সারা জঙ্গল খুঁজে পাবি না।'

দ্বিতীয় খরগোস হি হি করে হেসে বলল, 'এটা ঠিক বলেছিস; সারা জঙ্গলেও পাবো না। মানুষ তো আর জঙ্গলে থাকে না।' হঠাৎ কান খাড়া করে বলল—'আবার কারা যেন আসছে। চল, লুকিয়ে পড়ি—

ওরা জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে গেল।

আরেক দল ছেলেমেয়ে ছড়া কাটতে-কাটতে চলেছে—

'আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি
যদু মাস্টার শ্বশুরবাড়ি
রেল কম ঝমা ঝম
পা পিছলে আলুর দম।'

বলতে-বলতে ওদের মধ্যে কেউ-কেউ আছাড় খেয়ে পড়ল। তাই দেখে হিহি, খ্যাখ্যা, চিঁচিঁ করে বেশ কটা বাঁদর গাছ থেকে লাফিয়ে নামল। যারা পড়েছিল তাদের তুলল। তারপর গোদা বাঁদর বলল, 'তোমরা কারা? জঙ্গলে লাফাচ্ছ কেন?'

'—আমরা রাখাল। গরু চরাই, চাষ করি, কাঠ কুড়োই। হাতে সময় থাকলে খেলি—'

শুনে বাঁদরেরা অবাক হল খুব। গোদা বলল, 'আছাড় খেয়ে পড়াটা খেলা? কী কাণ্ড—'

'—ওটা তো মিছিমিছি আছাড় খাওয়া। আমরা ডিগবাজিও খাই, গাছের ডাল ধরে দোল্লা খাই—'

শুনেই কুচো বাঁদরেরা হৈ হৈ করে কেউ ডিগবাজি, কেউ ডাল ধরে দোল্লা খেয়ে এ গাছ সে গাছ করতে লাগল। ছেলেমেয়েরা হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করতে লাগল। কেউ-কেউ নিজেরাও ডিগবাজি খেল।

গোদা বাঁদর বলল, 'বাঃ তোমরা তো বেশ ভালো ছেলেমেয়ে। বড়োরা কিন্তু তোমাদের মতো হয় না। তারা খুব নিষ্ঠুর হয়।

'—তোমাদের মেরেছে?'

'—হাতে মারেনি। ঘরছাড়া করার তালে আছে। গাছ কেটে আমাদের পথে বসাচ্ছে—'

'—আমরা চেষ্টা করব, এটা বন্ধ করার—'

'—ধন্যবাদ।' গোদা বাঁদরের নির্দেশে অন্য বাঁদরেরা জঙ্গলের ভিতরে চলে গেল। গোদা বাঁদর বলল, 'এখানেই থেকো—আবার আসবো।' বলে গাছে-গাছে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। ঝোপের ভিতরে বসে প্রথম খরগোস মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'আদিখ্যেতা। ভিখিরি কোথাকার। দুই গালে দুই থাপ্পড় মেরে বলতে পারতো—তোদের বাবারা গাছ কাটে—তাই মারলাম—'

দ্বিতীয় খরগোস বলল, 'ওমা, ওদের বাবারা গাছ কেটেছে, কে বলল তোকে?'

'—ওদের বাবা না হোক—কারুর তো বাবা তারা—'

'—তাই বলে একজনের দোষে অন্য কেউ শাস্তি পাবে?'

'—তোর যে দরদ উথলে উঠলো! অন্যায় করেছে মানুষ। তাই মানুষের

বাচ্চাকেও শাস্তি পেতে হবে।'

'—বাচ্চারা কখনো অন্যায় করে না। ওরা ফুলের মতো, আকাশের মতো, নদীর মতো—'

হৈ হৈ করে প্রথম দলের ছেলেমেয়েরা আবার এলো। রাখাল-বালকদের দেখে একটু থমকে গেল। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

রাখাল ছেলেমেয়েরাই প্রথম কথা বলল, 'তোমরা বুঝি বনভোজনে এসেছো?'

'—আমরা প্রজাপতির বন্ধু। জঙ্গলের সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারলে ভালো লাগতো। তোমরা কারা?'

'—আমরা রাখাল, মাঠে-মাঠে ঘুরি।'

'—আমরা প্রজাপতির মতো উড়ি। দেখবে?' বলেই ওরা প্রজাপতির মত ডানার বদলে হাত নেড়ে নাচল। অনেক প্রজাপতি এসে ওদের মাথার উপর উড়তে লাগল। সে এক দারুণ দৃশ্য। রাখাল বালকরা বলল, 'তোমরা পাখি হতে পারো?'

ওরা পাখির ভঙ্গিতে ওড়াউড়ি করল, তারপর থেমে বলল, 'আমরা ফড়িং হতে পারি, মেঘ হতে পারি, এরোপ্লেন হতে পারি—। তোমরা কী পারো?'

রাখালরা বলল, 'আমরা গরু চরাতে পারি, কাঠ কুড়োতে পারি, ফসল ফলাতে পারি—'

স্কুলের ছেলেমেয়েরা জানতে চাইল—'ফসল কী ভাই?'

রাখালরা সুর করে, পালা করে বলে গেল,

'বীজ লাগালে গাছ
গাছের থেকে ধান
ধানের থেকে চাল
চালের থেকে মুড়ি
আমরা ইচ্ছেমতো ঘুরি।'

প্রথমদলের ছেলেমেয়েরা বলল, 'গাছে ফুল ফোটে না?'

ওরা আবার পালা করে বলল, —'ফোটে, গাছে ফোটে ফুল।

ফুল থেকে ফল
ফল থেকে বীজ
বীজ থেকে গাছ।'

এই সময় একটা শালিখ পাখি এসে গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করল, '—কী নিয়ে শোরগোল?'

দ্বিতীয় দল বলল, 'গাছ-ফুল-ফল।'

শালিখ বলল, 'তোমরা গাছকে ভালোবাসো? বন্ধু?'

দ্বিতীয় দল বলল, 'গাছ তো কথা বলতে পারে না। বন্ধু হবে কেমন করে?'

প্রথম দল বলল, 'আমরা কিন্তু সবার বন্ধু। গাছ, ফুল, পাখি, প্রজাপতি, জন্তু—'

শালিখ বিজ্ঞের মতো বলল, 'শুনে খুশি হলাম।'

দ্বিতীয় দল বলল, 'ওরা বলছিল, গাছে নাকি আর ফুল ফোটে না।'

শালিখ বলল, 'ফুটবে, ফুটবে। ভালোবাসলেই ফুটবে। তোমাকে ভালোবাসলে তোমার আনন্দ হয় তো?'

'—খুব। আনন্দে তখন নাচতে ইচ্ছে করে।'

'—প্রজাপতি হয়ে উড়ে যেতে ইচ্ছে হয়?'

'—এমনি করে প্রজাপতি ওড়ে।' উড়ে দেখাল।

'—তা হলেই দ্যাখো, ভালোবাসলে কতো কি হতে পারে—আর গাছে ফুল ফুটবে না?'

'—আমাদের হারিয়ে যেতেও খুব ইচ্ছে করে—'

'—তা বাধা দিচ্ছে কে? হারিয়ে গেলেই হয়।'

'—তোমাদের তো ডানা আছে। আমাদের নেই—'

'—ডানার দরকার কী। ভেবে নিলেই হল, তুমি উধাও হয়ে যাচ্ছ, মেঘের সঙ্গে, চিলের সঙ্গে—'

ওদের হঠাৎ মনে পড়ে গেল স্কুলে শেখা গানটা ঃ

'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা—'

ওরা দল বেঁধে নাচল, গাইল। সেই বাঁদরের দল শুকনো গাছের ডালের

বোঝা নিয়ে এলো। মাটিতে নামিয়ে রেখে ওরাও নাচল ওদের সঙ্গে। তারপর যে যেদিকে যাবার চলে গেল। কলকাকলিতে মুখরিত জঙ্গল নীরব হয়ে থমথম করতে লাগল। যেন মৃত্যুপুরী!

ঝোপের পাশ থেকে বেরিয়ে সেই খরগোসদুটো দেখলো চারদিক। প্রথম খরগোস বলল, 'ভালোবাসার এত গুণ?'

দ্বিতীয় খরগোস বলল, 'আগেই তো বলেছিলাম—ওরা ভালোবাসতে জানে। চারদিকে ভালো করে চেয়ে দ্যাখ—এই জঙ্গলের সব পশু-পাখি জড়ো হয়ে অবাক চোখে ওদের দেখছিল। আনন্দে ওদের মুখগুলি কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।'

প্রথম খরগোস বলল, 'বড়ো মানুষদের শেখা উচিত। বড়োরা খুব হিংসুটে হয়।'

'—তুই একটু ভালোবাসতে শেখ। নজরটা একটু উঁচু কর। দেখবি পৃথিবীটা কত সুন্দর।'

প্রথম খরগোস খিঁচিয়ে উঠলো—'মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করিস নে তো। চল গাজর খেতে যাই—'

বাঁদররা হঠাৎ ওদের দিকে চেয়ে খিঁচ-খিঁচ করে হেসে জঙ্গলের ভিতরে চলে গেল।

খরগোসদুটো ছড়া কাটতে-কাটতে গাজর খেতের দিকে চলল ঃ

আমরা দুটি ভাই
গাজর খেতে যাই
আলু মূলো বাঁধাকপি
যখন যেটা পাই
যাবার আগে বলছি শোনো—
রাগ রেখোনা মনে কোনো
তোমার কাছে আমরাও যে
ভালোবাসা চাই।

ইস্টিশনের ফুলি

কার্তিক ঘোষ

ইস্টিশনের কাছেই থাকে ফুলিরা। ফুলিরা বলতে ফুলি আর ওর মা। না। বাবা নেই ওর। কোন ছোটবেলায় যে বাবাকে ও হারিয়েছে সেসব কথা এখন আর কিছু মনে পড়ে না ফুলির।

তবে বাবা না থাকুক, বাবার নিজের হাতে বসানো কদম গাছটা দিব্যি বড়ো হয়েছে এখন। গাছটাই যেন সবসময়ের বন্ধু ফুলির। ফুলিদের দরমা-দেওয়া ছোট্ট ঘরটার সামনেই তো দাঁড়িয়ে থাকে গাছটা। মা বকা-ঝকা করলে চোখ ডবডবিয়ে ফুলি তো গাছটাকেই জড়িয়ে ধরে আগে।

গাছটাও যেন কেমন!

ফুলি একটু কাঁদলেই গোটা গাছটা যেন কেমন হু হু করে কেঁদে ওঠে হাওয়ায়-হাওয়ায়। আবার ফুলি একটু হাসলেই পাতায়-পাতায় ঝিরিঝিরি করে গাছের তখন কী হাসি!

ফুলির মা অবশ্য এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না কখনো। মেয়েকেও বোঝায়।

—গাছটা কিন্তু আমাদের নয় ফুলি। এসব রেলবাবুদের। কবে বলতে

কবে কেটে নেবে তার ঠিক নেই!

শুনেই তো ফুলির মুখটা শুকিয়ে যায়।

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে গাছটার দিকে। ভাত খেতেও ভালো লাগে না তখন। দুপুরবেলায় মেল গাড়িটা যখন ইস্টিশন কাঁপিয়ে চলে যায় তখনই বাবার জন্যে কেমন হু হু করে ওঠে মনটা।

ইস! বাবা থাকলে নিশ্চয়ই গাছটা কাটতে দিত না কাউকে।

কিন্তু মা কী করবে একলাটি!

বাবা নেই বলেই তো কোন ভোরে উঠে মাকে কাজ করতে যেতে হয় রেলবাবুদের বাড়ি-বাড়ি। ফুলিকেও চেয়েছিলেন কেউ-কেউ। খাওয়া-থাকা ছাড়াও জামা-কাপড়, মাসে-মাসে কিছু টাকা।

কিন্তু না। মায়ের মতোই কদম গাছটাও যেন রাজি নয় এ কথায়।

গাছ তো কথা বলতেই পারে না। তাই কখনো ডাল নেড়ে, পাতা নেড়ে না-না-যাস না-বলে ইসারা করেছে ফুলিকে।

ফুলিও কী কম চালাক। সাততাড়াতাড়ি গিয়ে ভর্তি হয়ে এসেছে ইসকুলে।

ফুলির এখন অনেক পড়া। অনেক বই।

কদম গাছটারও খুব খুশি। দরমা-ঘরের একটুকরো জানলা দিয়ে দেখে, ফুলি কেমন নিজের নাম লিখছে খাতায়! ছবি আঁকছে রেলগাড়ির। কিন্তু গাড়ির জানলা দিয়ে কার মুখ ওটা? চওড়া গোঁফের ফাঁকে মুচকি একটু হাসি!

ওমা! ও আবাক কী! এই ছবিটা এঁকেই কি না চোখদুটো ডবডবিয়ে ওঠে ফুলির!

মা কিছু বুঝতেই পারে না। কিন্তু কেমন যেন হঠাৎ মন-মরা হয়ে যায় কদম গাছটা। পাতা-টাতা কিচ্ছু নড়ে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ফুলির মা তো অতশত বুঝতে পারে না। তাই বলে, আ মলো, আজ আবার একটুও হাওয়া নেই গাছটায়! কাঠ হয়ে কেমন দাঁড়িয়ে আছে দেখছিস?

কিন্তু গাছটাও সব বোঝে।

বলতে কী, গরমে একটু কষ্ট হবার উপায় নেই ফুলির। ফুরফুর করে

রাতদিন ফুলিকে হাওয়া করে কদম গাছটা। বৃষ্টির দিনে ঝামড়ি-ঝুমড়ি পাতার আড়াল দিয়ে রাখে ওদের ঘরের ওপর। ঝড়ের দিনেও যেন বুক চিতিয়ে আড়াল করে রাখে ফুলিদের। আর রোদ উঠলে তো কথাই নেই! ফুলির জন্যে মিষ্টি একটুখানি ছাওয়া ছড়িয়ে রাখে তলায়। কাজ থেকে ফিরে ফুলির মা-ও সেই ছায়ায় বসে একটু জিরোয়।

তা এমনি করেই একদিন আরও একটু বড়ো হয়ে যায় ফুলি।

মায়ের কাছে রান্না শেখে। বান্না শেখে। এক-একদিন কুটনো কাটে ফুলি। রঙিন সুতোর ফুল তোলে বালিশের ঢাকায়।

মা একদিন কিনে নিয়ে আসে দু'ছড়ি উল। উল বোনার কাঁটা।

সব নিয়ে গাছের কাছে ছোটে ফুলি। হাসতে-হাসতে বলে, ও গাছ—গাছ, এবার শীতে তোমার জন্যে তৈরি করে দেব একটি টুপি। কেমন!

কিন্তু সময় হল না আর।

ইস্টিশনের বাবুরাই একদিন ডেকে পাঠালেন ফুলির মাকে। ওঁরাই সবাই ঠিক করলেন চাঁদা তুলে। হ্যাঁ। আচমকাই কি না ঠিক হয়ে গেল ফুলির বিয়ে। ফুলির বর নাকি গাড়িতে-গাড়িতে ঘুরে বিক্রি করে যত রাজ্যের বই। বাপ-মা বলতে কেউ কোথ্থাও নেই তার।

তবু ফুলি ডুকরে উঠল শুনে। না। না। এই গাছ আর মাকে ছেড়ে কোথ্থাও যাবে না সে। কিছুতেই না। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল গাছটাকে।

গাছ যেন ছোট্ট একটা ডাল বাড়িয়ে একটু আদর করে দিলো ফুলিকে। তবু যেন কান্না থামে না ফুলির। মা বললে, ওমা, কাঁদছিস কেন? আমি তো তোর কাছেই থাকব!

দেখতে দেখতে বিয়ের দিনটাও একদিন এসে গেল।

সকাল হতেই ফুলি আর ফুলির মা তো হাঁ। কী আশ্চর্য! কদম গাছটার ডালে এত ফুল ফুটল কখন! গন্ধে যে ভুরভুর করছে গোটা ইস্টিশন।

ফুলির মা তো আনন্দে একেবারে আটখানা। সত্যি! কী কপাল ফুলির! ফুলের বাহারে গাছটাকে যেন চেনা যাচ্ছে না আর। তবু বিয়েবাড়ি বলে কথা। আশপাশের বউ-ঝিরা সবাই এসে পড়ল হই-হই করে। তারা কেউ গেঁথে ফেললে কদমফুলের হার, কেউ গাঁথলে বাউটি, কেউ একটা কদম

ফুলের মুকুট করে ফুলিকে সাজিয়ে দিলে।

সন্ধেবেলা আধখানা একটা চাঁদও উঠল আকাশে।

ঝরনার মতো ঝুরঝুর করে একটু জোছ্‌নাও ঝরে পড়ল ফুলির মাথায়। আর তার ফাঁকেই কখন বিয়ে হয়ে গেল ফুলির। বরযাত্রীরা সবাই বাড়ি ফিরল একটা করে কদম ফুল হাতে নিয়ে।...

তারপর?

তারপর আর কী?

এই গল্পের শেষটুকু না বললেই নয়।

হ্যাঁ।

ইস্টিশনের কাছেই এখন বই-খাতার একটা দোকান দিয়েছে ফুলির বর। টালির ছাওয়া দেড়খানা ঘর নিয়েছে ভাড়ায়। একসঙ্গেই থাকে ফুলির মা। ফুলিও আবার ভর্তি হয়েছে বড় ইসকুলে!

আর সেই গাছটা?

রেলবাবুরাই বাঁধিয়ে দিয়েছেন তার গোড়া।

বাবার জন্যে মনটা একটু খারাপ হলেই এখনও ফুলি সেখানে গিয়ে বসে থাকে। কখন-সখনও কদমগাছটার গায়ে হাত বুলোয়।

গাছটাও তখন খুশিতে এমন ডগমগ করে কী বলব!

নিঝুমপুরীর কান্না

হিমাংশু সরকার
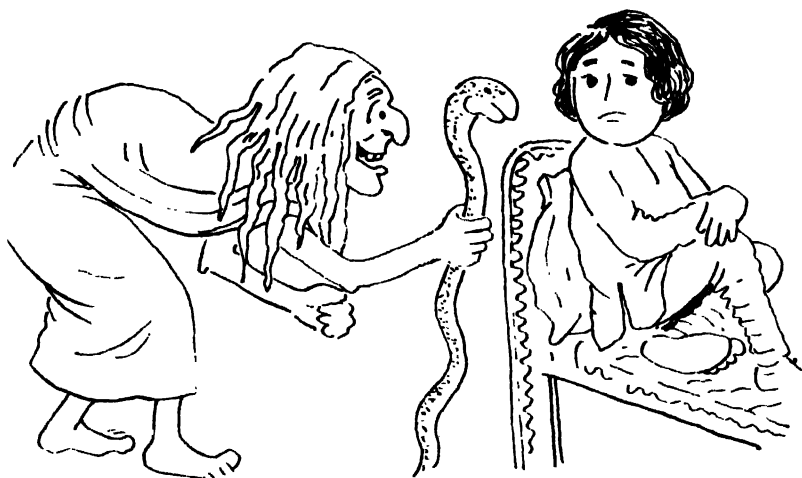
নিঝুমপুরীতে এই এক অশান্তি। রাত দুপুরে কে যেন কাঁদে। ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতেই থাকে সারা রাত। প্রথম প্রথম সবাই খোঁজ খবর করতো। এখন আর কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামায় না।

নিঝুমপুরের রাজকুমারের খুব ভয় হত এই কান্না শুনে। রাতের আঁধারে বাতাসে বাতাসে ঘুরে বেড়াত কান্নার সুর। সোনার পালংকে মায়ের কোলে শুয়েও ভয়ে কেঁপে উঠত রাজকুমারের বুক। বলতো, মা-এত রাতে কে কাঁদে? রানীমা বলতেন, ও আমাদের মালী বউ।

কেন কাঁদে মা?

ওর মেয়েকে যে ডাইনী ধরে নিয়ে গেছে।

ডাইনী কেন ধরে নিয়ে গেল?

ডাইনীরা অমনই হয়। ভারী দুষ্টু হয় ওরা।

আমার ভয় করে।

ভয় কি। তুমিতো আমার কাছেই রয়েছো।

মালী বউ যে কাঁদে।

কাঁদুক। তুমি ঘুমোও। বলে রাজকুমারের পিঠ চাপড়াতেন রানীমা। কখন বা মিহি সুরে খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো গান গাইতেন তিনি। রাজকুমার সেই গানের তালে তালে ঘুমিয়ে পড়তো এক সময়।

এমনি করে কেটে গেল অনেকগুলি বছর। রাজামশাই বুড়ো হয়ে এলেন। রানীমার চুলে পাক ধরলো। মালী বউয়েরও বয়স বাড়লো। কিন্তু তখনো কান্না থামলো না তার। প্রতিরাতে মেয়ের শোকে দাওয়ায় বসে কাঁদতো সেই মালী বউ।

একদিন রাজকুমার নিজেই এলো মালী বউয়ের কাছে। বলল, মালী বউ, প্রতিরাতে তুমি এমন করে কাঁদ কেন?

মালী বউ বলল, আমার মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে এক দুষ্টু ডাইনী। আমি সেই দুঃখে কাঁদি।

রাজকুমার বলল, সেতো কতকাল আগের কথা। আমি ছোটবেলায় শুনেছি এ গল্প। এখন এতদিন পর আর কেঁদে কি লাভ? সেতো আর ফিরবে না।

মালী বউ বলল, ও কথা বলো না রাজকুমার। ও কথা বলো না। আমার এ কান্না একদিন না একদিন ঠিক তার কানে পৌঁছবে। তখন ঠিক সে ফিরে আসবে।

সে কি এখনো বেঁচে আছে?

রাজকুমারের কথা শুনে কান্নার বেগ বেড়ে গেল মালী বউয়ের। ফুলে ফুলে কাঁদল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, আমি মা। আমার মন বলছে সে ঠিক বেঁচে আছে।

তাহলে ঘরে বসে এমনি কান্নাকাটি না করে তার খোঁজ করছো না কেন?

সে যে অনেকদূরের পথ। যেতে ছ মাস আসতে ছ মাস। এতদূরে যাবার শক্তি তো আমার নেই। তাই বসে বসে কাঁদি।

যেতে ছ মাস আসতে ছ মাস! বেশ বললে বটে। এতই যখন জানো তাহলে বল দেখি সে জায়গাটার নাম কী?

মালী বউ বলল, ডাইনী পাহাড়। ডাইনী পাহাড়ের রত্ন গুহায় থাকে ডাইনী বুড়ি। সেখানেই লুকিয়ে রেখেছে আমার মেয়েকে।

রাজকুমার বলল, দেখ মালী বউ, যদি সত্যি সত্যি তোমার মেয়ে বেঁচে থাকে ঠিক তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারবো। আর যদি কথা মিথ্যে হয় তাহলে তোমাকে শুলে চড়াব।

মালী বউ আনন্দে লাফিয়ে উঠলো রাজকুমারের কথা শুনে। বলল, তাই হবে বাবা, তাই হবে। আমার কথা মিথ্যে হলে আমাকে শুলেই চড়িও। তবু তুমি একবার খোঁজ নিয়ে দেখ।

রাজকুমার বলল, আর একটা কথা।

মালী বউ বলল, বল।

রাজকুমার বলল, আমি কালই বেরোব তোমার মেয়ের খোঁজে। আমি যতদিন না ফিরে আসি ততদিন তুমি আর কান্নাকাটি করতে পারবে না। আর কেউ আমার খোঁজ খবর জানতে চাইলে কাউকে তা বলতেও পারবে না।

মালী বউ বলল, বেশ তাই হবে। আজ থেকে আমি আর কাঁদবো না বাবা। বলে কান্না থামিয়ে মালী বউ শুতে গেল ঘরে। আর সেই নিশুতি রাতে রাজকুমার ফিরে এল রাজবাড়িতে।

পরের দিন রাতে কাউকে কিছু না বলে রাজকুমার বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। রাজবাড়িতে তখন খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছে সবাই। রাজা রানী সেপাই সান্ত্রী কেউ টেরও পেলো না রাজকুমার কখন রাজপুরী ছেড়ে পথে নেমে পড়েছে। টগবগিয়ে ছুটে চলেছে কোন অজানার উদ্দেশ্যে।

সারারাত ছোটার পর ভোরের দিকে ক্লান্ত হয়ে এল তার ঘোড়া। একটু বিশ্রাম নেবে বলে থমকে দাঁড়াল এক বিশাল বটগাছের তলায়। ঘোড়া থামতে নীচে নেমে এল রাজকুমার। তার শরীর তখন ক্লান্ত। ভাবল ঘোড়াটা যখন বিশ্রাম চাইছে তখন ভালই হয়েছে। এই ফাঁকে তারও একটু বিশ্রাম হয়ে যাবে। এই না ভেবে হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়ল সে বট তলায়।

একটু একটু আলো ফুটছে তখন আকাশে। একটা দুটো পাখির কিচির মিচির শোনা যাচ্ছে এদিক ওদিক। শিরে শিরে বাতাস বয়ে চলেছে বটপাতার গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে। বাতাসে হিমেল আমেজ। ক্লান্ত রাজকুমার সেই হিমেল আমেজে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময় সেই বটতলাতেই।

যখন ঘুম ভাঙলো তখন ভয়ে বিস্ময়ে তার মুখ দিয়ে আর কথা সরে না। কোথায় সেই বট তলা, কোথায় তার সে ঘোড়া? রাজকুমার দেখল

সে শুয়ে আছে আশ্চর্য সুন্দর এক রাজপ্রাসাদে। তখনো রাত। মাথার কাছে সোনার প্রদীপে জ্বলছে ঘিয়ের বাতি। সেই বাতির আলোয় ঝলমল করছে তার শয়নকক্ষ। দুধের মত সাদা নরম তার বিছানা। রাজকুমার কিছুতেই ভেবে পেলো না এ কী করে সম্ভব। সেতো বিশ্রাম করবে বলে বসে ছিল এক বটগাছ তলায়। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তার ঘোড়াটাও। সে ঘোড়াটাই বা কোথায় গেল আর সে নিজেই বা এখানে এলো কেমন করে? তাছাড়া তখনতো ছিল ভোর। সবে আলো ফুটছে তখন। অথচ এখন অনেক রাত। তবে কি সে সারাদিন ঘুমিয়ে ছিল? তা কি সম্ভব? রাজকুমার ঘটনার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে না পেরে হাঁ হয়ে গেল সেই বিছানায় বসে বসেই।

অনেকক্ষণ পর বিস্ময়ের ঘোর কিছুটা যেন কাটল তার। খুট করে আওয়াজ হল একটা। দরজা খুলে গেল তার শয়ন কক্ষের। কুঁজো এক বুড়ি লাঠি টুক টুক করে সামনে এল তার। তারপর একগাল হেসে বলল, ঘুম হল বাছা?

রাজকুমার অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল সেই বুড়িকে। তারপর মাথা হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ।

বুড়ি বলল, তাহলে এবার খেয়ে নাও বাছা। আমি খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বুড়ির হাসি, চলন বলন ভাল লাগেনি রাজকুমারের। তাই বলল, আমি খাব না। আমার খিদে নেই।

বুড়ি বলল, কিন্তু আমার যে খিদে আছে বাপধন ।

রাজকুমার বলল, তোমার খিদে আছে তুমি খেয়ে নাও।

বুড়ি এবার হাসল হ্যা হ্যা করে। বলল, আমার খিদে আছে বলেইতো তোমায় খেতে হবে বাপধন।

রাজকুমার বুড়ির কথার অর্থ বুঝতে না পেরে বলল, তার মানে?

বুড়ি বলল, মানে বুঝে আর তোমার কাজ নেই বাছা। যা বলছি শোন। আমি তোমার খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি খেয়ে নিও। বলে যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎই আবার লাঠি ঠুক ঠুক করে চলে গেল ঘর ছেড়ে। ড় চলে যেতে অদ্ভুত সুন্দর এক লাল রংয়ের বাঁদর ছানা এল থালায় করে

খাবার নিয়ে। বাঁদর খাবার নিয়ে আসায় আবার বিস্মিত হল রাজকুমার। এ কেমন রাজপুরী! এখানে শাসন করে কুঁজো বুড়ি। খাবার নিয়ে আসে বাঁদর ছানা! এ সত্যি! না স্বপ্ন! রাজকুমার নিজের গায়ে নিজেই চিমটি কাটল। বুঝল এ স্বপ্ন নয়। সে জেগেই আছে। যা দেখছে সবই সত্যি। তাহলে?...

রাজকুমারের বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে বাঁদরটা মুখ কাচু মাচু করে কী যেন বলতে চাইল একবার, তারপরই চারদিকে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ কী দেখে ভয় পেয়ে যেন এক লাফে চলে গেল ঘরের বাইরে। বাঁদরটা চলে যেতে ঘরের চারদিকে তাকাল রাজকুমার। সে ভেবে পেল না বাঁদরটা হঠাৎ কী দেখে এমন ভয় পেয়ে পালাল। চারদিকের দেওয়াল সোনা রূপোয় মোড়া। ঘরের দরজা জানলাগুলি পর্যন্ত মণি মুক্তোয় গড়া। ভয় পাওয়ার মত তো কোথাও কিছু নেই। তাহলে... ভাবনায় বাধা পড়ল রাজকুমারের। ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ এল তার কানে। জানলার দিকে চোখ গেল তার। দেখল সেখানে চুপচাপ বসে আছে একটা বিশাল আকারের চামচিকে। লাল চোখ দুটো তার অবিরত ঘুরছে এদিক ওদিক। এতক্ষণে রাজকুমার বুঝতে পারল বাঁদরছানার ভয় পাওয়ার কারণটা। কিন্তু এমন সুন্দর একটা ঘরে ওই কুচ্ছিত চামচিকে কোথা থেকে, কেনই বা এল তা ভেবে ভেবেও বুঝতে না পেরে একসময় খাবার থালাটা টেনে নিল সামনে। তারপর খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ল আবার।

এবার কিন্তু শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর ঘুম এলো না। হাজার ভাবনায় ঘুরপাক খেতে লাগল তার মন। এ কেমন দেশ! এ কেমন রাজপুরী! সারা প্রাসাদ জুড়ে এত মণি মানিক্যের ছড়াছড়িই বা কেন! এই কি তবে সেই ডাইনী বুড়ির দেশ! কিন্তু তা কি করে সম্ভব?... মালী বউ বলেছিল সে ছ মাসের পথ। তাহলে?... ভাবতে-ভাবতে অনেক রাত কেটে গেল তার। একসময় মনে হল চামচিকে যেন আবার ডানা ঝাপটাচ্ছে। রাজকুমারের চোখ গেল জানলার দিকে। দেখল চামচিকে এবার ঘরের চারদিকে একপাক ঘুরে চলে যাচ্ছে বাইরে। আর চামচিকেটা চলে যেতেই সেই নিঝুম নিশুত রাতে টুক টুক করে ফিরে এল আবার লাল বাঁদরছানাটা। ঘরের ভেতর ঢুকে আগের মতই ভয়ে ভয়ে একবার চারদিকে তাকাল সে। তারপর কোথাও কাউকে দেখতে না পেয়ে সোজা এগিয়ে এল রাজকুমারের কাছে।

এসে ডাকল, রাজকুমার, রাজকুমার—

রাজকুমার তো জেগেই ছিল। তাই সাড়া দিল বাঁদরের ডাকে। বলল, কী?

বাঁদরছানা বলল, তুমি পালিয়ে যাও রাজকুমার। কাল রাতেই ডাইনী বুড়ি তোমায় খাবে।

রাজকুমার অবাক হয় বাঁদরের কথা শুনে। বলল, খেলেতো আজই খেতে পারতো, কাল কেন?

বাঁদর বলল, আজ খেয়েছে তোমার ঘোড়াটা। তাই আজ বেঁচে গেছ তুমি। কাল তোমার পালা। কালতো পূর্ণিমা।

পূর্ণিমা তো কী হয়েছে?

পূর্ণিমায় মানুষ পেলে ডাইনী তাকে পুড়িয়ে খায়।

আর অন্যদিন পেলে?

এই আমাদের দশা করে রেখে দেয়।

তোমাদের দশা মানে? তুমি কে? বাঁদর নও?

না রাজকুমার। আমি বাঁদর নই। ডাইনী মন্ত্র পড়ে আমাকে বাঁদর বানিয়ে রেখেছে। কাউকে ছাগল বানিয়েছে। কাউকে পাখি বানিয়েছে। কাউকে বা চামচিকে।

চামচিকে? আমার ঘরে যে চামচিকেটা বসেছিল সেও তবে মানুষ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তবে যে ওকে দেখে তখন তুমি পালিয়ে গেলে?

ওর কাজ তোমায় পাহারা দেওয়া। নতুন কাউকে ধরে আনলে ডাইনী ওকে পাহারায় বসায়। ও ভারী দুষ্টু।

ও? তাহলে এই সেই ডাইনী বুড়ির প্রাসাদ?

হ্যাঁ।

তাহলে আমি এখান থেকে পালাবো কী করে? এখানকার পথ ঘাটতো আমি চিনি না।

আমিও ঠিক চিনি না। তবে ফুলপাখি চেনে। সেতো পাখি। এখানে ওখানে উড়ে উড়ে বেড়ায়। তাই পথ ঘাট বোধ হয় সে জানে। তাকে বলেছি তোমার কথা। সে এখনি আসবে তোমায় দেখবে।

বাঁদরের কথা শেষ হতে না হতেই মিষ্টি একটা ফুলের গন্ধে ঘর ভরে গেল। রাজকুমার তাকিয়ে দেখল খুব সুন্দর একটি পাখি এসে বসল তার খাটের পাশে। সারা শরীরে তার হলদে কালোয় ফুল আর লতা-পাতা আঁকা। এমন অদ্ভুত সুন্দর পাখি সে জীবনে কখনো দেখেনি। তাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সেই পাখির দিকে।

ফুলপাখি রাজকুমারের অবাক চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, আমায় দেখে অবাক হচ্ছো? আমিও তোমার মত মানুষই ছিলাম। খুব ছোটবেলায় আমায় চুরি করে নিয়ে আসে ডাইনী বুড়ি। তারপর পাখি বানিয়ে রেখে দিয়েছে এই ডাইনী পাহাড়ে। এই লালমুখো বাঁদরও আসলে মানুষই।

রাজকুমার বলল, কিন্তু এসব হচ্ছে কেন?

ফুলপাখি বলল, জানি না। তবে যাই হোক না কেন, আমরাতো প্রাণে বেঁচে আছি। তোমার কিন্তু সে আশাও নেই। কালই তোমায় মেরে ফেলবে এই দুষ্টু ডাইনী বুড়ি। তাই বলতে এলাম, তুমি এখনি পালাও এ দেশ ছেড়ে।

কেমন করে পালাব, আমি তো পথ ঘাট চিনি না।

আমি দেখিয়ে দেব পথ ঘাট।

কিন্তু আমার ঘোড়াটা কোথায় তাও তো জানি না।

ঘোড়াটা আর বেঁচে নেই। ঘোড়ার মাংস খেয়ে ডাইনী এখন আরাম করে ঘুমোচ্ছে। এই ফাঁকে যতদূর সম্ভব পালিয়ে যাও।

রাজকুমার এতক্ষণে যেন বুঝতে পারল তার বিপদের কথাটা। যদি বাঁদরের কথা, ফুলপাখির কথা সত্যি হয় তাহলে এখনই পালাতে হবে তাকে এ প্রাসাদ ছেড়ে। কিন্তু বাঁদরকে, ফুলপাখিকে এ ভাবে দুষ্টু ডাইনীর কাছে ফেলে রেখে পালিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে? ফুলপাখিকে বলল সে কথা।

ফুলপাখি বলল, আমাদের এ ভাবে নিয়ে গেলে লাভ কি হবে। আমরাতো আর মানুষ হতে পারবো না।

রাজকুমার বলল, কোন উপায় নেই?

বাঁদর বলল, উপায় একটা আছে। তবে সে বড় কঠিন।

হোক কঠিন। বল সে কী উপায়?

ডাইনীর বাঁ হাতে বাঁধা আছে একটা বড় তাবিজ। সেই তাবিজে পোরা আছে মন্ত্র লেখা কাগজ। সেই কাগজ দেখে মন্ত্র পড়ে জল ছিটোলে

আমরা আবার মানুষ রূপ ফিরে পেতে পারি। কিন্তু সে বড় কঠিন কাজ। ডাইনীকে বধ করা সহজ নয়।

রাজকুমার বলল, যত কঠিন কাজই হোক। আমি এখনই তাকে বধ করব। সে কোথায় শুয়ে ঘুমিয়ে আছে দেখিয়ে দাও।

বাঁদর বলল, চল আমার সঙ্গে। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

বাঁদরের পেছন পেছন চলল, রাজকুমার আর ফুলপাখি। এ ঘর সে ঘর করে করে অনেকগুলি ঘর পেরোল তারা। তারপর একসময় এল অন্ধকার এক উঠোনে। উঠোনের ওপারে ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। কিছুদুর উঠে এক অন্ধকার গুহা। ডাইনীর ঘুমোবার জায়গা। বাঁদর সেদিকেই নিয়ে চলেছে ফুলপাখি আর রাজকুমারকে। কিন্তু উঠোন পেরোতে না পেরোতে সেই অন্ধকারে কিচ কিচ করতে করতে ছুটে এল ইঁদুর ছানা। বলল, রাজকুমার অন্ধকারে কোথায় চলেছ তোমরা?

বাঁদর বলল, ডাইনীর খোঁজে।

ওখানে গেলে লাভ হবে না।

কেন? ওই অন্ধকার গুহাতেইতো ডাইনী ঘুমোয়।

তা ঘুমোয় বটে। কিন্তু ডাইনীকে মারতে হলে ওখানে গেলে হবে না।

রাজকুমার অবাক হল ইঁদুরছানার কথা শুনে। বলল, তুমি কে ভাই? তোমার কথাতো ঠিক বুঝতে পারছি না।

ইঁদুরছানা বলল, আমিও মানুষ ছিলাম। বহু বছর হল ডাইনী আমায় ধরে এনে ইঁদুরছানা করে রেখেছে। সেই থেকে আমি চাই ডাইনী বুড়ির মরণ। কিন্তু এখনতো আমি আর মানুষ নেই, তাই কিছুতেই কিছু করে উঠতে পারছি না। রাজকুমারকে দেখে বুঝেছি সে কি করতে চলেছে। তাই ভাবলাম একটু সাহায্য করি।

রাজকুমার বলল, তুমি বলতে পার ডাইনীকে কি ভাবে বধ করা যাবে?

হ্যাঁ। ডাইনীকে বধ করার জন্য ডাইনীর কাছে যাবার দরকার নেই। তোমরা আমার সঙ্গে চল। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কী করতে হবে।

ইঁদুরের কথা শুনে তার পেছন পেছন চলল বাঁদর ছানা, ফুলপাখি আর রাজকুমার। ইঁদুরছানা কিছুদূর গিয়ে একটা গর্ত দেখিয়ে বলল, এই গর্তে বাস করে এক বিষধর কেউটে সাপ। আগে বধ কর এই সাপটাকে।

তারপর সেই সাপের রক্ত ছিটিয়ে দাও ডাইনী বুড়ির গায়ে। দেখবে ঘুমের মধ্যেই মরে পড়ে থাকবে বুড়ি।

সবাই মিলে তখন গর্ত থেকে খুঁচিয়ে বার করল সেই সাপকে। তারপর পাথর দিয়ে থেঁতলে মেরে ফেলল তাকে। সাপের রক্ত নিয়ে ছুটল বাঁদরটাই সবার অগে। ছিটিয়ে দিয়ে এল ডাইনী বুড়ির গায়ে। আর কী আশ্চর্য! ইঁদুরের কথাই সত্যি হল তখন। ডাইনী বুড়ি সত্যি সত্যি ঢলে পড়লো মৃত্যুর কোলে।

রাজকুমার অবাক হয়ে গেল এসব দেখে শুনে। বলল, ইঁদুর ভাই, তোমার কথাই সত্যি হল দেখছি। তুমিই আজ আমাদের প্রাণে বাঁচালে।

ইঁদুরছানা বলল, এখন এসব কথা বলার সময় নয় রাজকুমার। ডাইনী বুড়ি মরল বটে কিন্তু বিপদ এখনো কাটেনি। কাল তোমায় পুড়িয়ে খাবে বলে ডাইনী বুড়ি তার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে এসেছে আজ। সকাল হলেই তারা সব আসবে খেতে। তখন কাউকে আর বাঁচতে হবে না। রাত শেষ হয়ে আসছে। সকাল হতে আর বেশি দেরী নেই। যা করার তাড়াতাড়ি কর।

ইঁদুরছানার কথা শেষ হতে না হতেই বাঁদরছানা এক লাফে ডাইনী বুড়ির হাত থেকে ছিঁড়ে নিয়ে এল সেই তাবিজ। ঘসে ঘসে খুলে ফেলল তাবিজের মুখ তারপর ভেতর থেকে টেনে বার করল মন্ত্র লেখা সেই কাগজ।

রাজকুমার কাগজের মন্ত্র পড়ে অবাক! একদিকে লেখা কেমন করে মন্ত্র পড়ে জল ছিটিয়ে ইচ্ছে মতন পশুপাখি করে দেওয়া যায় মানুষকে। আবার কাগজের অন্যদিকে লেখা কেমন করে মন্ত্র পড়ে জল ছিটিয়ে দিলে সেই সব পশু পাখিকে আবার মানুষ করে তোলা যায় মুহূর্তেই। কাগজটা হাতে নিয়ে মানুষ করার মন্ত্রটা বার বার পড়ল রাজকুমার। তারপর হঠাৎ আনমনা হয়ে গেল সে মালী বউয়ের জন্য। সে এসেছিল মালী বউয়ের মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বলে। অথচ কী থেকে কী হয়ে গেল। আজ বাঁদর ইঁদুর ফুলপাখিদের সঙ্গে তাকে একাই ফিরে যেতে হবে ডাইনী পাহাড় থেকে।—

রাজকুমারকে হঠাৎ আনমনা হয়ে যেতে দেখে ফুলপাখি অবাক হয়ে বলল, কি হল রাজকুমার? কী ভাবছো?

রাজকুমার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ভাবছি আমি যে জন্য ডাইনী বুড়ির খোঁজে এতদূর এসেছিলাম, আমার সে কাজ তো শেষ হলো না এখনও?

সে কী কাজ রাজকুমার?

আমাদের মালী বউয়ের মেয়েকে কোন সে ছোটবেলায় চুরি করে এসেছিল ডাইনী বুড়ি। সেই শোকে মালী বউ আজও কাঁদে। আমি তাকে কথা দিয়ে এসেছিলাম তার সেই মেয়ে যদি সত্যিই বেঁচে থাকে, তাহলে তাকে ঠিক ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। কিন্তু তারতো খোঁজ পেলাম না এখনো।

রাজকুমারের কথা শুনে ফুলপাখি বলল, হ্যাঁ, এটা ভাববার কথাই বটে। তবে যাদের সামনে পেয়েছো তাদের গায়ে মন্ত্রটা জল ছিটিয়ে আগে তাদেরতো মানুষ করে দাও। তারপর সবাই মিলে না হয় আবার খোঁজা যাবে মালী বউয়ের মেয়েকে।

বাঁদর ইঁদুর গলা মেলালো ফুলপাখির কথায়।

রাজকুমার তখন মন্ত্র পড়ে পড়ে এক এক জনের গায়ে জল ছিটিয়ে দিতে লাগল। আর কী আশ্চর্য! গায়ে জল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে পেতে লাগল তার পুরনো চেহারা। কেউ রাজকুমার, কেউ রাখাল ছেলে। কেউ চাষি। ফুলপাখি হয়ে গেল শুধু অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ে । রাজকুমার ফুলপাখির রূপ দেখে অবাক হয় তাকিয়ে রইল তার দিকে। বলল, এখন থেকে তুমি তো আর ফুলপাখি নও। তোমায় আমি ফুলকুমারী বলে ডাকবো।

মেয়েটি বলল, আমার নামতো ফুলকুমারীই।

রাজকুমার বলল, সত্যি?

ফুলকুমারী বলল, সত্যি। সত্যি। সত্যি। তুমি যার খোঁজে এতদূর এসেছো আমি সেই মালী বউয়ের মেয়ে ফুলকুমারী। মা আমায় আদর করে ফুলকুমারীই ডাকতো।

শুনে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো সবাই।

ইঁদুরছানা, আসলে যে নিজেও একজন ভিনদেশের রাজকুমার সে শুধু গম্ভীর হয়ে বললো, সকাল হতে কিন্তু দেরী নেই।

তখন সবাই হাসতে হাসতে বাড়ির পথ ধরল। ডাইনী পাহাড়ে মরে পড়ে রইল শুধু দুষ্টু ডাইনী বুড়ি আর কালকেউটে সাপটা।

ঘোড়ার গাড়ি

প্রণব সেন
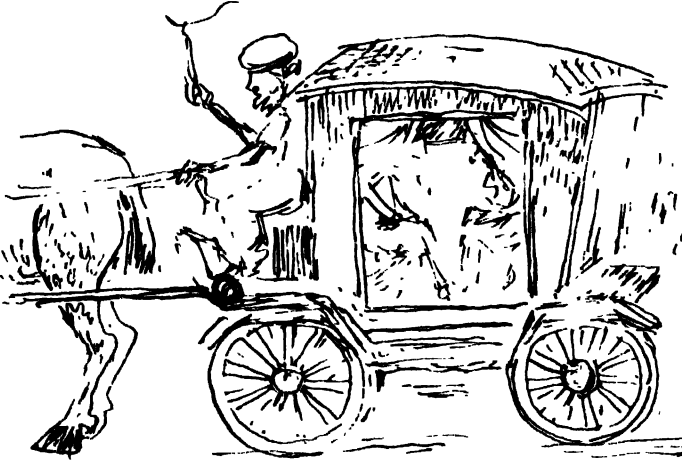
রাজা ও মন্ত্রী চলেছেন নগর ভ্রমণে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে। প্রজারা অবাক চোখে দেখছে রাজাকে। তিনি ঘোড়ার গাড়ি চড়ে বেড়াতে বেরোবেন, কেউ যে কখনও ভাবতেও পারেনি। রানী অবশ্য আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু এখন তিনি বেড়াবার আনন্দ বেশ খুশিমনেই উপভোগ করছেন। রাজপথের বুকে ঘোড়ার খুরের টগবগ শব্দ তাঁর মনে অদ্ভুত এক ছন্দের দোলা জাগিয়ে তুলেছে।

আজকাল কোনও রাজাই ঘোড়ার গাড়ি চড়েন না। কিন্তু এই রাজ্যের রাজা পুরানো ঘরানা আঁকড়ে ধরে থাকতে ভালোবাসেন। তিনিই উদ্যোগ নিয়েছিলেন, অন্য গাড়ির সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ি রাখার। রাজার অমন বিদঘুটে খেয়াল সমর্থন করতে না পারলেও বিরোধিতা করার সাহস পাননি কোনও মন্ত্রী। তাঁরা ভেবেছিলেন, শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হবার ভয়ে রাজা কখনও ঘোড়ার গাড়ি চড়তে চাইবেন না। কিন্তু আজ রাজা তাঁদের সেই ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণ করে দিয়েছেন। তবুও তাঁরা আশঙ্কা করেছেন, যেকোনও মুহূর্তে রাজা বিপদে পড়তে পারেন।

ফুরফুরে হাওয়া খেয়ে রাজার মন যেন খুশিতে প্রজাপতির মতো পাখনা মেলে উড়ছে। এতদিন উনি এই গাড়িতে না চড়ে বেজায় ভুল করেছিলেন। রানীকে বললেন, এখন কেমন লাগছে বলো? তখন তুমি তো কিছুতেই রাজি হতে চাইছিলে না।

রানী সত্যিই জানতেন না, এমন গাড়িতে চড়ার আনন্দ কতখানি হতে পারে। তিনি বললেন, আমি জীবনে কখনও ঘোড়ার গাড়ি চড়িনি। আমি কি করে বুঝব, এই গাড়িতে চড়ার স্বাদই আলাদা?

কোচোয়ান হঠাৎ গাড়ি থামাতে বাধ্য হলো। দুজন প্রজা রাজার সঙ্গে দেখা করতে চান। চলার পথে এ কি আবার উটকো অশান্তি এসে হাজির হলো। রাজা বললেন, তোমরা আমার সঙ্গে দরবার হলে দেখা করো আগামীকাল। আমি তোমার সব অভিযোগ শুনব, তার প্রতিবিধান করার চেষ্টা করবো। রাজার কথা ওরা মেনে নিতে চাইলো না। ওরা এখনই রাজার সঙ্গে কথা বলতে চায়। রানীর মেজাজ বেশ বিগড়ে গেল। এত মনোরম ভ্রমণে বাধা পেয়ে উনি রেগে গিয়ে বললেন, একদিন অপেক্ষা করতে যদি ইচ্ছা না হয়, তবে তোমাদের কথা কখনই রাজা শুনবেন না। আমাদের এখনই যেতে দাও।

ওরা পথ থেকে সরে দাঁড়াল। রাজা বললেন, ভ্রমণের আনন্দটাই ওরা মাটি করে দিল। বড্ড বেরসিক।

রানী তখনও রাগে কপাল কুঁচকে আছেন। বললেন, এবার বুঝতে পারছ কেন আমি ঘোড়ার গাড়ি চড়তে আপত্তি করেছিলাম। অন্য গাড়ি হলে ওরা কাছে আসার সাহসই পেত না। পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারতাম।

রাজা যদিও রানীর সঙ্গে একমত নন, তবুও কথা কাটাকাটি করে বেড়াবার আনন্দ নষ্ট করতে চাইলেন না। রাজা মনের খুশিতে গুনগুন করে গান গাইছেন। এমন আনন্দ তিনি বিদেশ-ভ্রমণেও কখনও পাননি। ওঁরা এসে পৌঁছলেন রাজ্যের শেষপ্রান্তে। এদিকে রাজ্যের সীমান্ত জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল পাহাড়। পাহাড়ের ওপ্রান্তে অন্য এক রাজ্য। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে এক ঝরনা। এই ঝরনা থেকে সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যের একমাত্র নদী। রাজা এই ঝরনা দেখার সুযোগ কখনও পাননি। তাঁর ইচ্ছে হলো,

পাহাড়ি পথে উঠে ঝরনা দেখার।

কোচোয়ান বলল, আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারি কিন্তু আকাশের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। যেকোনও মুহূর্তে ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে যেতে পারে।

এত কাছে এসেও ফিরে যেতে হবে। জীবনে এমন সুযোগ হয়ত আর কখনও পাবেন না। উনি বললেন, তুমি শুধু একবার ঘুরিয়ে নিয়েই চলে আসবে।

রাজার ঝরনা দেখার যখন এত ইচ্ছে, ঝড়বৃষ্টির ভয় দেখিয়ে ওর উৎসাহ কমানো সম্ভব হবে না। কোচোয়ান পাহাড়ি পথে ঘোড়ার গাড়ি ছুটিয়ে দিল। রাজা দেখছেন প্রকৃতির সৌন্দর্য আর রানী পাহাড়ের একদিকে গভীর খাদ দেখে চোখ বুজে আছেন। ঝরনার কাছে পৌঁছবার আগেই ঝড়ো বাতাস বইতে শুরু করল। আকাশ ক্রমশ ঢেকে যাচ্ছে কালো মেঘে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে প্রচণ্ড বৃষ্টি। কোচোয়ান রাজাকে বলল, আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত। বৃষ্টিতে ভিজতে শুরু করলে ঘোড়া ছুটতে চাইবে না।

রাজা আপত্তি করলেন না। রানী মুখ ব্যাজার করে বললেন, আমি তখনই বলেছিলাম ঘোড়ার গাড়ি চড়ে না বেরোতে। আমার কথা তো তুমি শুনলে না। ঘোড়ার মেজাজ যদি বৃষ্টিতে বিগড়ে যায়, আমাদের বাড়ি ফেরার কি হবে?

রাজার মনে একই দুশ্চিন্তা জড়ো হয়েছে। সত্যিই যদি ঘোড়া না ছোটে তবে যে পাহাড়েই আটকে থাকতে হবে।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বর্শার ফলার মতো বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে এসে বিঁধছে। কোচোয়ান ভিজে একেবারে সপসপে হয়ে উঠেছে। ঘোড়া যেকোনও মুহূর্তে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে পারে। রাজাও সেই আতঙ্কে রয়েছেন।

হঠাৎ থেমে গেল গাড়ি। আর তো নড়েচড়ে না। রাজা ধৈর্য হারিয়ে বললেন, কতক্ষণ আমাদের এখানে থাকতে হবে? কোচোয়ান নিচে নেমে রাজার কাছে এসে বলল, আপনি একবার বাইরে এসে ঘোড়াকে বলুন, কেন সে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আপনার কথা হয়ত শুনবে।

কিন্তু বৃষ্টিতে রাজা ভিজতে রাজি নন। ভিজলে নির্ঘাত নিউমোনিয়ায়

ভুগতে হবে। কোচোয়ান বলল, আপনি ভেতরে বসে আছেন, তাই বুঝতে পারছেন না। আমাদের কত কষ্ট হচ্ছে জলে ভিজতে। রাজা চুপ করে রইলেন। রানী উত্তর দিলেন রাজাকে বৃষ্টিতে ভিজতে বলছ, তোমার সাহস তো কম নয়। এই অপরাধে তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।

কোচোয়ান শাস্তির কথা শুনে বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে রাজাকে বলল, আমি জানি। আমি এখনই চলে যাচ্ছি। আপনাকেই আমি গাড়ি চালানোর দায়িত্ব দিয়ে গেলাম।

কোচোয়ান বৃষ্টির মধ্যেই হাঁটতে-হাঁটতে এগিয়ে চললো। রাজা-রানী খুবই বিপাকে পড়ে গেলেন। কে এখন রাজপ্রাসাদে পৌঁছে দেবে? রানী কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, আমি এজন্যই তোমাকে বলেছিলাম, ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বেড়াতে না বেরোতে। শুনতে চাওনি আমার কথা। এখন যাও নিজেই কোচোয়ান হয়ে গাড়ি চালাও। রাজা কোচোয়ান হবার যন্ত্রণা কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না। বিশেষ করে এই বৃষ্টির মধ্যে। তিনি কেমন উদাস হয়ে তাকিয়ে রইলেন আঁকাবাঁকা সব পাহাড়ি পথের দিকে।

রাজকুমারীর বন্ধু

পঞ্চানন মালাকর
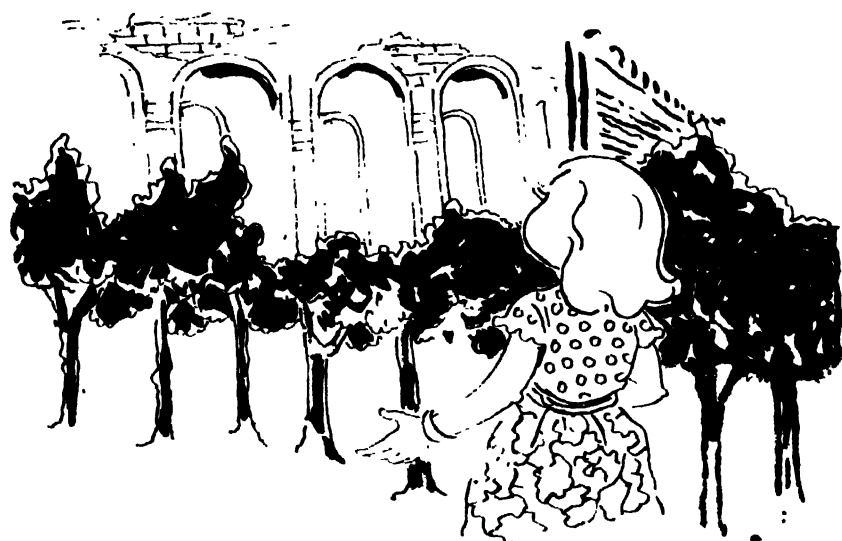
জায়গাটা মাম্পির ভারি পছন্দ হয়ে গেল। রুখু মাটির দেশ হলেও এই পাহাড় ঘেরা ছোট্ট শহরে আসতে পেরে মনে মনে খুব খুশি সে। তার বাবা সরকারি আপিসে চাকরি করে. বদলির চাকরি। তিনচার বছর পরই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বদলি হতে হয়। বাবা প্রায়ই বলে, এমন চাকরি করি যে, হাঁড়িতে কালি পড়তে পারে না।

কথার অর্থ মাম্পি বুঝতে পারে না। তবে এটুকু বোঝে যে, তার বাবার মনে একটা দুঃখ আছে। এভাবে বদলির চাকরি তার ভালো লাগে না। মাঝে মাঝেই নিজের চাকরিটাকেই দোষারোপ করে। অবশ্য মাম্পিরও ভালো লাগে না। সেটা অন্য কারণে। এক জায়গায় কিছুদিন থাকলে অনেক বন্ধু হয়। তাদের ছেড়ে যেতে কষ্ট হয় ভারি। মুখে কিন্তু বলতে পারে না সে। তবে যে দুঃখটা বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে তার কথা কাউকে বলতেও পারে না।

এর আগে তারা একটা ছোট্ট শহরেই ছিল। আর সে শহরের পাশ দিয়ে একটা নদী চলে গেছে। নদীতে সারাদিন কত যে নৌকো ভেসে

যেত—তার কোনো হিসেব নেই। নৌকোগুলো যে কোথা থেকে আসে আর কোথায় যায় তা মাম্পি বুঝতেই পারে না। বাবাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা বাবা! ওই নৌকোগুলো কোথায় যায়?

বাবা তার প্রশ্নটাকে তেমন পাত্তা দেয়নি। গা এলানো উত্তর দিয়েছিল, কোথায় আর যাবে—নদীর পারে যেসব গ্রাম আর শহর আছে সেখানেই যায়।

উত্তরটা তেমন পছন্দ হয় না মাম্পির। সে অবশ্য বাবাকে আর কিছুই জিজ্ঞেস করেনি। চুপ করে গেছল। আসলে ওইসব নৌকো আর তার বাহারি পাল দেখে তার মনে হয়েছে এসব নৌকো নিশ্চয়ই অনেক দূর দূর দেশ ঘুরে বেড়ায়। ঠাম্মির কাছে অনেক দেশের গল্প শোনে সে। রাজার গল্প, রাজপুত্রের গল্প। চম্পাবতী রাজকন্যের কথা। সেইসব রাজারাজড়াদের দেশে ওরা ঘুরে বেড়ায়। সে যদি ওদের সঙ্গে যেতে পারতো কী মজাই না হতো। কিন্তু যাবে কেমন করে। সে যে ছোটো। কিছু করতে গেলেই মা বলবে, তুমি এখন ছোটো সোনা, বড়ো হও সব জানতে পারবে। সব দেখতে পারবে।

কবে যে বড়ো হবে। মাম্পির ভীষণ রাগ হয়। সে কেন তাড়াতাড়ি মায়ের মতো বড় হয় না। কবে যে ছাই বড়ো হবে। ইচ্ছে মতো ঘুরতে পারবে। দেশ দেখে বেড়াতে পারবে। বড়ো হওয়ার স্বপ্ন দেখে সে।

এই পদমপাহাড় জায়গাটা তার ভারি পছন্দ। পাহাড় খুব একটা বেশি নেই। কিছুটা দূরে আকাশের কোল ঘেঁষে একটা টিলা পাহাড় দেখা যায়। ওটার নামই পদম পাহাড়। চারিদিকে শাল মহুয়া আর সেগুনের গাছ। রাস্তার লাল ধুলো গাছের পাতায় লালের পোঁচ দিয়ে রেখেছে।

এখনো স্কুলে ভর্তি হতে পারেনি মাম্পি। তাই পড়াশোনার তেমন চাপ নেই। বাবা খোঁজ নিয়েছে। দিন দশেক পরে তাকে ভর্তি করে দেবে এখানকার রামকমল হাই স্কুলে। এবার মাম্পির ক্লাশ সিক্স হবে। সকাল বিকেল এখন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। ওদের বি.ডি.ওর বাংলোর সামনের বাগানে খুব সুন্দর ফুল ফোটে। একটা সোনালি রঙের কনকচাঁপা ফুলের গাছে কত্তো ফুল ফুটে থাকে। একটা মিষ্টি গন্ধে গাছটার তলাটা ভরে থাকে। মাম্পি সকাল বিকেল একবার করে গাছটার তলায় গিয়ে বসে থাকে। মাঝে মাঝে নিচু ডাল থেকে কনকচাঁপা ফুল তুলে এনে মাকে

দেয়। মা ফুল খুব ভালোবাসে। তাকে কনকচাঁপা ফুল আনতে দেখে বলে, এভাবে ফুল ছিঁড়তে নেই। ফুল গাছে থাকলেই তো ভালো। আচ্ছা মা। ফুল ছিঁড়লে ওদের ব্যথা লাগে—না?

হ্যাঁ! তা তো লাগবেই।

তাহলে যারা ফুল এনে ঘর সাজায়—তাদের কী হবে? ওরা তো ফুলকে কষ্ট দেয়।

তা দেয়। মা কী বলবে ভেবে পায় না। মাম্পি প্রশ্ন করতে শুরু করলে আর শেষ হয় না। তবুও কথা ঘোরাতে চেষ্টা করে, একবার দুবার ফুল ছিঁড়লে কোনো দোষ হয় না।

মাম্পি আর ফুল ছেঁড়ে না। আজ গাছতলায় এসে দেখলো এক থোকা ফুল শুদ্ধ ডাল কে যেন ছিঁড়ে ফেলেছে। আহা! ফুলের কত কষ্ট। ফুলের থোকাটা তুলে নিল সে। মনটা খারাপ হয়ে যায়। আজ আর ভালোলাগে না বসে থাকতে। একবার গাছটাকে দেখে বাইরে বেরিয়ে এলো। বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না। সামনের রাস্তা ধরে পায়ে পায়ে হাঁটতে লাগল।

এদিকটায় এর আগে আসেনি মাম্পি। নির্জন রাস্তা। দুদিকে ছোটো বড়ো গাছ। দু একটা বাড়ি। আর সেইসব ছাড়িয়ে দু'পাশে ছড়িয়ে আছে রাঙামাটির পথ। আনমনে পথ চলতে চলতে মাম্পি দেখল গাছপালা ঘেরা এক বিশাল বাড়ি। সাতমহলা রাজবাড়ির মতো। সামনে আবার সিং-দরোজা। দেখেই মনে পড়ে গেল—বাবা সেদিন মাকে বলেছিল এদিকে এক রাজবাড়ি আছে।

এটাই সেই রাজবাড়ি। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মাম্পি। গাছপালায় ঘেরা বিশাল বাড়িটার এখানে ওখানে রঙ চটে গেছে। দু'এক জায়গায় পলেস্তেরা খসে গেছে। তবুও অবাক বিস্ময়ে বাড়িটাকে দেখে মাম্পি। দু'এক পা এগিয়ে গিয়ে দেখল বাড়ির পাশেই একটা সুন্দর বাগান। দু'একটা ফুলের গাছ। তবে কেউ মনে হয় তেমন যত্ন করে না। বাগানের পাঁচিল একটা জায়গায় ভেঙে গেছে।

সেখানটায় তারকাঁটা দিয়ে বেড়া দেওয়া। মনে মনে ভাবে মাম্পি, এ কেমন রাজবাড়ি। এমন ভাঙা কেন? রাজা কি গরিব হয়ে গেছে! না কি রাজা নেই। কোনো এক রাক্ষস তাদের সবাইকে মেরে একমাত্র রাজকন্যেকে বাঁচিয়ে রেখেছে এর তিনতলার চিলে কোঠায়। হয়তো সেখানেই তাকে

সোনার কাঠি আর রুপোর কাঠির ছোঁয়ায় ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে।

ওমা! তাতো নয়! মাম্পির চোখ গোল গোল হয়ে ওঠে। গাছের ছায়াঘেরা বাগানে ফুলপরীর মতো দেখতে সুন্দর মেয়েটি কে? নিশ্চয়ই রাজকন্যে! তাহলে এখানে ঘুরছে কি করে। ওকে কি রাক্ষস কিছু বলেনি! একটা সিল্কের ঘাঘরা মতো পরা। সুন্দর চুলের ঢল মাথায় নিয়ে সে মেয়েটি ঘুরছে সে মাম্পির চেয়ে বয়সে বেশ বড়ো। রূপের ঢল নেমেছে যেন তার সারা অঙ্গে। হাঁ করে চেয়ে থাকে মাম্পি। তার চোখে পলক পড়ে না। সে ভাবতেই পারছে না। সত্যিকারের রাজকন্যে তার সামনে বাগানে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে।

এবার রাজকন্যের দৃষ্টি পড়ে মাম্পির দিকে। তাকে ওভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে তার চোখে ভ্রূকুটি ফোটে। দাঁড়িয়ে পড়ে। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে তারকাঁটার বেড়ার ধারে। তাকে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে গো? কোথায় থাকো? এখানে কেন এসেছো?

মাম্পি ভয়ে শিউরে উঠলো। তাই তো! কী বলতে চাইছে রাজকন্যে। এখানে আসা তার কি ভুল হয়েছে। এখন তো বিকেল। এরপরেই কি সেই রাক্ষস ফিরে আসবে? তাই তাকে সাবধান করে দিচ্ছে রাজকুমারী। ভয়ে তার গলা শুকিয়ে আসে। কী বলবে বুঝতে পারে না। এবার কী করবে সে। এক ছুটে পালাবে! পালাতে গেলে সেই রাক্ষস যদি পিছু ধাওয়া করে। তখন কী করবে? কান্না পাচ্ছিল তার। কেন যে এখানে এসেছিল। নিজের বোকামির জন্যে ভীষণ আফশোষ হচ্ছে।

তোমার হাতে কী ফুল? প্রশ্ন করে রাজকুমারী। ফুল দেখে তার চোখ দুটো চকচক করে ওঠে, বাঃ! সুন্দর ফুল। চাঁপা ফুল তাই না!

হাতের ফুলের গুচ্ছ তুলে ধরে সে। সাহসে ভর করে বলে, কনকচাঁপা।

সত্যি! ভারি মিষ্টি ফুল। আমি না! কনকচাঁপা খুব ভালোবাসি। ফুলগুলো আমাকে দেবে?

পুতুলের মতো সুন্দর রাজকন্যে মাম্পির কাছে ফুল চাইছে। সে কি না করতে পারে। হাত বাড়িয়ে ফুলগুলো তারকাঁটার বেড়ার মধ্য দিয়ে গলিয়ে দিল সে।

ফুলগুলো হাতে নিয়ে রাজকুমারী মিষ্টি হাসি হাসল। হাসলে ওকে

আরো সুন্দর লাগে; যেন এক ফুলপরী।

এই ফুল আমাকে দিয়ে দিলে?

হ্যাঁ! খুশি হয় মাম্পি, আরো কত ফুল ফুটে আছে। আরো দিতে পারি।

সত্যি! রাজকুমারীর মুখে ফুটে ওঠে এক অনাবিল হাসি, আমাকে তুমি কনকচাঁপা এনে দেবে?

হ্যাঁ। তুমি বললে এনে দেবো।

বেশ। তুমি আজ থেকে আমার বন্ধু হলে। আমার বন্ধু হবে তো?

হু-উ! মাম্পির মনের মধ্যে এক ঝলক আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে। রাজকুমারীর বন্ধু সে। সত্যি! তার মতো সুখী আর কে আছে। রাজকুমারী তার বন্ধু! আনন্দে নেচে ওঠে তার মন।

রাজকুমারী হাসে, আবার এসো। হ্যাঁ!

আচ্ছা। বলে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় মাম্পি। রাজকুমারী তাকে হাত নেড়ে বিদায় জানায়।

এরপর প্রায়দিনই কনকচাঁপা ফুল নিয়ে সে রাজকুমারীর সাথে দেখা করতে যায়। একদিন রাজকুমারী তাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে বসায়। অনেক গল্প করে। নিজের কথা বলে। তার খবর নেয়। কোথায় থাকে? কী পড়ে? সব।

রাজকুমারী সত্যিকারের রাজকন্যে শুনে মাম্পির আনন্দ আর ধরে না। রাজকুমারীর ঠাকুরদাদা ছিলেন এ অঞ্চলের রাজা। এখনো তার বাবাকে সবাই রাজাবাবু বলে। তবে এখন আর তাদের রাজত্ব নেই। প্রজাও নেই। তার বাবা এখন এখানকার পাথরখাদানের ঠিকাদারি করে। তাদের অবস্থা অনেক পড়ে গেছে। তবুও তাদের বাড়িতে নায়েব আছে। গোমস্তা আছে। মন্ত্রী-সেনাপতি আছে কিনা সেকথা জিজ্ঞেস করতে পারে না মাম্পি। তার লজ্জা করে। মনে মনে কল্পনা করে, হয়তো এখনো আছে।

দিন তিনেক বাড়ি থেকে বেরোতে পারে না মাম্পি। একটু বৃষ্টি হওয়ায় ঠাণ্ডা পড়েছিল। বাইরে হাওয়া লাগিয়ে ঠাণ্ডা লেগে যায়। সর্দি-কাশি হওয়ায় মা বাইরে যেতে দেয়নি। তিনদিন পর ছুটি পেতেই ছুটে যায় রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু দেখা পায় না। বাগানে কেউ তার জন্যে অপেক্ষা করে নেই। কী করবে ভেবে পায় না। সে তার বন্ধুর জন্যে কনকচাঁপা-ফুল এনেছে। কিন্তু কাকে দেবে? সিং-দরোজার কাছে গিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারে। কাউকে দেখতে পেল না। দু'একবার বাগানের পাশ

দিয়ে ঘুরে এলো। কোথাও কেউ নেই। রাজকুমারী কোথায় গেল। তার কথা কি ভুলে গেল? নাকি তিনদিন আসেনি বলে অভিমান করে দেখা করবে না। কান্না পেল তার। উল্টে রাজকুমারীর আচরণে অভিমান হয়। সে কেন আসেনি, না জেনেই বন্ধু তার ওপর রাগ করলো! এ কেমন বন্ধু? মন ভার করে ফিরে এলো। একদিন নয়। পরপর তিনদিন। তিনদিনের পর বিকেলবেলা বেছে বেছে একগোছা কনকচাঁপা তুলে নিয়ে রাজবাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় মাম্পি। বাগানের দিকটা ঘুরে এসে দেখল কেউ কোথাও নেই। তার রাজকন্যা কি রূপকথার দেশে মিলিয়ে গেল। এত যত্ন করে তার জন্যে ফুল তুলে নিয়ে এলো। রাজকন্যের প্রিয় ফুল কনকচাঁপা। বুকের মধ্যে একটা চাঁপা ব্যথা। কারো কাছে বলতেও পারে না। ভিতরে ভিতরে এক চাঁপা কান্না অভিমান হয়ে জমে ওঠে।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে রাজবাড়িটাকে বড় মায়াময় মনে হয়। মিষ্টি আলোর স্পর্শ দিয়ে বৈকালিক সূর্য যেন বিদায় চাইছে।

সিং-দরোজার সামনে এসে দাঁড়ায়। বিশাল লোহার গেট আজ খোলা। ভিতরে একখানা সাদা রঙের মোটর দাঁড়িয়ে। দু'তিনজন লোককে দেখতে পেল সে। তারা যেন নিজেদের মধ্যে কী কথা বলছে। অদম্য সাহস করে পায়ে পায়ে ঢুকে পড়ে মাম্পি। তাকে কেউ দেখতে পায় না। দুরু দুরু বুকে এসে দাঁড়ায় গাড়িবারান্দার সামনে।

হঠাৎ করে কড়া স্বরে থমকে দাঁড়ায়। বাড়ির দারোয়ান তার দিকে এগিয়ে আসে, এই তুই কে-রে? কাঁ চাস?

থমকে দাঁড়ায় মাম্পি। হঠাৎ কথা বলতে পারে না। বুকে সাহস আনতে চায়। দারোয়ান এগিয়ে আসে, কোথায় যাবি? কাকে চাস?

রাজকুমারীর জন্যে ফুল এনেছি।

রাজকুমারীর জন্যে ফুল! ব্যঙ্গের সুরে দরোয়ান বলে, যা ভাগ!

মাম্পি পাথর হয়ে যায়। বারান্দার সামনে দাঁড়ানো সৌম্যকান্তি এক প্রৌঢ় এদিকে চোখ ফেরান! 'রাজকুমারীর জন্যে ফুল' কথাটা তাঁর কানে গেছে। তিনি দারোয়ানকে ধমক লাগান, দাঁড়াও! ওকে কিছু বলো না।

দেখিয়ে না বাবু...।

দারোয়ানের কথা শেষ হয় না। ভদ্রলোক এগিয়ে এসে মাম্পির সামনে দাঁড়ালেন, তুমি কার জন্যে ফুল এনেছ?

রাজকুমারী।

ভদ্রলোকের মুখে একটা হাসি ফুটে ওঠে। তিনি মাম্পির হাতের ফুলের দিকে একবার ভালো করে দেখেন। মিষ্টি-মোলায়েম সুরে প্রশ্ন করেন, রাজকুমারীকে ফুল দেবে?

হ্যাঁ।

এসো আমার সাথে।

মাম্পি তাঁর সঙ্গে পায়ে পায়ে বাড়ির ভিতরে ঢোকে। বিশাল বাড়ি। কাঠের সিঁড়ি। এত বড়ো বাড়িতে যে কাঠের সিঁড়ি থাকতে পারে তা তার ধারণাই ছিল না। সিঁড়ির মুখে বিশাল বিশাল আয়না। আরো সব বিচিত্র কাজ করা দরজা-জানালা দেখে অবাক হয় সে।

ভদ্রলোক দোতলার একটা ঘরে নিয়ে আসেন তাকে। ঘরে বাহারি পর্দা ঝুলছে। ঘরে মেহগনি কাঠের আসবাব এখনো ঝকঝক করছে।

এসো!

ভদ্রলোক তাকে একখানা খাটের সামনে নিয়ে গেলেন। খাটের সেকি কারুকার্য। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। খাটের ওপর সাদা চাদর গায়ে চোখ বুঁজে শুয়ে আছে তার বন্ধু রাজকুমারী। মুখটা বড়ো শীর্ণ। তার পায়ের কাছে বসে আছেন একজন বয়স্কা মহিলা।

শব্দ শুনে চোখ খোলে রাজকুমারী! মাম্পিকে ফুল হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার মুখে ফুটে ওঠে সেই অনাবিল হাসি। তবে আজকের হাসিটা মনে হয় বড়ো করুণ। ক্ষীণ কণ্ঠে কথা বলে সে, কনকচাঁপা ফুল!

তোমার জন্যে।

রাজকুমারী বিছানায় উঠে বসে। তার চোখের কোণে জল চিকচিক করে। অনেকদূর থেকে ভেসে আসা গলায় বলে, তুমি আমাকে খুব ভালোবাসো তাই না?

হ্যাঁ। ধরা গলায় জবাব দেয় মাম্পি।

কেন?

তুমি যে আমার বন্ধু। মাম্পির কণ্ঠে এক অহংকার ফুটে ওঠে। রাজকুমারী হাতটা এগিয়ে দিয়ে মাম্পির হাত থেকে ফুলের গুচ্ছ তুলে নেয় নিজের হাতে। কনকচাঁপার মাতাল করা গন্ধ সারা ঘরে তিল তিল করে ছড়িয়ে পড়ে।

ফুলপরীর বনে

সুখেন্দু মজুমদার
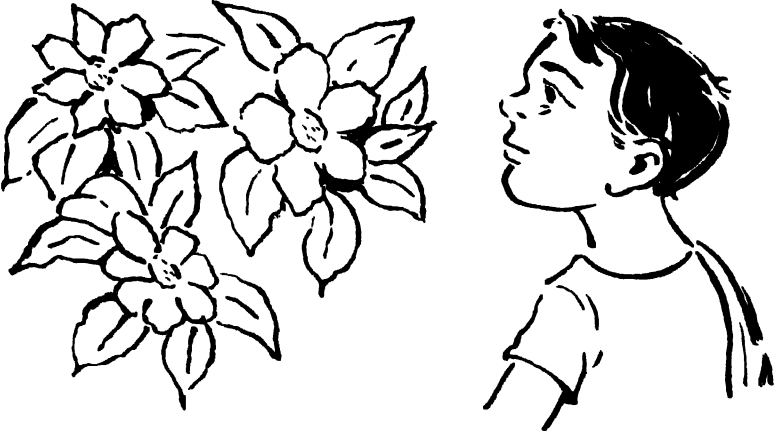
সে এক অবাক দেশ। সার-সার পাহাড়। ধবধবে বরফের মুকুট পরে মেঘের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছবির মতো। চারধারে সবুজ বন। একটু এগিয়ে গিয়ে কালচে নীল সমুদ্রের জল। সারাদিন গর্জন করতে-করতে ছুটে এসে একবার তটে আছড়ে পড়ছে আবার পিছু হটে পালিয়ে যাচ্ছে। যেন এক মজার খেলা। দিনেরবেলা যখন রোদের আলোয় চারধার ঝলমল করে তখন দেখা যায় রঙবেরঙের কত ফুল ফুটে আছে দেশ জুড়ে। কি যে বাহার, না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। তেমনি তাদের গন্ধ। হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে সে সুবাস দেশের একপ্রান্ত থেকে পৌঁছে যায় আর একপ্রান্তে। কখনও-সখনও দেশের সীমানা পেরিয়ে ঢুকে পড়ে অন্য দেশে। সেই দেশের লোকেরা বলাবলি করে, যে ফুলের গন্ধ এত মিষ্টি সে ফুল না জানি কত সুন্দর। সবাই মনে-মনে ভাবে যদি একবার দেখতে পেতাম সে ফুল! কিন্তু দেখবে কেমন করে? তাছাড়া ফুল যে কোন বনে আছে তাও তো কারো জানা নেই। তাই মনের ইচ্ছে মনেই থেকে যায়। ফুল আর কারোর দেখা হয় না।

রাতের বেলা ফুলের গন্ধ প্রতিদিন শুয়ে-শুয়ে পায় দীপ। বাবার সঙ্গে যখন ভোরে ফুল তুলতে যায় তখন সে গন্ধটা কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। সুযোগ পেলেই বাবার চোখ এড়িয়ে একটু খুঁজে নেয় দীপ গন্ধটা। কোথায় কোন ফুলে আছে সেটা খুঁজেই পায় না। দীপ মনে-মনে ভাবে যদি সে কোনোদিন একলা ফুল তুলতে আসে তবে সেটা খুঁজে বার করবেই।

এইভাবে দিন যায় মাস যায়। একটু-একটু করে বড় হয়ে ওঠে দীপ। তবু একা-একা ফুল তুলতে যেতে দিতে চায় না মা-বাবা। কিন্তু সুযোগ একদিন ঠিক এসে যায়।

কিছুতেই ঘুম আসছে না দীপের। কেমন একটা মজা বারবার এসে নাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। বালিশ থেকে মাথাটা তুলে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায় দীপ। ঠিক বুঝতে পারছে না এখন কত রাত। আজ ওকে একা-একাই যেতে হবে। বাবার শরীরটা ভালো নেই। মা অবশ্য বলেছিল, 'দীপ, আজ আর ফুল তুলতে গিয়ে কাজ নেই। একটা দিন না গেলে এমন কিছু হবে না।'

দীপ সে কথা শোনেনি। মাকে বলল, 'জান মা, আজ কিন্তু ঝুলন পূর্ণিমা। অনেক মালা বিক্রি হবে। আর অনেক মালা বিক্রি মানেই অনেক পয়সা। তখন একজন ভাল বদ্যি ডেকে এনে বাবাকে দেখিয়ে নিতে পারবো।'

এবার সত্যি-সত্যি বিছানায় উঠে বসল দীপ। বাইরের দিকে তাকিয়ে মনে হলো আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। তাহলে আর ফুলই পাওয়া যাবে না। তড়িঘড়ি করে বিছানা থেকে নেমে বাবার সেই সাততালি দেওয়া ঝোলাটা কাঁধে তুলে নিল। হাতে নিল আঁকশি। চাঁদের আলোয় পথ হাঁটতে শুরু করে দীপ।

অন্যান্য দিন বাবা সঙ্গে থাকলে যে পথে যায় আজ তার ঠিক উল্টো পথ ধরে হাঁটতে থাকে। কই, এখনো কোনো ফুল তো চোখে পড়ল না? তাড়াতাড়ি চারপাশটা দেখে নিয়ে আবার এগিয়ে যায়। চাঁদের বুড়ির বোনা রূপালি চাদরটার রং আস্তে-আস্তে ফিকে হয়ে আসছে। কোথায় একটা পাখি যেন ডেকে উঠল। দীপ বুঝতে পারে ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। একটা ফুলও তোলা হয়নি। ফুলই দেখতে পেলে না আর তুলবে

কেমন করে!

ভীষণ ভয় পেয়ে গেল দীপ। এ কোন বনে এল যেখানে কোনো ফুলই নেই! অথচ অনেক ফুল পাবে এই আশাতেই উল্টো পথটা বেছে নিয়েছিল সে। মনে পড়ল মার কথা। মার নিষেধ না শুনে কি বোকামিই না করেছে।

ততক্ষণে রূপালি চাদর গুটিয়ে পশ্চিম আকাশে ফিরে গেছে চাঁদের বুড়ি। পুবআকাশে কে যেন চকিতে বুলিয়ে গেল আলোর পোঁচ। চারধার ঝলমল করে উঠল। আর তখন ভীষণ কান্না পেল দীপের। এ কোথায় এসেছে সে? একেবারে বনের মধ্যিখানে। লোক নেই, জন নেই, পথের কোনো নিশানা নেই। কেমন করে সে বাড়ি ফিরবে? বনের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে কাঁদতে শুরু করে দীপ। দু'চোখের জল গাল বেয়ে মাটিতে পড়ে আর সেখানে ফুটে ওঠে ফুল। যতই কান্না বাড়ে ততই ঝরে পড়ে চোখের জল। দেখতে-দেখতে গোটা বনটা একসময় ফুলে ফুলে ভরে ওঠে।

ফুলের বনে হাঁটতে-হাঁটতে দীপ দেখে বনের মধ্যিখানে একটা শানবাঁধানো দিঘি। আয়নার মতো স্বচ্ছ জল। চোখ-মুখটা ধুয়ে নেবার জন্য জলের কাছে যেতে জলে ভেসে উঠল মুখটা। জলে নেমে হাত দিতেই মুখটা নড়েচড়ে হয়ে গেল অসংখ্য। সঙ্গে-সঙ্গে পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, 'আর ভয় নেই তোমার।'

অবাক কাণ্ড! এমন মিষ্টি স্বরে কে কথা বলল? পিছন ফিরে দীপ কাউকে দেখতে পেল না। একটু ভয় পেল। জল থেকে উঠে চুপচাপ বসে পড়ল বাঁধানো শানে।

'কী হলো, বসে পড়লে যে? কাছে এস।' যেদিক থেকে কথাটা ভেসে এল, দীপ এগিয়ে গেল সেদিকে। আর একটু এগিয়ে যেতেই আবার সেই কণ্ঠস্বর। 'শোন, আমি হলাম ময়না। এ দেশের রাজকন্যে।' কথাটা শোনামাত্রই পাথরের মতো স্থির হয়ে যায় দীপ। কাছেপিঠে কাউকে দেখা যাচ্ছে না তবে কথাটা বলছে কে! একটু সামলে নিয়ে বলল, 'তাহলে তুমি এখানে কী করছ?' সঙ্গে-সঙ্গে ময়না উত্তর দেয়, 'সে অনেক কথা। একটা ইতিহাস। বেশ কয়েকবছর আগে আমি আর আমার বন্ধুরা একদিন বিকেলে ঘুরতে-ঘুরতে বন পেরিয়ে চলে এলাম এই দিঘিতে গা ধোব বলে। জলে নেমে খেলতে-খেলতে কখন যে বিকেল পেরিয়ে গেছে তার খেয়াল

নেই। যখন খেয়াল হলো তখন দেখি রূপালি চাদর বিছিয়ে চাঁদের বুড়ি চরকা কাটতে বসেছে। জল থেকে উঠে তাড়াতাড়ি পা বাড়ালাম বাড়ির পথে। অমনি পথ আটকিয়ে দাঁড়াল একদল পরী। জানো তো পরীরা খুব দুষ্টু আর হিংসুটে হয়। ওদের দিঘিতে নেমেছি বলে আমাদের সকলকে ফুল করে রেখে দিয়েছে ওরা।'

'তবে তো আমাকেও ফুল করে রেখে দেবে ওরা।' বলে ওঠে দীপ। 'না, না, সে ভয় নেই তোমার। আমরাই লুকিয়ে রাখব তোমাকে,' ময়না বলে। 'তারপর সন্ধে নামলে চাঁদের বুড়ির রূপালি চাদর জড়িয়ে মেঘের দেশ থেকে নেমে আসবে পরীরা। আজ তো ঝুলন পূর্ণিমা। রূপালি আলোয় ঝলমল করবে বন। দিঘির জলে গা ধুয়ে আমাদের ডেকে নেবে ওরা। চলবে ওদের নাচগানের আসর। তখন তুমি কিন্তু আমাদের চিনে রেখ। তারপর ভোর হবার আগেই আমাদের আবার ফুল করে দিয়ে পরীরা ফিরে যাবে মেঘের দেশে। দিনের আলোয় তখন যদি তুমি আমাদের ডাল থেকে ছিঁড়ে ওই দিঘির জলে ছোঁয়াতে পার তবেই আমরা আবার মানুষ হয়ে যাব। সবাই মিলে এই বন পেরিয়ে তখন পালিয়ে যেতে পারব।'

যেমনি কথা, তেমনি কাজ। দিনের আলো শেষ হবার আগেই ফুলের বনে ডালপালা আর পাতার নিচে লুকিয়ে পড়ল দীপ। একটু পরে সন্ধ্যা নামলে মেঘের আড়াল থেকে ডানা মেলে উড়ে-উড়ে নেমে এল পরীর দল। কি সুন্দর দেখতে তাদের। দীপ অবশ্য মায়ের কাছে শুনেছিল পরীরা দেখতে খুব সুন্দর হয়। পাতার আড়ালে বসে-বসে সব দেখছিল দীপ। ইচ্ছে করছিল বাইরে বেরিয়ে আসে। কিন্তু ধরা পড়ার ভয়। আর একবার ধরা পড়ে গেলে সারাজীবন ওকে ফুল হয়ে থাকতে হবে এই বনে। আর পালাতে পারবে না।

দিঘির জলে গা ধোয়া শেষ করে ময়না আর তার বন্ধুদের ডেকে নিল পরীরা। দীপ তো অবাক! কেমন করে ফুলগুলো সব মানুষ হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ভেসে এল ফুলের সেই মিষ্টি গন্ধ। প্রতিদিন রাতে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে যে গন্ধ সে পেত। আনন্দে লাফাতে ইচ্ছে করছে দীপের। এতদিনে সে ফুলের দেখা পেয়েছে, কিন্তু ধরা পড়ার ভয়।

ফুলের গন্ধে আর পরীদের নাচগানের ছন্দে সারারাত বনে যেন উৎসব। চাঁদের বুড়ি ফোকলা দাঁতে হেসে সে উৎসবের মজা উপভোগ করতে-করতে গোটাতে শুরু করে রূপালি চাদর। পরীরাও ডানা মেলে মেঘের দেশে যাবার আগে ময়না আর ওর বন্ধুদের আবার ফুল করে দেয়।

আস্তে-আস্তে দিনের আলো ফুটতে শুরু করে। আর অপেক্ষা করতে পারছে না দীপ। ফুলগুলো ঠিক চিনে রেখেছে সে। যেই রোদের আলো পাতার ফাঁক দিয়ে ফুলেদের গায়ে এসে পড়েছে, ময়না বলে ওঠে, 'এবার তোমার কাজ শুরু কর। আর দেরি করে লাভ নেই। এখনি পালাতে হবে এই বন থেকে।'

ময়নার কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি অমনি পাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে দীপ চিনে রাখা ফুলগুলো তুলে সাততালি দেওয়া ঝুলিতে ঢুকিয়ে দৌড়ে যায় দিঘির পাড়ে। তারপর একটা-একটা করে ফুল ঝুলি থেকে বার করে দিঘির জলে ছোঁয়াতেই অমনি হয়ে গেল মানুষ। রাজকন্যা ময়নামতী আর তার বন্ধুর দল।

ময়না বলল, 'আর অপেক্ষা নয়, চল এবার পালাই।' দীপের হাত ধরে ছুটতে শুরু করে ময়না। পিছনে ময়নার বন্ধুরা। ছুটতে-ছুটতে একসময় বন পেরিয়ে যায় ওরা। বন পেরিয়ে একটু যেতেই বিরাট রাজপ্রাসাদ।

ময়না আর তার বন্ধুদের সঙ্গে দীপকে দেখে সবাই তো অবাক! তারপর ময়নার মুখে সমস্ত শুনে রাজামশাই ঠিক করলেন ময়নামতীর সঙ্গে দীপের বিয়ে দেবেন।

গতকাল রাতের উৎসবের আনন্দ এখন রাজপ্রাসাদে। ঘোড়ার পিঠে ছুটে গিয়ে রাজার লোকজন দীপের বাবা আর মাকে নিয়ে এল। হারানো দীপকে খুঁজে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলো মা। দীপ তখন মায়ের কানে-কানে বলে, 'বাবাকে এবার রাজবদ্যি দেখিয়ে নেব মা।'

হীরাতোতা ও সোনালি ঈগল

আনসার উল হক
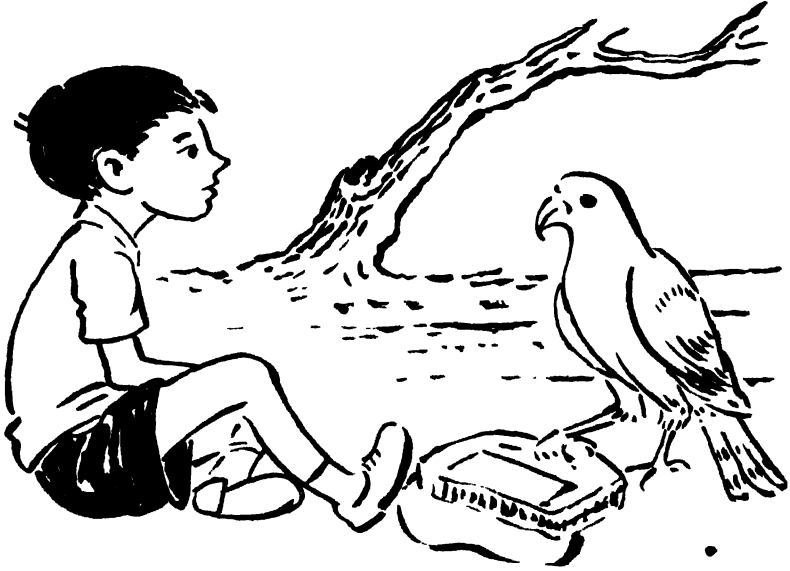
জলপরী, দত্যি-দানো, ডাইনোসর কিংবা রাক্ষস-খোক্ষসের কথা তোমরা সবাই শুনেছ। কিন্তু হীরা-তোতার কথা তোমরা অনেকেই শোননি। তার না ছিল পক্ষীরাজ ঘোড়া, না ছিল রাজার কুমার আর না ছিল ঢাল-তলোয়ার। তার ছিল শুধু খোলা আকাশ আর উন্মুক্ত সবুজ প্রান্তর। মনে ছিল অদম্য সাহস আর চোখে ছিল বিশ্বজয়ের বাসনা।

অম্বিকাচরণ হল বুম্বাগড়ের এক কৃষক। তারই ছেলে হীরাতোতা। হীরাতোতার ভালো নাম হয়তো আছে। কিন্তু তা নিয়ে কারুর মাথা-ব্যথা নেই। কেউ-কেউ আবার তাকে শুধুই হীরা বলে ডাকে। তাদের অবস্থা খুবই খারাপ। এ-বেলা খাওয়া হয় তো ও-বেলা উপোস। তবু তার বাবা তাকে কষ্টেসৃষ্টে নিকটবর্তী এক স্কুলে ভর্তি করে দেয়। ক্লাস টু-তে। বয়স বড়জোর আট। লেখাপড়ায় হীরামন খুব একটা ভালো ছিল না তবে পড়াশোনার প্রতি তার আগ্রহ ছিল যথেষ্ট। প্রতি বছর পাশ করে যায়। কিন্তু মায়ের ইচ্ছার সঙ্গে সে কোনমতেই পাল্লা দিতে পারছে না। মা চায় সে পরীক্ষায় আরো বেশি-বেশি নম্বর পাক। কিন্তু আন্তরিকভাবে চেষ্টা

করেও হীরামন পেরে উঠছে না। তার মা তাকে খুব ভালোবাসে। মায়ের ইচ্ছা সে লেখাপড়া করে মস্তবড় একজন মানুষ হোক। হীরাও তার মাকে খুব ভালোবাসে। আর বাবার কাছে গল্প শুনতে আরো বেশি ভালোবাসে।

সেদিন ছিল সোমবার। ভূগোলের পড়া না পারায় আর হোমটাস্ক অসম্পূর্ণ থাকায় গুরুমশাই তাকে ক্লাস থেকে বের করে দিলেন। অবজ্ঞা আর অপমানে হীরা বইখাতাপত্তর নিয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে গেল। যেদিকে দু-চোখ যায়, সেইদিকেই চলতে লাগল। বগলে বইয়ের বোঝা। সারাদিন খাওয়া নেই। মাথা ঝিমঝিম করছে। পা আর চলছে না। সন্ধে হয়-হয়। চলতে-চলতে সে একটা নদীর পাড়ে এসে উপস্থিত। সেখানে ছিল ঝাঁকড়া এক পাকুড়গাছ। ধারে-কাছে লোক-মনিষ্যি নেই। হীরা সেই পাকুড়গাছের তলায় বসে বিস্ফারিত চোখে নদীর জলের দিকে চেয়ে রইল।

আস্তে আস্তে অন্ধকার নামছে পাকুড়গাছের মাথায়। হীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে আছে। পাকুড়গাছের গুঁড়িতে পিঠ লাগিয়ে হেলান দিয়ে। এখনও। ভাবছে বাড়ি যাবে কি যাবে না। অবশেষে সে মনে-মনে প্রায় ঠিকই করে ফেলে যে সে আর বাড়ি ফিরবে না। লেখাপড়াও করবে না। মনের দুঃখে নিজের বইখাতাগুলো দুহাতে শক্ত করে ধরে উপরেই ছুঁড়ে ফেলে দিল। ভাবল, এই বইখাতাগুলোর এখন আর প্রয়োজন নেই।

ছুঁড়ে ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ ঘটে গেল এক অভাবনীয় কাণ্ড। নিজের চোখকেও সে বিশ্বাস করতে পারছে না। আকাশ থেকে নেমে আসছে বিশাল এক সোনালি ঈগল। তার পায়ের দিকে তাকিয়ে সে আরো আশ্চর্য হয়ে গেল। প্রথমে সে একটু ভয় পেল। তারপর মনে সাহস এনে চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে রইল। তার বইগুলো তো ঈগলের নখে আটকানো। সোনালি ঈগলও আস্তে-আস্তে হীরার পায়ের কাছে এসে বসল।

হীরা বলল—কে তুমি? থাকোই বা কোথায়?

ঈগল বলল—আমি সোনালি ঈগল। থাকি সারা আকাশ জুড়ে। কেউ বিপদে পড়লে আমি ছুটে আসি। সাহায্য করি।

এই কথা শুনে হীরামন আরো সাহস পেল। সামনে এগিয়ে গিয়ে বলল—তুমি আমার বাবাকে বোলো না আমি স্কুল পালিয়ে এসেছি।

ঈগল বলল—ছিঃ, স্কুল পালিয়ে আসতে নেই। স্কুলের গুরুমশাই রাগ করবেন। তোমার মা-বাবা খুব দুঃখ পাবেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মা-বাবা আমাকে খুব ভালোবাসেন।

—এই নাও তোমার বই। এই বলে সেই সোনালি ঈগল ডান পা-টা উঁচু করে, নখ আলগা করে বইখাতাগুলো হীরামনের হাতে তুলে দিল।

হীরা এখন খুব সহজ হয়ে গেছে! সোনালি ঈগল হয়ে গেল হীরার বন্ধু। সে ঈগলকে বলল ঃ

—মাস্টারমশাই আমাকে মারলে কেন? আমি আর ইস্কুলে যাব না।

ঈগল বলল—মাস্টারমশাই তোমাদের গুরু। মারতেই পারেন। তোমায় মেরেছে তোমার ভালোর জন্যই। পড়াশোনা করবে। আর মারবে না।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। কিন্তু আমার খুব খিদে পেয়েছে। আমাকে খেতে দাও।

ঈগলের খুব দয়া হল। সে চোঁ-চোঁ করে ডানা ঝাপটে আকাশে উধাও হয়ে গেল। কিন্তু হীরার খুব খারাপ লাগল আর ঈগলের উপর তার খুব রাগ হল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সে ঈগলবন্ধু বলে কয়েকবার চিৎকার করল। মুহূর্তেই ঈগলটা এসে হাজির। একেবারে হীরার সামনে। ঈগলের ঠোঁটে ঝোলানো পায়েসের পেয়ালা আর নখের ফাঁকে আটকানো কারুকার্য করা সুন্দর একখানা রুপোর চামচ। ক্ষুধার্ত হীরা পায়েসটুকু খেয়ে খুব খুশি হল। ঈগলটাও হাসি-হাসি মুখ করে তাকিয়ে রইল হীরামনের দিকে।

হঠাৎ কি মনে করে হীরামন তার বন্ধুর কাছে এক আব্দার জুড়ে দিল। বলল—আমার একটা কাঠের ঘোড়া চাই। তবে আমি বাড়ি যাব। ঘোড়ায় চড়ে।

তার বাড়ি ফেরার কথা শুনে ঈগলটা খুব খুশি হল। সে বার দুই তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করে উঠতেই হীরা দেখল তার একেবারে পাশেই একটা কাঠের ঘোড়া। সে আনন্দিত হয়ে একলাফে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল। ঘোড়াটা খুব একটা বেশি বড় নয়। ফুটতিনেক হবে। পা-গুলো

কারুকার্য করা, খুব সুন্দর। কানদুটো একেবারে খাড়াই। তবে লাগাম নেই। ঈগল জানিয়ে দিল ঐ কানদুটোই লাগামের কাজ করে। হীরা বলল—ও ঈগলবন্ধু, ঘোড়া কি ছুটবে না?

—এ ঘোড়া ছোটে না। আকাশে ওড়ে।

—কি মজা, কি মজা! আমি আকাশে উড়ব। বলেই সে নড়েচড়ে গুছিয়ে বসল ঘোড়ার পিঠে। অতি অল্প সময়েই সে আকাশে ঘোড়া ছোটাবার কৌশল জেনে নিল। তারপর আস্তে-আস্তে ঘোড়ার বাম কানটা বাম হাত দিয়ে ধরল আর ডান কানটা ডান হাত দিয়ে। কানদুটো আস্তে-আস্তে মোচড় দিতেই কাঠের ঘোড়াটা হয়ে গেল একেবারে পক্ষীরাজের ঘোড়া। সোঁ-সোঁ করে উঠতে লাগল আকাশে। শুধু বাম কানটা মোচড় দিতে ঘোড়া ঘুরে গেল বামদিকে। ডান কানটা মোচড় দিতেই ঘোড়াটা ডানদিকে ঘুরে হু-হু করে ছুটে চলল।

এইভাবেই হীরা ঘোড়ার পিঠে চেপে চলতে লাগল। আকাশের মাথার ওপর দিয়ে, রাশি-রাশি মেঘ ফুঁড়ে। চলতে লাগল বাড়ির পথে। একবার বেশি উপরে উঠে যাওয়ায় তার ভয় লাগল। সে সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়ার কানদুটো বিপরীত দিকে আস্তে-আস্তে ঘুরিয়ে দিল। ঘোড়াটা আস্তে-আস্তে খানিকটা নিচে নেমে এল। আর আগের মত একই গতিতে চলতে লাগল। অনেক ওপর দিয়ে।

হীরা ঘোড়ার পিঠে বসে নিচে তাকিয়ে দেখল ঘরবাড়িগুলো খুব ছোট-ছোট, যেন খেলনা বাড়ি। দেশলাই-এর খোলের মত লাগছে। বড়-বড় গাছগুলো লাগছে লম্বা ঘাসের মত। নদীকে লাগছে সুতি খালের মত। মনে হয় যেন খাতায় আঁকা ছবি। তার খুব আনন্দ হচ্ছে।

এদিকে তার মা আর বাবা সারা রাজ্য তন্ন-তন্ন করে তাকে খুঁজছে। খাওয়া নেই নাওয়া নেই, কেবলই লুকিয়ে-লুকিয়ে কাঁদছে তার মা। ছেলের জন্য তাঁরা আকুল। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলো তাঁরা আর কোনদিন হীরাকে বকাবকি করবেন না।

হীরামন সাদা পেঁজা তুলোর ভিতর দিয়ে ভাসতে-ভাসতে এগিয়ে

চলেছে। একসময় আনন্দে চিৎকার করে উঠল 'সোনালি ঈগল, সোনালি ঈগল' বলে। এবং চেয়ে দেখল বন্ধু ঈগল তার পিছনে-পিছনে উড়ে আসছে। হাত বাড়ালেই ধরা যাবে—একসময় এরকম কাছে চলে এল। উভয়েই ভেসে-ভেসে এগোচ্ছে হীরার বাড়ির দিকে। ঈগল যেন হীরার দেহরক্ষী হয়ে তাকে এক নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে চলেছে।

হঠাৎ হীরা তার ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিল—ঘোড়াটার কানদুটো মুচড়ে দিয়ে। আবার নিচের দিকে ঘোরাতেই ঘোড়াটা নামতে লাগল নিচে। নামতে-নামতে সে নেমেই পড়ল তাদের বাড়ির সামনের একফালি উঠোনে। বন্ধু ঈগল তাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়ে সোঁ-সোঁ করে আকাশে উড়ে মিলিয়ে গেল।

মা হঠাৎ হীরামনকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগলেন। গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললেন—আমি আর তোকে কক্ষনো বকাবকি করব না। কক্ষনোও না।

হীরা বলল—না মা, তুমি আমায় বকাবকি করেছিলে নিশ্চয়ই আমার ভালোর জন্যে। আমি আবার স্কুলে যাব। আর কোথাও পালাব না। ঈগল বন্ধু আমাকে বলেছে।

হীরা, সমস্ত ঘটনা মাকে খুলে বলতেই মা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বাবা দূরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন হীরামনের দিকে।
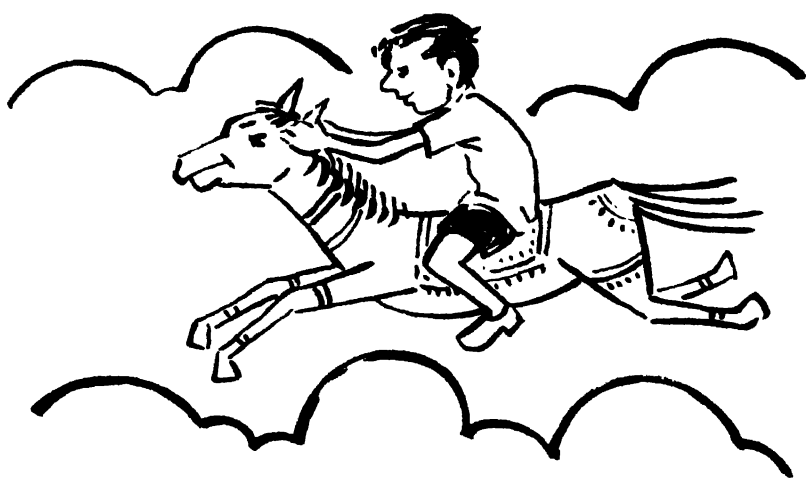
চিংড়ির বুদ্ধি

সুনির্মল চক্রবর্তী

সে অনেক-অনেকদিন আগের কথা।

এক ছিল বুড়ো আর এক ছিল বুড়ি।

একদিন বুড়ো মেলায় গেল। সেখানে গিয়ে কিনল এক ছাগল। ছাগল নিয়ে খুব খুশিতে বাড়ি ফিরল বুড়ো। পরদিন সকালবেলা বড় ছেলেকে ডেকে বলল, "যাও, ছাগল চরিয়ে এসো।"

ছেলে সন্ধে অবধি ছাগল চরাল, তারপর ছাগল নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। দরজার সামনে আসতেই দেখল বুড়ো লাল জুতো পরে দাঁড়িয়ে আছে। ছাগলকে বলল, "হ্যাঁ রে, পেটে ঠিকমতো দানাপানি পড়েছে তো?"

"না দাদু, আমি কিছুই খাইনি। কী খাব? দানাপানি জুটবে, তবে না? তবু—

গাছ পেরিয়ে এক লাফেতে
যেই গিয়েছি ছুটে,
ঠোঁটের কোণে একটা পাতা
কখন গেল জুটে।
সাঁকো দিয়ে এক লাফেতে

পেরিয়ে গেছি যেই,
একফোঁটা জল পেয়েছিলাম
আর তো মনে নেই।
সেইটুকুই খেয়েছি, আর সেইটুকুই পেয়েছি আমি।"

ছাগলের কথা শুনে বুড়ো বড্ড খেপে গেল তার ছেলের ওপর। বকেঝকে ছেলেকে ঘর থেকে বের করে দিল। এমন অপদার্থ ছেলে তার, যে সারাদিন বেচারা ছাগলকে ঠিকমতো দেখাশোনাই করেনি। তাকে না খাইয়ে রেখেছে।

পরদিন ছোট ছেলেকে ডাকা হল। বুড়ো বলল, "যাও, ছাগল চরিয়ে এসো।"

ছোট ছেলেও সন্ধে অবধি ছাগল চরাল, তারপর ছাগল নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। বাড়ির সামনে আসতেই দেখল দরজার পাশে বুড়ো লাল জুতো পরে দাঁড়িয়ে। ছাগলকে বুড়ো বলল, "হ্যাঁ রে, আজ নিশ্চয়ই পেটে ঠিকমতো দানাপানি পড়েছে?"

"না গো দাদু, আজ কিছুই খাইনি। যেখান চরে বেড়িয়েছি সেখানে তো ঘাসই নেই। এমন কী জলও পাওয়া যায় না। তবুও—
গাছ পেরিয়ে এক লাফেতে
যেই গিয়েছি ছুটে,
ঠোঁটের কোণে একটা পাতা
কখন গেল জুটে!
সাঁকো দিয়ে এক লাফেতে
পেরিয়ে গেছি যেই,
একফোঁটা জল পেয়েছিলাম
আর তো মনে নেই।"

ছাগলের কথা শুনে বুড়ো খুব রেগে গেল তার ছেলের ওপর। গালাগাল দিয়ে ছেলেকে ঘর থেকে বের দিল। ছোট ছেলেও যে এক অপদার্থ, তা আগে জানা ছিল না তার।

বুড়ো ভাবল, পরদিন বুড়িকেই পাঠানো যাক।

সকাল হতেই বুড়িকে ডাকল সেই বুড়ো। বলল, "ছেলেদের দেখলাম, কোনও কম্মের নয়, এবার তুমিই যাও। ছাগল চরিয়ে এসো। বেচারা দুদিন

ধরে কিছুই খায়নি।”

বুড়ি বুড়োর কথামতো সন্ধে অবধি ছাগল চরাল। তারপর ছাগল নিয়ে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরল। দরজার সামনে বুড়ো লাল জুতো পরে তখন দাঁড়িয়ে। বুড়ো ছাগলকে বললে, “হাঁ রে, আজ নিশ্চয়ই পেটে দানাপানি পড়েছে?”

“না দাদু, আজও কিছুই খাইনি। বুড়ি তো আমাকে নিয়ে হাঁটতেই পারে না। যেখানে চরে বেড়িয়েছি সেখানে ঘাসই নেই। জলও পাওয়া যায় না। তবুও—

গাছ পেরিয়ে এক লাফেতে
যেই গিয়েছি ছুটে,
ঠোঁটের কোণে একটা পাতা
কখন গেল জুটে!
সাঁকো দিয়ে এক লাফেতে
পেরিয়ে গেছি যেই,
এককোঁটা জল পেয়েছিলাম
আর তো মনে নেই।”

বুড়ো এসব কথা শুনে খেপে গিয়ে বুড়িকেও ঘর থেকে তাড়িয়ে দিল।

পরদিন বুড়ো নিজেই গেল ছাগল চরাতে। সারাদিন মাঠে-মাঠে ছাগল চরাল। তারপর সন্ধেয় বাড়ির দিকে পা বাড়াল। নিজেই আগে-আগে এল। লাল জুতো পরে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

ছাগলকে ডেকে এবারে বুড়ো বলল, “আজও কি বলবি যে পেটে কিছুই পড়েনি?”

“হ্যাঁ গো দাদু, তুমি ঠিক বলেছ, আজও কিছুই খাইনি।”

বুড়ো এবারে ভীষণ খেপে গেল। কামারশালায় গিয়ে ছুরিতে শান দিল। তারপর ছাগলকে কাটতে গেল। ছাগলের বড্ড তেজ। বুড়োকে ফেলে সে দৌড়ল বনের দিকে।

বনে এসে এক খরগোশের বাসায় ঢুকল। লুকিয়ে রইল রান্নাঘরের কোনায়!

খরগোশ বাড়ি ফিরল। ঘরে ঢুকেই গন্ধ শুঁকে বুঝল কেউ ঘরে লুকিয়ে আছে। জিজ্ঞেস করল, “কে, কে তুমি?”

ছাগল কম দুষ্টু নয়। বলল,
"নাদুসনুদুস দেখতে আমি
কোটটা ছেঁড়াফাটা,
তিন পয়সায় কিনল বুড়ো
আছে বুকের পাটা।
শিং বেঁধাতে পারি তোমায়,
ভয় দেখাতেও খামতি কোথায়?
লেজটা দিয়েও মারতে পারি
তোমার মুখে চাঁটা,
দৌড়ে যদি পালাও ভাল
না হয় দিও হাঁটা।"

খরগোশ তো এসব শুনে সত্যিকারের ভয়ই পেল। ঘর ছেড়ে দৌড়ে পালাল সে। গাছের নিচে বসে কাঁদতে লাগল।

হঠাৎই থপথপ আওয়াজ করে সেখানে এল এক ভালুক। জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে হাপুস-হুপুস, কেন কাঁদছিস তুই? কে তোকে মেরেছে? কে বকেছে?

কাঁদো-কাঁদো স্বরে খরগোশ বলল, "আর বোলো না! এক ভয়ঙ্কর জন্তু আমার ঘরে এসে বসে আছে। আমাকে এমন ভয় দেখাল যে..."

"বেশ, আমি দেখছি। আমিই ব্যাটাকে মেরে শেষ করব।" এই বলে খরগোশের ঘরে গিয়ে ঢুকল সেই ভালুক।

ঘরে ঢুকে উঁকি দিয়েই ভালুক বলল, "ঘরের মধ্যে কে তুই? একবার আয় দেখি কাছে।"

ছাগলটা একটুও ভয় না পেয়ে বলল,
"নাদুসনুদুস দেখতে আমি
কোটটা ছেঁড়াফাটা,
তিন পয়সায় কিনল বুড়ো
আছে বুকের পাটা।
শিং বেঁধাতে পারি তোমায়,
ভয় দেখাতেও খামতি কোথায়?
লেজটা দিয়েও মারতে পারি

তোমার মুখে চাঁটা,
দৌড়ে যদি পালাও ভাল
না হয় দিও হাঁটা।”

ভালুকও ভীষণ ভয় পেয়ে খরগোশের ঘর ছেড়ে দৌড়ে পালাল। যেতে-যেতে বলল, “বাপ রে! কী ভীষণ জন্তু! খরগোশ-বোন তোর জন্যে কিছুই করতে পারলুম না।”

খরগোশ আর কী করে? আবার গাছের নিচে বসে কাঁদতে লাগল। হঠাৎই সেখানে এল এক ধেড়ে নেকড়ে। জিজ্ঞেস করল, “হ্যাঁ রে, বোকার মতো হাপুস-হুপুস কাঁদছিস কেন? আমি থাকতে তোর ভয় কিসের? একবার বল কে তোকে মেরেছে, কে বকেছে?”

কাঁদো-কাঁদোভাবে খরগোশ বলল, “আর বোলো না দাদা, এক ভয়ঙ্কর জন্তু আমার ঘরে এসে বসে আছে। আমাকে এমন ভয় দেখাল যে...”

“বেশ, আমি দেখছি,” এই বলে খরগোশের ঘরে গিয়ে ঢুকল সে। ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে বলল, “ঘরের মধ্যে কে রে তুই? দেখি একবার মুখখানা, তোর সাহস তো কম নয়, একবার আয় দেখি কাছে।”

ছাগলটা এবারও ভয় না পেয়ে বলল,

“নাদুসনুদুস দেখতে আমি
কোটটা ছেঁড়া ফাটা,
তিন পয়সায় কিনল বুড়ো
আছে বুকের পাটা।
শিং বেঁধাতে পারি তোমায়,
ভয় দেখাতেও খামতি কোথায়?
লেজটা দিয়েও মারতে পারি
তোমার মুখে চাঁটা,
দৌড়ে যদি পালাও ভাল
না হয় দিও হাঁটা।”

ভয় পেয়ে নেকড়েটা সেই যে পালাল আর তাকে কেউ দেখতেও পেল না।

যেতে-যেতে অবশ্য বলেছিল, “বাপ রে! আগে জানলে এখানে কেউ আসে? কথায় বলে, চাচা আগে আপন প্রাণ বাঁচা।”

খরগোশ কী করবে ভেবেই পেল না। গাছের নিচে বসে এবারও

কাঁদতে লাগল।

পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক ধুমসো শেয়াল। খরগোশকে কাঁদতে দেখে বলল, "কী হয়েছে তোর? কেন কাঁদছিস?"

কাঁদো-কাঁদো স্বরে খরগোশ বলল, "শেয়ালমামা আর বোলো না। সেই থেকে এক অদ্ভুত জন্তু আমার ঘরে বসে আছে। নড়ছেও না চড়ছেও না। আমাকে এমন ভয় দেখাল যে, আর একটু হলেই মরে যেতুম।"

"বেশ, আমি দেখছি।" এই বলে খরগোশের ঘরে গিয়ে ঢুকল সে। ঘরে ঢুকে বলল, "কে রে তুই? তোর সাহস তো কম নয়। দেখি তোর মুখখানা।"

ছাগলটা গম্ভীর হয়ে বলল,

"নাদুসনুদুস দেখতে আমি
কোটটা ছেঁড়াফাটা,
তিন পয়সায় কিনল বুড়ো
আছে বুকের পাটা।
শিং বেঁধাতে পারি তোমায়,
ভয় দেখাতেও খামতি কোথায়?
লেজটা দিয়েও মারতে পারি
তোমার মুখে চাঁটা,
দৌড়ে যদি পালাও ভাল
না হয় দিও হাঁটা।"

ভয় পেয়ে ধুমসো শেয়াল লেজ তুলে সেই যে পালাল, কেউ তাকে খুঁজেও পেল না।

খরগোশ বেচারা আর কী করে? গাছের নিচে বসে এবারও কাঁদতে লাগল।

সেই সময় কোত্থেকে হামাগুড়ি দিয়ে এল এক গলদাচিংড়ি। জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে, তখন থেকে কেন কাঁদছিস তুই?"

খরগোশকে বলতে হল, "কেন কাঁদব না মাসি? এক ভয়ঙ্কর জন্তু আমার ঘরে সেই যে ঢুকে বসে আছে, আর বেরোতেও চায় না। আমি কার ঘরে গিয়ে উঠি বলো?"

"বেশ, আমিই দেখি ওকে ভাগাতে পারি কি না।"

খরগোশ বলল, "তুমি কী করে পারবে মাসি? ভালুকদাদা গেল, পারেনি। নেকড়েভাই গেল, সেও পারেনি। শেষপর্যন্ত শেয়ালমামাও গেল, সেও

পারল না। তুমি কী করে পারবে শুনি?”

“একবার দেখি চেষ্টা করে।”

এই বলে হামাগুড়ি দিয়ে খরগোশের ঘরে গিয়ে ঢুকল সেই গলদাচিংড়ি। তারপর বলল, “কে রে তুই ওখানে বসে আছিস?”

ছাগল একটুও ভয় পেল না। আগের মতোই আওড়াল,

“নাদুসনুদুস দেখতে আমি
কোটটা ছেঁড়াফাটা,
তিন পয়সায় কিনল বুড়ো
আছে বুকের পাটা।
শিং বেঁধাতে পারি তোমায়,
ভয় দেখাতেও খামতি কোথায়?
লেজটা দিয়েও মারতে পারি
তোমার মুখে চাঁটা,
দৌড়ে যদি পালাও ভাল
না হয় দিও হাঁটা।”

চিংড়িমাসি মোটেই ভয় পেল না। হামাগুড়ি দিয়ে রান্নাঘরের কোনায় গিয়ে পৌঁছল। তারপর বলল,

“সবার মতো ভয়টি পাব
আমি কিন্তু তেমন নই,
কামড়ে দিলেই বুঝবি ঠেলা
আমি গলদাচিংড়ি হই।
খামচে যদি দিই এখুনি
দেখবি চোখে সর্ষে ফুল,
বুঝবি তখন চালাক সেজে
ভয় দেখানো কেমন ভুল।”

সত্যি-সত্যিই ছাগলটাকে খুব জোরে কামড়ে দিল সেই গলদাচিংড়ি। দুষ্টু ছাগল ব্যা-ব্যা করে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে সেই যে ছুট দিল আর তাকে দেখাই গেল না।

খরগোশের তখন আনন্দ দেখে কে। ঘরে এসে চিংড়িমাসিকে বাহবা দিল। কতবার বলল, “সাবাস চিংড়িমাসি!”

সেদিন থেকে খরগোশ তার বাড়িতেই খুব আরামেই থাকে।

(ইউক্রেনের উপকথা অবলম্বনে)

কাঁচের পুতুল

তপনকুমার দাস
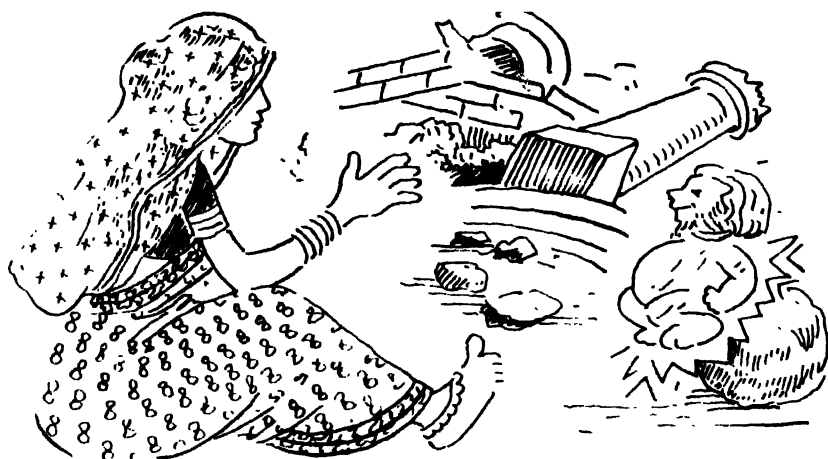
চাষীর মেয়ে লক্ষীমনির সাথে বিয়ে হয়ে গেল সওদাগরের ছেলে অরূপকুমারের। সওদাগর আসলে ব্যবসায়ী। অনেক অনেকদিন আগে ব্যবসায়ীদের বলা হতো সওদাগর। অরূপকুমারের বাবা বিজয়শংকর বাণিজ্য করতে এসে দেখে ফেলে লক্ষীমনিকে। গরিব চাষীর মেয়ে—বাবার সাথে হাটে এসেছে বায়না করে। ঝাঁকায় ভরে লাউ কুমড়ো বেঁচে চাল ডাল কিনবে আর পয়সা বাঁচলে মেয়ে লক্ষীমনিকে কিনে দেবে দু'একটা কাঁচের

ব্যস! ঐ কাঁচের চুড়ি কিনতে গিয়েই যত তালগোল। বিজয়শংকরের সামনা-সামনি পড়ে গেল লক্ষীমনি। অমনি কাঁচের চুড়ি হাতে উঠলো। দুটো নয়, চারটে নয়, একেবারে ডজন ডজন। লক্ষীমনিকে চুড়ি পরিয়ে বাবা শিবনাথকে দোকানের আড়ালে ডেকে নিয়ে কি যে বললো বিজয় সওদাগর কে জানে। বিয়ে ঠিক হয়ে গেল লক্ষীমনির। হবেই বা না কেন। অমন সুন্দরী মেয়ে কি আর সাত দেশের সাইত্রিশ গাঁয়ে কোথাও আছে?

শিবনাথ অবশ্য আপত্তি করেছিলো। গরীবের মেয়ে বড়লোক শশুর

বাড়িতে যদি বেমানান হয়? চাল নেই, চুলো নেই, সোনা নেই, দানা নেই, টাকা নেই, পয়সা নেই সে কি ভাবে মেয়ের বিয়ে দেবে? তাছাড়া জামাই তো আর যে সে ছেলে নয় একেবারে ডাকসাইটে সওদাগরের ছেলে। একমাত্র ছেলে। ঠিক রূপকথার রাজপুত্তুরের মতো। বিজয়শংকর নাছোড়বান্দা। না, এসব ঠুনকো ওজর আপত্তি শোনার পাত্রই নয় সে। চাল নেই তো কি হয়েছে নতুন খড় পাঠিয়ে চাল তুলে দেবে। সোনা দানা? একমাত্র ছেলের বউকে মুড়ে রাখবে সোনা দানা হারে মুক্তো জহরতের চুড়ি গয়নায়। টাকা পয়সা? গৌরী সেন বিজয়শংকর বেঁচে থাকতে অভাব কিসের? সব দিয়েও তার লক্ষীমনিকে চাই। রাজপুত্তুর ছেলের রাজকন্যে বউ।

অতএব আর আপত্তি করতে পারে না শিবনাথ। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে, মেয়ের সুখের কথা চিন্তা করে দুচোখ তার জলে ভরে ওঠে। ন্যাঁ ত্যানঁ ন্যাঁ নাঁ—সানাই বেজে ওঠে গরীব চাষীর অঙ্গনে। বেজে ওঠে ড্যাম কুড় কুড় ঢোল কাঁসর—উলু শঙ্খের সুরে গমগম করে ওঠে বাতাস। বিজয়শংকর নিজে দাঁড়িয়ে বিয়ের সব ব্যবস্থা তদারকি করে। সারা গাঁয়ের লোক পাতা পাড়ে শিবনাথের উঠোনে—পেট ভরায় মন্ডা মেঠাই পোলাও কোপ্তা কালিয়ায়। বিয়ের পরদিন সকালে অরূপকুমার লক্ষীমনিকে নিয়ে পাড়ি দেয় শহরের বাড়িতে। নতুন চকচকে ফুলে-ফুলে মোড়া ময়ূরপঙ্খীর মতো গাড়িতে চাপিয়ে গাঁয়ের পথের সব ধুলো উড়িয়ে লক্ষীমনি চলে যায় শ্বশুরবাড়ি।

শিবনাথ গরীব চাষী। মেয়ের বিয়েতে কিছুই যৌতুক দিতে পারে না। সোনা-দানা, গয়না-গাটি, খাট-পালঙ্ক, আলমারি-টালমারি, বিছানা-টিছানা, কাপড়-চোপড় কিছুই না—কিচ্ছু না। অবশ্য বিজয়শংকর চায় নি কিছুই। লক্ষীমনি কিন্তু চুপিচুপি একটা জিনিষ না নিয়ে কিছুতেই ছাড়ে না। সবাই বোঝায় বড়লোক শ্বশুরবাড়িতে কত কত জিনিস পাবি। লক্ষীমনির ঐ এক গোঁ—কাঁচের পুতুলটা না নিয়ে কিছুতেই সে শশুরবাড়ি যাবে না—দরকার হলে বিয়ের সব কাপড়-চোপড়—বিজয়শংকরের দেওয়া গয়না গাঁটি সব খুলে ছেঁড়া জামা পরে পেয়ারা গাছ তলায় দড়ির দোলনায় দোল খেতে চলে যাবে।

মেয়ের জিদ দেখে অগত্যা শিবনাথ আর তারামনিকে রাজী হতে হয়। বিদায়ের সময় লক্ষীমনির কাপড়ের পুটলীর সাথে বেঁধে দিতে হয় কাঁচের পুতুলটা। পুতুল ঠিক নয়, একটা নকশা করে কাঁচের শিশি। দামী বিদেশী আতরের শিশির মত। ইয়া বড় দৈত্যের পেটওয়ালা ছোট্ট শিশিটার মুখে সিংহের আদল। সিংহের মুখ শক্ত করে শিশির গায়ে আটকানো—খোলা যায় না। অন্ততঃ হাজার চেষ্টা করেও শিবনাথ, তারামনি আর লক্ষীমনি কোন দিন খুলতে পারে নি। খুলেও কোন লাভ নেই। কারণ ফাঁকা শিশি—চকচকে কাঁচের আড়ালে দিব্যি বোঝা যায় ভেতরে কিছুই নেই।

লক্ষীমণির বয়েস তখন চার কি পাঁচ। বলদ আর লাঙল নিয়ে মাঠে চাষ করছিল শিবনাথ। মনটা মোটেই ভাল ছিল না। বিকেলের রোদে ঘেমে নেয়ে একশা। এত পরিশ্রম করেও দুবেলা দু মুঠো ভাত ঠিকমত পেটে পড়ে না—তার উপর আবার মেয়ের বায়না—খেলনা কিনে দিতে হবে। লক্ষীমনিরই বা কি দোষ? ওর বয়সী সব মেয়েদের এতো এতো খেলনা আছে—পুতুল আছে—আর লক্ষীমনির? মাটি ছেনে উনুনের আগুনে পুড়িয়ে এই টুকু টুকু চারটে পুতুল বানিয়ে দিয়েছে তারামনি। তাতেই খুশি ছোট্ট টুকটুকে লক্ষীমনি। সেই চারটে মাটির পোড়া পুতুলের কোনটা মেয়ে, কোনটা ছেলে। ছোটো দুটো আবার নাতি নাতনি। মায়ের ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো পরিয়ে তাদের সাজায়—বাগান থেকে ফুল তুলে এনে পুজো পুজো খেলা করে আপনমনে। কিন্তু অত সকালে বাদ সাধলো ঐ সাড়ে ছ আনাওয়ালা ফেরীওয়ালা। পুতুল কিনে দিতে হবে লক্ষীমনিকে। শিবনাথের ট্যাঁক শূন্য আর তারামনির ভাঁড়েও ভবানী। মেয়ের বায়না কুলানো তাদের সাধ্যে নেই। সাধ্যে না থাকলে কি আর ঐটুকু ছোট মেয়ে শোনে—সে কান্না জুড়ে দেয়—হাউ হাউ করে দুচোখ জলে ভাসিয়ে। শিবনাথের তখন মাঠে যাওয়ার সময়। বিরক্ত হয়ে ধমক দেয় মেয়েকে। হাত ওঠায় চড় মারতে।

এইসব সাতপাঁচ ভাবতে-ভাবতে মনটা যখন খুব ভারী হয়ে উঠেছে শিবনাথের, ঠিক তখনই লাঙলের ফলায় ঠক ঠকাং। হেই! হাঃ! বলদ দুটোর রাশ টেনে ধরে দাঁড় করায়। নিচু হয়ে লাঙলের ফলার কাছে শব্দ লক্ষ্য করে হাতে তুলে নেয় মাটির চাঙড়। ওমা—এযে সীতা পুতুল। মাটি

ফুড়ে যেমন জনক রাজার ঘরে এসেছিলো ঠিক তেমন। চকচকে কাঁচের বাহারী শিশি। পুতুলের চেয়েও অনেক অনেক বেশী সুন্দর। সাড়ে ছ'আনার পুতুল-এর কাছে ছোঃ। মাঠের কাজ থামিয়ে হুড়মুড় করে বাড়ি ছুটে অসে শিবনাথ। কুঁয়োর থেকে বালতি বালতি জল তুলে ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে কুড়িয়ে পাওয়া কাঁচের পুতুলটাকে। আর লক্ষীমনি—পুতুল পেয়ে কি খুশি, কি খুশি।

সেই যে কাঁচের শিশিরের পুতুল আঁকড়ে ধরেছে লক্ষীমনি—একেবারের জন্যও কাছ ছাড়া করেনি এখনও পর্যন্ত। নাইতে, খেতে, উঠতে বসতে, খেলতে কাঁচের পুতুল সঙ্গী হয়ে আছে। চোখের আড়াল করতেও মন চায় না। লক্ষীমনি সারা পৃথিবী একদিকে ঠেলে ফেলতে পারে কিন্তু কাঁচের পুতুল কিছুতেই নয়। তাই অরূপকুমারের সাথে বিয়ের পরে সেই পুতুলের সঙ্গ ছাড়বে কি ভাবে?

ওদিক বিজয়শংকরের বাড়িতে হৈ হৈ হুলুস্থুল। কি সুন্দর টুকটুকে বউ এনেছে অরূপকুমার—ঠিক রূপকথার পরীর মত। কিন্তু, এ্যা মা! বউয়ের সাথে সোনা দানা কই? গয়না গাটি কই? ঘাট আলমারি কই? দামী দামী কাপড়-চোপড় জিনিষ পত্তর কই? তত্ত্ব কই? এটা কই? সেটা কই? বাড়ির মেয়ে বউরা সব গুনগুন করে, ফিস ফিস করে। শেষ পর্যন্ত লক্ষীমনির সামনে সকলের হয়ে হাজির হয় অরূপকুমারের ছোট পিসি মানদাসুন্দরী, কি গো বউ, তোমার বাপ মা কি দিলো দেখাও!

লজ্জায় কুঁকড়ে যায় লক্ষীমনি। পুটলীতে একটা আটপৌরে গামছা ডুরে শাড়ি আর সেই কাঁচের পুতুল ছাড়া যে কিছুই নেই। সওদাগর বাড়ির ঝিঁ চাকররাও অমন শাড়ি জন্মে পরে না। এই পুটলী কি খোলা যায় সবার সামনে? এত বড়লোক শশুর বাড়িতে? মাথা নিচু করে বসে থাকে সে—তার দুচোখ বেয়ে জল পড়ে টপ টপ করে।

লক্ষীমনির চোখের সেই জল মুখ গড়িয়ে, পুটলি এড়িয়ে টপ করে নক্‌শা কাটা পাথরের মেঝেতে পড়ে। অমনি কড় কড় কড়াৎ....। মেঘের ডাক তো নয়, যেন হাজার হাজার দৈত্য গর্জে ওঠে একসাথে। ডেঙ্গু জ্বরের কাঁপুনির মত থরথর করে কেঁপে ওঠে সওদাগরের বিশাল প্রাসাদ। এতক্ষণের সব আনন্দ ধুলোয় মিশিয়ে রব ওঠে, বাঁচাও! বাঁচাও!

অন্যদের মত লক্ষীমনিও ভয়ে শিরশির করে ওঠে। হঠাৎ একোন অঘটন! ছুটে আসে অরূপকুমার। বিজয়শংকর। বাড়ির মেয়েরা কেউ শাঁখ বাঁজায়। কেউ উলু দেয়। আজ বুঝি কারো রক্ষে নেই। খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় লক্ষীমনি—আকাশে ঘন কালো মেঘের চাদর। ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায় তার। নতুন বউয়ের রকমসকম দেখে ভারী রাগ হয় অরূপকুমারের ছোট পিসির। ঝড়ের বেগে সারা শরীর ধড়ফড় করে কাঁপলেও মুখের বিরাম নেই, কি যে অলুক্ষুণে বউ আনলে দাদা। দেখা নেই, শোনা নেই, ওঠ ছেমরী তোর বিয়ে। নাও, এখন ঠ্যালা সামলাও।

কে কার ঠ্যালা সামলাবে? ঝড়ের ঠ্যালা সামলাতেই তখন সবার প্রাণ ওষ্ঠাগত। অলুক্ষুণে শব্দ লক্ষীমনি কোনদিনও শোনে নি। তাই তার মনে হয় 'অলুক্ষুণে' খুব খারাপ গালাগালি। অমনি তার চোখ গড়িয়ে আরও জল বেয়ে আসে আর টুপটাপ পড়তে থাকে নক্‌শা পাথরের মেঝেয়। লক্ষীমনির চোখের জল যত মেঝেয় পড়ে তত বাড়ে ঝড়ের বেগ—আর মেঘের কড়াৎ কড় ডাক। ঝড়ের বেগে একসময় হুমমুড় করে ভেঙে পড়ে বিজয়শংকরের বিশাল প্রাসাদ। চোখ বন্ধ করে শিউরে ওঠে লক্ষীমনি। মুহূর্তের মধ্যে লক্ষীমনির চোখ ভরে যায় কালো কালো অন্ধকার সব বিন্দুতে। শেষ পর্যন্ত যখন চোখে আলো আসে তখন ঝড় থেমে গেছে। চারপাশে কেউ নেই-কেউ না। না বিজয়শংকর, না অরূপকুমার। ধূ ধূ মাঠের মাঝে একা লক্ষীমনি। সামনে বাপের বাড়ি থেকে বহে আনা সেই পুটলী। ভেতরে গামছা ডুরে শাড়ি আর কাঁচের শিশি পুতুল।

বাবা মা-র জন্য ভীষণ মন খারাপ হয় লক্ষীমনির। বিয়ে করে রাজরানী হওয়া দূরে থাক—পথের ভিখারীর চেয়েও খারাপ দশা তার। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ ঝড়ে সব স্বপ্ন সাধ ভেঙে চুরচুর হয়ে যায় লক্ষীমনির। কোথায় উধাও গাঁয়ের বাপের বাড়ি আর শহরে শ্বশুরের পেল্লায় অট্টালিকা? মন যত খারাপ হয় তত চোখ ভেসে যায় জলে। যত চোখ জলে ভেসে যায় ততই মন খারাপ হয়ে যায়।

শুধুই কি বাপের বাড়ির জন্য? লক্ষীমনির মন খারাপ হয় শশুর বাড়ির জন্যও। মন খারাপ হয় বিজয়শংকর আর অরূপকুমারের জন্য। নিজেকে সত্যিই অলুক্ষুণে মনে হয়—নইলে এমন ঝড় উঠবে কেন? হাউ মাউ

করে কেঁদে ওঠে লক্ষীমনি। বিয়ের নতুন বেনারসী ভিজে যায় চোখের জলে। পুটলী খুলে বের করে কাঁচের পুতুল। তার অনেক অনেক দিনের পুরানো বন্ধুকে। দু'হাতে চেপে তাকে চোখের সামনে মেলে ধরে। বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ভাসিয়ে দেয় পুতুলের সারা শরীর। কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ কাঁচের শিশিরের আড়াল থেকে দূরে কি যেন দেখতে পায় লক্ষীমনি। ঘোড়া ছুটিয়ে কে যেন ভেসে আসছে মেঘের ওপার থেকে—টগ বগ কিবিস কিবিস। মনটা ভারী চনমনে হয়ে ওঠে। ডাকাত কিংবা দৈত্য নয় তো? ভূত পেত্নী ব্রহ্ম নয় তো?

না গো না তোমার অরূপকুমার...। তোমার রূপকথার রাজপুত্তুর।

কে? চমকে ওঠে লক্ষীমনি। শূন্য ধূ ধূ মাঠে কার গলা? এমন সুন্দর গানের সুরের মত?

আমি গো! তোমার বন্ধু! কাঁচের পুতুল...ভারী ভয় পায় লক্ষীমনি। কাঁচের পুতুল! এতদিন তার কোলে পিঠে কাছে কাছে আছে, কোনদিন তো কথা বলে নি? তবে কি অলুক্ষুণের জের?পুতুলটা সত্যি দানো নয় তো? ধুত্তোরী! হাতের এক ঝটকায় সে ছুড়ে ফেলে কাঁচের পুতুল। সামনেই ছিলো একটুকরো পাথর। ব্যস, ছুঁড়ে ফেলা মাত্রই পাথরে আছাড় খেয়ে চুরচুর ভেঙে যায় খান খান হয়ে। কাঁচের পুতুল কি আর পাথরের ঠোক্কর সইতে পারে?

না! ঝনঝন করে কান্নায় ভেঙে পড়ে লক্ষীমনি—এ তো সে চায় নি। সে কিছুতেই চায় নি। তার এমন সাধের পুতুল চুর চুর হয়ে যাক ভেঙে।

ছিঃ! দুঃখ করতে নেই। কাচের জিনিষ তো ভাঙার জন্যই তৈরী হয়, কে যেন সান্ত্বনা দেয় লক্ষীমনিকে। মাথায় হাত বোলায়। পিঠে হাত রাখে। হাত তো নয় যেন ফুলের রেণু। তবু চোখ খোলে না লক্ষীমনি। বিয়ে হয়ে বাবা মা পর হলো। ঝড়ে শশুর বাড়ি হারালো আর ভয় পেয়ে ভেঙে ফেললো এতদিনের বুকে ধরে রাখা সাধের কাঁচের পুতুল। এরপরও কি কারও চোখ খুলতে ইচ্ছে করে?

এমা, এতবড় মেয়ে কাঁদে! মিষ্টি গানের সুরের মত মনে হয় কথাগুলো, এখুনি ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পড়বে রাজপুত্তুর অরূপকুমার—নতুন বউকে কাঁদতে দেখলে কি যে মজা পাবে...

যা-ও! লজ্জায় লাল হয়ে যায় লক্ষীমনি। ঘোড়ার খুরের কিবিস কিবিস টগ বগম আওয়াজ কানের খুব কাছে ভেসে আসে। তবু চোখ খুলতে সাহস পায় না। ধূ ধূ মাঠে যদি ভূত পেত্নী ধরে? কিংবা নিশি?

নিশিরা তো রাত্রে বের হয়—এখন যে ফুটফুটে দুপুর গো...

তাই তো! তারামনির কাছে শোনা সব গল্পের নিশিরা তো রাত্রে ছাড়া বের হয় নি। মনে মনে খুব লজ্জা পায় লক্ষীমনি। চোখ বন্ধ করেই পিঠে হাত রাখা মানুষটাকে অনুভব করার চেষ্টা করে। কি নরম ফুলের মত তুলতুলে হাত। মানুষের মত না হলেও ভূত পেত্নী বা দৈত্য দানবের মত নয়। আস্তে আস্তে মনের জোর ফিরে আসে, বল না গো তুমি কে?

এমা! আমায় চিনতে পারলে না? এতদিন আমার সাথে খেলা করলে, নাড়লে চাড়লে আর এখন চিনতে পারছো না? রাজপুত্তুর পেয়ে আমায় ভুলে গেলে? আমি তোমার কাঁচের পুতুল গো-কাঁচের পুতুল...

কাঁচের পুতুল কি এমন নরম তুলতুলে হয়? তার কি হাত পা আছে। সে কি কথা বলতে পারে? অভিমান করে বলে লক্ষীমনি, তাছাড়া সে তো ভেঙে চুর চুর হয়ে গেছে।

ভেঙে গেছে বলেই তো আমি মুক্তি পেয়ে তোমার সাথে কথা বলতে পারছি—তোমার গায়ে মাথায় হাত দিচ্ছি।

মুক্তি পেয়ে-মানে? চোখ বন্ধ রেখেই অবাক হয় লক্ষীমনি।

চোখ খুলেই না হয় একবার আমাকে দেখে নাও। অনুরোধ করে কাঁচের পুতুল। তবু চোখ খোলার সাহস হয় নি লক্ষীমনির—

আসলে তো আর আমি কাঁচের পুতুল ছিলাম না। ছিলাম পরীর রানী। আতরপরীর কাছ থেকে গন্ধ চুরি করে নাকে ধরে রেখেছিলাম কিনা তাই রাজা আমাকে বেদম শাস্তি দিয়ে পুঁতে রেখেছিল চাষের ক্ষেতে। সেখান থেকে টুক করে তোমার বাবার লাঙলের ফলায় উঠে সোজা হাজির হলাম তোমার কাছে। তোমার খেলনা পুতুল হয়ে।

কাঁচের পুতুলের কথা শুনতে শুনতে একটু একটু করে মনের মধ্যে সাহস বাড়তে থাকে লক্ষীমনির। আর কানের মধ্যে বাড়তে থাকে ঘোড়ার খুরের কিবিস কিবিস টগম বগম আওয়াজ—

তারপর! তারপর! চোখ বন্ধ করেই জানতে চায় লক্ষীমনি। ঠিক মায়ের

কোলে শুয়ে রূপকথার গল্প শোনার মত।

তারপর আর কি! কাঁচের শিশির মধ্যে বসে তোমার আদর খেতাম আর মনে মনে ভাবতাম সুযোগ পেলেই তোমাকে রানী করে দেবো। রাজপুত্তুরের সাথে তোমার বিয়ে দেবো। সাতমহলা বাড়ি করে দেবো। সাত ডিঙা হিরে জহরৎ দেবো। তুমি যা চাইবে তাই দেবো। সব দেবো। সারা জগত উজার করে দেবো।

অলুক্ষুণে মেয়ের কপালে কি আর সে সব আছে, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে লক্ষীমনি।

নেই মানে? থাকতেই হবে। আমি আছি না। তোমার বন্ধু সারা পরীর দেশ এনে উজার করে দেবে তোমার জন্য। তোমার আদর যত্ন না পেলে আমি কবেই মাটির নীচে গুমরে টুকরো টুকরো হয়ে মরে যেতাম।

কাঁচের পুতুলের কথা শুনে লক্ষীমনির মনটা উথলে ওঠে। নিজের তো কোন দিদি ভাই বোন কেউ নেই তাই পরীর রানিকেই দিদি বলে ডাকতে ইচ্ছে করে, জানো দিদি,আমার বাবা না ভীষণ গরীব...

কে বলেছে তোমার বাবা গরীব? লক্ষীমনির মুখের কথা কেড়ে নেয় কাঁচের পুতুল, তোমার বাবার মতন সৎ আর ভালো মানুষেরা কি কখনো গরীব থাকতে পারে? চোখ মেলে চারিদিকটা একবার দেখোই না।

এতক্ষণে মনের মধ্যে সাহস ভিড় করে আসে লক্ষীমনির। আস্তে আস্তে চোখের পাতা খোলে। চোখের পাতা খোলা তো নয়, যেন কুড়ির পাপড়ি ছেড়ে ফুলের ফুটে ওঠা। ওমা! চারদিকে কি সুন্দর সব ফুলের বাগান। দূরে এক বিশাল প্রাসাদ। চমকে ওঠে লক্ষীমনি। কোথায় উধাও ধূ ধূ তেপান্তরের নিরালা নির্জন মাঠ? আবার ধুকুপক করে ওঠে বুকের ভেতর সে ঠিক দেখছে তো?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ ঠিকই দেখছো, লক্ষীমনির মনের কথা কেড়ে নেয় কাঁচের পুতুল, এটাই তোমার বাপের বাড়ি। পিস শ্বাশুড়ির কথায় অভিমান করে চলে এসেছিলে মনে নেই। নতুন বিয়ের কনের ধুলো পায়ে বাপের ঘরে ঢুকতে নেই তাই তোমাকে বাগানেই বসিয়ে রাখতে হলো এতক্ষণ। যাও এবার অরূপকুমারের সাথে ফিরে যাও তোমার শ্বশুর বাড়ি—সেখানে সবাই তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছে যে!

আনন্দে ঝলমল করে ওঠে লক্ষীমনি। ওমা এতো বিশাল তার বাপের বাড়ি। পরমুহূর্তেই সে আনন্দ চুপসে যায়—মনে পড়ে যায় ঝড়ের কথা। শ্বশুরবাড়ির প্রাসাদ তো ধুলোয় মিশিয়ে গেছে।

চলো, বাড়ি চলো লক্ষীমনি, ঝপাৎ করে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে অরূপকুমার লক্ষীমনির হাত চেপে ধরে।

কিন্তু...

না, কোন কিন্তু নেই। তোমার গামছা ডুরে শাড়ি আর পুটলির ভেতর কতো জিনিস ছিলো তাও জানো না—হীরে জহরৎ মনি মুক্তো সোনা দানা কতো কি?

কিন্তু ঝড়? বাড়ি ভেঙে পড়া? অবাক চোখ মেলে অরূপকুমারকে দেখতে দেখতে জানতে চায় লক্ষীমনি।

ধুস! ওটা তো দুঃস্বপ্ন। তোমার পরীদিদি এক মুহূর্তে সব ঠিক করে দিয়েছে। বাড়িটা এখন আগের চেয়েও দশগুণ বড় হয়েছে, বোঝায় অরূপকুমার, আর তোমার বাবার পাঠানো হীরে জহরৎ তো রাখার জায়গাই হচ্ছে না।

কিন্তু ছোট পিসি?

তোমাকে না দেখে ছোট পিসি তো কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে। তোমার দিদির দেওয়া শাড়ি আর গয়না পেয়ে..

বেশ তবে চলো, একলাফে অরূপকুমারের হাত ধরে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে লক্ষীমনি। অরূপকুমার ঘোড়া ছোটাতে চাবুক তোলে। থামিয়ে দেয় লক্ষীমনি, আমার কাঁচের পুতুল? আমার পরীদিদি?

সে তো আমাদের সাথেই আছে। আমাদের যাবতীয় সুখ শান্তি ধন-দৌলত সবই তো তার স্মৃতি। চলো, বেলা অনেক হলো। বলেই কিবিস কিবিস ঘোড়া ছুটিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যায় অরূপকুমার আর গরীব চাষীর বড়লোক মেয়ে লক্ষীমনি।

ঘাস-পিপুলের জঙ্গলে

অধীর বিশ্বাস

গাঙশালিকটা কোথা থেকে যেন একটা ঘুঘরো পোকা ধরে আনল। পরিষ্কার জায়গায় এনে ঠোঁট ঝাঁকিয়ে ছিঁড়ছে তাকে। ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। খেতে খেতে মাথাটা কিন্তু পারছে না। ইচ্ছে করলে গিলে নিতে পারে। ভয় আছে আবার। যদি আটকে যায়! ঠোঁটে করে আবার অন্য জায়গায়। মাথাটা টুকরো করার জন্য হাতুড়ি পেটানোর মতো দুই ঠোঁট ফাঁক করে বিঁধতে লাগল। বার বার। না, কিছুতেই ছেঁড়া গেল না। সামনে রেখে আবার দেখল তাকে। কী শক্ত রে বাবা! তারপর এমনভাবে ত্যাগ করল, যেন ছেড়ে দিলাম তোকে, যাঃ!

ছেঁড়া হাত-পায়ের মাথাটা নিয়ে ঘুঘরোটা পড়ে রইল। শালিক আমতলার অন্য পাতা উল্টে উল্টে দেখে। যদি একটা কেঁচো-টেচো কিংবা —। খুব ব্যস্তভাব। যেন বনগাঁর হাটে যেতে হবে। বেলা বয়ে যায়। যাবার আগে যা-হোক করে বাগানটা খুঁজে দেখা।

দুপুরবেলা বেজায় ঢল দিয়েছে। এদিককার মাটি দো-আঁশ প্রকৃতির। বৃষ্টির কিছুক্ষণের মধ্যেই শুকিয়ে নরম। এই মৃত্তিকা তখন দুর্গা ঠাকুরের

গায়ে দো-মেটের মতো মৃসণ। বৃষ্টির স্রোত শুকনোর পর মাটিতে কারুকাজের দাগ। লাল পিঁপড়েরা ইলিবিলি মুখ শুঁকে ঘুরছে। জোড় বেঁধে ছাই-পেঁচা খাবার খুঁজতে বেরিয়েই দেখে গাঙশালিককে। লাফানো-চলা থামিয়ে দেখল ভালভাবে। 'এ কি আমাদের বাগানে থাকে?' অন্য পেঁচা চোখ ঘুরিয়ে দিতেই বোঝা গেল, 'কি জানি!'

'কী করব?' চুপ করে সোজা হয়ে দাঁড়ানো মানে এই কথা।

মাথা নিচু হওয়া অর্থ 'ছেড়ে দাও।'

পেঁচারা আবার লাফ দিতে দিতে ডাইনে-বাঁয়ে তাকাতে লাগল। ফের দাঁড়িয়ে দেখল। অন্যটা কাছে ঘেঁষে দেখে, একটা শামুক সুপুরি গাছে উঠতে চাইছে। খোলসে পাক খেয়েই বুঝি শিকড় ছাড়িয়ে উঠে পড়বে। মুখ তুলে নীচে নামালো পেঁচা। 'ঠোক্কর দিয়ে ফেলে দেব?'

মাথা বেঁকিয়ে থাকা মানে 'কী দরকার? ওদেরও তো খিদে পায়! গাছের রস পছন্দ ওদের।'

লাফাতে লাফাতে আবার চলা। সবুজ গাছপালা আর মাটির কাছাকাছি ঘাস-পিপুলের জঙ্গলে এই দুই পাখি যেন বিদেশ থেকে আসা কোনও পর্যটক। গায়ের রঙ আর চোখ সেই ইংরেজদের সঙ্গে তুলনীয়। পূর্ব ভারতেই বেশি দেখা যায়। মানুষজন নাম দিয়েছে ছাই-পেঁচা। কোথাও আবার অন্য নাম। তাতে এদের যায় আসে না। এদের তাতে রূপ বদলায় না। শব্দটব্দ অপছন্দ। হুটপাট এ-ডাল ও-ডালেও নেই। শান্তশিষ্ট, নধরকান্তি।

শুধু এরাই নয়, নিস্তব্ধ প্রকৃতির কোলে ওই যে একটা কানাকুয়ো, মানে হাঁড়িচাচা 'কোট্‌রর' ডাক তুলে হাজির। ও অবশ্য এই পরিস্কার জায়গায় নয়, পাশের সীমানায় নারকোলের ডগা দিয়ে ঘেরা নীচে কী খুঁজছে যেন। কী আর খুঁজবে? সে-ও তো ওই পোকামাকড়! —এ কী? কী ধরেছে ও?

ভেজা পাতারও শব্দ আছে। সে শব্দ এখন 'ফ্যারর্‌ ফ্যারর্‌'। ছাই-পেঁচারা থমকে যায়। ঘুরে দেখে বড়সড় কী ধরেছে ও। গিরিগিটি না? ওই তো উল্টে-যাওয়া শাদা বুক, লম্বা লেজ। বাঃ! বড় শিকার। সবটা যদি খেতে পারে তা হলে কিন্তু দু'দিন না-খেলেও চলবে। বড্ড হিংসে হয়। হঠাৎ এসে যদি চোখের সামনেই কেউ এমন ধরে, তবে কিন্তু মন-খারাপেরই

কথা। লুকিয়ে লুকিয়ে জিভের জল গিলে ফেলল। তারপর দুজন দু'জনের দিকে এমনভাবে চাইল যেন 'সাহস করে ধরতেও পারতাম না কিন্তু।— চলো, ভেবে লাভ নেই।'

বাগানের সেই ও-প্রান্ত থেকে এ-প্রান্ত, এখনও তেমন শিকার জুটল না। শুধুই অন্যেরটা দেখে যাওয়া। প্রথমে গাঙশালিকের ঘুঘরো, পরে শামুকের গাছের রস, এখন কানাকুয়োর গিরগিটি। অপেক্ষা করলে শালিকের ফেলে-যাওয়া মুন্ডু-খাওয়াও দেখতে হবে। লাল পিঁপড়ের ঝাঁক এল বলে। এখন ইশারাতেও কেউ কোনও কথা বলে না। দুজনেরই খুব দুঃখ। আবার চলতে লাগল। তাদের দেখলে যে কেউ ভাববে, পেট-মোটা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেমন, দেখো! আসলে যে তা নয়, কাউকেই বোঝানো যাবে না। সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে যদি কখনও দেখা হয় তো জিজ্ঞেস করবে —কেন এমন নধর করেছ? সবাই ভাবে ভিন্ন কথা!

না। আর ফর্সা জায়গা দিয়ে নয়, এবার জঙ্গলের দিকে যাওয়া যাক। জোড়া-পেঁচা যেই বাঁক নিতে যাবে অমনি যশোর রোডের ডোবা থেকে একটা সোনাব্যাঙ থপথপ লাফ দিয়ে একেবারে মুখের সামনে। এমন চকচকে চেহারা মানে কোনও ব্যাঙের গিন্নিই হবে। মনে হয় কিছু বলবে।

সামনে এমনভাবে পথ-আটকে দাঁড়িয়ে কেন? মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত সবুজের চিকচিকে আভা। যেন এক ঢাল চুল ছড়ানো। যেন এই মাত্র স্নান সেরে গাছপালার নীচে এসে চুলগুলো শুকিয়েই আঁচড়াতে বসবে। ড্যাবা-ড্যাবা চোখে কী বলতে চায়?

কিছুই না। সামনে দিয়ে পেটমোটা লাল পিঁপড়ের সারি। নাচের ভঙ্গিতে পা ঘুরিয়ে দেখে, ম্যাপে ছোট্ট একটা দেশের মতো পিঁপড়েরা গিজগিজ করছে। কোনও শব্দ নেই। একটা মরা পোকার খন্ডাংশ ঘিরে রেখেছে জায়গাটা। পথে আরও সারি দেওয়া। ওদের দেখে সোনামাসির কেমন যেন কষ্ট হয়। অন্য পিঁপড়েদের দেখেছে, কোথাও খাবার সন্ধান পেলে পটাপট লাইন দিয়ে টুকরো টুকরো অংশ নিয়েই দৌড়ে বাসার মধ্যে। আর এরা কেমন! যেন গ্রামসুদ্ধ লাল পিঁপড়ের দল এক জায়গায় হাজির। খাওয়াদাওয়া সব এক জায়গায়। তারপর ফিরে যাওয়া।

সোনাব্যাঙের ইচ্ছে হয় একবার জিভ উল্টে ঝাঁক-পিঁপড়ে তুলে আনে।

কিন্তু ওই যে, কেমন মায়া। যেন দরিদ্র পল্লীর এই প্রাণীরা এসেছে দুটো খাবার জন্যে। ব্যাঙ আবিষ্ট হয়ে ভাবে, সীমান্তের এই এলাকায় ওরা কি শরণার্থী হয়ে এসেছিল কোনও দিন? মুক্তিযুদ্ধের সময়? চৌষট্টির দুর্যোগে? সেই থেকে লুকিয়ে?

সোনাব্যাঙ শিরদাঁড়া সোজা হয়ে ভাবে, তবে কি কারও ভয়ে লুকিয়ে থাকা? নিরিবিলিতে একটু খাদ্যের সন্ধান পেয়েছে তাই ওদের বেরিয়ে আসা! খুব মন-খারাপ হয়ে যায়। যদি সত্যিই এমন হয়, তবে বেদনার। সে-ও যেমন নাও ভাঙা নদী দিয়ে ভেসে ভেসে এই ভারতে আশ্রয় পেয়েছিল সেই ছোটবেলা। কী টানে অন্য কোথাও যাওয়া হয়নি তার। যশোর রোডের এ-ডোবা সে-ডোবা করেই বেড়ায় সে। আসলে অন্য কোথাও যেতে মন চায় না। ভ্যান-রিকশায় কত মানুষ! ওপার বাংলার লোক। তাদের বাচ্চাকাচ্চা।

এই পিঁপড়ে যেখানকারই হোক, বাংলার কথা, তার জন্মভূমির কথা মনে পড়িয়ে দিল। মনটা ভীষণই বিষণ্ণ। সোনাব্যাঙ এবার আর লাফ নয়, হেঁটে হেঁটেই ডোবার দিকে। বাগানটায় একটু পরেই অন্ধকার হয়ে আসবে। এই বয়সে বেশি জোরে যেতেও পারে না। কীসের শব্দ ওই বেড়ার ধারে? আবার সোজা হয়ে দেখল, কানাকুয়ো কী যেন খাচ্ছে। পোকা বা খাদ্য-প্রাণীর ঝাপটার শব্দ। ব্যাঙ আরও ভাবল, প্রকৃতির যত প্রাণী, সবাই কাউকে না কাউকে খাচ্ছে। বড় ছোটকে। সবল দুর্বলকে। ভাবলে সত্যিই বড় অন্যায়। নিজেও কিন্তু এভাবেই বেঁচে আছে। আবার যে খাচ্ছে তারও কাউকে না কাউকে ভয়। নিজের যেমন সাপ কিংবা কোনও শিকারী মানুষ!

যাক, এতসব ভাবলে কূল-কিনারা পাওয়া যাবে না। পৃথিবীর যারাই আছো, বেঁচে থাকো নিজের সাবধানে।—এমন একটা ভাবনা আসতেই সোনাব্যাঙ ঝপাং করে ঝাঁপ দিল।

হঠাৎই যেন সন্ধে নেমেছে। ঝিঁঝির কলতান, ব্যাঙের নানা সুর এই জগতে। এরই মধ্যে আলো দেখাতে বেরিয়ে পড়েছে কেউ কেউ। তারা কারা? এরা সন্ধেবেলার বাতিঅলা, নাম—জোনাকি পোকা।

বাড়ি ফেরা

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

ঋতবান হাঁটছিল একা-একা। তবে একদম একা বলা চলে না। কারণ ওর চতুর্দিকে লাল-বেগুনি-হলুদ ফুলের রঙবাহারি ঝুঁটি-মাথার সবুজ গাছপালারা মাথা দোলাচ্ছিল, ছোটবড় পাখি, ফড়িং, প্রজাপতি পাতায় ফুলে দোল খাচ্ছিল। আর দূরে বরফ পাহাড়ের ঢেউয়ের দিকে টকটকে লাল সূর্যটা বলের মতো গড়িয়ে-গড়িয়ে এগোচ্ছিল।

অন্যসময় হলে ঋতবান এসবের মাঝে বুঁদ হয়ে যেত। ওর সোলা খেতে রঙিন কলম আর খাতা বের করে বসে যেতো পথের কিনারে। কিন্তু ও আজ বড় অন্যমনস্ক। ওর মনটা পাথরের মতো ভারী হয়ে আছে।

গতকাল রাতে ফাদারই ধরিয়ে দিয়েছিলেন চিঠিটা। মা লিখেছে কলকাতা থেকে। বাবা ব্যবসার কাজে বিদেশে চলে গেছেন। মায়ের বিজ্ঞাপন সংস্থায় হঠাৎ পড়ে গেছে প্রচণ্ড কাজের চাপ, উইন্টার ক্যাম্পেনের না কিসের কাজ! কোনভাবেই ছুটি পাচ্ছেন না। তাই এবারের শীতে হয়তো তাঁকে ওরা বাড়িতে নিয়ে আসতে পারবেন না। ও যেন কিছু মনে না করে!

মনে না করে! ঋতবানের ছোট্ট শরীরটা রাগে-ব্যথায়-অভিমানে ফুঁসছিল, —ওর জন্যে কি বাবা-মায়ের এতটুকু স্নেহ-ভালবাসা নেই? ওঁরা বুঝতে

পারেন না, এই পাহাড়ের হাড়কাঁপানো শীতে পুরো হোস্টেল যখন ফাঁকা হয়ে যাবে, চলে যাবে ওর সব বন্ধুরা, ও একা থাকবে কী করে? বুঝতে চান না টাকার লোভে? বাবা-মা তো দুজনে মিলে প্রচুর টাকা আয় করেন, তবুও আরও? আরও চাই? এই তো ও দেখেছে ওর পাহাড়ি বন্ধু শেরিংরা কী গরিব, দুবেলা ভালমতন খেতে পায় না। তবুও সবাই মিলে ঐ ছোট্ট দম আটকানো বস্তিতে কত সুখে আছে। শেরিঙের মা কী ভালো, ওঁর সবটাই যেন 'মা' দিয়ে তৈরি।

ঐ চিঠি পাবার পর থেকেই ঋতবান একদম অন্যরকম হয়ে গেছে, অহর্নিশ ওর মাথায় ঘুরছে—বাড়ি, ও বাড়ি যাবেই। বছরে এই একবারই তো সুযোগ, তাও হবে না?

কিন্তু কী করে ফিরবে? জানে না। ঋতবান উদ্দেশ্যহীনভাবে হেঁটে চলে সামনের দিকে। লাল বলটা এখন পাহাড়ের খাঁজে। বরফচুড়োয় লাল মাখামাখি। লাল আবির ছড়িয়ে গেছে পাশের গভীর খাদের রুপোলী ফিতের মতো ঝরনাতে, গাঢ় সবুজ বনেও।

কে আছে ওর বন্ধু, যে ঋতবানকে নিয়ে যাবে বাড়িতে? ও বড্ড ছোট, বড্ড অসহায়। ঋতবানের দুচোখ বেয়ে টপটপ জল ঝরতে থাকে।

ঠিক তখনই কে যেন ওর খুব কাছেই বলে ওঠে, —কেঁদো না ঋতবান, কেঁদো না। আমিই তোমায় বাড়ি নিয়ে যাবো।

চমকে ওঠে ঋতবান! কে? কে বলল কথাটা? দুচোখ রগড়ে নিয়ে ও চারিদিকে তাকাতে থাকে। কোথায়, কেউ তো নেই।

—এই তো আমি তোমার সামনেই!

কথাগুলো একদম সামনে থেকে! ঋতবান অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে কেউ কোথাও নেই। সুনসান ফাঁকা চারধার।

শুধু পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে একখণ্ড মেঘ। তারপর পথ ঝাপসা।

ধ্যুৎ, নিশ্চয়ই ভুল শুনেছে! ঋতবান পা বাড়াল!

ঠিক তখনই সামনের মেঘটার ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল, —আমি দাঁড়িয়ে আছি সামনেই। চিনতে পারছো না?

ভ্রু কুঁচকে থমকে দাঁড়ায় ঋতবান। বাড়ি যাবার চিন্তায় ওর মাথাটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেল? মেঘ আবার কথা বলে নাকি?

ঠিক তখনই সেই গলা আবার বলে উঠল, —না, না, ঋতবান, তোমার মাথা ঠিকই আছে।

ঋতবান খুব বিরক্ত হলো! নিশ্চয়ই কেউ তাকে নিয়ে ঠাট্টা করছে! ইস্, কী নিষ্ঠুর! কে বাড়ি যেতে পারছে না বলে খাঁচায় বন্দী পাখির মতো ছটফট করছে, আর তার সঙ্গেই—

—তুমি ভুল করছো ঋতবান, আমি তোমার বন্ধু। তোমার উপকার করতে চাই।

এবার স্থানকাল ভুলে ঋতবান চেঁচিয়ে উঠলো, —কীসব হাবিজাবি বকছো তখন থেকে? কে তুমি, কোথায় আছো?

মেঘের মধ্যে দিয়ে এবার স্পষ্ট শুনলো ঋতবান, —এই তো আমি!

এটা তো মেঘ! —ঋতবান চেঁচিয়েই বলে ঃ মেঘের আবার জীবন থাকে নাকি? মেঘ তো ছোট-ছোট জলকণার সমষ্টি, ধুলোয় চেপে ঘুরে বেড়ায়। সব পড়েছি বিজ্ঞান বইয়ে। মেঘ ভারী হলে নিচে আসে। বর্ষা নামায়, আবার মিশে যায় নদী-সাগরের জলে। সব জানি!

বলতে-বলতে ঋতবান একেবারে ভেঙে পড়ে, —সত্যি করে বলো না তুমি কে? কেন মজা করছো আমার সঙ্গে? আমি, আমি যে বড্ড একা, অসহায়।

বিশ্বাস করো, একেবারেই মজা করছি না। —মেঘ বলে ওঠে ঃ আমরা এখন তোমাদের পৃথিবীর মেঘের মধ্যেই মিশে আছি। খুদে-খুদে পদার্থকণা হয়ে। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমরা তোদের মতোই প্রাণী। তবে তোমাদের গ্রহের নয়!

অ্যাঁ! আচমকা বিস্ময়ের ধাক্কায় কেঁদে ওঠে ঋতবান।

হ্যাঁ বন্ধু, আমরা বহু-বহু দূরের এক সৌরজগৎ থেকে আসছি। নিরুপায় হয়ে। —মেঘ বললো ঃ আমাদের গ্রহটা গেছে ধ্বংস হয়ে। তারপর মহাশূন্য বেয়ে আলোর গতিতে ভাসতে-ভাসতে, আশ্রয় খুঁজতে-খুঁজতে তোমাদের সবুজ গ্রহে এসে পড়েছি।

তারপর? —কোনরকমে ঋতবান শুধোয়।

বলছি, সব বলবো তোমায়। —মেঘ বললো ঃ তুমি ঐ পাথরটার ওপর বসো। আমি দেখাচ্ছি, কেমন দেখতে আমায়। ভয় পাবে না তো?

—না, না!

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই বিমূঢ়ের মতো ঋতবান দেখলো, সামনের মেঘটা জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। তারপর তার মধ্যে থেকে—উঃ কী কুৎসিত-কদাকার। দুহাতে চোখ ঢাকে সে।

ঠিক মাকড়সার মতো দেখতে রোমশ এক প্রাণী। মাথাটা শরীরের তুলনায় অনেক বড়ো। দুটো চোখ দূরবীনের মতো বেরোনো, দপদপ জ্বলছে।

দেখলে তো, ভয় পেয়ে গেলে! —মাকড়সা-প্রাণী বলে ঃ আচ্ছা আমি আবার মেঘ হয়ে যাচ্ছি।

না না আমি আর ভয় পাচ্ছি না। —ঋতবান অনেকটা সামলে নিয়েছে।

মাকড়সা-লোকটা এবার দুটো দাঁড়ায় ভর দিয়ে ঋতবানের দিকে এগিয়ে আসে। বাকি দাঁড়াগুলো দিয়ে ওর গায়ে মাথায় বুলোতে থাকে আর করে বলে, —ঋতবান, দেখো, তুমি ঠিক বাড়ি ফিরবেই।

কিন্তু তোমরা কোন গ্রহ থেকে এসেছো, বললে না তো? —ঋতবানকে এখন বিষম কৌতূহলে পেয়ে বসেছে।

হ্যাঁ, বলছি। —মাকড়সা বলে ঃ আচ্ছা বন্ধু, সুপারনোভা কাকে বলে জানো?

একটু-আধটু শুনেছি। মানে অতি উজ্জ্বল তারা, তাই তো? —ঋতবান বলে ঃ ফাদার সেদিন বলছিলেন পৃথিবী থেকে নাকি একটা সুপারনোভাকে দেখা গেছে।

ঠিক বলেছো। —মাকড়সা লোকটা বলে ঃ আর মজার ব্যাপার কি জানো, যেটা তোমরা দেখেছো, নাম দিয়েছো 'সান্দুলিক', আমরা ছিলাম ঐ সৌরজগতেরই বাসিন্দা।

—মানে?

—মানে হচ্ছে, তোমাদের সৌরজগতে সূর্যই যেমন প্রধান শক্তি। তার চারপাশে পাক খাচ্ছে গ্রহ-উপগ্রহরা। তেমনি আমাদের ওখানে সান্দুলিক তারাটাই ছিল সূর্য। আকারে তোমাদের সূর্যের চেয়ে অনেক বড়। ওর চারপাশে মানতান, চাথি, নওবু, লুকটা এইরকম চব্বিশটা গ্রহ ঘুরতো। তার তিনটেতে আমরা বাস করতাম। তারপর হঠাৎ একদিন—

একটু থেমে মাকড়সা-লোকটা বললো, —আমাদের বিজ্ঞানীরা দেখলেন, তোমাদের সান্দুলিক একটু-একটু বড় হচ্ছে, ফুলছে। তার চতুর্দিকে জমছে গ্যাস-ধোঁয়ার পুঞ্জ। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁরা সতর্ক করলেন, সাবধান! সূর্যটা সুপারনোভা হয়ে গেছে। মৃত্যু ওর অবধারিত। আমরা বিজ্ঞানে তোমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। মহাকাশযানে চেপে বেরিয়ে পড়লাম নতুন বাসা খুঁজতে।

তারপর? —ঋতবানের চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

বলো না বন্ধু, আশ্রয় খুঁজে পেলাম না। —বিষণ্ণ কণ্ঠে মাকড়সা বলে ঃ গ্রহ অনেক, থাকার মতো পরিবেশ নেই। এদিকে শেষসময় ঘনিয়ে আসছে। আমাদের সূর্যের তেজ বেড়ে গেছে অনেকগুণ, গ্যাস আর ধোঁয়ায় ভরে গেছে আমাদের গ্রহগুলো।

এদিকে ততদিনে আমাদের বিজ্ঞানীরা জীবন্ত শরীরকে কিভাবে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম কণায় ছড়িয়ে দিতে হয়, আবিষ্কার করে ফেলেছেন। বের করে ফেলেছেন অসীম শূন্যে কিভাবে না খেয়েও শুধু শক্তি সঞ্চয় করে বেঁচে থাকা যায়, তার কায়দাও। ব্যস, তারপর আর কি! ভেসে পড়লাম মহাশূন্যে।

ভেসে পড়লে? —ঋতবান বাড়ি না ফেরার দুঃখ ভুলে গেছে। চোখ বড়-বড় করে গোগ্রাসে গিলছে তার ভিনগ্রহী বন্ধুর কথা। সূর্য ডুবে গেছে। আঁধার নেমেছে নির্জন পাহাড়ে, কনকনে হাওয়া বইছে, কোনদিকে খেয়াল নেই।

হ্যাঁ, ভেসে পড়লাম। —মাকড়সা-বন্ধু বলে চলে! নিজেদের মিশিয়ে দিলাম শূন্যে ছুটে বেড়ানো লক্ষকোটি পদার্থকণার মধ্যে। খুঁজে বেড়াতে লাগলাম নতুন ঘর, নতুন আশ্রয়। ছুটতে-ছুটতে একসময় বহুদূর থেকে দেখলাম, তোমাদের সান্দুলিক তারা ফেটে চৌচির হয়ে গেলো। তার সঙ্গে শেষ হয়ে গেলো আমাদের কত লক্ষ বছরের বাসভূমি সুন্দর গ্রহগুলোও। হতভাগ্য আমরা! অসীম মহাশূন্যে নিরাশ্রয়, নিরাকার, পাগলের মতো খুঁজছি থাকার জায়গা।

তারপর? —ঋতবান বলে ওঠে। ও লক্ষ করে, ওর বন্ধুর লম্বা-লম্বা চোখের কোলদুটো চিকচিক করছে। ও কি কাঁদছে?

তারপর? —একটু সামলে নিয়ে মাকড়সা বলে ঃ ওরকম ছুটতে-ছুটতে একদিন দেখলাম আকাশের অসংখ্য ফুটকির মাঝে একটা সবুজ গ্রহ ঝলমল করছে। যে কজন একসাথে ছিলাম, ছুটে এলাম এদিকেই, তোমাদের পৃথিবীতে।

কেন? —ঋতবান বলে ঃ আরও কত গ্রহ তো আছে আকাশের সৌরজগতে। সেগুলো ছেড়ে এখানেই এলে কেন?

মাকড়সা আবার একটু হাসে, —ঠিক বলেছো। আসলে কি জানো, আমরা যে জানি, যেখানে সবুজ, সেখানেই থাকবে গাছ। আর যেখানে গাছ, সেখানেই তো জীবন। জান ঋতবান, আমাদের সবার প্রিয় রং সবুজ। সবুজ মানেই তো প্রাণের স্পন্দন, জীবনের কলধ্বনি।

মন্ত্রমুগ্ধ ঋতবান, অবাক বিস্ময়ে সে শুনছে অজানা সব কথা।

সে বললো, —আচ্ছা বন্ধু, কদিন লাগলো তোমাদের এখানে পৌঁছুতে?

দিন! —এবার যেন হেসেই ফেললো মাকড়সা-লোকটা। বলে ঃ দিন কেন, তোমাদের বছরের হিসেবেও তার মাপ কষা অসম্ভব। বলতে পারো, কত আলোকবর্ষ লেগেছে। এক বছরে আলো যতদূর যেতে পারে, তাকেই বলে আলোকবর্ষ। সেইরকম একলক্ষ সত্তর হাজার আলো বছর ছুটে আমরা পৌঁছেছি এখানে।

ঋতবানের মাথাটা এবার টলমল করে উঠলো। সামনের পাথরটা আঁকড়ে ধরে নিজেকে সামলালো সে। তারপর অতিকষ্টে বললো, —একটা কথা, তোমাদের মৃত্যু নেই? মানে—মানে তোমরা কি অমর?

মৃত্যু! মানে—মানে যাকে বলা যায় জীবনের শেষ, প্রাণহীনতা। —মাকড়সা নিজেই এবার অবাক ঃ সে তো বহু বছর আগেই বিদায় নিয়েছিল আমাদের গ্রহ থেকে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে। আমাদের বয়সই তো বাড়ে না!

ঋতবান! কোন কথাই বেরোল না তার মুখ দিয়ে। ফ্যালফ্যাল করে সে শুধু চেয়ে থাকে মাকড়সা-বন্ধুর দিকে।

এবার মাকড়সাই বলে, —চলো ঋতবান, তুমি তৈরি তো?

তৈরি! —ঋতবানের ঘোর কাটে না।

হ্যাঁ। —মাকড়সা বললো ঃ তুমি বাড়ি যাবে না? কলকাতায় নিজেদের বাড়ি? চলো, তোমায় পৌঁছে দিই।

—তুমি পৌঁছে দেবে? কিভাবে?

এইভাবে। —বলে আরও এগিয়ে এসে ঋতবানের জড়িয়ে ধরে মাকড়সা-বন্ধু। বলে ঃ এবার আমি আবার মেঘ হয়ে যাবো। উড়বো দক্ষিণমুখো।

—পড়ে যাবো না তো?

—না, না। কোন ভয় নেই তোমার। চুপটি করে তুমি বসে থাকো, আমি তোমার আঁকড়ে নিয়ে যাবো। আর হ্যাঁ, চোখ বুজেই থেকো। নতুবা অন্ধকার আকাশে তোমার ভয় লাগবে।

চোখ বুজে ফেললো ঋতবান। সে অনুভব করলো মাকড়সার রোমশ শরীরের স্পর্শ আর সে পাচ্ছে না। তার বদলে একটা ঘন হয়ে আসা শক্তি তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে।

তারপরই সে বুঝতে পারে, ঐ শক্তিটাই তাকে আঁকড়ে ধরে উড়িয়ে

নিয়ে যাচ্ছে, শোঁ-শোঁ বেগে। কিন্তু, কিন্তু—উঃ! কী ভয়ানক ঠাণ্ডা! হাত-পা জমে যাচ্ছে যেন! ঋতবান আর সহ্য করতে পারছে না, ওর গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না...মাকড়সা-বন্ধু, তুমি আমায় নামিয়ে দাও...কিন্তু...ওঃ! ওর সমস্ত চেতনা ডুবে যাচ্ছে, শরীর অসাড় হয়ে আসছে...মাকড়সা...বন্ধু...!

ঋতবানের কানে ভেসে এলো কটা শব্দ, —যাক্ জ্ঞান ফিরেছে। আর ভয় নেই।

আধো তন্দ্রা আধো জাগা অবস্থায় চোখ খুললো ঋতবান—একী! ও কোথায়!

এটা তো তাদের কলকাতার বাড়ি নয়, এ তো ওদের স্কুলের হোস্টেল! ওর মুখের কাছে ঝুঁকে রয়েছেন ফাদার পিটার, তাঁর পাশে গলায় স্টেথিসস্কোপ ঝুলিয়ে ডাক্তারবাবু।

তাহলে? তাহলে মাকড়সা-মানুষ, আকাশে ওড়া ওসব—আরে! দরজার কাছে দাঁড়িয়ে উনি—ঋতবানের দৃষ্টি স্পষ্ট হয়ে আসে, ঐ তো! ঐ তো না! মুখে আঁচল চাপা, চোখ লাল, আলুথালু বেশ।

মা! মা এসেছে!

অতিকষ্টে প্রাণপণ চেষ্টায় বলে উঠলো ঋতবান, —মা, ওমা!

মুহূর্তে মায়ের সব বাঁধ ভেঙে গেল। পাগলের মতো ছুটে এসে ঋতবানকে চেপে ধরলেন বুকের মধ্যে।

আঃ কী শান্তি, কী নির্ভয়! কী নরম, কী মিষ্টি মা! ঋতবান বাড়িতে ফিরছেই কলকাতায়।

ঋতবানের মাথায় তখন টপটপ করে পড়ছে মায়ের বুকনিংড়ানো অশ্রু, অশ্রুর ধারায়। ওর গায়ে-মাথায় চুমু খেতে খেতে অস্ফুটে মা বলছেন, —আমরা না হয় অন্যায় করেছি। তাই বলে এ কী শাস্তি দিচ্ছিলি বাবা! ঐ ঠাণ্ডায়, ঐ পাহাড়ে তুই তো জমে গেছিলি, পড়ে ছিলি রাস্তার ধারে! তোর—তোর যদি কিছু হতো, আমরা—আমাদের কী অবস্থা হতো, ভাবলি না সোনা! ফাদার গতকাল ট্রাঙ্ককল করতেই, সব ফেলে আমি—বল, কোনদিন আর এমন করবি না? বল? আমরা প্রত্যেকবার তোকে বাড়ি নিয়ে যাবোই!

ঋতবান মুখ গুঁজেই ঘাড় নাড়ে। মনে-মনে সে ভাবছে, ও এমন করলো বলেই না মা ছুটে এলেন! মাকড়সা-বন্ধু তো ঠিকই বলেছিলো, বাড়ি ও ফিরবেই। তাহলে সবটাই কি স্বপ্ন, মিথ্যে?

বুবুন ও নীলপাখি

তাপস মুখোপাধ্যায়
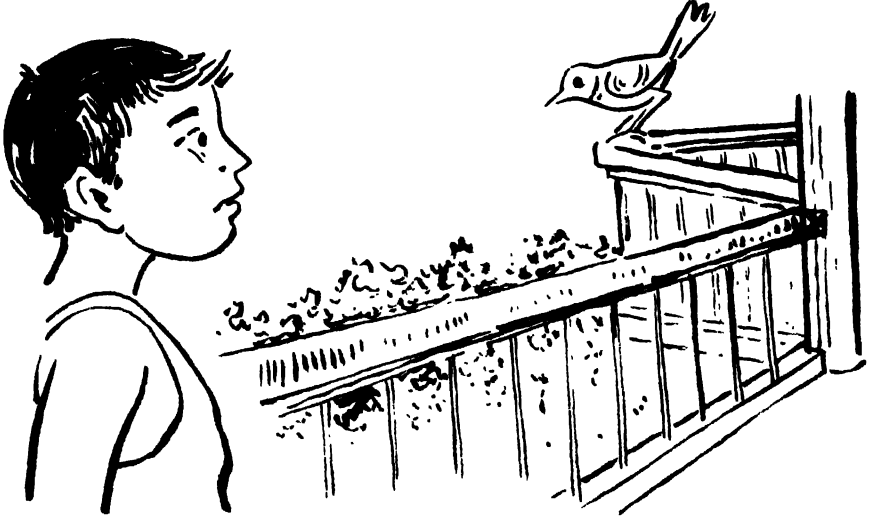
বুবুন বারান্দার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। কী সুন্দর একটি পাখি। বারান্দার পাঁচিলের উপর বসে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। এতো সুন্দর পাখি এর আগে কখনও দেখেনি সে। নীল রঙের পাখি। এত ঝকঝকে নীল রঙের পাখি কি হয়?

—কী ভাবছো বুবুন সোনা?

বুবুন চমকে উঠল। পাখিটা কথা বলছে!

এ কী করে সম্ভব? বুবুনের চোখ গোল-গোল হয়ে গেল।

—কী হল উত্তর দিচ্ছ না যে? আমি তোমাদের ভাষায় কথা বলছি দেখে অবাক হয়ে গেছ বুঝি?

সত্যি তো! নিজের কানকে বিশ্বাসই করতে পারছে না বুবুন। এই দুপুরবেলায় বিজ্ঞান বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল সে। সামনেই এ্যানুয়ালি পরীক্ষা। পাশের ঘরে মা ঘুমুচ্ছে। বিকেলে পড়া ধরবে বলেছে। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে আলোর গতিপথ পড়তে-পড়তে হঠাৎই চোখ পড়ে যায় ওর বারান্দার দিকে। তার পড়ার এই ঘরের লাগোয়াই খোলা বারান্দা।

—কী হল? বললে না তো কী ভাবছো? ওঃ বুঝেছি, তুমি আমাকে কথা বলতে দেখে খুবই অবাক হয়ে গেছ।

বুবুন থতমত খেয়ে বলল, আমি তো সত্যি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে তুমি কথা বলছো এক্কেবারে আমাদের মত।

—শুধু তাই নয়, আমাদের গ্রহের সকলেই সব ভাষাতেই কথা বলতে পারে।

বুবুন নিজের শরীরে চিমটি কেটে দেখে নিল সে সত্যি জেগে আছে না স্বপ্ন দেখছে।

নাঃ, সত্যি তো। বুবুন ধীরে-ধীরে বইটা খাটের উপর রেখে বিছানা ছেড়ে বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল। পাখিটার এক্কেবারে কাছে এগিয়ে এল বুবুন।

—এ কী তুমি আমাকে দেখে ভয় পেয়ে উড়ে পালালে না তো? বুবুন জিজ্ঞেস করলো।

—ভয়? ভয় খেতে যাবো কেন? আমরা কেউ কাউকে ভয় করি না কারণ আমাদের ওখানে ভয় কী জিনিস কেউ জানে না। প্রত্যেকে যদি প্রতেককে ভালবাসে তবে কি ভয় আসে?

ঠিকই তো। ভালবাসলে ভয় আসে না। বুবুনের কথাটা মনে ধরলো।

—তা তুমি কী এই গ্রহের পাখি নও? আমাদের এখানে তো পাখিরা কথা বলতে পারে না। তাছাড়া মানুষ দেখলেই ভয় পেয়ে উড়ে যায়।

—ঠিক ধরেছো তুমি। আমি এই গ্রহের পাখি নই। আমি অনেক দূরের নীলগ্রহ থেকে আসছি। আর ভয় পাওয়ার কথা বলছো? এখানে মানুষেরা তো পাখিদের মারে, খায়—এই জন্যই তো ওরা ভয় পেয়ে উড়ে যায়। মানুষেরা যদি ওদের ভালবাসতো তবে ওরা ভয়ও পেত না আর উড়েও পালাত না। বুঝলে?

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছো তুমি। আচ্ছা তুমি বলছো, দূরের গ্রহ থেকে এসেছো, পৃথিবী ছাড়াও অন্য গ্রহে প্রাণী আছে তাহলে?

—হ্যাঁ, আছেই তো। আমাদের নীল গ্রহেই তো আছে।

—সত্যি? দারুণ ব্যাপার তো! আর কী কী আছে? বুবুন দারুণ খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

—অ-নে-ক, অ-নে-ক কিছু। তুমি যাবে সেই গ্রহে?

—খুব ইচ্ছে করছে দেখতে তোমাদের গ্রহটা, কিন্তু মা বকবে যে।

—কেন? তোমার মা বুঝি তোমায় বকে?

—এমনিতে বকে না তবে পড়াশুনো না করলে বা দুষ্টুমি করলে বকে।

—তোমার পড়াশুনো করতে ভালো লাগে না বুঝি?

—শুধু বিজ্ঞান সাবজেক্টটাই ভালো লাগে। বিশেষ করে মহাকাশ সম্পর্কে খুব জানতে ইচ্ছে করে। তবে অন্য সাবজেক্ট ভাল লাগে না। মার্কসও বেশি পাওয়া যায় না। এজন্য তো আমার গল্পের বই বেশি ভাল লাগে।

বুবুন নীল পাখির সাথে বেশ জমিয়ে গল্প করতে লাগল।

—গল্পের বইও পড়া, স্কুলের বইও পড়া। গল্পের বই পড়তে ভাল লাগে কারণ আনন্দ করে, খুশি করে পড়ো না এজন্যই ভাল লাগে না। যে কোন বই যদি আনন্দে পড়তে শুরু করো, তাহলে সব বই-ই সমান ভাল লাগবে। বই পড়া মানে তো জানা, শেখা, ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা অর্জন করা এবং এই জানা নিজের জীবনে অন্যের জন্য কাজে লাগানো। এজন্যই তো পড়াশুনো।

—বাঃ, দারুণ বলেছো তো তুমি। কিন্তু পরীক্ষা-টরিক্ষা বিচ্ছিরি ব্যাপার না?

—ওটা, তুমি সত্যি-সত্যি ভালভাবে জেনেছো কিনা এর জন্য। ধরো তুমি গল্পের পরীক্ষা দিচ্ছ এই ভেবে পড়াশুনো করো, দেখবে আনন্দ পাবে। আমাদের গ্রহে সবাই আনন্দ করে পড়াশুনো করে এবং পড়াশুনো করে আনন্দ পায়। বিরক্তি নিয়ে কেউ পড়াশুনো করে না।

—ঠিক বলেছো তুমি। আনন্দ করে গল্পের বইয়ের মত আকর্ষণ অনুভব করতে হবে এবং জানার আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে।

—তা, কী? অনেক গল্প তো হলো, এবার কী ঠিক করলে? যাবে তো, আমাদের স্বপ্নের মতো সুন্দর নীল গ্রহে? যেখানে সব ছেলেমেয়েরা নিজেরাই খেলছে, পড়াশুনো করছে, পরস্পরকে ভালবাসছে, অন্যের কথা ভাবছে আর দারুণ আনন্দে আছে?

—হ্যাঁ, যাব। তবে মা ঘুম থেকে ওঠার আগেই ফিরে আসতে পারবো তো?

—হ্যাঁ, সে তোমাকে আমি ঠিক ফিরিয়ে নিয়ে আসবো সময়মতোই।

—কিন্তু, যাব কী করে?

—কেন? আমার সাথে। আমার পিঠে চেপেই তো যাবে তুমি।

—বাঃ, তবে ঠিক আছে। কিন্তু অক্সিজেন সিলিন্ডার তো নেই। তাহলে কী হবে?

—ওসব কিচ্ছু লাগবে না। আমাদের সঙ্গে গেলে ওসব প্রয়োজন হয় না।

—ঠিক আছে।

বুবুন দেখল, নীল পাখি হঠাৎ আকারে বড়ো হয়ে গেল। বুবুন পাখিটার পিঠে চাপতেই নীল পাখি হু-স-স করে বুবুনকে নিয়ে আকাশে উড়ে গেল।

—আরে, আরে কী সুন্দর!

ঘরবাড়ি গাছপালা ছাড়িয়ে আকাশের দিকে উড়ে যেতে-যেতে বুবুন আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

আকাশ থেকে আমাদের শহরটাকে ভারি সুন্দর দেখায় তো! সবুজ গালিচায় যেন মোড়া পুরো শহরটা। ধীরে-ধীরে মেঘের মধ্যে ভাসতে-ভাসতে বুবুন নীলপাখির সঙ্গে উড়ে চলল আর মাঝে-মাঝেই এক-একটা দৃশ্য দেখে নিজের মনেই বলে উঠতে লাগল, বাঃ, কী অপূর্ব!

—তোমার ভয় করছে না তো? নীল পাখি বুবুনকে জিজ্ঞেস করলো।

—না-না, দারুণ মজা লাগছে। এভাবে পাখির পিঠে চেপে আকাশে উড়ে যাচ্ছি, ভাবতেই পারছি না আমি। মেঘগুলো কত নিচে ভেসে-ভেসে যাচ্ছে।

বুবুন যত উপরে উঠতে লাগল ততই বিস্ময়ে তার চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল।

—এতো নীল আকাশটা? চাদ্দিকে শুধু নীল আর নীল। দ্যাখো, দ্যাখো, পৃথিবীটাকে এখন কেমন ছোট্ট বলের মতো দেখাচ্ছে।

—আমি তো প্রায়ই দেখি, তুমি এখন দ্যাখো।

ধীরে-ধীরে পৃথিবী ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে গেল বুবুন আর নীল পাখি। পৃথিবীকে আর দেখা যাচ্ছে না।

—আরে, এটা কী গ্রহ? বুবুন একটা গ্রহের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে জিজ্ঞেস করলো।

—এটা মঙ্গল, সূর্যের বিপরীত দিকে তোমাদের পৃথিবীর সব থেকে কাছের গ্রহ।

—বাঃ, শুক্র তো দেখছি ঠিক সেরকমই যেরকম বইয়ে পড়েছি। বুবুন আশ্চর্য হয়ে শুক্রকে দেখতে-দেখতে এগিয়ে যেতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর একে-একে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো ছাড়িয়ে আরও দূরে এগিয়ে চলল বুবুন আর নীল পাখি।

বুবুন প্রতিটি গ্রহকে খুব ভাল করে কাছ থেকে অবাক হয়ে দেখল। এতদিন শুধু বইয়ে পড়েছে আর টিভিতেও দেখেছে। প্লানেটোরিয়মেও দেখেছে একবার। কিন্তু স্বচক্ষে দেখা! এতো দারুণ অভিজ্ঞতা। ইচ্ছে করলে নেমেও যেতে পারতো গ্রহের মাটিতে।

আর কিছুক্ষণ পরে বুবুন লক্ষ করল তারা এবার সত্যিকারের একটা অদ্ভুত নীল গ্রহের মধ্যে নামছে।

—ওয়েলকাম বুবুন। ওয়েলকাম। সমস্বরে কারা যেন স্বাগত জানাচ্ছে বুবুনকে। বুবুন ভাল করে নজর দিতেই অবাক হয়ে দেখল, নীলগাছ, নীল পাখি, নীল ঝরনা, নীল নদী সবাই কথা বলছে। তাকে স্বাগত জানাচ্ছে। এ তো অবিশ্বাস্য কাণ্ড! চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল বুবুনের।

গ্রহের মাটি স্পর্শ করতেই কোথা থেকে একদল সমবয়সী ছেলেমেয়ে চলে এলো বুবুনের কাছে—

—এসো বুবুন, স্বাগতম।

বুবুনকে ছেলেমেয়েগুলো হৈ-হৈ করতে-করতে নিয়ে গেল তাদের গ্রহটা ঘুরে-ঘুরে দেখাতে।

নীল পাখি বললো, তুমি ঘুরে-টুরে এসো, আমি এখানেই আছি। খুবই ছোট্ট গ্রহ। এত ছোট্ট গ্রহ হতে পারে কল্পনাই করতে পারে না বুবুন। আয়তনে বড়জোর একটা বড় পাড়ার সাইজের। তার মধ্যে বুবুন দেখল বাড়িঘর, খেলার মাঠ, নদী-গাছপালা, একটা ছোট্ট পাহাড়, ঝরনা সবই আছে। সাজানো-গোছানো ছবির মতো। কিন্তু সবই নীল রঙের। এরকম নীল কী হয় কখনও? ছেলেমেয়েরা কী সুন্দর! সবাই একসাথে মিলেমিশে

আনন্দ করছে। একসাথে ভাগ করে খাবার খাচ্ছে, একসাথে পড়তে বসছে, একসাথে খেলাধুলো করছে। এক-একটা দল নিজেরা নিজেরাই আনন্দে, খুশিতে উচ্ছল হয়ে তাদের কাজগুলো করে চলেছে।

বিশেষ করে পড়ার হলঘরে যেখানে সকলে পড়াশুনো করছে সেখানটা দেখে অবাক হল বুবুন। কেউ-ই ওদের শাসন করছে না, কান ধরে ওঠবোস করাচ্ছে না, পড়াও ধরছে না কেউ অথচ সকলেই কী সুন্দরভাবে পড়াশুনো করছে। বুবুনের তো পড়ার চাপে মাঝে-মাঝে বিরক্তিই এসে যায় অথচ এখানে পড়ার সময় এত খুশি দেখাচ্ছে কেন ওদের?

—-তোমাদের এখানে সকলেই এতো খুশিতে থাকে কী করে? বুবুন একটি মেয়েকে জিজ্ঞেস করলো। মেয়েটি বুবুনের থেকে সামান্য বড়।

—এতে অবাক হবার কি আছে! আনন্দ ও খুশি তো ভাগ করে নিতে হয়—দুঃখ-কষ্টও তাই। সকলেই এখানে পরস্পরের সঙ্গে আনন্দ আর দুঃখ ভাগ করে নেয় ফলে সকলেই খুব খুশিতে থাকে।

বাঃ, এই কথাটা আগে ভাবেনি তো সে সেভাবে। সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ায় যে আনন্দ আছে তা চোখের সামনে দেখে অভিভূত হয়ে গেল বুবুন।

—আচ্ছা এখানে বড়দের দেখছি না তো? বাবা-মা বা টিচার কিংবা আন্টি? ওরা না থাকায় অসুবিধে হচ্ছে না?

—হ্যাঁ, ওনারা সবাই আছেন তবে সবসময় আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে থাকেন না। আমাদের কাজ আমরা নিজেরাই করি। যখন প্রয়োজন হয় তখন ওরাই আমাদের শিখিয়ে দেন, নির্দেশ দেন, আমাদের সঙ্গে খেলেন। বন্ধুর মতোই মেশেন আমাদের সঙ্গে!

—পড়া না পারলে বা দুষ্টুমি করলে বকে না?

—এ মা! পড়া করবো না কেন? পড়া কি আমরা বড়দের কথা ভেবে করি? পড়াশুনো তো আমরা আমাদের জন্যই করি। শেখার জন্য, জানার জন্য, বড় হয়ে আরও ভালো কাজ করার জন্যই তো পড়াশুনো করি। অন্যদের জন্য বেশি করে ভাবতে যেন পারি, সেবা করতে পারি এজন্যই তো পড়ি আমরা আর এসব কথা আমাদের বড়রাই শিখিয়ে দিয়েছেন।

—ওমা, তাই তো, কী সুন্দর বললে তুমি। কিন্তু দুষ্টুমি করলে বড়রা

বকে না?

—হিঃ হিঃ দুষ্টুমি করবো কেন? আমরা আমাদের কাজ তো আমরা নিজেরাই সময়মতো করি। গান গাই, খেলি, গাছেদের সঙ্গে কথা বলি, নদীর সঙ্গে কথা বলি—সকলে মিলেই আনন্দ করি।

—বাঃ, দারুণ ব্যাপার তো!

কথা বলতে-বলতে বুবুনের ইচ্ছে হল খোলা মাঠে একটু দৌড়াই।

—আমি একটু দৌডাবো এই মাঠে! বুবুন জিজ্ঞেস করলে ছেলেমেয়েগুলোকে।

—হ্যাঁ, তবে সাবধানে। পড়ে যেওনা যেন।

সকলে একসাথে বলে উঠল।

বুবুন বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল খোলা হাওয়ায়। তারপর যেই দৌড়াতে গেল হঠাৎ ধপাস করে পড়ে গেল।

কিন্তু এ কী?

সুন্দর কার্পেটের মত মাঠের ঘাসগুলো গেল কোথায়? শক্ত ঠেকছে কেন নরম মাঠটা?

চোখ-টোখ কচলে বুবুন তাকিয়ে দেখল, সে মেঝেতে পড়ে আছে। বিছানায় তার বিজ্ঞানের বই আর বারান্দায় কেউ কোথাও নেই।

এতক্ষণ তাহলে স্বপ্ন দেখছিল সে? বুবুনের মনটা খারাপ হয়ে গেল। কী সুন্দর ছিল স্বপ্নটা! বুবুন উঠে দাঁড়ালো। মা এখনো ঘুমুচ্ছে। বুবুনের নীল পাখির কথা মনে পড়ল। একাট দীর্ঘশ্বাস পড়লো বুবুনের। বিছানার দিকে ভাল করে লক্ষ করতেই বুবুন অবাক হয়ে গেল। বিছানায় তার বিজ্ঞানের বইয়ের ঠিক পাশেই পড়ে আছে একটা সুন্দর নীল রঙের পালক। কোথা থেকে এল এই পালক? আগে তো ছিল না এটা?

বুবুন পালকটা হাতে নিয়ে উদাস হয়ে গেল।

বাঁচার জন্য

দিলীপ চক্রবর্তী
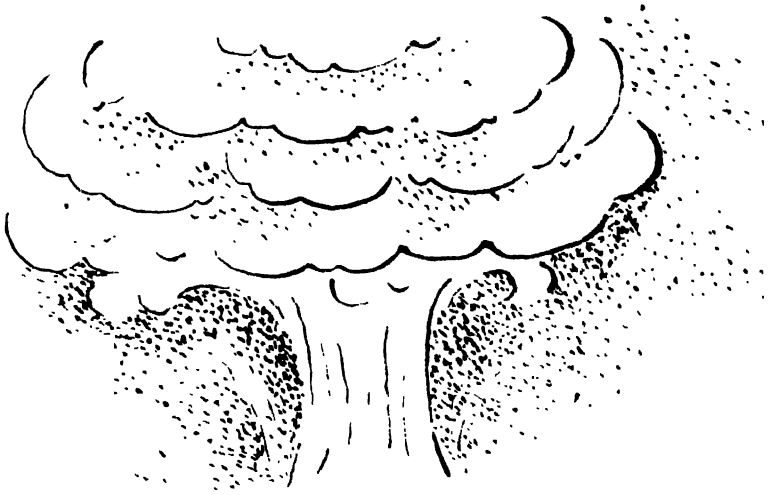
প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক ছোট-ছোট দ্বীপ-রাষ্ট্রের একটি ভরতপুর। চারিদিকে বন-জঙ্গল-পাহাড়ঘেরা এক সুজলা-সুফলা দেশ। মানুষজন দারুণ সুন্দর। যেমন ব্যবহার তেমন মিশুকে। কিন্তু সে দেশের রাজা ছিল লোভী। আর তাঁর মন্ত্রী ছিল ভীষণ রকমের দুষ্টু। সেই রাজা তাঁর রাজ্যকে আরো প্রসারিত করার জন্য অন্য দেশকে আক্রমণ করতো। তাই দেশের প্রতিরক্ষা বিভাগকে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের দিয়ে তৈরি করলো এক শক্তিশালী অস্ত্র। যা দিয়ে অন্য দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে নিজের আধিপত্য বজায় রাখা যায়। আজ সেই অস্ত্রের মহড়ার জন্য দেশের দক্ষিণপ্রান্তে মরুভূমি অঞ্চলে সমবেত হতে চলেছেন দেশের মান্যগণ্য ব্যক্তি-পণ্ডিতরা। রাজধানীতে তাই মহা-উল্লাস। রাজা নিজেকে দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মহাশক্তিশালী মনে করছে। মন্ত্রীর বুক ছত্রিশ থেকে ছাপ্পান্ন হয়েছে। আরো যে কতো ব্যাপার তা বোঝানো যাবে না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত যদুরত্ন—তিনি এ সংবাদ পেয়ে ভীষণ দুঃখ পেয়েছেন। তিনি এর প্রতিবাদ করলেন। দেশের মানুষকে বোঝালেন যে, এর ফলে প্রাণীজগৎ

নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমাদের আগামী প্রজন্ম অক্ষম হয়ে পড়বে। পণ্ডিতের এসব কর্মকাণ্ড দেখে মন্ত্রী তাকে বন্দী করার হুকুম দিলেন। সৈন্যদল পণ্ডিতকে বন্দী করতে এলে দেশের মানুষ বাধা দিলো। বন্দী করা গেল না। রাজা বুঝতে পারলো দেশের মানুষ পণ্ডিতের পক্ষে। অতএব পণ্ডিতকে নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করা ঠিক নয়।

যথা সময় সেই বিস্ফোরণ ঘটলো। নানা দেশ থেকে ভরতপুরের রাজার জন্য অভিনন্দনপত্র আসতে লাগল। কোন-কোন রাজ্যের রাজা আগে থেকে নতিস্বীকার করে নিলো। রাজার সুখ দিন-দিন বৃদ্ধি পেল— কিন্তু দেশের মানুষ আরো গরিব হতে লাগল। এভাবে চলছিল ভরতপুরের রাজার শাসন।

এ ঘটনার কিছুদিন পর জঙ্গলে মহামারী দেখা দিল। বাঘ, সিংহ, ময়ূর, হাতি, ভল্লুক এক-এক করে তাদের প্রিয়জনদের হারাতে থাকলো। পশুর রাজা সিংহ ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে উঠলো। সে বনের পশুদের নিয়ে একজায়গায় জমায়েত হল। সবার কাছ থেকে জানতে চাইলো কী কারণে এই মহামারী দেখা দিয়েছে? প্রথমে বাঘ উঠে দাঁড়িয়ে বললো ঃ

"মহারাজ আমাদের পূর্বপুরুষের পাপের ফলে আমাদের এই দুঃখ।"

ভল্লুক এ কথার প্রতিবাদ করে বলে উঠলো—না, দেশের রাজা বলেছেন দেবতারা আমাদের কাজকর্মে অসন্তুষ্ট হয়ে এসব করাচ্ছে।

শিয়ালমামা তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পণ্ডিতের ভঙ্গিমায় বলে উঠলেন— না সে কথাও ঠিক না। যদি তাই হবে তবে শুধু পশুকুলের উপর সেই অভিশাপ পড়বে কেন? দেশের মানুষেরা তার থেকে বাদ যাবে কেন? এবার পশুরাজ সিংহ উঠে দাঁড়ালো।

বন্ধু শেয়ালের কথার যুক্তি আছে। এই প্রাণীজগৎ-এর মধ্যে মানুষ হল সবচেয়ে বুদ্ধিমান। তারা সবসময় অন্যায় করে ও অন্যায়কে সহ্য করে, পাপ যদি করে থাকে তবে মানুষই প্রথম করেছে। তাদেরই আগে অভিশাপ লাগা উচিত। তবে...মহারাজের কথা শেষ হতে না হতেই হাঁপাতে-হাঁপাতে খরগোস সেখানে হাজির। —খরগোসকে এভাবে সভায় উপস্থিত হতে দেখে সবাই একটু অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলো, কি হয়েছে খরগোস ভায়া? খরগোস একটু দম নিয়ে নিল। তারপর বলতে শুরু করলো—

"মহারাজ আমি রাজধানী থেকে আসছি। সেখানে দেশের মানুষেরা বলাবলি করছে রাজা কি একটা অস্ত্র বানিয়ে পরীক্ষা করেছে। তার ফলে আমাদের স্বজনরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। আমার মনে হয় আমাদের এই অবস্থার জন্য দেশের রাজাই দায়ী। রাজার এই অন্যায় আচরণের জন্য দেশের মানুষজন ভীষণভাবে বিচলিত, তারাও রাজার বিরুদ্ধে সকলে সমবেত হচ্ছে।..."

সিংহ সমস্ত কথা শুনে এ খবরের সততা যাচাই করার জন্য কাককে পাঠালো রাজধানীতে। কাক মহারাজের আদেশে তৎক্ষণাৎ উড়ে গেল রাজধানীর উদ্দেশে।

রাজধানীতে গিয়ে কাক বসলো একটি পাঠশালার চালের উপর, সেখানে ছোট-ছোট বাচ্চারা পড়াশুনা করছে। পণ্ডিত মহাশয় তাদের বোঝাচ্ছেন যে দেশের পশুপাখিরা কেন মরে যাচ্ছে। কারণ, দেশের রাজা এমন এক অস্ত্র পরীক্ষা করেছে যার বিষক্রিয়ায় পশুদের প্রাণ চলে যাচ্ছে। বাচ্চারা পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনে খুব দুঃখ পেলো। তারা রাজার এ অন্যায় কাজের জন্য ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হলো। কাক এসব শুনে খুব দ্রুত ফিরে এলো যথাস্থানে।

কাক বলল, "মহারাজ আমি দেখে এলাম দেশের পণ্ডিত যদুরত্ন রাজার এই অপকর্মের কথা সকলকে বলছেন এবং এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য দেশের মানুষকে সমবেত করছেন।"

খরগোসের সমস্ত কথাই সত্যি সে বিষয় সন্দেহ রইল না পশুরাজের। অতঃপর পশুরাজ সিংহ সকলের উদ্দেশ্যে বললো, "ভাইসব তোমরা তৈরি হও। আগামী অমাবস্যায় আমরা রাজধানীর উদ্দেশে রওনা হবো। এই অত্যাচারী রাজাকে শিক্ষা দেবো।"

সকলেই পশুরাজের কথায় সায় দিয়ে চিৎকার করে উঠলো, "আমরা এই অত্যাচারী রাজার শাস্তি চাই!"

দেখতে-দেখতে অমাবস্যার রাত এসে গেল। বনের সমস্ত পশু রওনা হল রাজধানীর পথে।

হাজার-হাজার পশুপাখির চিৎকারে রাজধানীর মানুষের ঘুম ভেঙে গেল, তারা দেখতে পেল বনের পশু-পাখিরা রাজপ্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে।

পশুপাখিদের চিৎকারে রাজারও ঘুম ভেঙে গেল। রাজা চিৎকার করে মন্ত্রীকে হুকুম দিলেন সৈন্যদের দিয়ে পশুদের আটকাবার। কিন্তু রাজার উপর সৈন্যরা কেউই তুষ্ট ছিল না। তারা রাজা ও মন্ত্রীর কথায় কর্ণপাত করলো না।

পশুরা রাজবাড়ির ফটক ভেঙে প্রাসাদে প্রবেশ করলো। রাজা তখন ক্রোধে ফেটে পড়ছে। পশুরাজ সিংহ তাকে জিজ্ঞাসা করলো "আমরা কী অপরাধ করেছি যে আপনি আমাদের বাঁচার অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন।" উত্তরে রাজা বললো, "আমি যা করেছি তা দেশের জন্য, তাই যা করেছি ঠিক করেছি।"

রাজার মুখে এ কথা শুনে পশুরা ঝাঁপিয়ে পড়লো রাজার উপর। রাজা ও মন্ত্রীকে মেরে ফেললো।

এরপর রাজ-সিংহাসনে বসালো সেই পণ্ডিতকে যিনি প্রথম রাজার কীর্তি দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরেছিলেন।

যদুরত্ন রাজা হতে দেশে সুখশান্তি আবার ফিরে এলো।

পশুরাও বনে মহা আনন্দে বাস করতে লাগল। ভরতপুর রাজ্যে ফিরে এলো আনন্দের ঝর্নাধারা।
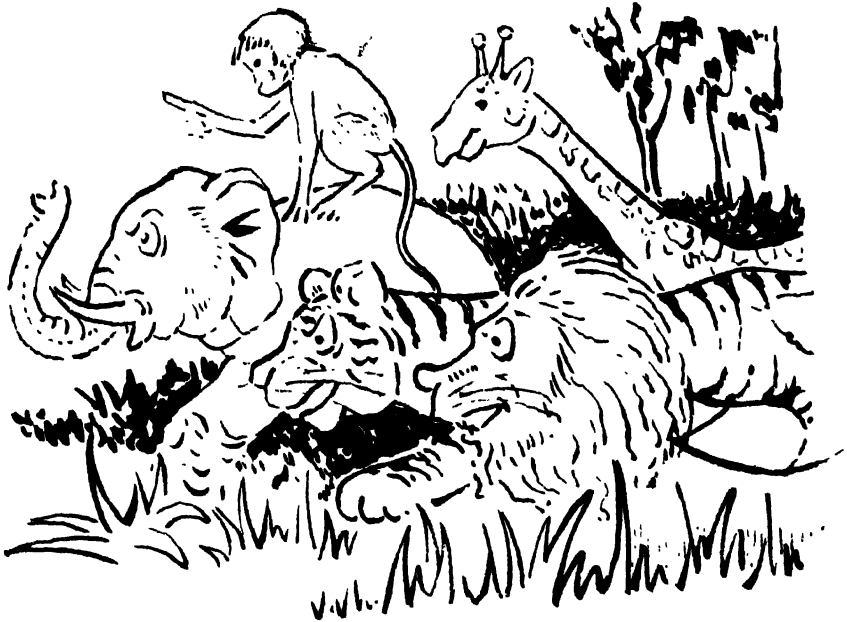
মণিমুকুট

হান্নান আহসান

মামণি, রোজ রোজ রাক্ষস-খোক্ষস দত্যি-দানো কত আর ভাল লাগে। ওসব থাক। আজ তোমায় শোনাচ্ছি এক রাজার গল্প। যে সে রাজা নয়, দারুণ ভাল রাজা। জবর কড়া রাজা। একেবারে মজার রাজা।

সেই রাজার এক নাক ছিল
নাকের উপর তিল ছিল
তিলে একটা গাছ ছিল
গাছে ফলতো ফুল।
ড্যাডাং ড্যাডাং ড্যাং
রাজার ভাঙা ঠ্যাং
রাজা বসেন পা দুলিয়ে
মাথায় মুকুট বুক ফুলিয়ে
দোদুল দোদুল দুল।

পূর্ব দেশের এই রাজাকে সব্বাই ভয় করতো। অন্যায় আচরণ করার সাহস পেত না কোন প্রজা। ছেলে-বাচ্চারা পর্যন্ত ভয়ে তটস্থ থাকতো। এই বুঝি ভয়ংকর রাজা এসে পড়ে! এই বুঝি ধরে নিয়ে যায় রাজপেয়াদা।

দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী এই রাজাকে ভয় করতো না কেবল বিদ্রোহী বরখাস্ত মন্ত্রীপুত্র সামুই। সামুই গলা উঁচিয়ে বলে বেড়াতো—

ভয় করিনা এই রাজাকে
ভয় করিনা তার সাজাকে
যে যেখানে তোমরা আছো
মেলাও হাতে হাত
সুযোগ পেলেই ঘাড় মটকে
করবো কুপোকাৎ।

বাব্বা, কী সাংঘাতিক তেজ এই মন্ত্রীপুত্রের। রাজার বিরুদ্ধে কথা বলা, যে সে কাজ নয়। মৃত্যুর কাছাকাছি এগিয়ে যাওয়া আর কি।

তবু চুপচাপ রাজা। কেন চুপচাপ কেউ জানে না। তবে কি মন্ত্রীপুত্রকে ভয় করেন রাজা! তা হয়তো হবে।

রাজ্যে চলছে দুর্দিন। রাজা একদিন বিশাল এক সমাবেশে প্রজা-সাধারণকে জানালেন—বন্ধুগণ, আমার রাজ্যে, কেউ অনাহারে অনিদ্রায় থাকবে না। সবারই মুখে আমি দেখতে চাই হাসি। কারো কোন অভিযোগ থাকলে জানান আমাকে। নিশ্চয়ই আমি তাদের অভাব মেটাবো।

মন্ত্রীপুত্র চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। হঠাৎই চিৎকার করে বলে ওঠে—

মোত বোলো তুম ঝুট
আরামপ্রিয় অত্যাচারী
এক্কেবারে বদের হাঁড়ি
করবো তোমায় শ্যুট।
অনাহারে ধুঁকছে মানুষ
তোমরা ওড়াও রঙিন ফানুস
চিনতে মোদের নেইকো বাকি
আর কটা দিন সমঝে থাকি
জাদুর খেলা জাদুর খেলা ফুস।

রাজা মহারাজাজীর চোখ গণগণে আগুনের মতো লাল হয়ে ওঠে। দাঁত কড়মড়িয়ে ওঠেন, সহ্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে, শয়তানকে আর একবার বাগে পেলেই হয়। দেখাবো কত ধানে কত চাল। পর মুহূর্তেই তিনি ভাবেন, না এভাবে তার ভাবা উচিত নয় হয়তো। তিনি যে রাজা। সব অভিযোগ, অনুযোগ শুনতে হবে তাকে।

সভা শেষ করে রাজা তাঁর সভাসদ পারিষদদের নিয়ে জরুরী বৈঠকে বসলেন। আলোচনার বিষয়, প্রজা বিদ্রোহের ব্যাপারে তারা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিশেষ করে মন্ত্রীপুত্রের বিবৃতি মাথা ব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। ক্রমশঃ প্রজাদের মধ্যে তার প্রভাব বাড়ছে।

রাজা কথা বলতে গিয়েই রেগে উঠলেন। শূন্যে মুষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—

আর দেরি নয় আর দেরি নয়
ধরতে হবে তাকে
তার কথাতে জ্বলছে মানুষ
জ্বলছে লাখে লাখে।

একটু থেমে রাজা আবার বললেন—

নেতাগিরি চলবে না আর
নেতার দফা শেষ
এই শূলেতে তুলবো তাকে
আহা আহা বেশ।

পারিষদবর্গ আঁৎকে ওঠে। সে কি, সামুইকে রাজামশাই শূলে চড়াবেন। না না, এ রাজার অন্যায় আব্দার।

তারা জানে, সামুই অন্যায় কিছু করছে না। আরাম প্রিয়তার জন্য রাজা অনেক দিকেই খেয়াল রাখতে পারেন না। তাছাড়া সন্ধ্যার পর তিনি আর অন্দরমহল ছেড়ে বাইরে বেরুন না।

আরো একটা ব্যাপার ভাববার আছে। জরিপমন্ত্রী বললেন, আমাদের এই রাজা ছাড়া অন্য রাজা ভাবা যায় না। রাজকার্য চালানোর মত কেউ অন্ততঃ এ রাজ্যে নেই।

জরিপমন্ত্রীর তোষামোদে কথা শুনে রাজা অত্যন্ত খুশি হলেন।

প্রধানমন্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ ডেকে জানালেন—

এক্ষুনি চাই তাকে
করছি হুকুম জারি
জানুক সবাই জানুক
রাজা কঠিন ভারি।

রাজা ক্ষেপেছেন। বিদ্রোহী নেতাকে দমন করতে তিনি এতটুকু দ্বিধা করবেন না। রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে তিনি বদ্ধপরিকর।

ওদিকে প্রজারা ভয়ে তটস্থ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সামুই লড়ছে। রাজার কাজে ত্রুটি ধরলেই যত গণ্ডগোল। চারদিকে দারিদ্র্যে ধুঁকছে মানুষ, জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া, কাজ নেই—মানুষ বাঁচবে কি করে? রাজারও তো এসব ভাবনা-চিন্তা করা উচিত। রাজার মাথায় এসব নেই। পরিবর্তে তার বিরুদ্ধে কথা বললে হয়ে যায় রাজদ্রোহ। রাজা ধরে তাকে শূলে চড়ান। না, এসব চলতে পারে না। প্রজারা মুখে না প্রকাশ করলেও মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এ রাজাকে সরাতেই হবে।

এ রাজা তো আরাম প্রিয়
গদির মোহে বুঁদ
খাচ্ছে কাবাব বিরিয়ানি
গোপন খবর আমরা জানি
দেশে নেইকো খুঁদ।

হঠাৎ রাজপ্রহরী এসে রাজাকে সেলাম ঠুঁকে জানাল, রাজামশাই, ভীষণ বিপদ আসছে দেশে। দ্বিপদ-রাজা ঢুকে পড়েছে আমাদের রাজ্যে। শুনছি ক্রমে ক্রমে রাজধানীর দিকে তারা এগিয়ে আসছে। রাজামশাই এখনি ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে আমাদের।

প্রমাদ গুণলেন রাজা। রাজপ্রহরীকে বললেন, দেখ দেখি কদিন শরীরটা ভাল যাচ্ছে না—আর আক্রমণ করার সময় পেল না ওরা। তা রাজপেয়েদাকে বলো, আমার মণিমুকুট আর স্বর্ণকম্বলটা এক্ষুনি দিতে।

মণিমুকুট ওখানেই থাক। এক পাও নড়বার চেষ্টা করবেন না। সামনে খোলা তলোয়ার উঁচিয়ে দ্বিপদ রাজার প্রধান সেনাপতি বলল—

চিন্তা কিসের রাজামশাই
চিন্তা কিছু নেই
আমরা এখন দেশ চালাবো
থাকি যেখানেই।

দ্বিপদ রাজার প্রধান সেনাপতির আদেশে রাজাকে বন্দী করতে গেল অন্য এক সেনাপতি। এমন সময় সামুই বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজদরবারে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

বেধে গেল তুমুল যুদ্ধ। মন্ত্রীপুত্র একাই দ্বিপদরাজার অনেক সৈন্যকে মেরে ফেললো। ধরা পড়লো প্রধান সেনাপতি। তাকে শূলে চড়ানোর নির্দেশ দিল সামুই।

মূর্চ্ছা যাওয়া রাজামশাইয়ের জ্ঞান ফিরে এলো। তার চোখ-মুখ খুশিতে ভরে উঠলো। সামুইকে তিনি ডেকে পাশে বসালেন। বললেন—

এখন থেকে সামুই নেতা
সামুই দেশের রাজা
ওরে তোরা কোথায় আছিস
বাজা মাদল বাজা।
মণিমুকুট তোমায় দিলাম
তুমিই দেশের মান
তোমার জন্য এই প্রজারা
তুচ্ছ করে প্রাণ।
দুঃখ মোছাও কষ্ট মোছাও
থাকবো সবাই সুখে
রইবে না আর অভাব কারো
রইবে না কেউ দুখে।
সামুই এখন দেশের রাজা
ওরে তোরা মাদল বাজা।

রূপসাগরের গল্প

সমর পাল

টুবুল তার বন্ধুদের সঙ্গে রোজ খেলা করে ওদের বাড়ির সামনে খেলার মাঠে। শুধু খেলার মাঠ বললে ভুল হবে। চারিদিকে বনবিতানে ঘেরা। নানারকমের গাছে-গাছে ভরা সবুজায়নের ছোঁয়ায় ঘেরা সেই খেলার মাঠ। বিভিন্ন ধরনের সুন্দর-সুন্দর পাখিরাও আসে এই বনবিতানের মাঝে।

বিকেল হলেই সব ছোটদের হাট বসে যায় এই মাঠে। এমন সুন্দর জায়গায় কার না মন চায় যেতে! সবাই যখন খেলায় মেতে থাকে টুবুল তখন একা-একা তাকিয়ে থাকে দেবদারু গাছটির দিকে। দেবদারু গাছটির দিকে তাকিয়ে থাকলে টুবুল দেখতে পায় একটি নাম না জানা নতুন ধরনের পাখি। টুবুলকে শিস দিয়ে ডাকে। টুবুল বেশ শুনতে পায় পাখিটি টুবুলকে ওর নাম ধরে ডাকে। রোজই পাখির ডাক শুনতে-শুনতে একদিন টুবুল ওই গাছটার কাছে গিয়ে পাখির দিকে তাকিয়ে বলে, আমায় তুমি রোজ ডাকো কেন?

টুবুলের কথা শুনে পাখিটি বলে, তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। তুমি আমার সঙ্গে যাবে রূপসাগরের তীরে? রূপসাগরের তীরে অনেক সুন্দর-সুন্দর জিনিস আছে। একবার গেলে তোমার খুব ভালো লাগবে।

পাখির কথা শুনে টুবুল বলল, আচ্ছা তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমি মাকে বলে আসছি। পাখিটি সঙ্গে-সঙ্গে বলে ওঠে, না না তোমার মাকে বলতে হবে না। আমি সন্ধ্যের আগেই তোমাকে আবার এখানে পৌঁছে দেবো। তোমার কোন চিন্তা নেই।

টুবুল বললো, ঠিক বলছো? পাখিও মহা আনন্দে জানালো, সত্যি বলছি। আমি গাছ থেকে উড়ে যেই নিচে নামবো তুমি সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে ছোঁবে আর আমিও তোমাকে ঠিক নিয়ে যাবো।

টুবুলের সম্মতি পেয়ে পাখি ওর কাছে উড়ে আসতেই টুবুল তাকে যেই ছোঁয় আর অমনি টুবুলও পাখির সঙ্গে উড়তে -উড়তে সোজা চলে যায় রূপসাগরের তীরে। রূপসাগরের তীরে পৌঁছতেই একদল পরী এসে টুবুলকে ঘিরে ধরলো। টুবুলকে পেয়ে পরীরা ওকে নিয়ে গেল নীল সাগরের নিচে এক আশ্চর্য দেশে। দেশ তো নয় যেন এক বিশাল রাজপ্রাসাদ। সেখানে পরীরা টুবুলকে ঘিরে নাচতে-নাচতে বরণ করে নিয়ে যায় রাজার কাছে।

রাজা টুবুলকে দেখেই বলে, এসো এসো টুবুল। আমি তোমার কথা অনেক শুনেছি আমাদের পরী রানীর কাছে ওরফে পাখির কাছে। তোমার গল্প শুনে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি। তাই আমি পরী রানীকে বলেছিলাম তোমাকে আমাদের দেশে নিয়ে আসতে। তুমি আমাদের এখানে খেলা করো তোমার কোন অসুবিধে হবে না।

রাজার কথা শুনে টুবুল বললো, তোমাদের এখানে খেলতে থাকলে সন্ধ্যে হয়ে যাবে যে! আমি কেমন করে বাড়ি যাবো? রাজা বললো, সে তোমায় চিন্তা করতে হবে না। তুমি ঠিক সময়েই বাড়ি ফিরে যাবে।

এমন সময় রাজপ্রাসাদের হাতি এসে শুঁড় তুলে সেলাম করে বলল, এসো আমার কাছে। আমার পিঠে চড়ে তুমি ঘুরবে। তোমাকে রাজপ্রাসাদের সব দর্শনীয় জায়গা দেখাবো।

হাতির কথা শুনে টুবুল রাজি হয়ে হাতির পিঠে চড়ে বসে। তারপর হাতি টুবুলকে বিভিন্ন জায়গা ঘুরিয়ে দেখাতে-দেখাতে নিয়ে যায় রাজপ্রাসাদের বিশাল জলাশয়ের কাছে। জলাশয়ের চারদিকে সুন্দর-সুন্দর ফুলগাছে সাজানো। জলাশয়ের মাঝখানে এক ফোয়ারা। যার থেকে সব সময়ে জল নির্গত হচ্ছে। ফোয়ারার ঠিক মাঝখান থেকে লাল টুকটুকে রঙের আভা জ্বলজ্বল করছে। সেই আভা দেখে টুবুল তার সঙ্গী পরীদের

কাছে জানতে চায় সেখানে কেন লাল রঙের আভা বের হচ্ছে?

টুবুলের কথা শুনে পরীরা বলল—ফোয়ারার ভিতরে একটা ড্রাগন আছে। ওর চোখ থেকেই ওই আগুন ঝরছে। তাই সেখানে সব সময়ে লাল আভা বের হয়। টুবুল জানতে চায় ওখানে ড্রাগন থাকে কেন?

পরীরা বলল, সেই ফোয়ারার ভিতর দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ আছে। সেখানেই রয়েছে রাজ্যের গুপ্তধন। হীরে-মানিক-ধন-দৌলত। ড্রাগনই পাহারা দেয়। রাজ্যের রাজা অনেক চেষ্টা করেও সেখানে যেতে পারেন না। ড্রাগনের শক্তির কাছে সবাই পরাজিত। রাজামশাই অনেকদিন ধরেই খোঁজ করছেন এমন একজন ব্যক্তির যিনি ড্রাগনকে হত্যা করে রাজ্যের ধন-দৌলত রাজার হাতে তুলে দিতে পারেন।

পরীদের কথা শুনতে-শুনতে বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এল। পরী রানী বলল টুবুল, আজ আর নয়। এসো এখন তোমাকে তোমাদের বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি। নইলে তোমার মা চিন্তা করবে। আর একদিন তোমাকে আবার নিয়ে আসবো। আসবে তো?

টুবুল বলে, নিশ্চয় আসবো। আজ তবে চলো। পরীর রানী তখন পাখি হয়ে টুবুলকে পৌঁছিয়ে দিলো টুবুলদের বাড়িতে। টুবুল বাড়িতে এসে পরীদের কথা ও রূপসাগরের কথা ভাবতে লাগলো।

রূপসাগরের কথা বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে রোজের মতো পড়াশুনো করে খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে টুবুল স্বপ্নে দেখতে পায় ড্রাগনকে কীভাবে মারলে মেরে ফেলা সম্ভব হবে। টুবুল মনে-মনে খুব আনন্দ পায়। ওর স্বপ্ন যদি সত্যি হয় তবে খুব মজা হবে। রূপসাগরের পরীরা, রাজা, মন্ত্রী সবাই টুবুলকে খুব খাতির করবে ড্রাগনের মৃত্যু হলে। টুবুল ভাবে, ঠিক আছে ও যদি আবার কখনো রূপসাগরের তীরে যায় তবে ও নিশ্চয় চেষ্টা করবে ড্রাগনকে মারার।

বেশ কয়েকদিন কেটে যাবার পর ওই পাখি আবার টুবুলের খেলার মাঠে এসে দেখা করে টুবুলকে বলে তাদের রাজ্যে যাবার জন্য। টুবুল এক কথায় রাজি হয়ে যায়। আর পাখিও টুবুলকে নিয়ে সোজা পাড়ি দেয় রূপসাগরের তীরে।

রূপসাগরে পৌঁছেই টুবুল সোজা রাজার সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাব দেয় সে ড্রাগনকে হত্যা করতে আগ্রহী। টুবুলের কথা শুনে রাজা ভীষণ অবাক

হয়ে বলেন, না না তুমি ছোট ছেলে তুমি কী করে পারবে? তারপরে তোমার কোন ক্ষতি হয়ে গেলে আমি কী জবাব দেবো।

টুবুলের ভীষণ আবদারে রাজামশাই অবশেষে রাজি হলেন। তবে শর্ত একটাই। টুবুলের সঙ্গে থাকবে রাজপ্রাসাদের সেপাইরা। টুবুল তাতেই রাজি। সেপাইদের সঙ্গে নিয়ে টুবুল চলল ড্রাগনকে হত্যা করতে। সঙ্গে নিল একটা তীর-ধনুক। ফোয়ারার মুখের কাছে গিয়ে টুবুল ধনুক তুলে বলল, ড্রাগন তোর যদি মরার ভয় না থাকে তবে তুই আমার কাছে আয়। নতুবা আমিই তোর কাছে যাবো। ড্রাগন হুঙ্কার দিয়ে বলল, ওরে পুঁচকে, তুইতো হাতির কাছে একটা পিঁপড়ের সমান। তুই আমাকে মারবি না তুই আমার কাছে মরবি?

টুবুল বলে, ঠিক আছে দেখাই যাক তোর কেমন শক্তি। একথা বলেই টুবুল ধনুক নিয়ে ফোয়রার ভিতরে প্রবেশ করে বলে ড্রাগন, এখনো তোর সময় আছে, তুই ফোয়ারার বাইরে পালাবি না মরবি? ড্রাগন ওর চোখ থেকে আগুন বের করে বলে, তোর এতো বড় সাহস? ড্রাগনের হুঙ্কার ছাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই টুবুল ড্রাগনের ডান পায়ের বুড়ো আঙুল লক্ষ করে তীর ছোঁড়ে। তীর লেগেই ড্রাগনের পায়ের বুড়ো আঙুলটা কেটে যায় আর অমনি ড্রাগন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কেননা ওই বুড়ো আঙুলেই ছিল ড্রাগনের প্রাণশক্তির সঞ্চার।

টুবুল স্বপ্নে দেখেছিল ড্রাগনের সব শক্তি ওই বুড়ো আঙুলেই সঞ্চিত আছে। ওই আঙুলটা কেটে ফেলতে পারলেই ওর প্রাণ শেষ। মৃত্যু অনিবার্য। হ্যাঁ, টুবুলের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। ড্রাগনের মৃত্যু হয়েছে।

ড্রাগনের মৃত্যুর সংবাদে রূপসাগরের রাজা মহা আনন্দে টুবুলকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, বল, বল টুবুল তোমার কী চাই? তোমার কী চাই? তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি?

টুবুল বলল, মহারাজ আমার কিছুই চাই না। আমি শুধু চাই রূপসাগরের সব রূপকথার গল্প শুনতে। পরীদের গল্প শুনতে। আপনি সব পরীদের বলুন ওরা যেন আমাকে ওদের বন্ধু করে নেয়।

মহারাজ বলল, সে আর এমন কী কথা! আজ থেকে সব পরীরাই তোমার বন্ধু। তুমি ওদের সঙ্গে খেলা করবে। আর যে কোন প্রয়োজনে আমাকে ডাকবে। সেই থেকে টুবুল রূপসাগরের সবার কাছেই প্রিয় হয়ে উঠল।

রাজামশাইয়ের গল্প

নিরুপম ঘোষাল

আমি বললাম, রাজামশাইয়ের গল্প শুনবে?

সোনা, কৌস্তভ খুশিতে হাততালি দিয়ে বলল, হ্যাঁ—। সোনা আমার ভাইপো। আর কৌস্তভ আমার ভাগ্নে।

আমি বললাম, তবে শোন—

এক রাজামশাই ছিলেন। রাজামশাইয়ের এক রানী ছিলেন। আর রাজামশাইয়ের এক রাজপুত্র ছিল।

রাজামশাইয়ের আর কি কি ছিল?

বিরাট রাজ্য ছিল। সুন্দর রাজপ্রাসাদ ছিল। মহামন্ত্রি, মন্ত্রি-পরিষদ, পাহারাদার, আর দাস-দাসী ছিল।

রাজামশাইয়ের আর কি কি ছিল?

দক্ষ সৈন্যদল ছিল। ঘোড়াশালায় তাগড়াই ঘোড়া ছিল। হাতিশালায় বলবান হাতি ছিল।

রাজামশাইয়ের আর কি কি ছিল?

রাজামশাইয়ের মনে সুখ ছিল। প্রজাদের মনে সুখ ছিল। গোটা রাজ্যে

সুখ ছিল।

যাইহোক, রাজামশাই সুখে হাবুডুবু খেতে খেতে একদিন ভাবলেন, আমি রাজামশাই। আহা, আমার কত সুখ!

পরক্ষণে রাজামশাই ভাবলেন, আমি নিশ্চয়ই গত জন্মে ভাল কাজ করেছিলাম। তাই ভগবান এ জন্মে রাজামশাই করে পাঠিয়েছেন। এত সুখ দিলেন।

পরক্ষণে রাজামশাই ভাবলেন, গত জন্মে আমি কি ভাল কাজ করেছিলাম যে, ভগবান আমাকে এ জন্মে রাজামশাই করে পাঠালেন? এত সুখ দিলেন?

রাজামশাইয়ের খুব জানতে ইচ্ছে করল।

রাজামশাই মহামন্ত্রিকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা মহামন্ত্রি, তুমি বলতে পার, গত জন্মে আমি কি ভাল কাজ করেছিলাম?

মহামন্ত্রি বললেন, মাফ করবেন মহারাজ। আমি রাজকার্যের হিসেব ছাড়া আর কিছু জানি না। আমার মনে হয়, রাজপুরোহিত বলতে পারবেন।

রাজামশাই রাজপুরোহিতকে জিজ্ঞেস করলেন, রাজপুরোহিত, তুমি কি বলতে পার, গত জন্মে আমি কি ভাল কাজ করেছিলাম?

রাজপুরোহিত বললেন, মাফ করবেন মহারাজ। গণনা করা আমার কাজ নয়। এ কাজ রাজজ্যোতিষীর।

রাজামশাই রাজজ্যোতিষীকে জিজ্ঞেস করলেন, রাজজ্যোতিষী, তুমি নিশ্চয়ই বলতে পারবে, গত জন্মে আমি কি ভাল কাজ করেছিলাম?

রাজজ্যোতিষী বললেন, মাফ করবেন মহারাজ। আমি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলতে পারি। অতীত সম্পর্কে বলতে পারব না।

এবারে রাজামশাই রেগে গেলেন।

মহামন্ত্রিকে হুকুম করলেন, মহামন্ত্রি, সারা রাজ্যে ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করে দাও, যে আমার গত জন্মে কি ভাল কাজ করেছিলাম বলতে পারবে, তাকে আমি এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেব।

রাজামশাইয়ের হুকুমে মহামন্ত্রি ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করে দিলেন, যে রাজামশাইয়ের গত জন্মে কি ভাল কাজ করেছিলেন, বলে দিতে পারবে, রাজামশাই তাকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেবেন—

সেই রাজ্যে এক গরীব ব্রাহ্মণ বাস করত। খবরটা পেয়ে ব্রাহ্মণ ভাবল,

হায় ভগবান, আমি যদি রাজামশাইয়ের গত জন্মের কি ভাল কাজ করেছিলেন বলতে পারতাম। তাহলে রাজামশাই আমাকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিতেন। তাহলে আমি আর গরীব থাকতাম না।

ব্রাহ্মণ তখন ঠিক করল, বনে যাবে। বনে গিয়ে ভগবানকে ডাকবে। ভগবানকে বলব, ভগবান, আমাকে তুমি বলে দাও, গত জন্মে রাজামশাই কি ভাল কাজ করেছিলেন? ভগবান নিশ্চয়ই তাকে বলে দেবেন।

ব্রাহ্মণ কথাটা ব্রাহ্মণীকে বলল।

ব্রাহ্মণী কথাটা শুনে, ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল। আর বলতে লাগল, তুমি চলে গেলে, আমি একা কার সঙ্গে থাকব?

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর কথা শুনল না। বনে চলে গেল। বনে একটা বটগাছ ছিল। তার নিচে বসে, ভগবানকে ডাকতে লাগল।

দশদিন কেটে গেল।

ব্রাহ্মণের খিদে পেল। বৃষ্টিতে ভিজল। বাঘ সিংহের গর্জন শুনল। তবু ব্রাহ্মণ ভগবানকে ডাকতে লাগল।

বারোদিন পর, ভগবান ব্রাহ্মণকে সাড়া দিলেন।

ব্রাহ্মণ কেঁদে কেঁদে বলল, ভগবান, তুমি তো জান, আমি গরীব মানুষ। আমি, ব্রাহ্মণী কষ্ট করে বেঁচে আছি। তুমি যদি বলে দাও, রাজামশাই গত জন্মে কি ভাল কাজ করেছিলেন। তাহলে আমি এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা উপহার পাই। আমার দুঃখ ঘুচে যায়।

ভগবান বললেন, শোন, রাজপ্রাসাদের তিনক্রোশ দূরে, এক খোঁড়া গোয়ালা বাস করে। তার একটা অন্ধ গরু আছে। রাজামশাইকে বলবি গরুটাকে জিজ্ঞেস করতে। গরুটা সব জানে। বলে দেবে।

বলে, ভগবান উধাও হয়ে গেলেন।

ব্রাহ্মণ রাজামশাইর সঙ্গে দেখা করে বলল, মহারাজ, আমি আপনার গত জন্মে কি ভাল কাজ করেছিলেন, বলে দিতে পারি। তবে একটা শর্ত।

রাজামশাই বললেন, বল, কি শর্ত?

ব্রাহ্মণ বলল, আমি আপনাকে যা যা করতে বলব, করতে হবে।

রাজামশাই বললেন, বল, কি করতে হবে?

ব্রাহ্মণ তখন খোঁড়া গোয়ালার অন্ধ গরুর কথা বলল।

রাজামশাই তখন খোঁড়া গোয়ালার অন্ধ গরুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, গরু, তুমি নাকি আমার গত জন্মে কি ভাল কাজ করেছিলাম, জান?

গরু দুঃখ করে বলল, মহারাজ, এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে আমি বহু বছর অপেক্ষা করে আছি। হ্যাঁ আমি জানি, আপনি গত জন্মে কি ভাল কাজ করেছিলেন। তবে আমার থেকে ভাল জানে, এক পেত্নি। রাজ্যের পূবদিকে একটা তালগাছ আছে। সেই তালগাছে পেত্নি বাস করে। পেত্নি সব জানে। বলে দেবে। তবে গভীর রাতে যাবেন।

রাজামশাই গভীর রাতে পেত্নির কাছে গেলেন। পেত্নিকে জিজ্ঞেস করলেন, পেত্নি, তুমি নাকি আমার গত জন্মে কি ভাল কাজ করেছিলাম, জান?

পেত্নি হিঃ হিঃ করে হেসে উঠল। আর হাসতে হাসতে বলল, কে বলেছে? অন্ধ গরু বুঝি?

রাজামশাই ভয় পেয়ে গেলেন। গভীর রাতে। পেত্নি বলে কথা! তবু মনে সাহস এনে বললেন, হ্যাঁ। অন্ধ গরু তোমার কাছে আমাকে পাঠিয়েছে।

পেত্নি এবারে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, হ্যাঁ, মহারাজ। আমি আপনার গত জন্মে কি ভাল কাজ করেছিলেন জানি। এই কথা বলার জন্যে বহু বছর অপেক্ষা করে আছি। তবে আমার থেকে ভাল জানে, মহামন্ত্রির মেয়ে। মহামন্ত্রির মেয়ে সব জানে। বলে দেবে।

রাজামশাই রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে, মহামন্ত্রিকে ডেকে বললেন, মহামন্ত্রি, তোমার একটি মেয়ে আছে, তাই না?

মহামন্ত্রি খুশি খুশি মুখে বললেন, হ্যাঁ মহারাজ।

রাজামশাই বললেন, তাকে এক্ষুণি নিয়ে এস। সে নাকি আমার গত জন্মে কি ভাল কাজ করেছিলাম জানে।

মহামন্ত্রি আনন্দে আটখানা হয়ে মেয়েকে ডেকে নিয়ে এলেন।

রাজামশাই মহামন্ত্রি মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, মা, তুমি নাকি আমার গত জন্মে কি ভাল কাজ করেছিলাম জান?

মহামন্ত্রির মেয়ে তখন সব খুলে বলল—

অনেক দিন আগের কথা।

এ রাজ্যে এক ব্রাহ্মণ বাস করত। ব্রাহ্মণের বউ ছিল। এক ছেলে ছিল।

ছেলের বউ ছিল।

ব্রাহ্মণ ছিল ভীষণ গরীব। তাই ভিক্ষে করত।

একবার রাজ্য জুড়ে বৃষ্টি শুরু হল। বৃষ্টি আর থামে না। ব্রাহ্মণও ভিক্ষে করতে বেরতে পারে না। ফলে, কিছুদিন ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণের পরিবার অনাহারে কাটাল।

পনেরো দিন পর বৃষ্টি থামল। ব্রাহ্মণ তখন ভিক্ষে করতে বেরল।

সন্ধ্যের সময় ব্রাহ্মণ ভিক্ষে করে বাড়ি ফিরে এল। কিন্তু সেদিন সে ভিক্ষে কম পেল।

যাইহোক, ব্রাহ্মণী তা রান্না করে সবাইকে খেতে দিল। নিজেও খেতে বসল।

ব্রাহ্মণ মুখে ভাত তুলবে, এমন সময় বাড়িতে এক ভিক্ষুক এসে হাজির। ভিক্ষুক কাতর স্বরে বলতে লাগল, আমার ভীষণ খিদে লেখেছে। আমায় কিছু খেতে দেবে?

ব্রাহ্মণ পরিবার গরীব ভিক্ষুক হলেও, মনটা ছিল ভীষণ ভাল।

ব্রাহ্মণ, পরিবারের সকলকে বলল, তোমরা খাও। আমার খাবারটা ভিক্ষুককে দিয়ে আসি।

ব্রাহ্মণের পরিবারের লোকেরা বলল, তোমার থালায় যা খাবার ভিক্ষুককে খিদে মিটবে না। আমাদের সকলের খাবারগুলো ভিক্ষুককে চল দিয়ে আসি।

ব্রাহ্মণ পরিবার শেষে তাই করল।

ভিক্ষুক খাবার পেয়ে খিদের জ্বালায় গব গব করে খেয়ে ফেলল। তারপর খুশি হয়ে বলল, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবে।

গত জন্মের ভাল কাজের কথা শুনে রাজামশাই বললেন, মা, তাহলে আমার স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, ওরা কি এ জন্মেও আমার—

মহামন্ত্রির মেয়ে বলল, হ্যাঁ মহারাজ। আপনার এ জন্মের স্ত্রী, রাজপুত্র, আপনার গত জন্মের ব্রাহ্মণী ও ছেলে।

রাজামশাই বললেন, তাহলে পুত্রবধূ?

মহামন্ত্রির মেয়ে মৃদু হেসে বলল, মহারাজ, সে হল আমি।

রাজমশাই অবাক বললেন, তাহলে তুমি কেন মহামন্ত্রির ঘরে?

মহামন্ত্রির মেয়ে বলল, মহারাজ তা আমি জানি না। সে কথা ভগবান জানেন।